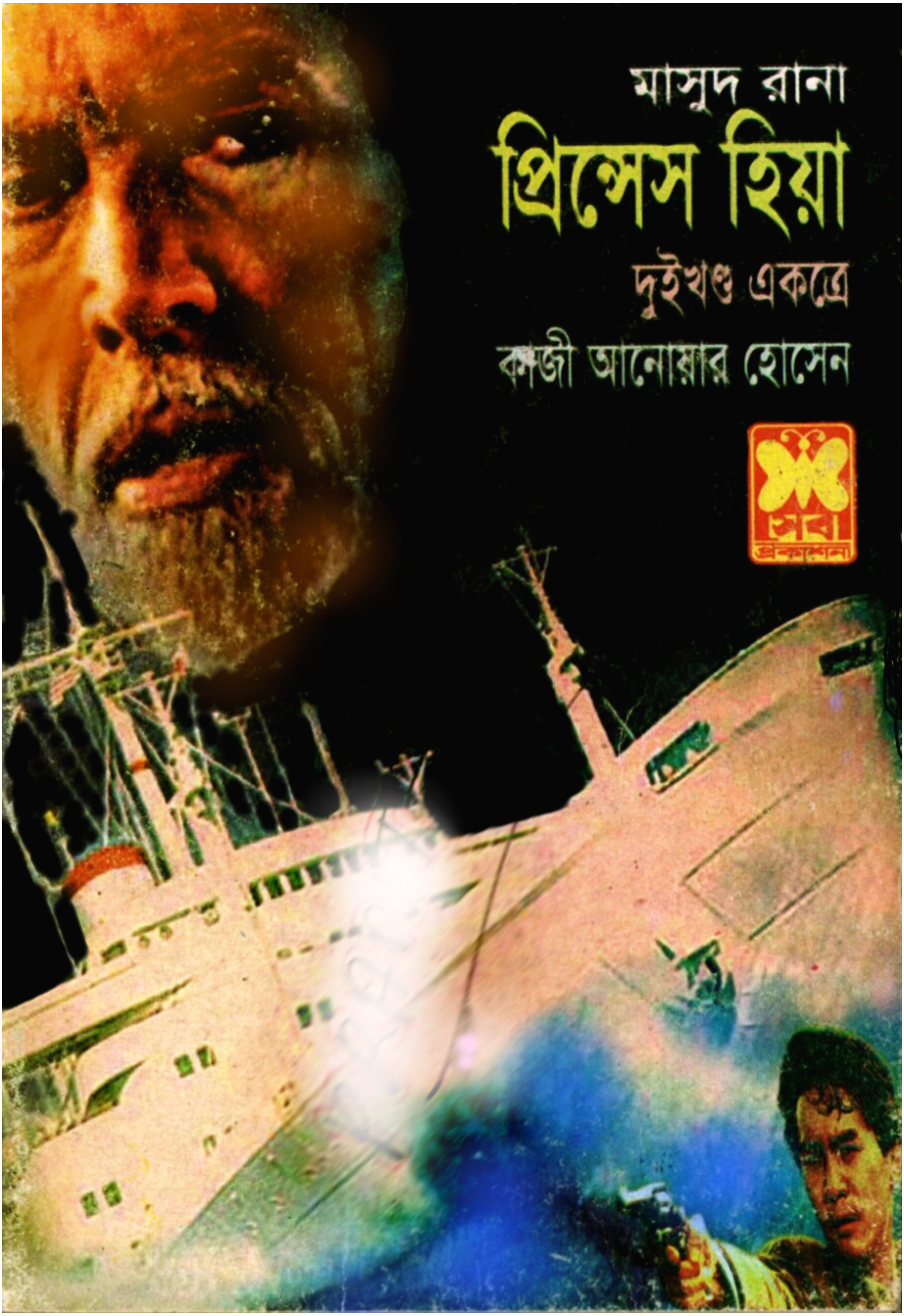

মাসুদ রানা
প্রিন্সেস হিয়া
দুইখণ্ড একত্রে
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা
প্রকাশনী

মাসুদ রানা

দুইখণ্ড একত্রে

কাজী আনোয়ার হোসেন

প্রিন্সেস হিয়া

সাগরের তলায় নরম পলি, বেশিরভাগ কঙ্কাল সেই পলির নীচ থেকে আংশিক বেরিয়ে আছে, সংখ্যায় বিশ-পঁচিশটার কম নয়। আঁতকে উঠে মাসুদ রানা এরপর মানুষের লাশ দেখতে পেল, পলির উপর পড়ে আছে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। পাইকারী হত্যাকাণ্ডের স্পষ্ট আলামত! ছুটির সময়টা বিশ্রাম নিতে এসে এ কীসের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ল ও? এবার রানা এমন এক চীনা ধনকুবেরকে প্রতিপক্ষ হিসাবে পেয়েছে যে কয়েক বিলিয়ন ডলার ঘুষ দিয়ে দুনিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট থেকে শুরু করে প্রশাসনের মাথাগুলোকে কিনে নিতে পারে। রানার সামনে কঠিন পরীক্ষা।

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মাসুদ রানা

প্রিন্সেস হিয়া

(দুইখণ্ড একত্রে)

কাজী আনোয়ার হোসেন



সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

ISBN 984-16-7274-4

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ২০০৫

প্রচ্ছদ: বিদেশী ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

হেড অফিস
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
E-mail: sebaprok@citechco.r
Website: www.Boi-Mela.con

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

Masud Rana
PRINCESS HIA
Part I & II
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain

সেবা প্রকাশনী

বাহান্ন টাকা

সূচি:

মাসুদ রানার ভলিউম

১৪৩-১৪৪	অপহরণ-১,২ (একত্রে)	৪১/-
১৪৫-১৪৬	আবার সেই দুঃস্বপ্ন-১,২ (একত্রে)	৩৩/-
১৪৭-১৪৮	বিপর্যয়-১,২ (একত্রে)	৪১/-
১৪৯-১৫০	শান্তিদূত-১,২ (একত্রে)	৪৩/-
১৫১-১৫২	শ্বেত সন্ত্রাস-১,২ (একত্রে)	৬৯/-
১৫৬-১৫৭	মৃত্যু আলিঙ্গন-১,২ (একত্রে)	৫২/-
১৫৮-১৬২	সময়সীমা মধ্যরাত+মাকিয়া	৪৬/-
১৫৯-১৬০	আবার উ সেন-১,২ (একত্রে)	৪৭/-
১৬২-১৬৫	কে কেন কিভাবে+কুচক্র	৪৭/-
১৬৩-১৬৪	মুক্ত বিহঙ্গ-১,২ (একত্রে)	৫৮/-
১৬৬-১৬৭	চাই সাম্রাজ্য-১,২ (একত্রে)	৬২/-
১৬৮-১৬৯	অনুপ্রবেশ-১,২ (একত্রে)	৪২/-
১৭০-১৭১	যাত্রা অশুভ-১,২ (একত্রে)	৪৩/-
১৭২-১৭৩	জুয়াড়ী ১,২ (একত্রে)	৩৪/-
১৭৪-১৭৫	কালো টাকা ১,২ (একত্রে)	৪৩/-
১৭৬-১৭৭	কোকেন সম্রাট ১,২ (একত্রে)	৪২/-
১৮০-১৮১	সত্যবাবা-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
১৮২-১৮৩	যাত্রীরা হুঁশিয়ার+অপারেশন চিতা	৪৩/-
১৮৪-১৮৫	আক্রমণ '৮৯-১,২ (একত্রে)	৪১/-
১৮৬-১৮৭	অশান্ত সাগর-১,২ (একত্রে)	৪২/-
১৮৮-১৮৯-১৯০	শ্বাপদ সংকুল-১,২,৩ (একত্রে)	৬৫/-
১৯১-১৯২	দংশন-১,২ (একত্রে)	৪২/-
৯৫-১৯৬	ব্ল্যাক ম্যাজিক-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
১৯৭-১৯৮	তিক্ত অবকাশ-১.২ (একত্রে)	৩৭/-
১৯৯-২০০	ডাবল এজেন্ট-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
২০১-২০২	আমি সোহানা-১,২ (একত্রে)	৪৫/-
২০৩-২০৪	অগ্নিশপথ-১,২ (একত্রে)	৩৫/-
২০৫-২০৬-২০৭	জাপানী ফ্যানাটিক-১,২,৩ (একত্রে)	৬৯/-
২০৮-২০৯	সাক্ষাৎ শয়তান-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
২১০-২১১	গুপ্তঘাতক-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
২১২-২১৩-২১৪	নরপিশাচ-১,২,৩ (একত্রে)	৫৫/-
২১৭-২১৮	অন্ধশিকারী১,২ (একত্রে)	৩৭/-
২১৯-২২০	দুই নম্বর-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
২২১-২২২	কৃষ্ণপক্ষ-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
২২৩-২২৪	কালোছায়া-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
২২৫-২২৬	নকল বিজ্ঞানী-১,২ (একত্রে)	৩৪/-
২২৭-২২৮	বড় ক্ষুধা-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
২২৯-২৩০	স্বর্ণদ্বীপ-১,২ (একত্রে)	৪০/-
২৩১-২৩২-২৩৩	রক্তপিপাসা-১,২,৩ (একত্রে)	৪৮/-
২৩৪-২৩৫	অপচ্ছায়া-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
২৩৬-২৩৭	ব্যর্থ মিশন-১,২ (একত্রে)	৩১/-
২৩৮-২৩৯	নীল দংশন-১,২ (একত্রে)	৩২/-
২৪০-২৪১	সাউদিয়া ১০৩-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
২৪২-২৪৩-২৪৪	কালপুরুষ-১,২,৩ (একত্রে)	৫৫/-
২৪৫-২৪৬	নীল বজ্র ১,২ (একত্রে)	৩২/-
২৪৯-২৫০-২৫১	কালকূট-১,২,৩ (একত্রে)	৫০/-
২৫৪-২৫৫	সবাই চলে গেছে ১,২ (একত্রে)	৩৮/-
২৫৬-২৫৭	অনন্ত যাত্রা ১,২ (একত্রে)	৩৯/-
২৬৩-২৬৪	হীরক সম্রাট ১,২ (একত্রে)	৪২/-
২৫৮-২৬৫	রক্তচোষা+সাত রাজার ধন	৪৩/-
২৫৯-২৬০-২৬১	কালো কাইল ১,২,৩ (একত্রে)	৪৮/-
২৬৬-২৬৭-২৬৮	শেষ চাল ১,২,৩ (একত্রে)	৫৬/-
২৬৯-২৮৫	বিগব্যাঙ+যাদকচক্র	৪৩/-
২৭০-২৭১	অপারেশন কসনিয়া+টার্গেট বাংলাদেশ	৩৮/-
২৭২-২৭৩	মহাপ্রলয়+যুবরাজ	৩৯/-
২৭৪-২৭৫	প্রিন্সেস হিয়া ১,২ (একত্রে)	৫২/-
২৭৬-২৯১	মৃত্যু ফাঁদ+সীমালঙ্ঘন	৪৫/-
২৭৯-২৮২	মায়ান ট্রেজার+জন্মভূমি	৫১/-
২৮০-২৮৯	ঝড়ের পূর্বাভাস+কালসাপ	৩৮/-
২৮১-২৭৭	আক্রান্ত দূতাবাস+শয়তানের ঘাঁটি	৪৬/-
২৮৩-২৮৮	দুর্গম গিরি+তুরুপের তাস	৪৭/-
২৮৪-৩১২	মরণযাত্রা+সিক্রেট এজেন্ট	৪২/-
২৮৬-২৮৭	শকুনের ছায়া ১,২ (একত্রে)	৪১/-
২৯০-২৯৩	গুডবাই, রানা+কান্তার মরু	৪৬/-
২৯২-২৯৮	রুদ্রঝড়+অগ্নিবাণ	৩৭/-
২৯৪-৩০৪	কর্কটের বিষ+সার্বিয়া চক্রান্ত	৪২/-
২৯৫-২৯৭	বোস্টন জ্বলছে+নরকের ঠিকানা	৩৩/-
২৯৬-৩০৬	শয়তানের দোসর+কিলার কোবরা	৪২/-
২৯৯-২৭৮	কুহেলি রাত+ধ্বংসের নকশা	৪৩/-
৩০০-৩০২	বিষাক্ত থাবা+মৃত্যুর হাতছানি	৪০/-
৩০১-৩৪৪	জলদস্যু+ক্রাইম বস	৪১/-
৩০৫-৩০৭	দুরভিসন্ধি+মৃত্যুপথের যাত্রী	৪৭/-
৩০৮-৩৪২	পালাও, রানা+অন্ধপ্রেম	৫৪/-
৩০৯-৩১০	দেশপ্রেম+রক্তলালসা	৪১/-
৩১১-৩১৪	বাঘের খাঁচা+মুক্তিপণ	৪৭/-
৩১৫-৩১৬	চীনে সঙ্কট+গোপন শত্রু	৪৯/-
৩১৭-৩১৯	মোসাদ চক্রান্ত+বিপদসীমা	৪০/-
৩১৮-৩৪৭	চরসদ্বীপ+ইশকাপনের টেক্কা	৫০/-
৩২০-৩২১	মৃত্যুবীজ+জাতগোক্ষুর	৪৩/-
৩২৩-৩৫২	অন্ধ আক্রোশ+মরুকন্যা	৬২/-
৩২৪-৩২৮	অশুভ প্রহর+অপারেশন ইজরাইল	৫৮/-
৩২৬-৩২৭	স্বর্ণখনি ১,২ (একত্রে)	৫৮/-
৩৩২-৩৩৩	টপ সিক্রেট ১,২ (একত্রে)	৩৯/-
৩৩১-৩৪১	ব্লাইন্ড মিশন+আরেক গডফাদার	৪২/-
৩৪০-৩৪৩	আবার সোহানা+মিশন তেল আবিব	৪৫/-
৩৪৮-৩৪৯	কালো নকশা+কালনাগিনী	৫০/-

প্রিন্সেস হিয়া-১

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৮

এক

ডিসেম্বর দশ, উনিশশো আটচল্লিশ। অজ্ঞাত জলপথ।

বাতাসের প্রতিটি ধাওয়া হিংস্র দানব করে তুলছে ঢেউগুলোকে। আকাশ ছোঁয়া সচল পাঁচিল যেন, একের পর এক ছুটে আসছে, চূড়ার মাথায় সাপের ফণা আকৃতির সাদাফেনা বিস্ফোরিত হচ্ছে, জলপ্রপাতের মত নেমে আসছে জাহাজের ওপর। সন্ধের আগেই তুষারঝড় এমন প্রবল হয়ে উঠল যে কালো মেঘ আর উত্তাল তরঙ্গমালা আলাদাভাবে চেনার উপায় থাকল না। রাত যত বাড়ল ততই প্রবল হয়ে উঠল প্রকৃতির আক্রোশ, পাহাড়ের মত উঁচু প্রতিটি ঢেউ অবিরত আঘাত হেনে দুর্বল ও কাবু করে ফেলছে প্রিন্সেস হিয়া লিয়েনকে; তবে আর মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই যে ভয়ঙ্কর বিপর্যয় ঘটে যাবে, জাহাজের আরোহীরা এখনও তা জানে না।

ঝড়টা উত্তর-পুব আর উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে বইছে, ফলে স্রোত আর ঢেউ জাহাজটাকে একই সঙ্গে দু'দিক থেকে আঘাত হানছে। আরও খানিক পর বাতাসের গতিবেগ দাঁড়াল ঘণ্টায় একশো মাইল, ঢেউ হয়ে উঠেছে ত্রিশ ফুট বা আরও বেশি উঁচু। প্রচণ্ড দুর্যোগে আটকা পড়ে গেছে প্রিন্সেস হিয়া লিয়েন, লুকাবার কোন জায়গা নেই। ঢেউয়ের চাপে মাথা নত করছে বো, খোলা ডেক ধরে ছুটে যাচ্ছে বিপুল জলরাশি, আবার পিছন দিকটা উঁচু হয়ে ওঠায় সেই পানিই ধেয়ে আসছে সামনের দিকে, ঘুরন্ত প্রপেলার পানি ছেড়ে উঠে আসছে শূন্যে। চারদিক থেকে ধাক্কা খেয়ে ত্রিশ ডিগ্রী ঘুরে যাচ্ছে জাহাজ, সামনে এগোবার গতি নেই বললেই চলে। সিধে হতে অনেক সময় নিচ্ছে প্রিন্সেস হিয়া লিয়েন।

তাপমাত্রা ফ্রীজিং পয়েন্টের কাছাকাছি। তুষার ঝড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে ওয়াচার সেকেন্ড মেট লাই মিং পিছিয়ে এসে হুইলহাউসে ঢুকল, বন্ধ করে দিল দরজাটা। ভাবছে, 'প্রিন্সেস'-এর ওপর ঈশ্বর সদয় নন, তা না হলে দুনিয়ার অর্ধেকটা পাড়ি দেয়ার পর বন্দর যখন আর দুশো মাইলও দূরে নয়, প্রকৃতি এমন বিরূপ হয়ে উঠবে কেন। গত ষোলো ঘণ্টায় মাত্র চল্লিশ মাইল এগোতে পেরেছে ওরা।

ক্যাপটেন পেঙ্গ ওয়াকার আর তাঁর চীফ এঞ্জিনিয়ার ঝাঁঝর সিং ছাড়া ক্রুদের সবাই জাতীয়তাবাদী চীনা। ব্রিটিশ রয়্যাল নেভিতে বারো বছর কাজ করেছেন ওয়াকার, আরও আঠারো বছর চাকরি করেছেন আলাদা তিনটে শিপিং কোম্পানীতে, এই ত্রিশ বছরের মধ্যে ক্যাপটেন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন পনেরো বছর। মানুষটা রোগা-পাতলা, মাথার সব চুল পেকে সাদা হয়ে গেছে, চোখের দৃষ্টি দেখে মনে হয় বহু দূরে কোথাও তাকিয়ে আছেন। সাংহাই বন্দর ত্যাগ করার আগে তাঁর ধারণা ছিল যে-কোন সামুদ্রিক ঝড় সামলে নিতে পারবে প্রিন্সেস হিয়া লিয়েন। কিন্তু এখন তিনি উপলব্ধি করতে পারছেন, ধারণাটা ভুল ছিল।

দু'দিন আগে একজন ক্রু চিমনির পিছন দিকে, স্টারবোর্ড সাইডের খোলে একটা ফাটল দেখিয়েছিল তাকে। এই মুহূর্তে ওই ফাটলটায় চোখ বুলাবার বিনিময়ে ছয় মাসের বেতন হারাতেও রাজি আছেন তিনি। খোলের বাইরের দিকে ফাটলটা, কাজেই খোলা ডেকে বেরিয়ে রেইলিং ধরে ঝুঁকে নিচের দিকে তাকাতে হবে। এই প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যে সে প্রশ্ন ওঠে না। নিজে যান বা আর কাউকে পাঠান, ফিরে আসা সম্ভব নয়। প্রিন্সেস হিয়া লিয়েন যে মর্মান্তিক পরিণতির দিকে এগোচ্ছে, এটা তিনি উপলব্ধি করতে পারছেন। ব্যাপারটা মেনে নিয়েছেন, জাহাজের নিয়তি তাঁর হাতে নেই।

হুইলহাউসের জানালায় জমে ওঠা বরফের মোটা স্তরের দিকে তাকালেন ওয়াকার, ঘাড় না ফিরিয়েই সেকেন্ড মেটকে জিজ্ঞেস করলেন, 'বরফ কতটা খারাপ, মি. মিং?'

'দ্রুত জমছে, ক্যাপটেন।'

'আপনার কি মনে হয় জাহাজ উল্টে যাবার ভয় আছে?'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল লাই মিং। 'এখুনি নয়, স্যার। তবে সকালের দিকে সুপারস্ট্রাকচার আর ডেকে যে বরফ জমবে, সেটা বিপদ হয়ে দেখা দিতে পারে–তখনও যদি এভাবে বারবার কাত হতে থাকে জাহাজ।'

এক মিনিট চিন্তা করলেন ওয়াকার, তারপর হেলমসম্যানকে বললেন, 'কোর্স ধরে রাখুন, মি. মিং। বাতাস আর ঢেউয়ের দিকে রাখুন বো।'

'আই, স্যার,' চীনা হেলমসম্যান জবাব দিল, পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছে, দুই হাতের শক্ত মুঠোর ভেতর ধরা পিতলের হুইল।

ফাটলটার কথা আবার স্মরণ করলেন ওয়াকার। ড্রাই ডকে শেষ কবে প্রিন্সেস হিয়া লিয়েনের পুরোদস্তুর মেরিন ইন্সপেকশন হয়েছে, মনে করতে পারলেন না। অদ্ভুত ব্যাপার হলো, খোলের ফাটল, মারাত্মকভাবে মরচে ধরা হাল প্লেট, দুর্বল বা নিখোঁজ রিভিট সম্পর্কে ক্রুদের মনে কোন অস্বস্তি বা উদ্বেগ নেই। ভাব দেখে মনে হচ্ছে জাহাজের ক্ষয় সম্পর্কে তারা সচেতন নয়। হেভি লিকেজ দিয়ে যতই পানি ঢুকুক, পাম্প করে সব ফেলে দিচ্ছে তারা, যাত্রার সেই প্রথম পর্ব থেকে। প্রিন্সেস যদি ডোবে, দায়ী হবে ক্ষয়ে দুর্বল হয়ে পড়া খোল। সমুদ্র পাড়ি দেয় এমন জাহাজ বিশ বছর সার্ভিস দিলে পুরানো হয়ে গেছে বলে ধরে নেয়া হয়। শিপইয়ার্ড থেকে বেরুবার পর পঁয়ত্রিশ বছরে প্রিন্সেস হিয়া লিয়েন কয়েক লাখ মাইল উত্তাল সাগর পাড়ি দিয়েছে। আজও যে এটা পানির ওপর ভেসে আছে, এটাই তো একটা বিস্ময়।

শিপ বিল্ডিং কোম্পানী হারল্যান্ড অ্যান্ড উলফ সিঙ্গাপুর প্যাসিফিক স্টীমশিপ লাইন্স-এর অর্ডার পেয়ে তৈরি করে জাহাজটাকে, পানিতে নামানো হয় উনিশশো তেরো সালে পানাই নামে। দশ হাজার সাতশো আটান্ন টনী, চারশো সাতানব্বুই ফুট লম্বা, মাঝখানে ষাট ফুট চওড়া। ট্রিপল-এক্সপানশন স্টীম এঞ্জিনগুলো জোড়া প্রপেলার ঘোরাতে ব্যয় করতে পারে পাঁচ হাজার হর্সপাওয়ার। প্রথম জীবনে ঘণ্টায় সতেরো নট গতিতে ছুটতে পারত। উনিশশো একত্রিশ সাল পর্যন্ত সিঙ্গাপুর আর হনলুলুর মাঝখানে সার্ভিস দেয়, তারপর হাত বদল হয়ে ক্যান্টন লাইনস-এ

চলে আসে। পানাই নামটা বাদ পড়ে, নতুন নাম রাখা হয় প্রিন্সেস হিয়া লিয়েন। মেরামত করার পর দক্ষিণ-পুব এশিয়ার বন্দরগুলোয় প্যাসেঞ্জার ও কার্গো আনা-নেয়ার কাজে লাগিয়ে দেয়া হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় অস্ট্রেলিয়া সরকার ট্রুপ ট্র্যান্সপোর্ট হিসেবে ভাড়া করে ওটাকে। কনভয় ডিউটিতে থাকার সময় জাপানী প্লেনের বোমা লাগলেও ডোবেনি। যুদ্ধের পর ক্যান্টন লাইনস-এ ফিরে আসে আবার, অল্প কিছুদিন সাংহাই আর সিঙ্গাপুরে আসা-যাওয়া করে। তারপর, উনিশশো আটচল্লিশ সালের বসন্তে, সিদ্ধান্ত হলো সিঙ্গাপুরী স্ক্র্যাপারদের কাছে এটাকে বিক্রি করে দেয়া হবে।

অ্যাকোমডেশন-এর ডিজাইনে দেখা যায় পঞ্চান্নজন প্রথম শ্রেণীর, পঁচাশিজন দ্বিতীয় শ্রেণীর আর তিনশো সত্তরজন তৃতীয় শ্রেণীর আরোহী বহন করতে পারবে। সাধারণত একশো নব্বুইজন ক্রু থাকে। তবে এই শেষ যাত্রায় ক্রু নেয়া হয়েছে মাত্র আটত্রিশজন।

এঞ্জিনরূমে যান্ত্রিক ও ধাতব শব্দজটের সঙ্গে খোলের কর্কশ গোঙানি মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে। বাল্কহেড থেকে মরচে ধরা লোহার গুঁড়ো ছুটছে, নাচানাচি করছে শূন্যে। ওয়াকওয়েতে ধীরে ধীরে উঁচু হচ্ছে পানির লেভেল। স্টীল প্লেটগুলোকে আটকে রাখা রিভিট খুলে যাচ্ছে, প্লেট থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসে বাতাস ভেদ করে মিসাইলের মত ছুটছে। ওয়েল্ডিং পদ্ধতি চালু হবার আগের যুগে তৈরি জাহাজে এ-ধরনের ঘটনা ছিল অতি সাধারণ–ক্রুরা যে যার কাজে ব্যস্ত, একজন বাদে কেউই খুব একটা উদ্বিগ্ন নয়।

তিনি হলেন চীফ এঞ্জিনিয়ার ঝাঁঝর সিং। তাঁর ঘন ও কালো পাকানো গোঁফ জুলফি ছুঁই ছুঁই করছে, কাঁধ দুটো যেন বৃষস্কন্ধ। নিজের পেশায় অভিজ্ঞ তিনি, দেখে ও শুনে বলে দিতে পারেন কোনও জাহাজ ভেঙে পড়ছে কিনা। তবে উদ্বিগ্ন হলেও, ভয়টাকে তিনি দমিয়ে রাখতে পেরেছেন; শান্ত মনে চিন্তা করছেন বাঁচার কি উপায় করা যায়।

এগারো বছর বয়েসে এতিম হন ঝাঁঝর সিং, কোলকাতার শিখ বস্তি থেকে পালিয়ে চলে আসেন খিদিরপুর ডকে, সেখান থেকে একটা জাহাজে চড়েন কেবিন বয় হিসেবে। স্টীম এঞ্জিনের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ও সযত্ন মমতা সংশ্লিষ্ট অনেকেরই দৃষ্টি কাড়ে। প্রথমে ওয়াইপার হিসেবে পদোন্নতি পান, তারপর থার্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট এঞ্জিনিয়ার হিসেবে। সাতাশ বছর বয়েসে চীফ এঞ্জিনিয়ার-এর দায়িত্ব দেয়া হয় তাঁকে। দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের বিভিন্ন দ্বীপে ট্র্যাম্প ফ্রেইটার আসা-যাওয়া করত, তারই একটায় তিন বছর কাজ করেন। তারপর, উনিশশো পঁয়তাল্লিশ সালের গ্রীষ্মে প্রিন্সেস হিয়া লিয়েনের চীফ এঞ্জিনিয়ার হিসেবে নাম লেখান।

চেহারা থমথম করছে, সেকেন্ড এঞ্জিনিয়ার ঝিং ঝি-র দিকে তাকালেন ঝাঁঝর সিং। 'ওপরে যান, একটা লাইফ ভেস্ট পরুন। ক্যাপটেনের আদেশ পাওয়ামাত্র জাহাজ ত্যাগ করার জন্যে তৈরি হয়ে থাকুন।'

মুখ থেকে সিগারেট নামিয়ে চীনা এঞ্জিনিয়ার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন।

'আপনার ধারণা আমরা ডুবে যাচ্ছি?'

'ধারণা নয়, জানি,' জবাব দিলেন ঝাঁঝর সিং। 'এই জং ধরা বালতি এক ঘণ্টাও টিকবে না।'

'ক্যাপটেনকে বলেছেন?'

'অন্ধ আর কালা না হলে তিনি নিজেই বুঝতে পারছেন।'

'আপনি আসছেন না?' জিজ্ঞেস করলেন ঝিং ঝি।

'আসছি, একটু পর।'

ন্যাকড়ায় হাতের তেল মুছে মই বেয়ে হ্যাচের দিকে উঠলেন ঝিং ঝি, হ্যাচ খুলে আপার ডেকে চলে যাচ্ছেন।

প্রিয় এঞ্জিনগুলোর দিকে শেষ বারের মত তাকালেন ঝাঁঝর সিং, নিশ্চিতভাবে জানেন আর কিছুক্ষণের মধ্যে পানির গভীরে তলিয়ে যাবে ওগুলো। ঘর্ষণের অস্বাভাবিক একটা কর্কশ আওয়াজে শিউরে উঠলেন তিনি, গোটা খোল থেকে প্রতিধ্বনিত হলো। একটা বাল্কহেডে ফাটল তৈরি হতে দেখে বুকটা হিম হয়ে গেল তাঁর, প্রথমে নিচের দিকে দীর্ঘ হলো সেটা, তারপর আড়াআড়িভাবে এগোল খোলের স্টীল প্লেট ধরে। শুরু হয়েছে পোর্টসাইড থেকে, স্টারবোর্ডের দিকে বিস্তৃত হবার সময় চওড়া হচ্ছে। ছোঁ দিয়ে জাহাজের ফোন হাতে নিলেন ঝাঁঝর সিং, ব্রিজের সঙ্গে কথা বলছেন।

সাড়া দিল লাই মিং। 'ব্রিজ।'

'ক্যাপটেনকে দাও!'

এক সেকেন্ড পর লাইনে এলেন পেন্স ওয়াকার। 'ক্যাপটেন।'

'স্যার, এঞ্জিনরূমে একটা ফাটল দেখা দিয়েছে। প্রতি মিনিটে বড় হচ্ছে ওটা।'

পাথর হয়ে গেলেন ক্যাপটেন। ক্ষীণ একটু আশা ছিল খোলের ফাটলটা মারাত্মক হয়ে ওঠার আগেই বন্দরে পৌঁছে যাবেন তাঁরা। 'পানি ঢুকছে কি রকম?'

'পাম্পগুলো পেরে উঠছে না, স্যার।'

'ধন্যবাদ, মি. সিং। তীরে না পৌঁছানো পর্যন্ত এঞ্জিনগুলোকে চালু রাখতে পারবেন তো?'

'সময়ের একটা হিসাব দেবেন আমাকে?'

'এই ধরুন এক ঘণ্টা।'

'দুঃখিত, স্যার,' জবাব দিলেন ঝাঁঝর সিং, মাথার পাগড়িটা এক হাতে ধরে আছেন। 'প্রিন্সেস আর দশ মিনিট ভেসে থাকবে।'

'ধন্যবাদ, চীফ,' ভারী গলায় বললেন ক্যাপটেন ওয়াকার। 'আপনি বরং সময় থাকতে এঞ্জিনরূম থেকে উঠে আসুন।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে ঘুরলেন ক্যাপটেন, হুইলহাউসের পিছন দিকের জানালাগুলোর দিকে তাকালেন। এরই মধ্যে কাত হয়ে পড়েছে জাহাজ, সিধে হবার কোন লক্ষণ নেই, দোল খাওয়ার মাত্রাও আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গেছে। দুটো বোট এরইমধ্যে পানির তোড়ে ভেঙে গেছে, নেমে গেছে জাহাজ থেকে। কাছাকাছি তীরে জাহাজ নিয়ে যাওয়া বা নিরাপদ কোথাও নোঙর ফেলা এখন আর

সম্ভব নয়। শান্ত পানিতে পৌঁছুতে হলে জাহাজটাকে স্টারবোর্ডের দিকে ঘুরিয়ে নিতে হবে। সারি সারি উত্তাল ঢেউ আড়াআড়িভাবে আঘাত করলে জাহাজ দু'চার মিনিটের মধ্যে ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে, কিংবা ঢেউয়ের তলায় নেমে আসার পর বো আর মাথা তুলতে পারবে না। তাছাড়া, এমনিতেও, সুপারস্ট্রাকচার আর খোলা ডেকে জমতে থাকা বরফ জাহাজটাকে উল্টে দিতে খুব একটা সময় নেবে না।

ক্যাপটেন কয়েক মুহূর্তের জন্যে ষাট দিন আগে ও দশ হাজার মাইল দূরে ফিরে গেলেন। ইয়্যাংৎসে নদী, সাংহাই। ওখানে স্টেটরুমগুলোর ফার্নিচার সরিয়ে প্রিন্সেস হিয়া লিয়েনকে খালি করা হচ্ছিল—শেষ যাত্রায় সিঙ্গাপুর যাবে জাহাজ, ওখানে ভেঙে ফেলা হবে ওটাকে। যাত্রা বিলম্বিত হলো, ন্যাশনালিস্ট চাইনীজ আর্মির জেনারেল চিউয়েন কাও একটা প্যাকার্ড লিমাজিনে চড়ে ডকে এসে ক্যাপটেনের সঙ্গে নিভৃতে আলাপ করতে চাওয়ায়। ক্যাপটেনকে তিনি গাড়িতে ডেকে পাঠালেন।

'প্লীজ, আমার নাক গলানোটাকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখুন, ক্যাপটেন। তবে কথা হলো এই যে সরাসরি জেনারেলিসিমো চিয়াং কাই-শেক ব্যক্তিগতভাবে নির্দেশ দিয়েছেন আমাকে; এখানে আমি তাঁর প্রতিনিধিত্ব করছি,' বললেন জেনারেল চিউয়েন কাও। তাঁর ত্বক আর হাত সাদা কাগজের মত মসৃণ, পরনের ইউনিফর্মে এতটুকু ভাঁজ নেই। বসে আছেন পিছনের গোটা প্যাসেঞ্জার কমপার্টমেন্ট জুড়ে, ফলে একটা জাম্প সীটে বাঁকা হয়ে বসতে হয়েছে ক্যাপটেন ওয়াকারকে। 'আপনাকে এই মর্মে নির্দেশ দিচ্ছি, প্রিন্সেস হিয়া লিয়েনকে দীর্ঘ সমুদ্র যাত্রার জন্যে প্রস্তুত রাখুন।'

'আমার বিশ্বাস কোথাও ভুল হয়েছে,' বললেন ওয়াকার। 'প্রিন্সেস হিয়া লিয়েন দীর্ঘ যাত্রার জন্যে এখন আর উপযোগী নয়। অল্প কিছু লোক, সামান্য ফুয়েল আর সাপ্লাই নিয়ে সিঙ্গাপুরের স্ক্র্যাপ ইয়ার্ডে যাচ্ছি আমরা।'

'সিঙ্গাপুরের কথা ভুলে যান,' হাত নেড়ে বললেন জেনারেল চিউয়েন কাও। 'আমাদের ন্যাশনালিস্ট নেভীর বিশজন লোক সহ প্রচুর ফুয়েল আর রসদ সাপ্লাই দেয়া হবে আপনাকে। জাহাজে কার্গো তোলার পর···,' থেমে লম্বা একটা হোল্ডারে সিগারেট ভরলেন, ধরালেন সেটা। '···তুলতে এই ধরুন দশ দিন লাগবে। তারপর আপনাকে সেইলিং অর্ডার দেয়া হবে।'

'সেক্ষেত্রে কোম্পানী ডিরেক্টরদের সঙ্গে ব্যাপারটা আমাকে পরিষ্কার করে নিতে হবে,' বললেন ওয়াকার।

'ক্যান্টন লাইনস-এর ডিরেক্টরদের জানানো হয়েছে আপাতত সরকার প্রিন্সেস হিয়া লিয়েনকে নিজের দখলে নিয়েছে।'

'ওরা আপত্তি করেননি?'

মাথা নাড়লেন চিউয়েন কাও। 'জেনারেলিসিমো পেমেন্ট হিসেবে প্রচুর সোনা দিয়েছেন, কাজেই তাঁরা খুশি মনেই রাজি হয়েছেন।'

'জানতে পারি, কোথায় আমাদেরকে যেতে হবে?'

'না, পারেন না, অন্তত এখুনি নয়,' জবাব দিলেন জেনারেল।

'আর কার্গো সম্পর্কে?'

'কার্গো নিরাপদে তীরে পৌঁছে দেয়ার পর সিঙ্গাপুরে ফিরে আসতে পারবেন আপনি।'

'আমি জানতে চাইছি...'

ক্যাপটেন ওয়াকারকে থামিয়ে দিয়ে জেনারেল কাও বললেন, 'গোটা মিশন পুরোপুরি গোপন রাখতে হবে। এই মুহূর্ত থেকে আপনি এবং আপনার ক্রুরা জাহাজেই থাকবেন, কেউ জাহাজ ছেড়ে কোথাও যেতে পারবেন না। আত্মীয় বা বন্ধুদের সঙ্গে কোন রকম যোগাযোগ করবেন না। কঠিন নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্যে আমার লোকজন রাত-দিন পাহারা দেবে জাহাজটাকে।'

'আই সী,' বললেন ওয়াকার।

'এখানে আমরা কথা বলছি, ওদিকে জাহাজের ওপর আমার লোকজন আপনার সমস্ত কমিউনিকেশন ইকুইপমেন্ট হয় সরিয়ে ফেলছে, নয়তো ভেঙে ফেলছে।'

ক্যাপটেন স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। 'কি বলছেন আপনি! রেডিও ছাড়া দীর্ঘ সমুদ্র যাত্রা কিভাবে সম্ভব? জাহাজ বিপদে পড়লে কি করব? সাহায্য চাওয়ার দরকার হলে?'

অলস ভঙ্গিতে সিগারেট হোল্ডারটা চোখের সামনে তুলে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করছেন জেনারেল কাও। 'আমি কোন বিপদ দেখতে পাচ্ছি না।'

'এ আপনি কি বলছেন, জেনারেল! প্রিন্সেস বুড়িয়ে গেছে। ঝড়-ঝাপটা সহ্য করার ক্ষমতাই নেই তার।'

'এই মিশনের গুরুত্ব বুঝিয়ে বলার অধিকার আমাকে দেয়া হয়নি, ক্যাপটেন ওয়াকার,' বললেন জেনারেল। 'তবে আপনাকে জানাতে বলা হয়েছে, মিশনটা সফল হলে জেনারেলিসিমো চিয়াং কাই-শেক পুরস্কার হিসেবে প্রচুর সোনা দেবেন আপনাদের সবাইকে। সেটা পরিমাণে এত বেশি, ভবিষ্যতে আর কাউকে খেটে খেতে হবে না।'

লিমাজিনের জানালা দিয়ে জাহাজের মরচে ধরা খোলের দিকে তাকালেন ক্যাপটেন। 'সাগরের তলায় শুয়ে থাকতে হলে সোনা আমার কি কাজে লাগবে, জেনারেল?'

'সেক্ষেত্রে পানির তলায় অনন্তকাল আপনি আমার সঙ্গ পাবেন,' তিক্ত হাসি ফুটল জেনারেল কাও-এর ঠোঁটে। 'প্যাসেঞ্জার হিসেবে আমিও আপনাদের সঙ্গে থাকছি।'

তারপরই প্রিন্সেস হিয়া লিয়েনকে ঘিরে প্রায় উন্মত্ত কর্মব্যস্ততা শুরু হয়ে গেল। পাম্প করে ফুয়েল ট্যাংকগুলো ভরে ফেলা হলো। খাদ্যসম্ভারের পরিমাণ ও মান লক্ষ করে হতভম্ব হয়ে গেল জাহাজের কুক। একের পর এক ট্রাক বহর আসছে, ডকের ওপর বিশাল ক্রেনের নিচে থামছে ওগুলো। বিশাল আকারের কাঠের অসংখ্য বাক্স তোলা হলো জাহাজের ডেকে, সেখান থেকে হোল্ডে নামিয়ে সাজিয়ে রাখা হলো সব। হোল্ডে জায়গা নেই, তারপরও ট্রাক বহর আসছে। শেষ বহরটায়

ছোট আকারের বাক্স নিয়ে আসা হয়েছে, একা একজন বা দু'জন মিলে বহন করতে পারে। খালি প্যাসেঞ্জার কেবিন, প্যাসেজওয়ে আর ডেকের নিচে যতগুলো কমপার্টমেন্ট পাওয়া গেল সব ভরে ফেলা হলো। ওভারহেড ডেকেরও প্রতি বর্গ ফুট দখল করে নিল বাক্সগুলো। শেষ ছ'টা ট্রাকের বাক্স প্রমানাড ডেকগুলোয় রাখা হলো। জাহাজে সবার শেষে উঠলেন জেনারেল চিউয়েন কাও, সশস্ত্র অফিসারদের ছোট্ট একটা গ্রুপকে নিয়ে। তাঁর ব্যক্তিগত লাগেজ হিসেবে রয়েছে দশটা স্টীমার ট্রাঙ্ক আর ত্রিশটা কেসে ভরা দামী ওয়াইন ও কনিয়্যাক।

সবই বৃথা গেল, বর্তমানে ফিরে এসে ভাবলেন ক্যাপটেন ওয়াকার। প্রকৃতির কাছে হেরে গেছে প্রিন্সেস হিয়া লিয়েন। গোপনীয়তা, মানুষকে বোকা বানানোর জন্যে জটিল কৌশল, সবই এখন অর্থহীন হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাংহাই ত্যাগ করার পর থেকে প্রিন্সেস একা ও নিঃশব্দে এত দূরের পথ পাড়ি দিয়ে এসেছে। রেডিও কমিউনিকেশন ইকুইপমেন্ট না থাকায় পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়া জাহাজগুলোর রেডিও কল শুনতে পাননি তাঁরা, সাড়াও দিতে পারেননি।

সম্প্রতি বসানো রাডারের দিকে তাকালেন ক্যাপটেন। প্রিন্সেসের পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে অন্য কোন জাহাজ নেই। ডিসট্রেস সিগনাল পাঠানোর সাধ্য নেই, কাজেই কেউ তাঁদেরকে উদ্ধার করতে আসবে না। হুইলহাউস থেকে টলতে টলতে বেরিয়ে আসছেন জেনারেল কাও, মুখ তুলে সেদিকে তাকালেন ক্যাপটেন। মড়ার মত সাদা হয়ে গেছে জেনারেলের চেহারা, নোংরা একটা রুমাল ঠোঁটে চেপে ধরেছেন। 'সীসিক, জেনারেল?' ক্যাপটেনের প্রশ্নে সামান্য বিদ্রূপ।

'শালার ঝড়টা কি,' বিড়বিড় করলেন জেনারেল কাও, 'থামবে না?'

'আমরা ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা–আপনি আর আমি।'

'মানে?'

'পানির নিচে পরস্পরকে আমরা অনন্তকাল সঙ্গ দেব। আর বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে না।'

ডেকে উঠে এসে হ্যান্ডরেইল ধরে ছুটলেন ঝাঁঝর সিং, প্যাসেজওয়েতে ঢুকে নিজের কেবিনের সামনে থামলেন। নিজেকে অস্থির বা দিশেহারা হতে দিচ্ছেন না, শান্ত গাম্ভীর্যের সঙ্গে প্রতিটি কাজ করছেন। বিশেষ কারণে দরজায় সব সময় তালা দিয়ে রাখেন তিনি, চাবির খোঁজে পকেট না হাতড়ে লাথি মেরে কবাট খুলে ফেললেন।

সাদা ও সোনালি রঙের ড্রেসিং গাউন পরে বিছানায় শুয়ে রয়েছে স্বর্ণকেশী এক তরুণী, বুকের কাছে খোলা একটা ম্যাগাজিনে চোখ। পাশ থেকে ছোট একটা ড্যাশান্ড কুকুর অকস্মাৎ লাফ দিয়ে নিচে নামল, ঘেউ-ঘেউ করছে। চমকে উঠল মেয়েটা, হাত থেকে খসে পড়ল ম্যাগাজিন। অপরূপ সুন্দরী সে, দেহ-সৌষ্ঠবে কোন খুঁত নেই। গায়ের রঙ দুধে-আলতা, মসৃণ ত্বক, চোয়ালের হাড় সামান্য উঁচু, আর চোখ জোড়া সকালের নির্মল আকাশের মত নীল। দাঁড়ালে ঝাঁঝর সিঙের চিবুকে ঠেকবে তার মাথা। নড়াচড়ার মধ্যে মার্জিত ও শোভন একটা ভঙ্গি আছে,

এক ঝটকায় উঠে বসে পা দুটো ডেকে নামিয়ে দিল, তবে না দাঁড়িয়ে বসে থাকল বিছানার কিনারায়।

'চলো, রিনা,' বলে স্ত্রীর কব্জি ধরে টান দিলেন ঝাঁঝর সিং। ক্যারিনা মেরিল দাঁড়াতে আবার তিনি বললেন, 'হাতে একদমই সময় নেই।'

'আমরা কি তাহলে পোর্টে পৌঁছেছি?' অবাক হয়ে জানতে চাইল ক্যারিনা।

'না, ডার্লিং। জাহাজটা ডুবে যাচ্ছে।'

ক্যারিনার একটা হাত মুখে উঠে এল। 'ওহ্ গড!'

হ্যাঁচকা টান দিয়ে ক্লজিটের দরজা খুলছেন ঝাঁঝর সিং, দেরাজ থেকে সমস্ত কাপড়চোপড় বের করে ছুঁড়ে দিচ্ছেন পিছন দিকে। 'তোমার আমার বাছবিচার করো না, যত বেশি সম্ভব কাপড় পরো। প্যান্টের ওপর প্যান্ট, মোজার ওপর মোজা, কোটের ওপর কোট··· কি বলছি বুঝতে পারছ তো? যত বেশি সম্ভব! পাতলা কাপড় আগে পরো, মোটাগুলো পরে। জলদি, রিনা, জলদি! জাহাজ যে-কোন মুহূর্তে তলিয়ে যাবে।'

প্রতিবাদ করতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিল ক্যারিনা, দ্রুত ড্রেসিং গাউন খুলে আন্ডারপ্যান্ট পরল, তার ওপর প্যাকস, সবশেষে স্বামীর একটা প্যান্ট। তিনটে ব্লাউজের ওপর হাতে বোনা পাঁচটা সোয়েটার চাপাল। স্বামীর সঙ্গে সিঙ্গাপুর যাবার উদ্দেশ্য নিয়ে জাহাজে চড়েছিল সে, হোটেল থেকে সমস্ত কাপড়চোপড় সুটকেসে ভরে নিয়ে এসেছিল বলে নিজেকে তার ভাগ্যবতী মনে হলো। আর যখন কিছু পরা যাচ্ছে না, ঝাঁঝর সিং নিজের জাম্পসুটটা স্ত্রীকে পরতে সাহায্য করলেন। পায়ে সিল্ক হোস আর কয়েক জোড়া মোজা গলিয়েছে ক্যারিনা, ঝাঁঝর নিজের এক জোড়া বুটও তাকে পরিয়ে দিলেন।

ছোট্ট ড্যাশান্ড ওদের পায়ের চারপাশে ছুটোছুটি আর নাচানাচি করছে, পাখির ডানার মত কান দুটো ঝাপটাচ্ছে প্রবল উত্তেজনায়। মাত্র তিন মাস হলো ক্যারিনাকে বিয়ে করেছেন ঝাঁঝর সিং, তার এক মাস আগে প্রস্তাবটা দেয়ার সময় এমারেল্ড এনগেজমেন্ট রিঙের সঙ্গে ছোট্ট এই কুকুরটাও ক্যারিনাকে গিফট হিসেবে দেন তিনি। ওটার গলায় লাল একটা লেদার কলার আছে, সঙ্গে ঝুলছে সোনালি ড্রাগন আকৃতির একটা রক্ষাকবচ। 'মিরা!' প্রিয় কুকুরকে তিরস্কার করল ক্যারিনা। 'বিছানায় চুপচাপ শুয়ে থাকো!'

ক্যারিনা দৃঢ়-প্রত্যয়ী মেয়ে, আত্মবিশ্বাসেরও কোন কমতি নেই। আইরিশ বাবা ছিলেন একটা ইন্টার আইল্যান্ড ফ্রেইটার-এর মাস্টার, ক্যারিনার বারো বছর বয়েসে সাগরে নিখোঁজ হন তিনি। রুশ মায়ের কাছে মানুষ হয় সে, তারপর কেরানী হিসেবে ক্যান্টন লাইনস-এ ঢুকে ধীরে ধীরে উঠে আসে ডিরেক্টরের এগজিকিউটিভ সেক্রেটারি পদে। ঝাঁঝর সিঙের চেয়ে দশ বছরের ছোট সে। প্রিন্সেস হিয়া লিয়েনের এঞ্জিন সম্পর্কে রিপোর্ট করার জন্যে স্টীমশিপ অফিসে ডেকে পাঠানো হয় ঝাঁঝর সিংকে, তখনই তাঁকে প্রথম দেখে। বলা যায় প্রথম দেখাতেই ভদ্রলোককে ভাল লেগে যায় তার। কোন কিছুতেই বিচলিত না হওয়া আর নির্লিপ্ত গাম্ভীর্য বাবার পর এই প্রথম একজনের মধ্যে দেখতে পেয়েছে ক্যারিনা, প্রেমে পড়ে যাবার এটাও অন্যতম একটা কারণ।

প্রিন্সেস হিয়া লিয়েনকে সিঙ্গাপুরে নিয়ে গিয়ে ভেঙে ফেলা হবে, এটা জানার পর বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেন ঝাঁঝর সিং। ঠিক হয় বিয়ের পর হোটেলেই থাকবে ক্যারিনা, তবে প্রতিদিনই জাহাজে ঝাঁঝর সিঙের সঙ্গে দেখা করতে আসবে, কিংবা ঝাঁঝর সিং তার হোটেলে যাবেন। আরও সিদ্ধান্ত হয়, স্বামীর সঙ্গে জাহাজে চড়েই সিঙ্গাপুরে যাবে ক্যারিনা।

এরকম একদিন দেখা করতে এসেছে ক্যারিনা, খানিক পরই জেনারেল চিউয়েন কাও-এর সশস্ত্র অফিসাররা জাহাজটা ঘিরে ফেলল। ব্যস, ফাঁদে আটকা পড়ে গেল সে। ঝাঁঝর সিং ও ক্যাপটেন ওয়াকার জাহাজে ক্যারিনার উপস্থিতির কথা জেনারেল কাওকে জানালেন, অনুরোধ করলেন তাকে যেন জাহাজ থেকে নেমে যাবার অনুমতি দেয়া হয়। কিন্তু জেনারেলকে কোন ভাবেই রাজি করা গেল না। তাঁর একটাই কথা, জাহাজের গোপন যাত্রা শেষ না হওয়া পর্যন্ত কাউকেই নামতে দেয়া যাবে না।

জাহাজ সাংহাই ত্যাগ করার পর কেবিন থেকে খুব কমই বেরিয়েছে ক্যারিনা। ঝাঁঝর সিং যখন এঞ্জিন রূমে কাজ করেন, তাকে সঙ্গ দেয় মিরাকল নামের ছোট ড্যাশান্ড কুকুরটা।

একটা ওয়াটারপ্রুফ অয়েলক্লথ পাউচে নিজেদের কাগজ-পত্র, পাসপোর্ট ও অল্প কিছু মূল্যবান জিনিস ভরে নিলেন ঝাঁঝর সিং। একটা ভারী সেইলর'স কোট গায়ে চাপিয়ে স্ত্রীর দিকে উদ্বিগ্ন চোখে তাকালেন। 'তুমি রেডি?'

হাত দুটো উঁচু করে পরে থাকা কাপড়চোপড়ের দিকে তাকাল ক্যারিনা। 'এ-সবের ওপরে লাইফজ্যাকেট পরব কিভাবে?' জিজ্ঞেস করল সে, গলা সামান্য একটু কেঁপে গেল। 'আর লাইফজ্যাকেট না পরলে তো টুপ করে ডুবে যাব!'

'ভুলে গেলে? জেনারেল কাও তো চার হপ্তা আগেই অর্ডার দিয়েছেন যে সমস্ত লাইফজ্যাকেট পানিতে ফেলে দিতে হবে। সে অর্ডার অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে তাঁর অফিসাররা।'

'তাহলে চলো তাড়াতাড়ি লাইফবোটে গিয়ে উঠি।'

'বোটের কথাও ভুলে যাও, সব ভেঙে গেছে।'

স্বামীর দিকে অপলক তাকিয়ে থাকল ক্যারিনা। 'আমরা তাহলে মারা যাচ্ছি, তাই না? যদি না-ও ডুবি, জমে বরফ হয়ে যাব।'

স্ত্রীর সোনালি চুলে একটা স্টকিং ক্যাপ বসিয়ে দিলেন ঝাঁঝর সিং। তারপর বললেন, 'তোমাদের আইরিশম্যানরা কি বলেন শোনোনি?'

ক্ষীণ, তিক্ত একটু হাসি ফুটল ক্যারিনার ঠোঁটে। 'হ্যাঁ, জানি। বলা হয়—আইরিশরা কখনও ডোবে না।'

স্ত্রীর হাত ধরে কেবিন থেকে বেরিয়ে এলেন ঝাঁঝর সিং। 'তুমি যদি না ডোবো, আমি কিভাবে ডুবতে পারি, বলো?' কম্প্যানিয়নওয়ে ধরে ওপরের ডেকে উঠে যাচ্ছেন ওঁরা।

লক্ষ্মী মেয়ের মত বিছানায় শুয়ে আড়মোড়া ভাঙছে মিরাকল, হয়তো ভাবছে একটু পরই ফিরে এসে ওকে তারা নিয়ে যাবে। তবে না, প্রিয় কুকুরের কথা একেবারেই ভুলে গেছে ক্যারিনা।

*

যে-সব ক্রু ডিউটি দিচ্ছে না তারা হয় তাস খেলছে, নয়তো অতীতের কোন ঝড়ের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করছে, বাকিরা যে-যার বার্থে ঘুমাচ্ছে, এখনও বুঝতে পারেনি জাহাজটা ভেঙে টুকরো টুকরো হতে যাচ্ছে। ডিনারের পর কুক তার সহকারীদের নিয়ে সার্ফ-সুতরোর কাজে ব্যস্ত, তারই মধ্যে কফি পরিবেশনও চলছে। ঝড়ের দাপট যতই বেশি হোক, বন্দরে পৌঁছানোর প্রত্যাশায় ক্লান্ত ক্রুরা সবাই খুশি। গন্তব্য গোপন রাখা হলেও, তারা জানে ত্রিশ মাইলের মধ্যে ঠিক কোথায় তাদের পজিশন।

হুইলহাউসে কোন ব্যস্ততা বা অস্থিরতা নেই। তুষার কণা আর জমাট বরফের ফাঁক-ফোকর দিয়ে জাহাজের পিছন দিকে তাকিয়ে আছেন ক্যাপটেন ওয়াকার, স্টার্নের দিকে চলে যাওয়া সারি সারি ডেক লাইট এত অস্পষ্ট, কোনরকমে দেখা যাচ্ছে। শান্ত আতঙ্কের সঙ্গে দেখতে পেলেন জাহাজের মাঝখানটা ডেবে যাচ্ছে, ধীরে ধীরে উঁচু হচ্ছে স্টার্ন। সুপারস্ট্রাকচারের চারপাশে বাতাসের গর্জন ছাপিয়ে শোনা যাচ্ছে ভেঙে টুকরো হবার আগে খোলের কর্কশ গোঙানি। হাত লম্বা করে ইমার্জেন্সী বেলের বোতামে আঙুল রাখলেন তিনি। জাহাজের সবখানে বেজে উঠবে অ্যালার্ম।

ঝাপটা দিয়ে বেলের বোতাম থেকে ক্যাপটেনের হাতটা সরিয়ে দিলেন জেনারেল কাও। 'কি করছেন!' আতঙ্কে গলা থেকে আওয়াজ বেরুতে চাইছে না। 'জাহাজ ছেড়ে কেউ আমরা কোথাও যাচ্ছি না।'

চোখে ঘৃণা, জেনারেলের দিকে ফিরে ক্যাপটেন বললেন, 'মরার সময় সাহস রাখুন, জেনারেল।'

'আমার মরা চলবে না। জেনারেলিসিমো চিয়াং কাই-শেকের সামনে দাঁড়িয়ে শপথ করেছি, যে-কোন মূল্যে তাঁর কার্গো নিরাপদে পৌঁছে দেব বন্দরে।'

'জাহাজটা ভেঙে দু'টুকরো হয়ে যাচ্ছে,' বললেন ওয়াকার। 'আপনাকে বা আপনার কার্গোকে কেউ এখন রক্ষা করতে পারবে না।'

'সেক্ষেত্রে আমাদের পজিশন ফিক্স করতে হবে, পরে যাতে উদ্ধার করা যায়।'

'ফিক্স করা হবে কার জন্যে? লাইফবোটগুলো পানির তোড়ে ভেসে গেছে। আপনার হুকুমে সমস্ত লাইফ ভেস্ট পানিতে ফেলে দেয়া হয়েছে। জাহাজের রেডিও নষ্ট করে ফেলেছেন আপনি। আমরা সাহায্য চেয়ে মেসেজ পাঠাতে পারছি না। গোপনীয়তা বজায় রাখার আয়োজনটা বড় বেশি নিখুঁত হয়ে গেছে, জেনারেল। এমনকি এদিকের জলপথে আসারই কথা নয় আমাদের। দুনিয়ার কেউ আমাদের লোকেশন সম্পর্কে কিছু জানে না। চিয়াং কাই-শেক শুধু জানতে পারবেন এখান থেকে ছয় হাজার মাইল দক্ষিণে সমস্ত ক্রুসহ গায়েব হয়ে গেছে প্রিন্সেস হিয়া লিয়েন। আপনার প্ল্যান সত্যি খুব ভাল ছিল, জেনারেল—একটু বেশি ভাল হয়ে গেছে, এই যা।'

'না!' হাঁপিয়ে উঠলেন জেনারেল কাও, যেন গলায় কিছু আটকে গেছে। 'আপনি আমাকে মিথ্যে ভয় দেখাচ্ছেন! জাহাজ ভাঙছে না!' বাধা দেয়ার সুযোগ

পাওয়া গেল না. ব্রিজ উইং-এ বেরুবার দরজা খুলে উন্মত্ত ঝড়ের মধ্যে ঝাঁপ দিলেন তিনি। বাইরে বেরিয়ে এসে পরিষ্কারই দেখতে পেলেন মৃত্যু যন্ত্রণায় খিঁচুনি উঠে গেছে জাহাজের. রীতিমত মোচড় খাচ্ছে খোল। স্টার্নটা স্টারবোর্ডের দিকে ঘুরে যাচ্ছে, সদ্য তৈরি খোলের ফাটলগুলো থেকে বাষ্প বেরিয়ে আসছে। স্টার্ন যখন জাহাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে শুরু করল, বিপুল বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে গেল চোখ জোড়া। ইস্পাতের মোটা পাত ছিঁড়ে যাচ্ছে, কর্কশ ধাতব শব্দ অসহ্য হয়ে উঠল। তারপর অকস্মাৎ জাহাজের সব আলো নিভে গেল, স্টার্নটা আর দেখতে পেলেন না তিনি।

নিচ থেকে হুড়মুড় করে ডেকে উঠে এল ক্রুরা। তুষার আর বরফে ঢাকা পড়ে গেছে ডেক। লাইফবোট আর লাইফ জ্যাকেট না থাকায় ভাগ্যকে অভিশাপ দিচ্ছে তারা, আতঙ্কিত ইঁদুরের মত বৃথাই ছুটোছুটি করছে। শেষ পরিণতিটা এত দ্রুত ঘটে গেল, কারুরই কিছু করার থাকল না। আতঙ্কিত ক্রুরা ডুবন্ত জাহাজ থেকে লাফ দিল পানিতে, যেন জানে না ঠাণ্ডা হিম পানিই তাদেরকে মেরে ফেলবে মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে।

স্টার্ন ডুবে যেতে চার মিনিটও লাগল না। জাহাজের মাঝখানের অংশটা পানির নিচে তলিয়ে গেল। স্মোকস্টাক থেকে বো সেকশন পর্যন্ত শুধু ভেসে আছে, তা-ও কতক্ষণের জন্যে বলা কঠিন। কয়েকজন ক্রু আংশিক ভাঙা একমাত্র লাইফবোটটাকে পানিতে নামাবার চেষ্টা করল, কিন্তু বিশাল এক ঢেউ এসে ডেকের ওপর দিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে গেল তাদের।

বজ্রমুষ্টিতে স্ত্রীর হাত ধরে অফিসার্স কেবিনের ছাদে উঠছেন ঝাঁঝর সিং। হুইলহাউসের পিছনে একটা লাইফ র‍্যাফ্‌ট রাখা আছে, জানেন তিনি। সেটা খালি দেখে বিস্মিত হলেন, সেই সঙ্গে আনন্দ আর আশা জাগল বুকে। বরফে মোড়া ছাদে দু'বার আছাড় খেলেন তাঁরা, তুষার ঝড় প্রায় অন্ধ করে রেখেছে। ছাদের ওপর একটা লাইফ র‍্যাফ্‌ট আছে, প্রবল আতঙ্কে দিশেহারা চীনা ক্রু বা অফিসারদের সে-কথা মনেই নেই। জেনারেল কাও-এর অফিসার সহ বেশিরভাগ লোকই অবশিষ্ট ভাঙাচোরা লাইফবোটের দিকে ছুটে গেছে, যদিও তাতে কোন লাভ হয়নি, ডেকে উঠে আসা পানির তোড়ে ভেসে গেছে সবাই।

'মিরা!' হঠাৎ কেঁদে ফেলল ক্যারিনা। 'মিরাকে আমরা কেবিনে ফেলে এসেছি!'

'এখন আর ফেরা সম্ভব নয়,' ঝাঁঝর সিং বললেন।

'সিং, প্লীজ! মেয়েটাকে ফেলে কিভাবে যাই আমরা!'

ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে স্ত্রীর চোখে তাকালেন ঝাঁঝর সিং। 'মিরাকলের কথা ভুলে যাও, ডার্লিং। ওকে বাঁচাতে চাইলে আমরাও মারা পড়ব।'

শরীরটা মোচড় দিয়ে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করল ক্যারিনা, কিন্তু ঝাঁঝর সিং তাকে ছাড়লেন না, টেনে-হিঁচড়ে লাইফ র‍্যাফ্‌টে তুলে ফেললেন। হাতে একটা ছুরি বেরিয়ে এল, র‍্যাফ্‌টের সঙ্গে বাঁধা রশিগুলো দ্রুত কাটছেন। কাজটা তখনও শেষ হয়নি, মুখ তুলে হুইলহাউসের দিকে তাকালেন। ইমার্জেন্সী লাইটের ক্ষীণ আভায় জানালার ভেতর দিকে, হেলম-এর পাশে নিষ্প্রাণ মূর্তির মত দাঁড়িয়ে

থাকতে দেখলেন ক্যাপটেন ওয়াকারকে। শান্ত ও স্থির দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গিটাই বলে দেয়, মৃত্যুকে তিনি কোন খেদ ছাড়াই মেনে নিয়েছেন।

ঘন ঘন দ্রুত হাতছানি দিয়ে ক্যাপটেনের দৃষ্টি নিজের দিকে ফেরাতে চেষ্টা করলেন ঝাঁঝর সিং। কিন্তু ওয়াকার ঘুরলেন না বা তাকালেন না। একবার নড়লেন, হাত দুটো ধীরে ধীরে কোটের পকেটে ঢোকাবার জন্যে। তারপর অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন জানালায় জমতে থাকা বরফের দিকে।

হঠাৎ সাদা তুষারে মোড়া একটা মূর্তি হোঁচট খেতে খেতে ব্রিজ থেকে বেরিয়ে এল। ছুটে এসে লাইফ র‍্যাফটের সঙ্গে ধাক্কা খেলেন জেনারেল চিউয়েন কাও, পড়লেন র‍্যাফটের ওপর। 'রশি খুলুন! রশি খুলুন!' র‍্যাফটে পড়েই চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি।

'আগেই কেটে ফেলেছি,' শান্ত সুরে জবাব দিলেন ঝাঁঝর সিং।

'জাহাজ ডুবলে পানিতে একটা টান পড়বে, সেই টানে আমরাও তলিয়ে যাব,' বাতাসকে ছাপিয়ে উঠল জেনারেলের গলা।

'আমি আশাবাদী, কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে নিরাপদ দূরত্বে সরে যাব,' জবাব দিলেন ঝাঁঝর সিং। 'র‍্যাফটের তলায় শুয়ে থাকুন, সেফটি রোপ ছাড়বেন না।'

জাহাজের নিচে থেকে গুরু-গম্ভীর একটা আওয়াজ ভেসে এল—বয়লারের ওপর দিয়ে ঠাণ্ডা পানির বন্যা বয়ে যাওয়ায় ওগুলো বিস্ফোরিত হয়েছে। জাহাজের সামনের অংশ ঝাঁকি খেলো, তারপর থরথর করে কাঁপতে শুরু করল। মাঝখানটা যত তলিয়ে যাচ্ছে ততই উঁচু হচ্ছে বো। মান্ধাতা আমলের লম্বা স্মোকস্টাক-এর অবলম্বন হিসেবে যে কেবলগুলো ছিল, প্রচণ্ড টান সহ্য করতে না পেরে ছিঁড়ে গেল। পানি উঠে এল লাইফ র‍্যাফটের লেভেলে, বয়ান্সির কারণে মাউন্ট থেকে আলাদা হয়ে ভাসতে শুরু করল। শেষবার ক্যাপটেন ওয়াকারকে দেখতে পেলেন ঝাঁঝর সিং-হুইলহাউসের দরজা দিয়ে ভেতরে পানি ঢুকছে, ঘুরপাক খাচ্ছে তাঁর পায়ের চারপাশে। জাহাজের সঙ্গেই ডুববেন, এই প্রতিজ্ঞায় অটল ক্যাপটেন শক্ত হাতে হেলম ধরে আছেন, দাঁড়িয়ে আছেন ঠিক যেন একটা পাথরের মূর্তি।

জাহাজ ডুবে গেল। পানির আলোড়ন থেকে সরে এল ওদের লাইফ র‍্যাফট। ম্যান্ডারিন ও ক্যান্টনিজ ভাষায় লোকজন সাহায্যের আশায় চিৎকার করে কাঁদছে, কিন্তু সাড়া দেয়ার কোন উপায় নেই। সারি সারি বিশাল আকৃতির ঢেউ আর বাতাসের গর্জনে প্রিয় সহকর্মীরা হারিয়ে গেল, অসহায় ঝাঁঝর সিং নীরবে শুধু কাঁদতে পারলেন। ওদেরকে কেউ উদ্ধার করতে আসবে না। রাডারে অদৃশ্য হতে দেখতে পাবে, এত কাছে অন্য কোন জাহাজ নেই। প্রিন্সেস হিয়া লিয়েন থেকেও সাহায্য চেয়ে কোন মেসেজ পাঠানো হয়নি।

'বডি হিট পাবার জন্যে তিনজনকে জড়াজড়ি করে থাকতে হবে,' ঝাঁঝর সিং বাকি দু'জনকে বললেন। 'সকাল পর্যন্ত টিকে যেতে পারলে সম্ভাবনা আছে কেউ আমাদেরকে দেখতে পাবে।'

রাতের গাঢ় অন্ধকারকে সরিয়ে দিয়ে ঘন কালো মেঘে ঢাকা আকাশ নিয়ে হাজির

হলো ভৌতিক সকাল, বাতাসে এত বেশি তুষার যে দশ হাত দূরেও দৃষ্টি চলে না। তবে প্রকৃতির দয়াই বলতে হয়, বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় বিশ মাইলে নেমে এসেছে, ঢেউও এখন আর দশ ফুটের বেশি উঁচু হচ্ছে না। ওদের র‍্যাফ্‌ট বা ভেলা নিরেট ও মজবুত বটে, তবে পুরানো মডেলের হওয়ায় অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে প্রয়োজনীয় ইমার্জেন্সী ইকুইপমেন্ট নেই। আরোহীরা উদ্ধার পাবার আগে পর্যন্ত ব্যক্তিগত সাহস ছাড়া আর কিছুর সাহায্য পাবে না।

কয়েক প্রস্থ কাপড় পরে থাকায় রাতে তেমন ভুগতে হয়নি ঝাঁঝর সিং আর ক্যারিনাকে। কিন্তু কোট ছাড়া শুধু ইউনিফর্ম পরে থাকায় ঠাণ্ডায় জমে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগোচ্ছেন জেনারেল কাও। ইউনিফর্মে আর মাথার চুলে তুষার জমে শক্ত বরফ হয়ে গেছে। শেষ রাতের দিকে নিজের গা থেকে কোট খুলে জেনারেলকে পরতে দিয়েছেন ঝাঁঝর সিং। সকাল হতে দেখা গেল সেটাতেও বরফ জমেছে। ক্যারিনা বুঝতে পারল, ভদ্রলোক বাঁচবেন না।

ঢেউগুলো র‍্যাফ্‌টটাকে নিয়ে যেন খেলছে। পানির ঢাল বেয়ে নামার সময় প্রতিবার ভয় জাগে মনে, এবার আর উঠতে পারবে না। কিন্তু পরবর্তী ঢেউ ছুটে আসার আগে ঠিকই নিজেকে সিধে করে নেয় ওটা, প্রস্তুতি নিয়ে অপেক্ষা করে আরেকটা ঢেউয়ের মাথায় চড়ার। সে তার আরোহীদের একবারও ঠাণ্ডা পানিতে ছুঁড়ে ফেলেনি।

প্রতি ঘণ্টায় একবার করে হাঁটুর ওপর সিধে হয়ে চারদিকে চোখ বুলাচ্ছেন ঝাঁঝর সিং, ভেলা যখন কোন ঢেউয়ের মাথায় থাকে। বৃথা চেষ্টা। বাতাসে তুষারের পরিমাণ খানিকটা কমলেও চারদিকে দেখার কিছু নেই। রাতে ওরা কোন আলো দেখেননি, দিনেও না কোন জাহাজের কাঠামো দেখতে পাচ্ছেন, না কোন তটরেখা।

ক্যারিনা কথা বলার জন্যে মুখ খুলতেই তার দু'সারি দাঁত পরস্পরের সঙ্গে বাড়ি খেলো। 'কাছাকাছি জাহাজ থাকতে বাধ্য!'

মাথা নাড়লেন ঝাঁঝর সিং। 'কই, কিছুই তো দেখছি না।' স্ত্রীকে বললেন না যে দৃষ্টিসীমা এখনও মাত্র পঞ্চাশ গজ।

'মিরাকলকে ফেলে আসায় নিজেকে আমি কোনদিন ক্ষমা করতে পারব না,' বিড়বিড় করল ক্যারিনা, চোখ বেয়ে পানি গড়াচ্ছে, খানিক পরেই সেই পানি বরফ হয়ে যাচ্ছে।

'আমি দায়ী,' সান্ত্বনা দিলেন ঝাঁঝর সিং। 'কেবিন থেকে বেরিয়ে আসার সময় আমারই উচিত ছিল বুকে তুলে নেয়া।'

'মিরাকল?' জানতে চাইলেন জেনারেল কাও।

'আমার প্রিয় ড্যাশান্ড,' বলল ক্যারিনা।

'আপনি একটা কুকুর হারিয়েছেন।' হঠাৎ বসে পড়লেন জেনারেল। 'আপনি একটা কুকুর হারিয়েছেন?' পুনরাবৃত্তি করলেন তিনি। 'আর আমি কি হারিয়েছি জানেন? আমি হারিয়েছি আমার দেশের হৃৎপিণ্ড আর আত্মা–,' কথা শেষ করতে পারলেন না, কাশতে শুরু করলেন। শারীরিক যন্ত্রণার ছাপ নগ্নভাবে ফুটে উঠেছে চেহারায়, চোখের দৃষ্টিতে সর্বস্ব হারানোর হতাশা, দেখে মনে হবে জীবন তাঁর

কাছে সম্পূর্ণ অর্থহীন হয়ে পড়েছে। বেশ কিছুক্ষণ কাশার পর থামলেন তিনি, বললেন, 'আমি আমার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছি। এখন মরে যাওয়াটাই আমার জন্যে সম্মানজনক।'

'বোকার মত কথা বলবেন না,' ঝাঁঝর সিং মৃদু তিরস্কার করলেন। 'একটু ধৈর্য ধরুন, এই বিপদ আমরা কাটিয়ে উঠব।'

মনে হলো জেনারেল তাঁর কথা শুনতে পেলেন না। যেন হাল ছেড়ে দিয়ে স্থির হয়ে গেলেন ভদ্রলোক। ক্যারিনা তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে ছিল। অনুভব করল, চোখ জোড়ার পিছনে একটা আলো যেন নিভে গেল। দৃষ্টিতে এখন চকচকে একটা ভাব, খোলা কিন্তু কিছু দেখতে পাচ্ছেন না। বিড়বিড় করল সে, 'উনি বোধহয় মারা গেছেন।'

'ওঁর গায়ে হেলান দাও, জড়িয়ে ধরো,' ঝাঁঝর সিং বললেন। 'বাতাস আর পানির ঝাপটা থেকে বাঁচাতে হবে। আমি এদিক থেকে জড়িয়ে রাখি।'

ক্যারিনার গায়ে কয়েক প্রস্থ কাপড় থাকায় জেনারেলের শরীর অনুভবই করতে পারছে না সে। বিশ্বস্ত সঙ্গদাত্রী বাচ্চা কুকুরটাকে হারিয়েছে, ডুবে যেতে দেখেছে স্বামীর প্রিয় জাহাজ প্রিন্সেস হিয়া লিয়েনকে, তারপর সারারাত একটা ভেলায় শুয়ে প্রবল তুষার ঝড় আর হিংস্র জলোচ্ছ্বাসের তর্জন-গর্জন শুনেছে–সব যেন একটা দুঃস্বপ্নের ভেতর ঘটে যাচ্ছে। দু'জন পুরুষকে আরও শক্তভাবে জড়িয়ে ধরল সে, একজন জীবিত, অপরজন মারা গেছে।

দিনের পর আবার রাত এল। ঝড় ধীরে ধীরে থামছে, কিন্তু খুনী ঠাণ্ডা বাতাস থেকে রেহাই পাচ্ছে না ওরা। ক্যারিনার হাত আর পায়ে কোন সাড়া নেই। মাঝে-মধ্যেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলছে সে। আধবোজা চোখে ঘুম এসে গেলে স্বপ্নও দেখছে–সাদা বালি ঢাকা সৈকত, পাম গাছের ছায়ায় স্বামীর পাশে বসে আছে, বালির ওপর ছুটোছুটি করছে মিরাকল, চোখাচোখি হতেই ঘেউ-ঘেউ করছে ওটা। স্বামীর সঙ্গে কথা বলছে সে, যেন টেবিলে বসে রেস্তোরাঁর ওয়েটারকে এইমাত্র অর্ডার দেয়া হয়েছে লাঞ্চের। বাবাকেও দেখতে পেল ক্যারিনা, ক্যাপটেনের ইউনিফর্ম পরে আছেন। র‍্যাফ্‌টে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি, একটু ঝুঁকে মেয়ের দিকে তাকিয়ে, হাসছেন মিটিমিটি। তাকে বললেন, 'চিন্তা কি? এই তো কাছেই তীর।' পরমুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেলেন তিনি।

'ক'টা বাজে?' কর্কশ গলায় জানতে চাইল সে।

'বিকেল। সন্ধে হতে আর বেশি দেরি নেই,' জবাব দিলেন ঝাঁঝর সিং। 'জাহাজ ডুবে যাওয়ার খানিক পরই আমার ঘড়ি বন্ধ হয়ে গেছে।'

'এই ভেলায় আমরা কতক্ষণ হলো ভাসছি?'

'এই ধরো আটত্রিশ ঘণ্টা, জাহাজ ডোবার পর থেকে।'

'তীর আর বেশি দূরে নয়,' বিড়বিড় করল ক্যারিনা।

'কি ভেবে কথাটা বললে, ডার্লিং?'

'বাবা আমাকে বলে গেলেন।'

'তোমার বাবা? বলে গেলেন?' ভুরু আর গোঁফে বরফ জমেছে, তারই ফাঁক দিয়ে সস্নেহ হাসি হেসে বললেন ঝাঁঝর সিং। মাথা আর চুল থেকে বরফের ঝুরি

ঝুলছে, সায়েন্স ফিকশন মুভি থেকে বেরিয়ে আসা দক্ষিণ মেরুর একটা দানব মনে হচ্ছে তাঁকে। ক্যারিনা ভাবল, কি জানি আমাকেও ওরকম দেখাচ্ছে কিনা।

'কেন, তুমি দেখতে পাচ্ছ না?'

ঠাণ্ডায় জমে আড়ষ্ট হয়ে গেছেন ঝাঁঝর সিং, বহু কষ্টে বসতে পারলেন। দিগন্তে চোখ বুলালেন তিনি। তুষারের চাদর সব ঢেকে রেখেছে, বেশি দূর দৃষ্টি চলে না। তবু চেষ্টা করছেন যদি কিছু চোখে পড়ে। এক সময় মনে হলো দৃষ্টি তাঁর সঙ্গে ছলনা করছে। ওটা কি তটরেখা? কিনারায় ওগুলো ছড়িয়ে রয়েছে বড় আকৃতির বোল্ডার? মাত্র পঞ্চাশ গজ দূরে তুষার মোড়া আকৃতিগুলো কি গাছ, বাতাসে দোল খাচ্ছে? ওগুলোর মাঝখানে একটা ছোট কেবিনের কাঠামোও তো দেখা যাচ্ছে।

শরীরের সমস্ত জয়েন্ট অবশ হয়ে গেছে, কোন সাড়া দিচ্ছে না; কোন রকমে পা থেকে একটা বুট খুলে সেটাকে বৈঠা হিসেবে ব্যবহার করছেন ঝাঁঝর সিং। মাত্র কয়েক মিনিট পরই গরম হয়ে উঠল শরীর, খাটনিটুকু গায়ে লাগছে না। 'ধৈর্য ধরো, ডার্লিং। একটু পরই ডাঙায় পা ফেলব আমরা।'

ক্যারিনা সাড়া দিল না। ঠাণ্ডায় থরথর করে কাঁপছে শরীরটা।

ভেলার তলায় জলমগ্ন পাথর ঠেকল। বুটটা আবার পরে নিলেন ঝাঁঝর সিং, লাফ দিয়ে অগভীর পানিতে পড়লেন। একটা বড় বোল্ডারে পা দিয়ে পড়েছেন, পানি কোমর সমান উঁচু। 'রিনা! ক্যারিনা!' উল্লাসে চিৎকার করছেন তিনি, যদিও গলা থেকে দুর্বল চিঁচিঁ আওয়াজ বেরুচ্ছে। 'তীরে পৌঁছেছি আমরা! আমরা বেঁচে গেছি!'

ক্যারিনা নড়ল না। শুধু বলতে পারল, 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, সিং।'

ভেলাটাকে টেনে তীরের কাছাকাছি নিয়ে এলেন ঝাঁঝর সিং। ক্যারিনাকে বুকে তুলে বয়ে আনলেন সৈকতে, শুইয়ে দিলেন একটা বোল্ডারের ওপর। তারপর ঘাড় ফেরাতেই দেখলেন ভেলাটা ভেসে গেছে দূরে, জেনারেল চিউয়েন কাও-এর লাশ সহ। কয়েক সেকেন্ড সেদিকে তাকিয়ে থাকলেন তিনি, তারপর আবার ক্যারিনাকে বুকে তুলে নিলেন, রওনা হলেন কেবিনটার দিকে।

তিন দিন পর কার্গো শিপ ডেভিড সেলার্স লাশ সহ একটা ভেলা দেখতে পেয়েছে বলে রিপোর্ট করল। পরে লাশটা উদ্ধার করা হয়। মৃত লোকটাকে চীনা বলে সন্দেহ করা হলো, দেখে মনে হলো বরফ খোদাই করে তৈরি করা হয়েছে তাকে। লাশটা সনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। এত পুরানো মডেলের লাইফ র‍্যাফ্‌ট, প্রায় বিশ বছর আগে ব্যবহার করা হত। তবে ভেলার গায়ে চীনা হরফে কিছু লেখা পাওয়া গেল। অনুবাদ করার পর জানা যায়, প্রিন্সেস হিয়া লিয়েন নামে কোন জাহাজ থেকে পানিতে নামানো হয় ওটাকে।

তল্লাশীও চালানো হয়, তবে টুকরো-টাকরা যে-সব আবর্জনা পাওয়া গেল সেগুলো পরীক্ষা করার জন্যে সংগ্রহ বা উদ্ধার করা হয়নি। পানিতে কোন তেল পাওয়া যায়নি। কোন জাহাজ নিখোঁজ হয়েছে বলেও কেউ রিপোর্ট করেনি। জাহাজ বা তীর থেকে কোন ডিসট্রেস কলও কেউ শোনেনি।

রহস্য আরও জটিল হয়ে উঠল যখন জানা গেল যে প্রিন্সেস হিয়া লিয়েন নামে একটা জাহাজ এক মাস আগে চিলি উপকূলে ডুবে গেছে।

ভেলায় পাওয়া লাশটা মাটিতে পুঁতে ফেলা হলো। অদ্ভুত, রহস্যময় ঘটনাটার কথা দ্রুত ভুলে গেল মানুষ।

দুই

ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরে আসছে, সেই সঙ্গে নিজের মৃত্যু কামনা করছে দীপালি সেন। কোমর থেকে শরীরের ওপরের অংশে প্রবল জ্বালা আর তীব্র ব্যথা, যেন কেউ আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। দাঁতে দাঁত চেপে গোঙাচ্ছে ও, চিৎকার করে কেঁদে উঠতে ইচ্ছে হলেও শক্তিতে কুলাচ্ছে না। ক্ষতবিক্ষত একটা হাত তুলে আঙুলের ডগা দিয়ে আলতোভাবে স্পর্শ করল মুখ। একটা চোখ অসম্ভব ফুলে পুরোটাই বুজে গেছে। অপর চোখটাও ফোলা, তবে আংশিক খুলতে পারছে। ভেঙে গেছে নাক, দুটো ফুটো দিয়েই রক্ত গড়াচ্ছে। অনুভব করল মাড়িতে এখনও গেঁথে আছে দাঁতগুলো, একটাও ভাঙেনি বা নড়বড় করছে না। তবে পেট, পিঠ, পাঁজর, হাত আর কাঁধে প্রচণ্ড ব্যথা।

প্রথমে দীপালি বুঝতে পারেনি একা শুধু ওকেই কেন ইন্টারোগেট-এর জন্যে বেছে নেয়া হয়েছে। নির্দয় পাষণ্ডরা শারীরিক নির্যাতন শুরু করার ঠিক আগের মুহূর্তে বুঝতে পারে, যে না, জাহাজের বারোশো আরোহীর মধ্যে থেকে অনেককেই ফেলে দেয়া হয়েছে কার্গো হোল্ডের অন্ধকার কমপার্টমেন্টে। ফেলে দেয়ার আগে নিশ্চয় তাদের ওপরও চালানো হয়েছে অকথ্য অত্যাচার। দিশেহারা বোধ করছে ও, কোন কিছুই স্পষ্ট বুঝতে পারছে না। বারবার শুধু মনে হচ্ছে ঈশ্বর পুরুষকে এত শক্তি কেন দিলেন যাতে তারা দুর্বল নারীর ওপর এরকম পৈশাচিক নির্যাতন চালাতে পারে। আবার জ্ঞান হারাতে ইচ্ছে করছে ওর, ইচ্ছে করছে মরে যেতে।

তাইওয়ানের তাইপে বন্দর থেকে রওনা হয়েছে জাহাজটা, প্রশান্ত মহাসাগর ধরে চলে এসেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপকূলে। জাহাজটার নাম সান বার্ড, সাধারণ ক্রুজ শিপ-এর মত দেখতে, খোলটা ওয়াটারলাইন থেকে চিমনি পর্যন্ত সাদা রঙ করা। ছোট আকৃতির যে-কোন ক্রুজ শিপে এক থেকে দেড়শো লোক আরাম-আয়েশের সঙ্গে ভ্রমণ করতে পারে, সেক্ষেত্রে সান বার্ড আকারে খুব একটা বড় না হওয়া সত্ত্বেও সব মিলিয়ে বহন করছে বারোশো আদম সন্তানকে। এদের মধ্যে বেশিরভাগই চীনা। তবে ভারতীয়, বাংলাদেশী, কোরিয়ান আর পাকিস্তানীদের সংখ্যাও কম নয়। সবাই ওরা অবৈধ পথে 'সব পেয়েছির দেশ' আমেরিকায় পৌঁছুতে চায়। সান বার্ডকে বাইরে থেকে দেখে মনে হয় নিরীহদর্শন প্রমোদতরী, ভেতরটা আসলে ক্ষুৎ-পিপাসা ও নির্যাতনে কাতর বারোশো মানুষের জন্যে স্রেফ একটা নরককুণ্ড। অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে যথেষ্ট খাবার ও পানি নেই, পয়ঃনিষ্কাশন পদ্ধতি প্রায় অনুপস্থিত, হাঁটাচলা করার সুযোগ নেই–শিশু আর বয়ঃবৃদ্ধরা

অনেকেই মারা গেছে। ল্যাশগুলো সরিয়ে ফেলা হয়েছে, কেউ জানে না কোথায়। দীপালির ধারণা, আবর্জনার মত ওগুলোকে ফেলে দেয়া হয়েছে সাগরে।

সান বার্ড আমেরিকার উত্তর-পুব উপকূলে পৌঁছুবার আগের দিন জাহাজের একদল অফিসার ত্রিশ কি চল্লিশজন আরোহীকে এক জায়গায় জড়ো করল, তারপর আলাদা একটা কমপার্টমেন্টে পালা করে শুরু হলো ইন্টারোগেশন। এই অফিসারদের এনফোর্সার বলা হয়, হংকং ত্যাগ করার পর থেকেই জাহাজে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে তারা। এক সময় এল দীপালির পালা। কমপার্টমেন্টে ঢুকে দেখে স্মাগলিং অপারেশনের চারজন এনফোর্সার একটা টেবিলের পিছনে বসে আছে। টেবিলের সামনে একটা চেয়ার, ওটায় ওকে বসতে বলা হলো তারপর শুরু হলো জেরা।

এনফোর্সাররা কালোর ওপর নীল ডোরাকাটা দামী কাপড়ের স্যুট পরে আছে, সবাই তারা তাইওয়ানিজ চীনা, হলদেটে মাখনের মত গায়ের রঙ। সবারই অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা, তবে ঠাণ্ডা নির্লিপ্ত ভাব বরফের কথাই মনে করিয়ে দেয়। দীপালি সম্পর্কে সমস্ত তথ্য তাদের ফাইলে আছে, তাসত্ত্বেও নতুন করে প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর চাওয়া হলো। দীপালি জানাল যে সে বাংলাদেশী নাগরিক। ঢাকায় নার্সিঙে ডিপ্লোমা করেছে। কিন্তু চাকরি না পাওয়ায় বেকার ছিল, এই সময় স্থানীয় একটা ম্যান পাওয়ার এজেন্সি 'আমেরিকায় যাবার সুবর্ণ সুযোগ' শিরোনামে বিজ্ঞাপন দেয়ায় তাদের ঠিকানায় যোগাযোগ করে সে। এজেন্সির লোকেরা প্রস্তাব দেয় পাঁচ লাখ টাকার বিনিময়ে তারা ওকে প্রথমে সিঙ্গাপুরে, তারপর আমেরিকায় পাঠিয়ে দেবে। সিঙ্গাপুরে পাঠানোর জন্যে প্রথমে তারা দু'লাখ টাকা নেয়। সিঙ্গাপুরে নিয়ে আসার পর জানানো হয় তিন থেকে চার মাস পর ওকে আমেরিকাগামী একটা জাহাজে তুলে দেয়া হবে। এই ক'মাস তাকে একটা ক্লিনিকে প্রায় বিনা বেতনে কাজ করতে হয়েছে। তারপর ওকে সান বার্ডে তুলে দেয়ার জন্যে তাইপেতে নিয়ে আসা হয়, বাকি তিন লাখ টাকা দেয়ার পর।

প্রশ্ন করা হলো, দীপালি চীনা ভাষা শিখল কোত্থেকে? দীপালি জবাব দিল, সিঙ্গাপুরে যে ক্লিনিকে সে কাজ করেছে সেখানে ডাক্তার থেকে শুরু করে সমস্ত স্টাফ চীনা, তাদের সঙ্গে থাকতে থাকতে শিখে নিয়েছে। তারপর জিজ্ঞেস করা হলো, আমেরিকায় যাবার পাঁচ লাখ টাকা তুমি পেলে কোত্থেকে? দীপালি জবাব দিল, ওর বাবা দিয়েছেন। পরবর্তী প্রশ্ন, আমেরিকায় তোমার কোন আত্মীয়স্বজন আছে? দীপালি মাথা নাড়ল।

এনফোর্সারদের একজন বলল, 'তোমার প্রতিটি কথাই মিথ্যে। তুমি আসলে একজন স্পাই, আমাদের স্মাগলিং অপারেশন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্যে সান বার্ডে উঠেছ।'

অভিযোগটা এমনই অপ্রত্যাশিত, হকচকিয়ে গেল দীপালি। তারপর নিজেকে কোন রকমে সামলে নিয়ে বলল,'আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি না। আমি একজন নার্স। আমাকে আপনি স্পাই বলছেন কেন?'

'আমাদের কাছে তথ্য আছে, এক বছর আগেও তুমি সিঙ্গাপুর আর তাইওয়ানে এসেছিলে–তবে ঢাকা থেকে নয়, ওয়াশিংটন থেকে।'

'এ-সব কি বলছেন আপনি!'

'তোমার ইংরেজি এত শুদ্ধ হয় কিভাবে?' এনফোর্সার জিজ্ঞেস করল। 'তাতে আমেরিকান বাচনভঙ্গি আসে কোথেকে?'

দীপালি রেগে গিয়ে জানতে চাইল, 'কে আপনি? আমার সঙ্গে বিনা কারণে এরকম নিষ্ঠুর আচরণ করছেন কেন?'

'আমি চুয়াং চু, এনফোর্সারদের হেড,' অফিসার বলল। 'এবার আমার শেষ প্রশ্নের জবাব দাও।' একটা ফাইল খুলল সে। 'তোমার ফাইলে দেখা যাচ্ছে আমরা তোমার কাছ থেকে আরও দশ হাজার মার্কিন ডলার পাব। টাকাটা এখনও তুমি দাওনি কেন?'

'কি আশ্চর্য! এ-সব কি বলছেন! আমার সঙ্গে কথা হয়েছে বাংলাদেশী পাঁচ লাখ টাকা দিলেই আমাকে আমেরিকায় পৌঁছে দেয়া হবে।'

'কার সঙ্গে কথা হয়েছে?'

'যারা আমাকে ঢাকা থেকে সিঙ্গাপুর, সিঙ্গাপুর থেকে তাইপেতে নিয়ে এসে সান বার্ডে তুলে দেয়।'

'তুমি আসলে ভুল বুঝেছ। ওরা তোমাকে সান বার্ডে তুলে দেয়া বাবদে পাঁচ লাখ টাকা নিয়েছে,' বলল চীফ এনফোর্সার। 'আমেরিকায় ওরা নয়, আমরা তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি। এর জন্যে দশ হাজার ডলার দেবে তুমি।'

'কিন্তু আমার কাছে তো আর কোন টাকাই নেই!'

'সেক্ষেত্রে তোমাকে তাইওয়ানে ফিরে যেতে হবে।'

'না, প্লীজ! আমার সর্বনাশ হয়ে যাবে!'

চীফ এনফোর্সার সকৌতুকে বাকি তিন সঙ্গীর দিকে তাকাল। তারা যেন একেকটা পাথরের মূর্তি। অফিসার এবার গলার সুর নরম করে বলল, 'ঠিক আছে, সেক্ষেত্রে বিকল্প একটা পথ বেছে নিতে হবে তোমাকে।'

'আপনারা যা বলবেন তাই করব আমি,' মিনতি করল দীপালি।

'তোমাকে আমরা আমেরিকার মাটিতে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে দেব, চাকরিও পাইয়ে দেব, বিনিময়ে তুমি যা বেতন পাবে তার অর্ধেক কেটে রাখব আমরা। চুক্তিটা হবে পাঁচ বছরের। তুমি রাজি হলে এখুনি চুক্তিনামায় সই করতে হবে। এখানে আরও একটা কথা পরিষ্কার হয়ে যাওয়া দরকার। তুমি বাংলাদেশে ডিপ্লোমা করেছ, আমেরিকায় ওই সার্টিফিকেটের কোন দাম নেই।'

দীপালি হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকল। 'তাহলে?'

কোদাল আকৃতির হলুদ দাঁত বের করে অশ্লীল হাসি হাসল চুয়াং চু। 'একটাই উপায় আছে। তোমাকে পুরুষ মানুষের মনোরঞ্জনের পেশায় নাম লেখাতে হবে।'

তাহলে এই ব্যাপার! দীপালির যেন চোখ খুলে গেল। পাঁচ লাখ টাকায় আমেরিকায় পৌঁছে দেয়ার কথা বলে এরা আসলে ম্যানপাওয়ারের ব্যবসা করছে না, মেয়েদেরকে দিয়ে দেহ ব্যবসা করাচ্ছে। ও যদি পুরুষ হত তাহলে হয়তো ড্রাগ বিক্রি করার প্রস্তাব দেয়া হত। 'প্রস্টিটিউশন?' আঁতকে উঠল দীপালি। 'আপনাদের স্পর্ধা...'

'ইয়েস অর নো?' জানতে চাইল চুয়াং চু। 'তুমি সুন্দরী ও যুবতী, পাঁচ বছর

এই ব্যবসা চালিয়ে যেতে পারলে আমাদের ঋণ শোধ করার পরও প্রচুর টাকা জমাতে পারবে, সারা জীবন আর খেটে খেতে হবে না। রাজি থাকলে বলো, আজ রাতে আমি...'

'অসম্ভব! আমি ভদ্র পরিবারের মেয়ে। এই নোংরা পথে যাবার আগে আমি বরং আত্মহত্যা করব...'

'ঠিক আছে,' বলল চুয়াং চু। 'তুমি এখন যেতে পারো।' চেয়ার ছেড়ে কোটের পকেটে হাত ভরল সে।

চেয়ার ছাড়ল দীপালিও, রাগে থরথর করে কাঁপছে। বুঝতে পারেনি কখন ওর ঠিক পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে চুয়াং চু। লোকটা পকেট থেকে ফুট দেড়েক লম্বা একটা রাবার হোস বের করেছে, সেটা দিয়ে সপাং সপাং করে দীপালির পিঠে আঘাত শুরু করল। ব্যথায় ও বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল দীপালি। ঘুরে দাঁড়াল, দু'হাত দিয়ে হোসটা ঠেকাবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে। প্রবল আক্রোশে চুয়াং চুর ঠোঁট ভাঁজ হয়ে মুখের ভেতর ঢুকে গেছে, হোসটা বিদ্যুৎ বেগে বারবার নেমে আসতে লাগল দীপালির চোখে-মুখে, কাঁধে আর পাঁজরে। তারপর এগিয়ে এসে দীপালির মাথার চুল খামচে ধরল সে, হিসহিস করে বলল, 'এবার হয়তো তুমি তোমার সিদ্ধান্ত পাল্টাবে।'

'না, কোনদিন না!' রক্তাক্ত ও ফোলা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে কোন রকমে বলল দীপালি। 'তার আগে আমি মারা যাব।'

'আচ্ছা!' কথা শেষ করেই হোসটা দিয়ে দীপালির মাথায় আঘাত করল চুয়াং চু।

ডেকের ওপর লুটিয়ে পড়ল দীপালি।

টেবিলে ফিরে এসে ফোনটা তুলল চুয়াং চু, মাউথপীসে বলল, 'ফকিরনীটাকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাও। যারা ওরিয়ন লেকে যাবে তাদের সঙ্গে রাখো ওকে।'

'আরেকবার চেষ্টা করে দেখবেন না?' টেবিলের আরেক মাথা থেকে একজন এনফোর্সার জিজ্ঞেস করল, 'জিনিসটা তোফা ছিল, সিন্ডিকেট ভাল পয়সা কামাত।'

মাথা নেড়ে দীপালির নিঃসাড় শরীরটার দিকে তাকাল চুয়াং চু। রক্তে ভেসে যাচ্ছে দীপালি। 'ফকিরনী বললাম বটে, কিন্তু ওকে আমার অন্য রকম সন্দেহ হচ্ছে। বসের কোটি কোটি ডলারের ব্যবসা এটা, কোন রকম ঝুঁকি নিয়ে সেই ব্যবসার নিরাপত্তা আমি নষ্ট করতে পারি না। দীপালি সেনের মরার ইচ্ছেই পূরণ হবে।'

দীপালি আসলে নার্স নয়, তবে যে চীনা বৃদ্ধা ওর সেবা-শুশ্রূষা করলেন তিনি জানালেন যে তাঁর নার্সিঙে ট্রেনিং নেয়া আছে। সঙ্গে একটা ফার্স্ট-এইড-কিট থাকায় নির্যাতিত অনেককেই প্রাথমিক চিকিৎসা দিতে পারছেন তিনি। দীপালির ক্ষতগুলো ডিজইন-ফেকট্যান্ট দিয়ে ধুয়ে দিলেন, দুটো পেইনকিলার ট্যাবলেটও খেতে দিলেন। মায়ের কোলে ছোট একটা ছেলে ফোঁপাচ্ছে দেখে তাড়াতাড়ি

সেদিকে চলে যেতে হলো তাঁকে।

আধ বোজা একটা মাত্র চোখ দিয়ে পরিবেশটা বোঝার চেষ্টা করছে দীপালি। ব্যথা একটু কমে আসতে নতুন করে মনে পড়ল কিভাবে এখানে এসেছে ও। ও নার্স নয়, ওর নামও দীপালি নয়। ওর মা-বাবার বিয়ে হয় ঢাকায়, আজ থেকে বত্রিশ বছর আগে, বিয়ের পরপরই তাঁরা আমেরিকায় লেখাপড়া করতে চলে যান। তিন বছর পর গ্রীন কার্ড পান ওঁরা, গ্রীন কার্ড পাবার এক বছর পর ক্যালিফোর্নিয়ার সান ফ্রান্সিসকোয় জন্ম হয় ওর। বাবা-মা দু'জনেই বর্তমানে আমেরিকায় অধ্যাপনা করেন। বাবার নাম সুলতানউদ্দিন আহমেদ। মেয়ের নাম রাখা হয় শাকিলা সুলতান। মা-বাবা দু'জনেই ইমিগ্র্যান্ট আমেরিকান, কিন্তু মেয়ে শাকিলা বাঙালী হলেও জন্মসূত্রে আমেরিকান। সান ফ্রান্সিসকোর চীনাপল্লীর পাশেই ওদের বাড়ি, ফলে ছোট বেলা থেকেই অনেক চীনা বন্ধু-বান্ধব পেয়েছে ও, সেই সঙ্গে ওদের ভাষাটাও খুব ভালভাবে শিখে নিতে পেরেছে।

ইউনিভার্সিটি থেকে বেরিয়ে চাকরি খুঁজছিল শাকিলা, রোদ ঝলমলে এক সকালে চাকরি নিজেই এসে হাজির হলো ওদের বাড়ির দরজায়। ইউনাইটেড স্টেটস ইমিগ্রেশন অ্যান্ড ন্যাচারালাইজেশন সার্ভিস-এর একটা শাখা হলো ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স ইনভেস্টিগেশন ডিভিশন। এই ডিভিশন শ্বেতাঙ্গ নয় অথচ আমেরিকান, আমেরিকান অথচ মাতৃভাষা না হওয়া সত্ত্বেও চীনা ভাষায় পটু, এরকম একটা মেয়ে খুঁজছিল। ইউনিভার্সিটিগুলোতে খোঁজ নেয় তারা, ফলে শাকিলার ঠিকানা যোগাড় করতে অসুবিধে হয়নি।

মোটা বেতন, দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানোর সুযোগ, চাকরিটায় আবার রোমাঞ্চ আর অ্যাডভেঞ্চারও আছে, ফলে ওদের প্রস্তাবে স্পেশাল আন্ডারকভার এজেন্ট হতে রাজি হয়ে যায় শাকিলা।

দেড় বছরের একটা ট্রেনিং শেষ করতে হয় শাকিলাকে। সেই ট্রেনিঙের অংশ হিসেবেই সিঙ্গাপুর আর তাইওয়ানে যেতে হয় ওকে। তারপর, মাত্র মাস পাঁচেক আগে ওকে পাঠানো হয় ঢাকায়, 'আমেরিকায় যাবার সুবর্ণ সুযোগ' শিরোনামে কোন বিজ্ঞাপন দেখলে দরখাস্ত করার জন্যে। নার্সিঙে ডিপ্লোমাধারী দীপালি সেনের যে কাভার দেয়া হয় ওকে সেটা নিশ্ছিদ্রই বলা যায়, কারণ ঢাকায় ওই নামে ওই ডিগ্রীপ্রাপ্ত একটা মেয়ে সত্যি ছিল। মেয়েটা তার মা-বাবার সঙ্গে গলাধাক্কা পাসপোর্ট নিয়ে ভারতে চলে যাওয়ায় যে শূন্যতা সৃষ্টি হয় সেটাই শাকিলাকে দিয়ে পূরণ করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল, কাজেই কেউ তদন্ত করলে কাভারটা টিকে যাবারই কথা। ওর অ্যাসাইনমেন্ট ছিল তাইওয়ান থেকে পরিচালিত মানুষ পাচারের একটা সিন্ডিকেটের মাধ্যমে হিউম্যান কার্গো হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছানো। তাতে লাভ হবে এই যে স্মাগলিং অপারেশনটা সম্পর্কে প্রচুর তথ্য জানতে পারবে শাকিলা। কথা ছিল তীরে নামার পর ইএনএস-এর অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিস্ট্রিক্ট ডিরেক্টর-এর সঙ্গে যোগাযোগ করবে ও, তিনি সিয়াটল ফিল্ড অফিসে সব রকম প্রস্তুতি নিয়ে অপেক্ষা করবেন, শাকিলার কাছ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া মাত্র যুক্তরাষ্ট্রের সমুদ্রসীমার ভেতর স্মাগলারদের গ্রেফতার করবেন, ভেঙে দেবেন সিন্ডিকেটের নর্থ আমেরিকান পাইপলাইন। কিন্তু এখন শাকিলার

ভাগ্য অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে, ওর এমন কি পালাবার উপায়ও নেই।

ট্রেনিং পাওয়া মেয়ে, নির্যাতনের ধকলটা ধীরে ধীরে সামলে উঠল শাকিলা। তবে ভুল পদ্ধতি গ্রহণ করায় নিজের ওপর খুব রাগ হলো। বেশ্যাবৃত্তিতে নাম লেখাবার প্রস্তাব মেনে নিতে পারত ও, তাহলে হয়তো নিরাপদে তীরে নামার সুযোগটা হাতছাড়া হত না। তবে জেরা করার সময় সন্দেহ হয়েছিল প্রস্তাবটা মেনে নিলেই বরং ওকে তারা স্পাই বলে সন্দেহ করবে। এখন দেখা যাচ্ছে, হিসেবে ওর ভুল হয়েছে। কোন রকম জেদ বা আপত্তি এনফোর্সারদের খেপিয়ে তোলে। প্রায় অন্ধকার কমপার্টমেন্টে যাদেরকে ফেলে রাখা হয়েছে প্রায় সবাই তারা আহত। ওর মনে পড়ল, চুয়াং চু বলেছে, ওদের সবাইকে ওরিয়ন লেকে পাঠানো হবে। কথাটার তাৎপর্য ওর জানা নেই, তবে আন্দাজ করতে পারছে–ওদেরকে সম্ভবত মেরে ফেলাই হবে।

সিয়াটল থেকে নব্বুই মাইল পশ্চিমে ওরিয়ন লেক। ছোট একটা জেনারেল স্টোরের মালিক জন হ্যামারহেড সামান্য একটু ঘাড় ফিরিয়ে দরজায় সদ্য এসে দাঁড়ানো আগন্তুকের দিকে তাকাল। দুর্গম পাহাড়ী এলাকা, লোকসংখ্যা খুবই কম, যানবাহন চলাচল করে এমন সব রাস্তা থেকে দূরত্বও কম নয়, কাজেই নতুন কাউকে দেখলে কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। কৌতূহল আগ্রহে পরিণত হলো, তাকাবার পর আর চোখ ফেরাতে পারছে না হ্যামারহেড। আগন্তুক শ্বেতাঙ্গ নয়, আবার নিগ্রোও নয়–গায়ের রঙ উজ্জ্বল শ্যামলা, দেখে ল্যাতিন আমেরিকান বলে সন্দেহ হলো। বেশ লম্বা, ছ'ফুটের কাছাকাছি হবে। মাথায় কালো চুল ব্যাকব্রাশ করা, কাঁধের কাছে স্তূপ হয়ে আছে। মুখে কয়েক দিনের না কামানো দাড়ি-গোঁফ। বিদেশী কোন পর্যটক, এদিক দিয়ে কোথাও যাবার সময় লেকে মাছ ধরার লোভে থেমেছে? হ্যামারহেড লক্ষ করল, দোকানে না ঢুকে দোরগোড়া থেকেই ডিসপ্লে কেসগুলোর ওপর চোখ বুলাচ্ছে আগন্তুক।

অভ্যাস নেই, তবু আরও কয়েক মুহূর্ত লোকটাকে খুঁটিয়ে দেখল হ্যামারহেড। গায়ের রঙ যাই হোক, রোদে পোড়া ভাবটুকু স্পষ্ট। কাঠামোর তুলনায় শরীরটা রোগা। চেহারায় একাধারে কাঠিন্য ও বিষণ্নতা এত পরিষ্কার, লোকটা যেন জীবনের বহু কিছু দেখে ফেলেছে, পার হয়ে এসেছে কঠিন সব সঙ্কট, আর শোকেও খুব ভুগেছে। দেখে ক্লান্ত মনে হলো, তবে সেটা শারীরিক অর্থে নয়, মানসিক অর্থে–তার ভেতর আবেগ যেন নিঃশেষে ফুরিয়ে গেছে, জীবন সম্পর্কে যেন তার আর কোন মোহ নেই। মৃত্যু এসে টোকা দিয়েছিল কাঁধে, যেভাবেই হোক ফাঁকি দিয়ে বিদায় করেছে তাকে? নিজেকেই প্রশ্ন করল হ্যামারহেড। অথচ, তারপর সে ভাবল, মায়াভরা কালো চোখ দুটো কিন্তু উল্টো কি যেন বলতে চায়–ওখানে শান্ত প্রকৃতির আনন্দ আছে, আর আছে অস্পষ্ট হলেও খানিকটা গর্ব। হ্যামারহেড জানতে চাইল, 'স্যার, আমি কি আপনাকে কোন সাহায্য করতে পারি?' বলার পর বুঝতে পারল 'স্যার'-টা বেরিয়ে গেছে নিজের অজান্তে।

'কিছু গ্রোসারি নিতে এসেছি,' দোকানে ঢুকে আগন্তুক জবাব দিল। একটা বাস্কেটে পছন্দ করা জিনিসগুলো ভরতে শুরু করল সে। 'এদিকে মাছ কেমন

পাওয়া যায়?'

'তারমানে এদিকে দিন কয়েক থাকার প্ল্যান আপনার?' জানতে চাইল হ্যামারহেড।

'আমার এক পুরানো বন্ধু লেকে তার কেবিনটা ধার দিয়েছে। আপনি হয়তো চিনবেন–ডানকান মনরো।'

'চিনি মানে? বিশ বছর ধরে চিনি। ব্যাটা বদমাশ চীনাটা তো শুধু ওর কেবিনটাই কিনতে পারেনি। বলতে হয় এলাকার লোকজন বড় বাঁচা বেঁচে গেছে। মনরো যদি কেবিনটা বিক্রি করে দিত; জেলেরা তাদের বোট নিয়ে লেকে নামার জায়গাই পেত না।'

'হ্যাঁ, আমিও ভাবছিলাম বেশিরভাগ কেবিন ভাঙাচোরা অবস্থায় খালি পড়ে আছে কেন। শুধু একটা বিল্ডিং দেখলাম, লেকের উত্তর দিকটায়, ছোট যে নদীটা পশ্চিম দিকে চলে গেছে তার মুখের উল্টোদিকে। বিল্ডিংটা দেখতে বড় অদ্ভুত, তাই না?'

গ্রোসারির তালিকা তৈরি করছে হ্যামারহেড। 'চল্লিশ দশকের দিকে ওটা ছিল একটা ফিশ ক্যানারি, কোম্পানী লালবাতি জ্বালার পর পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে ছিল। চীনা লোকটা পানির দরে কিনে নিয়ে ফ্যান্সি ম্যানশন বানিয়েছে। একটা নাইন-হোল গলফ কোর্সও তৈরি করেছে। তারপর লোকটা লেকের ধারে যার যত সম্পত্তি ছিল সব কিনতে শুরু করল, সেই বিরানব্বুই সাল থেকে। আপনার বন্ধু, ডানকান মনরোই শুধু নিজের সম্পত্তি বিক্রি করতে রাজি হয়নি।'

'দেখে মনে হয় ওয়াশিংটন আর ব্রিটিশ কলম্বিয়ার অর্ধেক লোকই বিদেশী,' আগন্তুক মন্তব্য করল। 'তাদের মধ্যে বেশিরভাগই চীনা।'

'কমিউনিস্ট সরকার হংকং ফিরে পাবার পাঁচ বছর আগে থেকে চীনারা প্যাসিফিক নর্থ-ওয়েস্টে ঢুকছে বন্যার পানির মত। গত বছর হংকং ব্রিটিশদের হাতছাড়া হয়ে গেছে, এখনও ঝাঁকে ঝাঁকে আসছে তারা। ডাউনটাউন সিয়াটল-এর অর্ধেক আর ভ্যানকুভার-এর প্রায় পুরোটাই এখন বিদেশীদের দখলে। পঞ্চাশ বছর পর জন্মসূত্রে আমেরিকানরা সংখ্যালঘুতে পরিণত হলে আশ্চর্য হবার কিছু থাকবে না।' ক্যাশ রেজিস্টারের টোটাল লিভারে চাপ দিল হ্যামারহেড। 'একশো এক ডলার হয়েছে আপনার।'

মানিব্যাগ থেকে একশো পাঁচ ডলার বের করে বাড়িয়ে ধরল আগন্তুক। 'আপনি যে চীনা লোকটার কথা বলছেন, তার ব্যবসাটা কি?'

'শুনতে পাই তাইওয়ানের একজন শিপিং টাইকুন, হংকঙেও অফিস আছে,' চার ডলার আগন্তুককে ফিরিয়ে দিয়ে প্যাকেটগুলো একটা ব্যাগে ভরে দিচ্ছে হ্যামারহেড। 'কিন্তু এদিকের কেউ আমরা তাকে কখনও দেখিনি। নিজে বোধহয় আসা-যাওয়া করে না। প্রকাণ্ড আকারের ডেলিভারি ট্রাকের ড্রাইভারদেরই শুধু দেখি, আর কাউকে ঢুকতে বা বেরুতে দেখা যায় না। এলাকার লোকজনকে জিজ্ঞেস করে দেখবেন, অদ্ভুত সব কাণ্ড কারখানা ঘটে। চীনা লোকটা যদি আসেও, লেকে সে দিনের বেলা মাছ ধরে না। সে-ও নয়, তার লোকজনও না। বোট মোটরের আওয়াজ আপনি শুধু রাতের বেলা শুনতে পাবেন। বোটে কোন

আলোও থাকে না। ন্যাট বোলান, নদীর কিনারা বরাবর যে শিকার করে বেড়ায় আর ক্যাম্প ফেলে, আমাকে বলেছে সে নাকি মাঝরাতে লেকে একটা অদ্ভুত দর্শন বোটকে প্রায়ই ঘুরে বেড়াতে দেখে, তবে আকাশে চাঁদ থাকলে ওটা বেরোয় না।'

'রহস্য মানুষ পছন্দ করে,' মন্তব্য করল আগন্তুক।

'এদিকে যখন দিন কয়েক আছেন, যদি কোন সাহায্য দরকার হয় জানাবেন। আমার নাম জন হ্যামারহেড।'

স্মিত হেসে আগন্তুক বলল, 'মাসুদ রানা।'

'আপনি কি ল্যাটিন আমেরিকান, মি. রানা?'

মাথা নাড়ল রানা। 'জন্মসূত্রে আমি বাংলাদেশী, তবে সঙ্গে আমেরিকান পাসপোর্ট আছে,' হালকা সুরে বলল ও। 'ওয়াশিংটনের একটা সরকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত–নুমা।'

'নুমা, স্যার?'

'ন্যাশনাল আন্ডারওয়াটার অ্যান্ড মেরিন এজেন্সি,' বলল রানা। 'তবে ভুল বুঝবেন না, ওরিয়ন লেকে আমি স্রেফ বিশ্রাম নিতে এসেছি, কোন কাজে নয়।'

ওপর-নিচে মাথা দোলাল হ্যামারহেড।

দোকান থেকে বেরিয়ে যাবার আগে, দরজার কাছে পৌছে ঘুরে দাঁড়াল রানা। 'স্রেফ কৌতূহল, মি. হ্যামারহেড–চীনা লোকটার নামটা যেন কি?'

রানার দিকে তাকিয়ে থেকে চোখ দুটোয় কি যেন খুঁজল হ্যামারহেড। 'লোকটার নাম হুয়ান। হুয়ান হান।'

'সে কি কাউকে জানিয়েছে পুরানো ক্যানিং ফ্যাক্টরিটা কেন কিনল?'

'সম্পত্তিটা বিক্রি হয় রিয়েল এস্টেট এজেন্ট ডেভিড কিলবার্নের মাধ্যমে। তার বক্তব্য হলো, পানির ধারে নিরিবিলি একটা জায়গা দরকার ছিল হানের, যেখানে সে তার ধনী ক্লায়েন্টদের জন্যে বিলাসবহুল একটা রিট্রিট তৈরি করতে পারবে।' হ্যামারহেডের চেহারায় অসন্তোষ ফুটে উঠল। 'আপনার দেখা উচিত আদর্শ একটা ক্যানারির কি হাল করেছে লোকটা। স্রেফ সময়ের ব্যাপার ছিল, স্টেট হিস্টোরিকাল কমিশন ওটাকে হিস্টোরিক সাইট হিসেবে ঘোষণা করত, কিন্তু তার আগেই হান ওটা দখল করে ফেলে। শুধু কিনে নিলে বা দখল করলেও কথা ছিল না, সে ওটাকে আধুনিক অফিস বিল্ডিং আর প্যাগোডা মিলিয়ে একটা সঙ্কর তৈরি করেছে। আমার দৃষ্টিতে এটা স্রেফ···কি বলব···স্রেফ অ্যাবরশন!'

'হ্যাঁ, দেখতে অদ্ভুত বা অভিনবই লাগে,' বলল রানা। 'প্রতিবেশীদের সঙ্গে লোকটার সম্পর্ক কেমন? শহরের গণ্যমান্য লোকদের পার্টিতে বা গলফ টুর্নামেন্টে দাওয়াত দেয়?'

'আপনি ঠাট্টা করছেন!' রাগ চেপে বলল হ্যামারহেড। 'নিজের সম্পত্তির এক মাইলের মধ্যে কাউকে ঘেঁষতে দেয় না হান, এমন কি মেয়র আর সিটি কাউন্সিলকেও নয়। বললে বিশ্বাস করবেন, মাথায় কাঁটাতার লাগানো দশ ফুট উঁচু একটা চেইন-লিঙ্ক বেড়া তৈরি করেছে লোকটা লেকের প্রায় চারদিকে?'

'এটা সে কিভাবে পারল?'

'রাজনীতিকদের পকেটে কিছু দিলে সবই পারা যায়। হানের তো লেক থেকে

লোকজনকে দূরে সরিয়ে রাখার কোন অধিকারই নেই। লেকটা রাজ্য সরকারের। কিন্তু লেকে নামা কঠিন করে তুলতে পারে সে। করছেও ঠিক তাই।'

'কিছু লোক প্রাইভেসী নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করে,' বলল রানা।

'তাহলে বাড়াবাড়ির মাত্রা সম্পর্কে আপনাকে একটা ধারণা দিতে হয়,' বলল হ্যামারহেড। 'এলাকার চারদিকে সিকিউরিটি ক্যামেরা বসিয়েছে হান। তার সশস্ত্র লোকজন জঙ্গলে টহল দিয়ে বেড়ায়। শিকারী আর জেলেরা ভুল করে ওদিকে পা ফেললে, ঘাড় ধাক্কা দিয়ে ভাগিয়ে দেয়া হয়, যেন মহা অপরাধ করে ফেলেছে।'

'আমাকে তো তাহলে লেকের শুধু আমার দিকটায় থাকতে হবে, নড়াচড়া করা যাবে না।'

'আমিও আপনাকে সেই পরামর্শই দেব।'

'ক'দিন পর আবার দেখা হবে, মি. হ্যামারহেড।'

'ইউ আর ওয়েলকাম, মি. রানা। হ্যাভ আ নাইস ডে।'

দোকানটা থেকে বেরিয়ে এসে আকাশের দিকে তাকাল রানা। গাছপালার পিছনে নেমে গেছে সূর্য। রেন্টাল কার-এর ব্যাক সীটে ব্যাগটা রেখে হুইলের পিছনে উঠে বসল ও। স্টার্ট দিয়ে ছেড়ে দিল গাড়ি। পাঁচ মিনিট পর অ্যাসফল্ট হাইওয়ে থেকে বাঁক নিয়ে নেমে এল মেঠো পথে, ওরিয়ন লেকে মনরো কেবিনের দিকে চলে গেছে সেটা। পথের দু'পাশে দুই মাইল পর্যন্ত দেবদারু, বাঁশ আর হেমলকের জঙ্গল। পথের শেষ সিকি মাইল সরলরেখার মত, তারপর দু'ভাগ হয়ে গেছে, শাখা দুটো লেকের তীর ঘেঁষে দু'দিকে চলে গেছে, মিলিত হয়েছে উল্টোদিকে পৌঁছে–তাইওয়ানিজ শিপিং টাইকুন হুয়ান হানের বাড়াবাড়ির ফসল সেই রিট্রিটটা ওদিকেই। দোকানদার হ্যামারহেডের বর্ণনা মেনে নিতে হলো রানাকে। সাবেক ক্যানারিটাকে আসলেও একটা আর্কিটেকচারাল মিসক্যারিজ-এ রূপান্তরিত করা হয়েছে, গাছপালায় সমৃদ্ধ পাহাড় ঘেরা একটা সুন্দর লেকের ধারে একেবারেই বেমানান। মালিক যেন বাইরে বেরিয়ে থাকা ইস্পাতের কড়ি আর কপার-টিনটেড সোলার গ্লাস দিয়ে আধুনিক একটা কাঠামো খাড়া করতে চেয়েছিল, কাজ খানিক দূর এগোবার পর সিদ্ধান্ত পাল্টে পঞ্চাশ শতকের মিং সাম্রাজ্যের কোন ঠিকাদারকে নিয়োগ করে, বিল্ডিঙের বাকি অংশটুকু তাইওয়ানিজ প্যাগোডার অনুকরণে তৈরি করে ঠিকাদার, ছাদ হিসেবে ব্যবহার করে সোনালি টাইল।

মালিক লোকটা কড়া সিকিউরিটি সিস্টেমের সাহায্যে নিজের সম্পত্তি সুরক্ষিত রাখে, এ-কথা শোনার পর লেকের নিরিবিলি পরিবেশে ছুটি কাটাতে আসা রানার মনে হলো, নিশ্চয়ই ওর ওপরও নজর রাখা হচ্ছে। মাত্র দিন কয়েক হলো এখানে পৌঁছেছে ও, লেকটা দেখলেও, সময় কাটাবার জন্যে লেকের ধারে এখনও বসা হয়নি। বাঁক নিয়ে বাঁ দিকের পথটা ধরল ও, আরও আধ মাইলটাক এগিয়ে থামল কাঠের একটা সিঁড়ির গোড়ায়, সিঁড়িটা উঠে গেছে পর্চ-এ, পর্চটা ঘিরে রেখেছে আকর্ষণীয় একটা লগ কেবিনকে। কেবিন থেকে লেকটা পরিষ্কারই দেখা যায়। গাড়ির ভেতর কয়েক মুহূর্ত বসে থাকল রানা, জঙ্গলের ফাঁকে একজোড়া হরিণকে ঘাস খেতে দেখছে।

আওয়াজ দিয়ে সামুদ্রিক প্রাণী আর দ্বীপবাসী মানুষদের মেরে ফেলছিল হীরক সম্রাট রডনি বুমার, তাকে শায়েস্তা করতে গিয়ে নিমবাস দ্বীপে আটকা পড়ে যায় ও, ঠিক যখন রডনি বুমারের সাউন্ড ওয়েভ ফিরে এসে দ্বীপটার দুটো আগ্নেয়গিরি বিস্ফোরিত হতে সাহায্য করছে। মলি বুমারের ছেলে দুটোকে বাঁচাতে পারলেও, মলিকে রানা বাঁচাতে পারেনি। সেই শোক এখনও কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়নি। তাছাড়া, কাকতালীয়ভাবে ও বেঁচে গেলেও, শরীরটার ওপর দিয়ে এমন সাংঘাতিক ধকল গেছে যে পুরো এক মাস হাসপাতালের বেডে শুয়ে থাকতে হয়েছে ওকে। ক্ষতগুলো এখন আর ব্যথা করে না, সব শুকিয়ে গেছে, কিন্তু শোক আর ভাবাবেগ-জনিত দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে সময় লাগছে।

রানার ওজন দশ পাউন্ড কমে গেছে। সেটা ফিরে পাবার খুব একটা চেষ্টাও নেই ওর মধ্যে। ওর চেতনা থেকে উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায় যেন উবে গেছে। চেহারা দেখে ওর অবস্থা যতটা খারাপ মনে হয়, অসুস্থ বোধ করে তারচেয়ে বেশি। তবে নিজের অস্তিত্বের গহীন গভীরে জন্মসূত্রে পাওয়া একটা আসক্তি আছে, যেটাকে কেবল আগুনের একটা ফুলকির সঙ্গেই তুলনা করা চলে–সেটা হলো, অজানাকে জানার আকুতি; রহস্যটা কি উঁকি মেরে দেখতে চাওয়ার নেশা। ফুলকিটা বিস্ফোরিত হলো কেবিনের ভেতর ঢুকে হাতের ব্যাগটা কিচেন সিঙ্ক-এ রাখার পরপরই।

মনে হলো কি যেন কোথাও ঠিক নেই। আঙুল তুলে দেখাতে পারবে না, শুধু ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলে দিচ্ছে কোথাও একটা খুঁত আছে। কিচেন থেকে লিভিং রুমে চলে এল। বেমানান কিছুই চোখে পড়ল না। বেডরুমে ঢুকল সাবধানে। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে চারদিকে চোখ বুলাল। তারপর ক্লজিট খুলে ভেতরটা দেখল। সবশেষে ঢুকল বাথরুমে। এখানেই মন খুঁত খুঁত করার কারণটা ধরা পড়ল। কোথাও এসে প্রথমেই শেভিং কিট থেকে বের করে রেজার, কলোন, টুথব্রাশ, হেয়ারব্রাশ ইত্যাদি জায়গা মত সাজিয়ে রাখা ওর একটা অভ্যাস। যেখানে রেখেছিল সেখানেই আছে সব, শুধু শেভিং কিটটা বাদে। পরিষ্কার মনে আছে ওর, বাইরের দিকের স্ট্র্যাপ ধরে ওটাকে একটা শেলফে গুঁজে রেখেছিল। সেই স্ট্র্যাপটা এখন শেলফের পিছন দিকের দেয়ালের দিকে ঘুরে গেছে।

শান্ত ও স্বাভাবিক আচরণ করছে রানা, প্রতিটি কামরার আলগা জিনিসগুলো খুঁটিয়ে দেখছে। কেউ একজন, বা কয়েকজন, কেবিনের প্রতিটি ইঞ্চি পরীক্ষা করেছে। লোকটা বা লোকগুলো প্রফেশনাল ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই, তবে কেবিনে এমন কিছু পায়নি যা দেখে নতুন বাসিন্দাকে সিক্রেট এজেন্ট বা বিপজ্জনক খুনী বলে মনে হতে পারে, ফলে তল্লাশীর শেষ দিকে আগ্রহ আর মনোযোগ হারিয়ে ফেলে তারা। কেবিন মালিকের কোন নিরীহ বন্ধু বা মেহমান, শান্তিতে বিশ্রাম নিতে এসেছে, কাজেই সতর্ক হবার খুব একটা প্রয়োজন বোধ করেনি। শহর থেকে ঘুরে আসতে পঁয়তাল্লিশ মিনিট লেগেছে রানার, তল্লাশী চালাবার জন্যে যথেষ্ট সময়। প্রথমে রানা বুঝতে পারল না তল্লাশী চালাবার কি কারণ থাকতে পারে, তারপর মস্তিষ্কের অন্ধকার গভীরে একটা আলোর আভা দেখা দিল।

রানা উপলব্ধি করল, তল্লাশী চালানোটা ছিল দ্বিতীয় কাজ। প্রথম কাজ ছিল লিসনিং ডিভাইস বা মিনিয়েচার ক্যামেরা ফিট করা। তারমানে কেউ একজন ওকে বিশ্বাস করতে পারছে না। সেই কেউ একজন কে হতে পারে? নিশ্চয়ই হুয়ান হান-এর সিকিউরিটি নেটওঅর্ক-এর চীফ?

লিসনিং বাগ বা ছারপোকা পিন-এর মাথার চেয়ে বড় না-ও হতে পারে, কাজেই ইলেকট্রনিক ডিভাইস ছাড়া সেটার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া কঠিন। নিজের সঙ্গে ছাড়া কথা বলার কেউ যেহেতু নেই, ক্যামেরা খোঁজার কাজে মন দিল রানা। ধরে নিল ওর ওপর নজর রাখা হচ্ছে, ওর প্রতিটি নড়াচড়া লেকের উল্টোদিকে কোথাও বসে টিভি মনিটরে লক্ষ করছে কেউ। একটা চেয়ার টেনে বসল রানা, খবরের কাগজ খুলে পড়ার ভান করছে, মাথার ভেতর চলছে গবেষণা। লিভিং আর বেডরূমে যা দেখার দেখুক ওরা, ভাবল ও। এই দুই জায়গায় এমন কিছু করা চলবে না যা দেখে ওরা কিছু সন্দেহ করে বা সতর্ক হয়ে ওঠে। পরিষ্কার রাখতে হবে কিচেনটাকে। কিচেনটাই হবে ওর ঘাঁটি।

কাগজটা নামিয়ে রেখে কিচেনে চলে এল রানা, দোকান থেকে কিনে আনা জিনিসগুলো ব্যাগ থেকে বের করে কাবার্ড আর রিফ্রিজারেটরে সাজিয়ে রাখছে। কাজের ফাঁকে কিচেনের প্রতি ইঞ্চিতে চোখ বুলাচ্ছে ও, প্রতিটি জিনিস খুঁটিয়ে লক্ষ করছে। সন্দেহজনক কিছুই চোখে পড়ল না। এরপর লগ কেবিনের দেয়াল পরীক্ষা করল। লগে অনেক ফাটল আর খুদে গর্ত আছে, সেগুলো স্বাভাবিক ভঙ্গিতে দেখার সময় চকচকে একটা লেন্সের অস্তিত্ব ফাঁস হয়ে গেল। গাছ তখনও কাটা হয়নি, সম্ভবত একটা পোকা গর্তটা তৈরি করেছিল। সেই গর্তের ভেতর গুঁজে রাখা হয়েছে লেন্সটা। ক্যামেরার সামনে অভিনয় করছে রানা, ঝাড়ু দিয়ে মেঝে ঝাঁট দিচ্ছে। কাজটা শেষ হতে ঝাড়ুটা উল্টো করে ধরল, ঝাড়ুর হাতলটা ক্যামেরার সরাসরি সামনে দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখল।

যেন প্রাণশক্তি বাড়াবার জন্যে ইঞ্জেকশন দেয়া হয়েছে রানাকে, শোক আর ক্লান্তি ঝেড়ে ফেলে কেবিন থেকে বেরিয়ে এল ও, ত্রিশ পা হেঁটে এসে ঢুকে পড়ল জঙ্গলে। জ্যাকেটের ভেতর দিকের পকেট থেকে মটোরোলা ইরিডিয়াম ফোনটা বের করল, ডায়াল করার পর ওর সিগনাল পৃথিবীর চারদিকে ছড়িয়ে থাকা ছেষট্টিটা স্যাটেলাইট বিশিষ্ট নেটওঅর্ক হয়ে পৌঁছে গেল ওয়াশিংটন ডি. সি.-র নুমা হেডকোয়ার্টারে, যাকে ওর দরকার তার প্রাইভেট লাইনে।

চারবার রিঙ হবার পর বিদ্রূপাত্মক একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল রিসিভারে, 'আমি ল্যারি কিং। যা বলার সংক্ষেপে বলুন, কারণ টাইম ইজ মানি।'

'কমপিউটরের বোতাম টিপে অলস সময় কাটাও, তোমার আবার সময়ের দাম কি হে?'

'আমি কি নুমার স্পেশাল প্রজেক্ট ডিরেক্টরকে খোঁচা মেরে বসেছি, যে কারণে আমাকে তার বিদ্রূপের শিকার হতে হচ্ছে?'

'হ্যাঁ।'

'এই, তুমি আছ কেমন?' কিং উদ্বিগ্ন, কারণ জানে মাস দেড়েক আগে নিমবাস বিস্ফোরিত হওয়ায় রানা মরতে মরতে বেঁচে গেছে।

'ভালই থাকব, তুমি যদি আমার একটা উপকার করো।'

'কি উপকার, বলে ফেলো।'

'হুয়ান হান সম্পর্কে তথ্য চাই আমার।'

'কে সে?'

'তাইওয়ানের একজন শিপিং ম্যাগনেট। হংকঙেও অফিস আছে। ওয়াশিংটন স্টেট-এর ওরিয়ন লেকে আছে প্রাইভেট একটা রিট্রিট।'

'নুমার কাউকে কিছু বলে যাওনি তুমি,' অভিযোগ করল ল্যারি কিং। 'এখন কি ওরিয়ন লেক থেকে বলছ?'

'বলিনি, কারণ চাইনি কেউ আমাকে ডিসটার্ব করুক।'

'হুয়ান হান সম্পর্কে কি জানতে চাও?' জিজ্ঞেস করল কিং। 'সে কি তোমার নাক কামড়ে দিয়েছে?'

'না, উঁকি দিয়ে আমাকে কাপড় ছাড়তে দেখে ফেলেছে।'

'ভারি অন্যায়। ডুয়েল লড়ার জন্যে চ্যালেঞ্জ করছ না কেন?'

'প্রতিবেশীরা বলছে, নিজের সম্পত্তির ধারে কাছে কাউকে সে ঘেঁষতে দেয় না। অথচ এটা তার বাড়িও নয়, এখানে সে সম্ভবত থাকেও না। শিপিং টাইকুন, দুনিয়ার বহু শহরে তার অনেক বাড়ি-ঘর থাকাই স্বাভাবিক।'

'তোমার সম্পর্কে তার আগ্রহী হয়ে ওঠার কি কারণ?'

'ভাল কোন লোকের সিকিউরিটি সম্পর্কে ম্যানিয়া থাকতে পারে না, যদি না কিছু গোপন করতে চায়,' বলল রানা।

'মুড ভাল থাকতে বলে ফেলো, আর কোন অনুরোধ?'

'কিছু জিনিস-পত্র দরকার, আজ রাতে পাঠালে কাল বিকেলের মধ্যে পেতে পারি।'

'বলে ফেলো। রেকর্ডার অন করে রেখেছি, তুমি থামলে প্রিন্ট হয়ে বেরিয়ে আসবে।'

ইকুইপমেন্টসহ আর কি কি দরকার বলে গেল রানা। সবশেষে যোগ করল, 'ওরিয়ন লেকের ওপর ন্যাচারাল রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্টের চার্ট পেলে খুশি হই। আন্ডারওয়াটার রেক, অবস্ট্রাকশন, পানির দূষণ, ফিশ স্পিসি ইত্যাদি সম্পর্কে।'

'রহস্য জট পাকাচ্ছে। চোট খেয়ে ছাতু হয়ে গেছে, এবং সবেমাত্র হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছে যে-লোক, এ-সব তথ্য কেন তার দরকার হবে?'

'আমার কথায় নাচো, তোমাকে আমি ডাকযোগে পাঁচ পাউন্ড স্মোকড স্যামন পাঠিয়ে দেব।'

'জিভে জল এসে গেল। ঠিক আছে, খেলনাগুলো পাঠাচ্ছি। তার আগে হুয়ান হান সম্পর্কে খবরও নিচ্ছি। ভাগ্য ভাল হলে তার ব্লাড গ্রুপও জানিয়ে দিতে পারব বলে আশা রাখি।'

ওরিয়ন লেক লম্বাটে এক ফোঁটা অশ্রুর মত দেখতে, নিচের অংশ থেকে সরু একটা নদী বেরিয়েছে। নদীর দুই তীর ক্রমশ উঁচু হয়ে উঠে গেছে, ঘন জঙ্গলে ঢাকা। এক পর্যায়ে জঙ্গল জায়গা ছেড়ে দিয়েছে পাথুরে অলিম্পিক পাহাড়কে

চূড়াটা এত উঁচু যে মেঘের নাগাল পেয়ে যায়। জঙ্গলে, গাছপালার নিচে, বিচিত্র বর্ণ বুনো ফুলের চোখ জুড়ানো সমারোহ। চারদিকের পাহাড়ী এলাকা থেকে গ্লেসিয়ারগুলো কয়েকটা ঝর্ণা বা নালার সাহায্যে লেকে পানি সরবরাহ করে, প্রচুর মিনারেল থাকায় পানির রঙ স্বচ্ছ নীলচে-সবুজ। অশ্রু ফোঁটার নিচের দিক থেকে বেরুনো পানির প্রবাহটাকে ওরিয়ন নদী বলা হয়। দুই সারি পাহাড়ের মাঝখানে একটা খাদের ভেতর দিয়ে বইছে নদীটা, ষোলো মাইল এগিয়ে গ্রেপভাইন বে নামে একটা ইনলেটে পড়েছে। গ্রেপভাইন বে-র অপরপ্রান্তটা মিশেছে প্রশান্ত মহাসাগরের সঙ্গে। নদীতে এক সময় জেলেরা প্রচুর মাছ পেত, সেই মাছ তারা সাপ্লাই দিত ক্যানারিতে। এখন খুব কম জেলেই নদীতে মাছ ধরে। প্লেজার বোট ছাড়া অন্য কোন বোটও খুব কম দেখা যায়।

শহর থেকে ঘুরে আসার পরদিন বিকেলে কেবিন থেকে পর্চে বেরিয়ে এল রানা, লম্বা টান দিয়ে বুকে বাতাস ভরল। খানিক আগে হালকা এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে, দূষণ-মুক্ত তাজা বাতাস ফুসফুসে যেন পারফিউম ছড়িয়ে দিল। পাহাড়ের আড়ালে ঢলে পড়েছে সূর্য, শেষবেলার রশ্মি একজোড়া চূড়ার মাঝখান দিয়ে বেরিয়ে নালা বেয়ে নিচে নেমে আসছে। সব মিলিয়ে দৃশ্যটা এত সুন্দর, সময় যেন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শুধু পরিত্যক্ত বাড়ি আর কেবিনগুলোই লেকের পরিবেশে গা ছমছমে ভৌতিক একটা ভাব এনে দিয়েছে।

পর্চ থেকে নেমে কাঠের একটা জেটিতে পা রাখল রানা, সৈকত হয়ে পানিতে ভাসমান বোটহাউসে চলে গেছে ওটা। রিঙ থেকে একটা চাবি বেছে দিয়ে দরজার ভারী তালাটা খুলল। ভেতরটা অন্ধকার। ঢোকার সময় ভাবল, এখানে নিশ্চয়ই কোন ছারপোকা বা ক্যামেরা নেই। বোটহাউসের ভেতর ক্রেডলের সঙ্গে পানির ওপর ঝুলে আছে, ইলেকট্রিক হয়েস্ট-এর সঙ্গে যুক্ত, দশ-ফুটী একটা সেইলবোট আর জোড়া ককপিট ও মেহগনি খোলসহ একুশ ফুটী একটা ক্রিস-ক্রাফট রানঅ্যাবাউট। দু'দিকের দেয়ালে তিনটে র‍্যাকে রয়েছে দুটো কাইয়্যাক আর একটা ক্যানু।

ইলেকট্রিক হয়স্ট চালু করল রানা, যান্ত্রিক গুঞ্জন তুলে সেইলবোটের মাথার ওপর চলে এল সেটা। হয়স্টের একটা হুক ক্রেডলের মেটাল লুপে পরাল। কয়েক মাস পর আজ এই প্রথম সেইলবোটের ফাইবারগ্লাস খোল পানিতে নামল। লকার খুলে নিখুঁত ভাঁজ করা সেইলটা বের করল রানা, অ্যালুমিনিয়াম মাস্ট জোড়া লাগাল, দড়ি-দড়া দিয়ে বাঁধল ওগুলো। জায়গা মত টিলার বসিয়ে সেন্টারবোর্ড ঢোকাল। প্রায় আধ ঘণ্টা পর পালে বাতাস পাবার জন্যে তৈরি হয়ে গেল বোট। বাকি থাকল শুধু মাস্তুলটা খাড়া করা, বোটহাউসের ছাদের নিচে থেকে বেরিয়ে যাবার পর দু'মিনিটের মধ্যে সারা যাবে কাজটা।

অলস, স্বাভাবিক ভঙ্গিতে কেবিনে ফিরে এল রানা, এয়ার-এক্সপ্রেস যোগে ল্যারি কিঙের পাঠানো বড় দুটো কার্টুনের একটা খুলল। কিচেন টেবিলে ওরিয়ন লেকের চার্টটা মেলে ঝুঁকে পড়ল। ডেপথ সাউন্ডিং-এ দেখা যাচ্ছে লেকের তলা তীর থেকে ঢালু হয়ে নিচের দিকে নেমে গেছে, ত্রিশ ফুট নামার পর খানিকটা জায়গা সমতল, তারপর খাড়াভাবে নেমে গেছে চারশো ফুট নিচে লেকের

মাঝখানে। উপযুক্ত ইকুইপমেন্ট আর সারফেস ক্রুর সাহায্য ছাড়া কোন ডাইভারের পক্ষে এই গভীরতায় নামা সম্ভব নয়। মানুষের তৈরি কোন বাধা-বিঘ্ন চার্টে চিহ্নিত করা হয়নি। ডুবে গেছে এমন বস্তু একটাই দেখা গেল—পুরানো ফিশিং বোট, ক্যানারির কাছা-কাছি। লেকের গড়পড়তা তাপমাত্রা একচল্লিশ ডিগ্রী ফারেনহাইট, সাঁতরানোর জন্যে বড় বেশি ঠাণ্ডা হলেও, ফিশিং আর বোটিং-এর জন্যে আদর্শ।

একটা বনমোরগ রোস্ট করে ডিনার সারল রানা, সঙ্গে ভেজিটেবল স্যালাড, খেলো পর্চে ফেলা টেবিলে বসে। ডাক্তার প্রেসক্রাইব করেছে, কাজেই বিয়ারের একটা বোতল খুলে ধীরে ধীরে চুমুক দিল। বোতলটা অর্ধেক খালি হতে টেবিলে নামিয়ে রাখল, চেয়ার ছেড়ে ফিরে এল কিচেনে। তেপায়াটা কিচেনের মাঝখানে, ছায়ার ভেতর নিয়ে এল ও, মাথায় একটা টেলিস্কোপ। আশা করল, দূর থেকে ওর নড়াচড়া কেউ দেখতে পাবে না। আই পীসে চোখ রেখে হুয়ান হানের রিট্রিটে তাকাল ও। হাই-পাওয়ারড ম্যাগনিফিকেশনের বদৌলতে বিল্ডিংটার পিছনে গলফ কোর্সে দু'জন খেলোয়াড়কে দেখতে পাওয়া সম্ভব হলো। আনাড়ি, উপলব্ধি করল রানা। কাপে বল ফেলতে দু'জনকেই চারবার করে আঘাত করতে হলো বলে। ওর বৃত্তাকার দৃষ্টিসীমা কয়েকটা গেস্টহাউসের দিকে সরে গেল, বিল্ডিঙের পিছনে এক ঝাঁক গাছপালার ভেতর দাঁড়িয়ে আছে। ওগুলো খালি বলে মনে হলো, শুধু একজন চাকরানীকে আসা-যাওয়া করতে দেখা যাচ্ছে। খোলা জায়গা আছে, তবে যত্ন করে তৈরি লন নেই। জমিনে ঘাস আর বুনো ফুল ফুটে আছে।

গাড়ি বারান্দা টালি দিয়ে ছাওয়া, বৃষ্টি হলে ভিআইপি মেহমানরা যাতে গাড়ি থেকে নামার বা গাড়িতে ওঠার সময় ভিজে না যায়। বিল্ডিংটার মূল প্রবেশপথ পাহারা দিচ্ছে ব্রোঞ্জের তৈরি বিশাল আকৃতির একজোড়া সিংহ। সিঁড়ির দু'পাশে ওগুলো। ধাপগুলো উঠে গেছে রোজউড-এর তৈরি দরজায়, সেটা তিন মানুষ সমান উঁচু। টেলিস্কোপ রিফোকাস করায় প্যানেলে খোদাই করা অদ্ভুত সুন্দর ড্রাগন মোটিফ দেখা গেল। সোনালি টাইল বসানো প্যাগোডা ধাঁচের ছাদ তৈরি করতে প্রচুর টাকা লেগেছে, কিন্তু এই ছাদের সঙ্গে কপার-টিনটেড সোলার গ্লাস দিয়ে তৈরি পাঁচিলটা একেবারেই বেমানান। পুরো কাঠামোর নিচের দিকটা বেড় দিয়ে রেখেছে ওই পাঁচিল। বিল্ডিংটা তিনতলা, গাছপালা কেটে ফাঁকা একটা জায়গায় বানানো হয়েছে, তীর থেকে খুব দূরে নয়।

টেলিস্কোপ সামান্য একটু নিচু করে ডকটা পরীক্ষা করল রানা। লেকের পানিতে নেমে যাওয়া অংশটুকু একটা ফুটবল মাঠের অর্ধেক হবে। ডকের পাশে দুটো বোট বাঁধা রয়েছে। ছোটটার তেমন কোন সৌন্দর্য নেই। ভোঁতা চেহারার একজোড়া ক্যাটাম্যারান হাল, ওপরে বাক্স আকৃতির একটা কেবিন, না আছে পোর্টহোল, না আছে জানালা। হুইলহাউসটা ছাদের ওপর। পুরো বোট কালো রঙ করা, সাধারণত যা দেখা যায় না। দ্বিতীয়টাকে জাহাজ বলে চালিয়ে দেয়া যায়। দর্শনীয় জলযান বা মোটর ইয়ট, খোলটা একশো বিশ ফুট লম্বা। একবার তাকালে চোখ ফেরানো কঠিন। রানা আন্দাজ করল মাঝখানটা চওড়ায় ত্রিশ ফুটের কাছাকাছি হবে। বিলাসবহুল আরাম-আয়েশের কথা মনে রেখে ডিজাইন করা

হয়েছে। সম্ভবত সিঙ্গাপুর বা হংকঙে তৈরি।

রানা তাকিয়ে আছে, প্রথম বোটটার চিমনি থেকে ডিজেলের ধোঁয়া বেরুতে শুরু করল। কয়েক মিনিটের মধ্যে বোটের ক্রুরা মুরিং লাইন তুলে ফেলল, লেক ধরে রওনা হয়ে গেল নদীর মুখ লক্ষ্য করে। বড় অদ্ভুত একটা বোট, ভাবল রানা। যেন জোড়া পনটুনের ওপর কাঠের একটা বাক্স ফেলে রাখা হয়েছে। কে এটা কি উদ্দেশ্যে তৈরি করেছে, ওর মাথায় ঢুকল না।

লেকের ওদিকটায় দু'জন গলফার আর চাকরানীটাকে বাদ দিলে গোটা এলাকা নির্জন আর পরিত্যক্ত লাগছে। সিকিউরিটি সিস্টেমের কোথাও কোন চিহ্নও নেই। তবে উঁচু কোন জায়গায় বা কোন খুঁটির মাথায় ভিডিও ক্যামেরা দেখা না গেলেও, রানা জানে থাকার কথা। সশস্ত্র গার্ডদের টহলও নেই। দৃশ্যটার সঙ্গে বেমানান যদি কিছু থাকে তো লগ দিয়ে তৈরি জানালাবিহীন কয়েকটা কাঠামো। হোস্টেল-টাইপ কুঁড়ে বলা চলে, সাধারণত শিকারী বা ভবঘুরেরা যেগুলো ব্যবহার করে। লেকের চারদিকে ছড়িয়ে আছে ওগুলো। রানা মাত্র তিনটে দেখতে পাচ্ছে, তবে আন্দাজ করল জঙ্গলের ভেতর আরও কয়েকটা আছে। তৃতীয় কুঁড়েটা যেন ভুল জায়গায় খাড়া করা হয়েছে। ডকের শেষ মাথায় ভেসে আছে ওটা, যেন ছোট একটা বোটহাউস। অদ্ভুতদর্শন কালো বোটটার মতই ওটারও কোন দরজা বা জানালা নেই। ওদিকে পুরো এক মিনিট তাকিয়ে থাকল রানা, বোঝার চেষ্টা করছে ওখানে ওটা তৈরি করার কি উদ্দেশ্য, ভেতরে আছেই বা কি।

রানার কৌতূহল আর টেলিস্কোপের সামান্য স্থান বদল সুফল বয়ে আনল। একটা দেবদারু গাছের পিছনে মাত্র অংশবিশেষ দেখা গেল। বেশি কিছু নয়, তবে তাতেই সিকিউরিটি সেটআপ সম্পর্কে একটা ধারণা পেয়ে গেল ও। রিক্রেয়েশন ভেহিকেলটা কৌশলে লুকিয়ে রাখা হয়েছে, ওটার ছাদে রয়েছে অ্যান্টেনা আর রিসেপশন ডিশ-এর একটা ছোট জঙ্গল। আরও খানিক সামনে, ফাঁকা একটু জায়গার পর, সরু রানওয়ের পাশে ছোট এয়ারক্রাফট হ্যাঙ্গার। রানওয়েটা খুব বেশি হলে পঞ্চাশ গজ লম্বা। ওটা যে হেলিকপ্টারের জন্যে তৈরি করা হয়নি, বোঝাই যায়। তাহলে কি আলট্রালাইট প্লেন ওঠা-নামা করে এখানে? চিন্তা করছে রানা। হ্যাঁ, এটাই একমাত্র জবাব।

আরভি বা রিক্রেয়েশন ভেহিকেলটাও চিনতে পারল রানা। ওটা আসলে মোবাইল কমান্ড পোস্ট। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ওয়াশিংটন থেকে কোথাও গেলে সিক্রেট সার্ভিস এজেন্টরা প্রায়ই এ-ধরনের মোবাইল কমান্ড পোস্ট ব্যবহার করে। লগ কুঁড়েগুলোর উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে পারছে ও। ওর পরবর্তী পদক্ষেপ হবে প্রতিপক্ষকে সাড়া দিতে প্ররোচিত করা।

শুধু একঘেয়েমি দূর করার জন্যে অন্যের ব্যক্তিগত বিষয়ে নাক গলাতে চাওয়াটা রানার স্বভাববিরুদ্ধ। বিশেষ করে হুয়ান হান সম্পর্কে ল্যারি কিং যেহেতু এখনও কোন রিপোর্ট পাঠায়নি, কৌতূহলকে মাত্রা ছাড়াতে দেয়া উচিত নয় ওর। তবু কেন যে নিজেকে সামলে রাখতে পারছে না সেটা একটা রহস্যই বটে। মনে হচ্ছে ওর মাথার ভেতর বিপদের প্রতীক খুদে একটা লাল ঝাণ্ডা উড়ছে। হুয়ান হান যেহেতু অসম্ভব ধনী মানুষ, নিশ্চয়ই অনেক দুর্লভ গুণের সমাবেশ ঘটেছে তার

জীবনে, কাজেই তার প্রতি ওর শ্রদ্ধা জাগারই কথা। কিন্তু কি কারণে রানা নিজেও বলতে পারবে না, তা জাগছে না।

যেন কারণটা ব্যাখ্যা করার জন্যেই ওর ইরিডিয়াম ফোনটা বেজে উঠল। ওর কোড একমাত্র ল্যারি কিং জানে। কেবিন থেকে বেরিয়ে নিরাপদ দূরত্বে সরে এসে পকেট থেকে ফোনটা বের করল ও। 'কিং?'

'লোকটা চিজই,' কোন ভূমিকা না করে মন্তব্য করল কিং।

'আমার নিরেট তথ্য দরকার, গুজব নয়,' বলল রানা।

'জীবনযাপন রোম সম্রাটদের মত। সারা পৃথিবী জুড়ে প্রভাবশালী মহলের সঙ্গে হেভি যোগাযোগ। দুনিয়ার কোথায় ব্যক্তিগত প্রাসাদ, ইয়ট আর প্লেন নেই বলা কঠিন। সিকিউরিটি গার্ডদের সংখ্যা এত বেশি, বলা যায় রীতিমত একটা সেনাবাহিনী পালে।'

'কাজকর্ম বা অপারেশন সম্পর্কে কি জানতে পেরেছ বলো।'

'খুব সামান্যই। ডিককে যতবার...'

'ডিক?'

'ডিক আমার বন্ধু। থাকে আমার কমপিউটরের ভেতর।'

'বলে যাও।'

'হুয়ান হানের নাম লেখা ডাটা ফাইলে ডিক যতবার ঢুকতে চায়, শহরের প্রতিটি ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি অনুসন্ধানে বাধা দিয়ে জানতে চাইছে–কেন, কি দরকার? দেখে-শুনে মনে হচ্ছে লোকটা সম্পর্কে একা শুধু তুমিই ইন্টারেস্টেড নও।'

'তোমাদের সরকার হান সম্পর্কিত তথ্য কেন তালা দিয়ে রাখবে?' জানতে চাইল রানা।

'আমার যেন মনে হচ্ছে ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিগুলো নিজেরাই তার সম্পর্কে ক্লাসিফায়েড ইনভেস্টিগেশন শুরু করেছে, তাই চাইছে না বাইরে থেকে কেউ নাক গলাক।'

'সন্দেহ তাহলে আরও বাড়ে,' বলল রানা। 'হান ধোয়া তুলসী পাতা হলে তোমাদের সরকার কেন তার বিরুদ্ধে গোপনে অনুসন্ধান চালাবে?'

'অন্য একটা আশঙ্কার কথা উড়িয়ে দিচ্ছি না,' বলল কিং। 'সরকার হয়তো হানকে রক্ষা করতে চাইছে।'

'মানে? তা কেন চাইবে?'

'কি করে বলি। ডিক যতক্ষণ না প্রপার ডাটা সোর্স পাচ্ছে, তোমার মত আমিও অন্ধকারে থাকব। তোমাকে শুধু এটুকু জানাতে পারি, রাজনৈতিক কারণে অপরাধ জগতের বহু রুই-কাতলাকে সরকার বা কর্তা ব্যক্তিরা অতীতেও রক্ষা করেছেন, বর্তমানেও করছেন, ধারণা করি ভবিষ্যতেও করবেন। পিছলা ঈল মাছের মত দুনিয়ার সবখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে হান, দেখে মনে হয় বৈধ ও আইনসম্মত ব্যবসা থেকেই টন টন টাকা কামাচ্ছে। আসলে কি ঘটছে, ঈশ্বরই বলতে পারবেন।'

'বলতে চাইছ অর্গানাইজড-ক্রাইম গ্রুপের সঙ্গে জড়িত, এমন কোন তথ্য

তুমি পাওনি?'

'না। তুমি?'

'তার লোকজন আমার কেবিন সার্চ করে গেছে,' বলল রানা। 'ভিডিও মনিটরে কেউ আমার আন্ডারঅয়্যার দেখবে, এটা আমি কি করে মেনে নিই?'

'নতুন কিছু পেলে তোমাকে জানাব। তুমি এখন কি করবে?'

'কিছুই যখন করার নেই, মাছ ধরব বলে ভাবছি,' জবাব দিল রানা।

কিংকে বোকা বানানো গেল না, গম্ভীর সুরে সাবধান করে দিল সে, 'পিছন দিকটায় খেয়াল রেখো।'

কল বাটনে চাপ দিয়ে ফোনটা একটা গাছের ফোকরে লুকিয়ে রাখল রানা। লুকিয়ে রাখার জন্যে আদর্শ জায়গা না হলেও, কেবিনে ফেলে রাখার চেয়ে ভাল।

বিশ্বস্ত ও আদর্শ বন্ধু বলেই ল্যারি কিং উদ্বিগ্ন, তবু রানা নুমার কমপিউটর গুরুকে যতটা সম্ভব কম জানতে দিতে চায়। কারণ এরপর যা করতে চাইছে, ওকে গ্রেফতার করা হতে পারে। আর যদি সাবধান না হয়, গুলি খেতেও হতে পারে। কেন যেন মনে হচ্ছে বড় কোন ভুল করে ফেললে ওর লাশ খুঁজে পাওয়া যাবে না।

তিন

দিনের আলো আর ঘণ্টা দুয়েক থাকতে বোটহাউসের ডকে ফিরে এল রানা, এক হাতে বড় আকৃতির আইস চেস্ট, অপর হাতে একটা শুকনো স্যামন মাছ। স্যামনটা কেবিনের ভেতর ফায়ারপ্লেস ম্যান্টল-এর ওপর রাখা ছিল, গৃহ-সজ্জার একটা উপকরণ হিসেবে। বোটহাউসে ঢুকে আইস চেস্টটা খুলল ও, ভেতর থেকে বের করল বেনথোস কোম্পানীর তৈরি ছোট একটা অটোনোমাস আন্ডারওয়াটার ভেহিকেল, সংক্ষেপে যেটাকে বলা হয় এইউভি। এই কোম্পানী আন্ডারসী সিস্টেমস টেকনলজি ডিজাইনার হিসেবে বিখ্যাত। এইউভিতে একটা কালার ভিডিও ক্যামেরা আছে, পঁচিশ ইঞ্চি লম্বা আর ছয় ইঞ্চি চওড়া কালো হাউজিং-এর ভেতর। এইউভি পাওয়ার সাপ্লাই পায় ব্যাটারি থেকে, তাতে একজোড়া কাউন্টার-রোটেটিং থ্রাস্টার দু'ঘণ্টার কিছু বেশি সচল থাকে।

নিরেট ছোট্ট ইউনিটটা সেইলবোটের তলায় রাখল রানা, সঙ্গে ফিশিং রড আর ট্যাকল বক্স। তারপর বোটহাউসের আউটার ডোর খুলল, নিচে নেমে আসন গ্রহণ করল টিলারে। বোট হুকের সাহায্যে ঠেলা দিয়ে ডক ও বোটহাউস থেকে দূরে সরে এসে মাস্তুল খাড়া করল, পাল তুলে নিচে নামাল সেন্টারবোর্ড।

অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে কেউ তাকালে নিরীহ ব্যবসায়ী ভদ্রলোক বলে মনে হবে ওকে, ছুটি কাটাতে এসে লেকে সেইলবোট ভাসিয়ে অলস সময় কাটাচ্ছে। ঠাণ্ডা একটু বেশি, তবে আবহাওয়া ভালই। লাল উলের তৈরি শার্ট আর খাকি প্যান্ট পরেছে রানা। পায়ে স্নিকারস আর সোয়েট সকস। দুটো বোটের মধ্যে সেইলবোটটা বেছে নেয়ার কারণ হলো, বোটে পাল থাকায় রিসর্ট-এর ভিডিও ক্যামেরায় ধরা পড়বে না ও কি করছে না করছে।

টিলার আগু-পিছু করছে রানা। বোটহাউস থেকে খানিকটা সরে আসতেই বাতাস লেগে ফুলে উঠল পাল। ওরিয়ন লেকের নীল-সবুজ পানি কেটে এগিয়ে চলেছে সেইলবোট। তাড়াহুড়ো বা আড়ষ্ট কোন ভাব নেই, শান্ত স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করছে ও, নির্জন তটরেখা ধরে বোট চালাচ্ছে, লেকের আরেক মাথায় দাঁড়ানো প্রকাণ্ড বিল্ডিংটার কাছ থেকে সম্মানজনক দূরত্ব বজায় রেখে। হুয়ান হানের বোট ডক থেকে সিকি মাইলেরও কম দূরে, লেক যেখানটায় সবচেয়ে গভীর, পাল বেশ খানিকটা নামিয়ে আনল ও; ওর কাজকর্ম যাতে আড়াল করা যায়। নোঙরে বাঁধা রশিটা এত লম্বা নয় যে লেকের তলার নাগাল পাবে, তবু ওটা যত নিচে সম্ভব নামিয়ে দিল পানিতে, বাতাসের টানে বোট যাতে তীরের খুব বেশি কাছাকাছি চলে না যায়।

নামানো পাল একদিকের তীর আড়াল করে রেখেছে, সেদিকেই মুখ করে বসেছে রানা। এক পাশে ঝুঁকে একটা বালতির ভিতর দিয়ে তাকাল ও, তলাটা স্বচ্ছ। পানি এত পরিষ্কার যে বালতিটার ভেতর দিয়ে একশো পঞ্চাশ ফুট নিচে স্যামন মাছের একটা ঝাঁককে স্পষ্ট দেখতে পেল। এরপর ফিশ ট্যাকল বক্স খুলে হুক আর লীড সিঙ্কার বের করল। হুকে একটা কেঁচো আটকে লাইনটা ফেলে দিল পানিতে।

মাছ ধরার ভান করছে রানা, তারই ফাঁকে সরু তারের একটা কয়েল খুলল, সেইলবোটের কিনারায় রাখল কফি-কাপ সাইজের একটা ট্র্যান্সপন্ডার। ট্র্যান্সপন্ডারটা ইলেকট্রনিক সিগনাল গ্রহণ ও প্রেরণ করতে পারে। সরু তার ছেড়ে বিশ ফুট নিচে নামাল ওটাকে। একই সাইজের ট্র্যান্সপন্ডার এইউভি-র শেষ প্রান্তে আরেকটা আছে। এই দুই ইউনিট আর এইউভি কেসিং-এর ভেতর ইলেকট্রনিক্স সহযোগে তৈরি হয়েছে সিস্টেমটার হৃৎপিণ্ড, অ্যাকুসটিকালি পরস্পরের সঙ্গে সিগনাল বিনিময় করবে, আন্ডারওয়াটার কন্ট্রোল ও ভিডিও সিগনাল রিসিভ করতে সাহায্য করবে ছোট একটা রেকর্ডারকে।

এরপর বোটের তলা থেকে এইউভি তুলে ধীরে ধীরে পানিতে ছেড়ে দিল রানা, কালো কেসিং থাকায় গভীর সমুদ্রের কদাকার একটা প্রাণীর মত লাগছে ওটাকে। এর আগে রোবোটিক আন্ডারওয়াটার ভেহিকল নিয়ে পানিতে থাকার অভিজ্ঞতা হয়েছে রানার, তবে অটোনোমাস সিস্টেম অপারেট করছে এবার নিয়ে দ্বিতীয় বার। লেকের গভীরে এইউভি অদৃশ্য হয়ে যেতে গলাটা একটু শুকিয়ে এল ওর, কারণ জানে এটা তৈরি করতে নুমার খরচ পড়েছে দুই মিলিয়ন মার্কিন ডলার। মিনিয়েচারাইজেশন এঞ্জিনিয়ারিঙে, অটোনোমাস আন্ডারওয়াটার সিস্টেম একটা বিস্ময়, এটা তৈরি করা সম্ভব হওয়ায় নুমার বিজ্ঞানীরা এখন সাগরের এমন সব জায়গায় রোবোটিক ইউনিট পাঠাতে পারে আগে যেখানে পাঠানো সম্ভব ছিল না।

অ্যাকটিভ-ম্যাট্রিকস ডিসপ্লেসহ ব্যাটারিচালিত একটা ল্যাপটপ কমপিউটরের ভাঁজ খুলল রানা। ঠিকমত অ্যাকুসটিক লিঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিনা দেখে নিয়ে কন্ট্রোল মেন্যুর ওপর চোখ বুলাল, বেছে নিয়ে চাপ দিল 'রিমোট অ্যান্ড লাইভ ভিডিও'র বোতামে। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে পানির তলার ক্যামেরা থেকে পাওয়া

ইমেজের লাইভ ডিসপ্লে দেখে সময় কাটাত রানা। কিন্তু পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকবে না বলেই ওর ধারণা, কাজেই হুয়ান হানের রিট্রিটের ওপর কড়া নজর রাখতে হবে ওকে। এইউভিকে নির্দিষ্ট কোর্সে ধরে রাখার জন্যে মাঝে মধ্যে ডিসপ্লেতে চোখ বুলালেই চলবে।

ছোট একটা রিমোট হ্যান্ডবক্সে রয়েছে জয়স্টিক, সেটা নাড়ল রানা। সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিয়ে পানির নিচে ডাইভ দিল ভেহিকেল, সামনের দিকে চার নট স্পীডে ছুটছে। কাউন্টার রোটেটিং থ্রাস্টার নিখুঁতভাবে ভারসাম্য রক্ষা করছে, ভেহিকেলটাকে পানির নিচে মাতলামি করতে দিচ্ছে না।

সীট কুশনে হেলান দিল রানা, সামনের বেঞ্চ সীটে পা তুলল, দুই পায়ের মাঝখানে গুঁজে রাখল এইউভি-র রিমোট কন্ট্রোল বক্স। রিমোটে ফিট করা লিভার আর জয়স্টিক ব্যবহার করে ভেহিকেলটাকে আধুনিক একটা সাবমেরিনের মত চালাচ্ছে। ষাট ফুট নিচে নামল ভেহিকেল, এই লেভেলে ওটাকে ধরে রেখে হানের বোট ডেকের দিকে এগোতে দিচ্ছে, এমন ভঙ্গিতে আগুপিছু করছে যেন একটা খেতে লাঙল চালাচ্ছে।

যারা জানে না তাদের মনে হতে পারে রানা বোধহয় একটা খেলনা নিয়ে খেলছে। তা নয়, ও আসলে হানের সিকিউরিটি সিস্টেমটা পরখ করে দেখতে চাইছে। যদি থাকে, প্রথমেই আন্ডারওয়াটার সেনসর-এর অস্তিত্ব খুঁজে পেতে হবে। কয়েকটা লাইন ধরে আসা-যাওয়া করার পর বোট ডকের দশ গজের মধ্যে চলে এল সেইলবোট, পানির তলা থেকে কোন কিছুর সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। এর মানে দাঁড়ায়, হানের সিকিউরিটি সিস্টেম লেক পর্যন্ত বিস্তৃত নয়। পানির দিক থেকে অনুপ্রবেশ ঘটতে পারে, এটা তারা ভাবেনি বা হুমকি বলে বিবেচনা করেনি।

রানা জানে আড়াল থেকে ওর ওপর নজর রাখা হচ্ছে, কিন্তু বাইরে বেরিয়ে এসে কেউ কিছু করছে না কেন? লিভার ধরে ধীরে ধীরে টান দিল ও, পানির তলা থেকে সারফেসে উঠে আসতে শুরু করল এইউভি। বোট ডেকের একটা পাশ থেকে মাত্র কয়েক গজ দূরে পানির ওপর মাথাচাড়া দিল ছোট সাবমারসিবল। প্রতিপক্ষ সাড়া দিতে কতক্ষণ সময় নেবে, রানার একটা ধারণা আছে। সেই ধারণাকে মিথ্যে প্রমাণিত করে তিন মিনিট পার হয়ে গেল। তারপর হঠাৎ জানালাবিহীন কুঁড়েগুলোর দেয়াল সবেগে ওপর দিকে উঠে গেল। কাঁধে স্ট্র্যাপের সঙ্গে ঝুলছে মেশিন পিস্তল, প্রতিটি কুঁড়ে থেকে পাঁচ-সাতজন করে গার্ড সগর্জনে মোটরসাইকেল চালিয়ে বেরিয়ে এল। জাপানী সুজুকি আরএম দুশো পঞ্চাশ সিসি সুপারক্রস বাইকের চীনা কপি বলে মনে হলো রানার ওগুলোকে। বেরিয়ে এসে কয়েকটা ঝাঁকে ভাগ হয়ে গেল গার্ডরা, সৈকত বরাবর পজিশন নিল। ত্রিশ সেকেন্ড পর ভাসমান ডকের শেষ মাথার কুঁড়ের দেয়ালও খুলে গেল, যেদিকের দেয়াল লেকের দিকে মুখ করা। চীনে তৈরি পারসোনাল ওয়াটারক্রাফট, জাপানী কাওয়াসাকি জেট স্কি-র অনুকরণে ডিজাইন করা, ধাওয়া করল এইউভিকে। ওয়াটারক্রাফটে দু'জন গার্ড বসে আছে।

রানা একটু হতাশই হলো। প্রতিক্রিয়া যথেষ্ট ক্ষিপ্র ও ব্যাপক নয়। দক্ষ সিকিউরিটি বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে আরও বেশি কিছু আশা করেছিল ও।

এমনকি ওদের হ্যাঙ্গারে আলট্রালাইটগুলো আড়ালেই থেকে গেল। এইউভির অনুপ্রবেশ তেমন গুরুত্বের সঙ্গে নিচ্ছে না, নিলে সিকিউরিটি সিস্টেমের সবগুলো মাধ্যম কাজে লাগিয়ে পুরোদস্তুর তল্লাশী চালাতে আসত।

ওয়াটারক্রাফটকে দেখামাত্র সাবমারসিবলকে পানির তলায় নামিয়ে দিয়েছে রানা। পানি এত স্বচ্ছ যে নিচে তাকালে ওটাকে দেখা যাবে, তাই রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে ওটাকে পাঠিয়ে দিল ডকের পাশে ভেসে থাকা ইয়টের তলায়। ওয়াটারক্রাফটের গার্ডরা মিনি সাবমেরিনটাকে দেখে ফেলবে, সে ভয় না পেলেও চলে ওর, কারণ সেইলবোটকে ঘিরে এত দ্রুত চক্কর দিচ্ছে ওটা, সারফেসের পানি দেখে মনে হবে টগবগ করে ফুটছে, নিচের কিছু দেখতে পাবার কথা নয়। রানা লক্ষ করল, ওয়াটারক্রাফটে বসা গার্ড দু'জনের কারও সঙ্গেই ডাইভিং ইকুইপমেন্ট, মাস্ক বা স্নরকেল নেই। বোঝাই যায়, পানির তলায় অনুসন্ধান চালাবার জন্যে প্রয়োজনীয় উপকরণ ও প্রস্তুতি নেই ওদের। মনে মনে হাসল ও–জমিনে প্রফেশনাল, পানিতে অ্যামেচার?

সৈকতে কোন অনুপ্রবেশের ঘটনা ঘটছে না, এটা লক্ষ করে বাইক থেকে নিচে নামল গার্ডরা, চুপচাপ দাঁড়িয়ে সেইলবোটটাকে দেখছে। অনুমতি ছাড়া সৈকত বা জমিনের ওপর দিয়ে হানের রিট্রিট-এ যাওয়া স্পেশাল ফোর্স ছাড়া আর কারও পক্ষে সম্ভব নয়। তবে পানি অন্য প্রসঙ্গ। ধরা না পড়ার ভয় ছাড়াই একজন ডাইভার ডক আর ইয়টের তলায় পৌঁছুতে পারবে।

এইউভিকে গাইড করে সেইলবোটে ফিরিয়ে আনছে রানা, একই সঙ্গে ফিশিং লাইন সারফেসের ঠিক নিচে টেনে আনল। মনরোর কেবিন থেকে পাওয়া স্যামনের শুকনো মুখের ভেতর হুকটা আটকাল। কায়দা করে নাড়াচাড়া করল হাত দুটো, অনেকদিন আগে মরা স্যামনটা পানির ওপর তুলে শূন্যে ঝুলিয়ে রাখল, আশপাশে উপস্থিত সবাই যাতে দেখতে পায়। দু'জন সিকিউরিটি গার্ড ওয়াটারক্রাফট নিয়ে এখনও পঞ্চাশ ফুট দূর থেকে চক্কর দিচ্ছে, পানির আলোড়নে সেইলবোট দুলছে। লেকটার মালিক রাজ্য সরকার, কাজেই রানা ধারণা করল গার্ডরা ওকে ধরতে আসবে না, ফলে এমন ভাব দেখাল যেন ওয়াটারক্রাফটটাকে গ্রাহ্য করছে না। সৈকতে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা গার্ডদের দিকে ফিরে মাছটাকে শূন্যে দোলাচ্ছে একটা পতাকার মত। সন্দেহজনক এমন কিছু নেই যাতে দাঁত বসাতে পারে, কাজেই বাধ্য হয়ে গ্রাউন্ড সিকিউরিটির সদস্যরা বাইকে চড়ে নিজেদের কুঁড়েতে ফিরে গেল।

এইউভি ওরা দেখতে পায়নি, বুঝতে পেরে পরম স্বস্তিবোধ করল রানা। এদিকে আর থাকা উচিত নয়, সিদ্ধান্ত নিয়ে নোঙর আর পাল তুলল ও, সেইলবোট ঘুরিয়ে নিয়ে মনরোর বোটহাউসের দিকে ফিরে আসছে, প্রভুভক্ত ডলফিনের মত সারফেসের ঠিক নিচে রয়েছে ছোট্ট সাবমারসিবল, পিছু পিছু আসছে।

বোটহাউসে ফিরে সেইলবোট বেঁধে রাখল রানা, এইউভি ভরে রাখল আইস চেস্টে, তারপর ক্যামেরা থেকে এইট-মিলিমিটার ভিডিওক্যাসেট খুলে পকেটে ভরল।

*

কেবিনে ঢুকে প্রথমেই রানা দেখে নিল ঝাঁটাটা এখনও সার্ভেইলান্স ক্যামেরার লেন্স আড়াল করে রেখেছে কিনা। বিকেলটা বেশ ভালই কেটেছে, সেজন্যে মনে মনে সন্তুষ্ট হলেও, সতর্ক থাকার প্রয়োজনবোধ করছে। বিয়ারের একটা বোতল নিয়ে বসল ও, কোলের ওপর একটা কোল্ট ফরটিফাইভ অটোমেটিক ফেলে ন্যাপকিন দিয়ে ঢেকে রাখল। বিয়ার শেষ করে কিচেন পরিষ্কার করল, এক কাপ কফি বানিয়ে চলে এল লিভিং রূমে। এইউভির ক্যামেরা প্যাকেজ থেকে বের করা ক্যাসেটটা স্পেশাল একটা অ্যাডাপ্টর-এ ভরে টেলিভিশন সেটের মাথায় রাখা ভিসিআর-এর পটে ঢুকিয়ে দিল। বসল টিভির একেবারে সামনে, স্ক্রীনটাকে আড়াল করে, লিভিং রূমে অনাবিষ্কৃত কোন ক্যামেরা থাকলে টিভির ছবি তাতে ধরা পড়বে না।

এইউভির রেকর্ড করা আন্ডারওয়াটার ভিডিও দেখছে রানা, জানে লেকের তলায় সাধারণত যা থাকে তার বেশি কিছু দেখতে পাবে না। ওর আগ্রহ বা কৌতূহল ডক আর ডকের পাশে নোঙর ফেলা ইয়টটাকে নিয়ে। ধৈর্য ধরে বসে থাকতে হলো, অগভীর ঢালের ওপর আগুপিছু করছে সাবমারসিবল। ঢালগুলোকে পিছনে ফেলে লেকের মাঝখানে, গভীর তলদেশে চলে এল ওটা, ধীরে ধীরে হুয়ান হানের ডকের দিকে এগোচ্ছে। প্রথম কয়েক মিনিট দু'চারটে মাছ দেখা গেল, যান্ত্রিক আগন্তুককে দেখে ছুটে পালাচ্ছে। নরম পলিতে জন্মানো আগাছার ছবিও ফুটে উঠল স্ক্রীনে। ঝর্ণার স্রোতে ভেসে এসেছে কিছু গাছের কাণ্ড। সৈকতের কাছাকাছি বাচ্চাদের কয়েকটা খেলনা আর একটা ছোট বাইসাইকেল দেখে হাসল রানা। আরও গভীর পানিতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে তৈরি একটা অটোমোবাইলও দেখা গেল। তারপর, হঠাৎ, নীল-সবুজ গভীরতায় সাদা ছোপ ছোপ দাগ ফুটে উঠল।

চমকে উঠল রানা। আতঙ্কে আড়ষ্ট হয়ে গেল শরীর। সাদা ছোপগুলো হাড়। শুধু হাড় নয়, মানুষের হাড়। স্ক্রীনে আরও স্পষ্ট হলো ছবি। মানুষের কঙ্কাল, পরিষ্কার চিনতে পারছে ও। নিজের অজান্তে দম ফেলতে ভুলে গেছে। শীতের মধ্যেও বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটছে কপালে।

আরও রোমহর্ষক বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। বেশিরভাগ কঙ্কাল পলির নিচে থেকে আংশিক বেরিয়ে আছে, সংখ্যায় বিশ-পঁচিশটার কম নয়। আঁতকে উঠে রানা এরপর মানুষের লাশ দেখতে পেল, পলির ওপর পড়ে আছে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। সংখ্যায় এগুলো বেশি নয়, পাঁচ-সাতটা হবে। কিন্তু এ তো পাইকারী হত্যাকাণ্ডের স্পষ্ট আলামত! আকস্মিক কোন দুর্ঘটনা হতে পারে না, দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে মানুষ মেরে লেকের তলায় ফেলে দেয়া হচ্ছে। লেকের আরও গভীরে আলো পৌঁছায়নি, ফলে ক্যামেরার লেন্স স্পষ্ট ছবি তুলতে ব্যর্থ হয়েছে। রানা ধারণা করল, পানির গভীরে আরও অনেক লাশ থাকা অসম্ভব নয়।

কঙ্কাল আর লাশের আকৃতি দেখে বোঝা যায় শুধু পরিণত বয়স্ক মানুষকেই খুন করা হয়নি, খুন করা হয়েছে বাচ্চাদেরও। লাশগুলোর মধ্যে তিনটেই মহিলার। এগুলো কবে লেকে ফেলা হয়েছে বলা কঠিন, কারণ গ্লেসিয়ার থেকে

নেমে আসা হিম শীতল পানিতে লাশ পচতে অনেক বেশি সময় নেয়। লাশগুলো দেখে মনে হচ্ছে মারা যায়নি, আরামে ঘুমিয়ে আছে, এখনও কোনটায় পচন ধরেনি। লাশগুলোর এক মিটারের মধ্যে চলে এল সাবমারসিবল, ফলে রানা দেখতে পেল ওদের হাতগুলো পিছমোড়া করে বাঁধা, মুখে টেপ লাগানো, কোমরে রশি দিয়ে বাঁধা হয়েছে আঙটা পরানো লোহার বল। দুটো লাশের চেহারা দেখে চীনা বলে চেনা গেল। তৃতীয়টাকে মনে হলো পাঞ্জাবী–ভারতীয় হোক বা পাকিস্তানী। আরেকটাকে চেনা গেল না, কোরিয়ান হতে পারে, কিংবা ফিলিপিনো। শেষ দুটো লাশের পরনে শাড়ি, তবে কোন দেশের বোঝা গেল না।

এখানে পাইকারী হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। বলা উচিত ঘটছে। কতদিন থেকে কে জানে। অথচ, অবাক হয়ে রানা লক্ষ করল, কোন লাশের গায়েই কোন জখম নেই–না গুলির, না ছুরির। লোকে যে যা-ই বলুক, পানিতে ডুবে মরা অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক। এর চেয়ে যন্ত্রণাদায়ক শুধু আগুনে পুড়ে মরা। পানির গভীরে দ্রুত তলিয়ে যাবার সময় এয়ারড্রাম বিস্ফোরিত হয়, নাকের ফুটোয় দ্রুত বেগে পানি ঢোকে, ফলে অবিশ্বাস্য সাইনাস পেইন শুরু হয়। ফুসফুসের ব্যথাটা হয় ভয়াবহ, মনে হয় গরম কয়লা দিয়ে চিরে ফেলা হচ্ছে। মৃত্যু খুব দ্রুতও ঘটে না। প্রথমে হাত-পা বাঁধা হয়, তখনকার আতঙ্ক বর্ণনা করা অসম্ভব। তারপর গভীর রাতে নিয়ে আসা হয় লেকের গভীরে। রানা ধারণা করল, এই কাজে জোড়া খোল ফিট করা রহস্যময় কালো বোটটা ব্যবহার করা হয়, হাত-পা বাঁধা জ্যান্ত মানুষগুলোকে ফেলে দেয়া হয় সেন্টার কেবিনের তলা থেকে। অসহায় মানুষগুলো অজ্ঞাত কোন ষড়যন্ত্রের শিকার, মারা গেছে বর্ণনার অতীত যন্ত্রণা আর আতঙ্ক নিয়ে।

ওরিয়ন লেকটাকে গোরস্থান হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। কিন্তু কে ব্যবহার করছে? কেন? শিপিং ম্যাগনেট হুয়ান হানের কর্মচারীরা দায়ী? নাকি ধনকুবের হান নিজেই জড়িত?

ছুটির সময়টা বিশ্রাম নিতে এসে এ কিসের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ল রানা?

চার

ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে রাত দুপুরে হোয়াইট হাউস থেকে স্বয়ং প্রেসিডেন্টের জরুরী তলব, কে না বিস্মিত ও উদ্বিগ্ন হবে। কিন্তু নুমার ডিরেক্টর অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন সম্পূর্ণ অন্য ধাতুতে গড়া; তাঁর ব্যক্তিত্ব, জীবনযাপন পদ্ধতি, প্রতিক্রিয়ার ধরন অন্য কারও সঙ্গে মিলবে না। প্রেসিডেন্টের চীফ অব স্টাফ জক ক্লিফোর্ড টেলিফোনে তাঁর ঘুম ভাঙালেন, জানিয়ে দিলেন আধ ঘণ্টার মধ্যে হোয়াইট হাউসে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করতে হবে, সঙ্গে করে নিয়ে আসতে হবে অ্যাডমিরালের চীফ এইড ও অপারেশন্স-এর ডিরেক্টর জর্জ রেডক্লিফকে। শুনে একটা মাত্র বাক্য উচ্চারণ করলেন অ্যাডমিরাল, 'আমাদের পৌঁছুতে পঞ্চান্ন মিনিট লাগবে,' বলেই রিসিভার নামিয়ে রাখলেন। কি ঘটনা, কেন ডাকা হচ্ছে, কিছুই জানতে চাইলেন না।

হোয়াইট হাউসে ঢোকার মুখে সিকিউরিটি সিস্টেমের ঝামেলা পোহাতে হলো। গাড়ি বারান্দার নিচে ওঁদের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন ক্লিফোর্ড, তিনিই পথ দেখিয়ে সিচুয়েশন রূমে নিয়ে এলেন। সিচুয়েশন রূমে আরও তিন ভদ্রলোককে দেখা গেল, একজনকে অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন চেনেন, বাকি দু'জন অপরিচিত। টেবিলে, নিজের চেয়ারের সামনে, দাঁড়িয়ে আছেন প্রেসিডেন্ট, হাতে কফির কাপ। বোঝা গেল, ওদের আসতে দেরি হওয়ায় অপেক্ষা করছিলেন সবাই। প্রেসিডেন্ট এডমন্ড গিবসনের সঙ্গে ওদের পরিচয় করিয়ে দিলেন চীফ অব স্টাফ ক্লিফোর্ড। 'মি. প্রেসিডেন্ট, অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন এবং কমান্ডার জর্জ রেডক্লিফ।'

নতুন প্রেসিডেন্টকে বয়েসের চেয়ে একটু বেশি বুড়োটে দেখায়। বয়েস পঞ্চাশ, দেখে মনে হয় ষাট। মাথায় অর্ধেকের বেশি চুল পেকে গেছে. মুখের ত্বক ভেদ করে ফুটে আছে লাল শিরা, চোখ দুটো লালচে। লালচে চোখের কারণে কার্টুনিস্টরা তাঁকে অ্যালকোহলিক হিসেবে আঁকতে পছন্দ করে, অথচ বিয়ার ছাড়া আর কিছু তিনি স্পর্শ করেন না, তাও মাঝেমধ্যে। দু'বছর আগে ভাইস-প্রেসিডেন্ট ছিলেন তিনি, প্রেসিডেন্ট নারীঘটিত কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়ার কারণে ইমপিচমেন্টের শিকার হওয়ায় প্রেসিডেন্ট হন, পরের বছর ইলেকশনে জিতে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হন।

খালি হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে এডমন্ড গিবসন বললেন, 'অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন, অবশেষে আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে আমি খুশি।'

'মি. প্রেসিডেন্ট, ধন্যবাদ; আশা করি আরও বহুবার সরাসরি সাক্ষাৎ হবে আমাদের।'

জবাবে কিছু না বলে রেডক্লিফের দিকে তাকিয়ে ছোট করে শুধু মাথা ঝাঁকালেন প্রেসিডেন্ট। জক ক্লিফোর্ড মেজবানের ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন, টেবিল ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকা বাকি তিন ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন ওদের।

ডীন ফেয়ার, ইমিগ্রেশন অ্যান্ড ন্যাচারালাইজেশন সার্ভিস-এর কমিশনার।

পিট লুকাস, ডীন ফেয়ারের এগজিকিউটিভ অ্যাসোসিয়েট কমিশনার, ফিল্ড অপারেশন্স-এর দায়িত্বে আছেন।

অ্যাডমিরাল মারভি হোপ, কোস্ট গার্ড কমান্ড্যান্ট।

'হোপ আর আমি পুরানো বন্ধু,' হ্যামিলটন বললেন।

হ্যান্ডশেক সেরে হ্যামিলটনের কাঁধে হাত রাখলেন হোপ, বললেন, 'ভাল লাগছে, জর্জ। অনেক দিন পর দেখা হলো।'

'আসুন, সবাই আমরা বসি,' অনুরোধ করলেন প্রেসিডেন্ট, সবাই বসার পর নিজেও আসন গ্রহণ করলেন। 'বৃষ্টির মধ্যে এত রাতে ডেকে পাঠাতে হলো, সেজন্যে সত্যি আমি দুঃখিত এবং ক্ষমাপ্রার্থী। কিন্তু জক এমন একটা গুরুতর বিষয়ে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল, সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করা গেল না। এই দুর্যোগের মধ্যে আপনাদেরকে ডাকার আরেকটা কারণ হলো, গোটা ব্যাপারটা গোপন রাখতে হবে, বিশেষ করে মিডিয়াকে কিছুই জানতে দেয়া চলবে না।

'বিষয়টা অবৈধ অভিবাসন সম্পর্কিত। একটু নাটুকে ভাষায় যদি বলি–

সঙ্কটটা আমাদের দোরগোড়ায় বিস্ফোরিত হচ্ছে। এর মধ্যে এতটুকু অতিরঞ্জন নেই, একশো ভাগ সত্যি। আপনাদের ডেকে পাঠানোর কারণ হলো, আপনারা আমাকে বুদ্ধি দেবেন এই অবৈধ অভিবাসনের স্রোত কিভাবে বন্ধ করা যায়। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি, আমাদের বিশাল উপকূল রেখায় পাচার হয়ে যারা আসছে তাদের মধ্যে চীনা, ভারতীয়, কোরিয়ান, ইন্দোনেশিয়ান, মালয়েশিয়ান, পাকিস্তানী, বাংলাদেশী—অর্থাৎ এশিয়ার লোকজনই বেশি। স্মাগলিং নেটওঅর্কটা বিশাল, সারা দুনিয়ায় হাজার হাজার এজেন্ট আছে ওদের, এবং এই নেটওঅর্ক পরিচালনা করছে একটা তাইওয়ানিজ ক্রাইম সিন্ডিকেট। শুধু মানুষ পাচার নয়, পাচার করা মানুষকে দিয়ে ড্রাগ বিক্রি করাচ্ছে ওরা, ছিনতাই-লুঠপাটের কাজে লাগাচ্ছে, ব্যাংক ডাকাতি করাচ্ছে, এমনকি দেহ-ব্যবসাও চালাচ্ছে। এটা ওদের বিলিয়ন ডলারের ব্যবসা, দিনে দিনে আরও প্রকাণ্ড ও ভয়াবহ হয়ে উঠছে। এই স্রোত যদি ঠেকানো না যায়, আমেরিকা আর আমেরিকা থাকবে না। আশা করি সমস্যাটার গুরুত্ব আমি বুঝিয়ে বলতে পেরেছি।'

অ্যাডমিরাল ভুরু জোড়া উঁচু করলেন, চেহারায় বিস্ময়। 'মি. প্রেসিডেন্ট, আমি বুঝতে পারছি না আইএনএস আর কোস্ট গার্ড থাকতে অবৈধ অভিবাসন ঠেকাতে নুমাকে কেন ডাকা হলো? নুমার কাজ পানির নিচে গবেষণা চালানো। তাইওয়ানিজ স্মাগলারদের ধাওয়া করা আমাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না।'

প্রেসিডেন্ট নন, উত্তর দিলেন আইএনএস-এর কমিশনার ডীন ফেয়ার, 'সম্ভাব্য সব উৎস থেকে সাহায্য দরকার আমাদের। কংগ্রেস আইএনএস বর্ডার-পেট্রল এজেন্টের সংখ্যা ষাট ভাগ বাড়াতে বলেছে, কিন্তু ইনভেস্টিগেশন ডিভিশনের জন্যে কোন বাজেট বরাদ্দ করেনি। দেশে ও বিদেশে ইনভেস্টিগেশন চালাবার জন্যে আমাদের গোটা ডিপার্টমেন্টে স্পেশাল এজেন্ট রয়েছে মাত্র আঠারোশো। অবৈধ অভিবাসন ঠেকাবার জন্যে আমরা প্রায় কিছুই করতে পারছি না।'

'এফবিআই?'

'চুরি-ডাকাতি, রেপ, ড্রাগ ট্র্যাফিকিং, খুন-জখম ঠেকাতেই হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে ওরা, অন্য দিকে খেয়াল দেয়ার সুযোগ নেই। শুধু নিউ ইয়র্ক শহরেই এগারোশো এফবিআই এজেন্টকে রাখতে হচ্ছে। এত লোকবল কোথায় যে উপকূল পাহারা দেবে?'

'কোস্ট গার্ড?'

'আইএনএস-এর যে অবস্থা, কোস্ট গার্ডেরও ওই একই অবস্থা,' এখনও ডীন ফেয়ার জবাব দিয়ে যাচ্ছেন। 'আমাদের উপকূল কত বড়, সেটা একবার ভাবুন। লোকবল এমনিতেই কম, তারা ডুবন্ত লোককে বাঁচাবে, না অবৈধ অভিবাসন ঠেকাবে?'

পিট লুকাস, অ্যাসোসিয়েট কমিশনার বললেন, 'এই স্রোত ঠেকানো না গেলে আমেরিকানরা সংখ্যালঘুতে পরিণত হবে, সংখ্যাগুরু হয়ে উঠবে বিদেশীরা। কিন্তু এর অন্য একটা দিকও আছে। সেটা হলো মানবিক। চীনা স্মাগলাররা যে-সব মানুষকে আমেরিকার মাটিতে পৌঁছে দিচ্ছে তাদের দুর্দশা চোখে না দেখলে

বিশ্বাস করা যায় না। জাহাজের একটা গোপন কমপার্টমেন্টে যদি দশজনের জায়গা হয়, সেখানে ভরা হচ্ছে একশোজনকে। খেতে দেয়া হয় না, পানি দেয়া হয় না, বাথরুম পর্যন্ত থাকে না। জাহাজগুলো সাধারণত সমুদ্রসীমার বাইরে নোঙর ফেলে, আরোহীদের বোটে নামিয়ে দেয়া হয়। অনেক বোটই ফুটো, তীরে পৌঁছানোর আগেই ডুবে যায়। তীরে যারা পৌঁছায়, ধরা পড়লে বছরের পর বছর জেলে পচে। আর ধরা না পড়লে সিন্ডিকেটের মাধ্যমে বেআইনী কাজে যোগ দেয়, যা আয় করে বেশিরভাগই তুলে দিতে হয় চীনাদের হাতে। হাজার হাজার নয়, লাখ লাখ মানুষ এভাবে প্রতারিত হচ্ছে। এটা আমরা কিভাবে মেনে নিই, আমেরিকা যেখানে মানবাধিকারের কথা বড় মুখ করে বলে বেড়ায়?'

'মানুষ পাচারের ব্যবসা ড্রাগ স্মাগলিংকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে,' বললেন প্রেসিডেন্ট। 'আমার দৃষ্টিতে এটা স্রেফ একটা মহামারী হয়ে দেখা দিয়েছে। সেটা আমেরিকাকে গ্রাস করে ফেলার আগেই যা করার করতে হবে আমাদের। চীনা স্মাগলারদের একটা হিসাব আছে, তা হলো এশিয়ার জনসংখ্যা প্রতি বছর বিয়াল্লিশ মিলিয়ন করে বাড়ছে, অথচ মাথাপিছু জমিন অতি সামান্য। উন্নত জীবনযাত্রার হাতছানিতে সাড়া দিতে চাইছে বা চাইবে কোটি কোটি লোক। এই সুযোগটাই কাজে লাগাচ্ছে স্মাগলাররা। তারা জানে তাদের ব্যবসা দিনে দিনে ফুলে-ফেঁপে উঠবে। আমি গোপন সূত্রে আভাস পেয়েছি, আগামী পঞ্চাশ থেকে একশো বছরের মধ্যে বিশ কোটি লোককে আমেরিকায় পাচার করার কথা ভাবছে ওরা।'

অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন বললেন, 'এই স্রোত বন্ধ করার নিশ্চয়ই একাধিক উপায় বের করা সম্ভব।'

'যেমন? আপনিই বলুন,' আহ্বান জানালেন প্রেসিডেন্ট।

'আর্মি আর মেরিনকে ডাকুন, উপকূল পাহারা দিক তারা,' বললেন হ্যামিলটন।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন প্রেসিডেন্ট। 'পয়েন্টটা আপনি মিস করেছেন বলে মনে হয়, অ্যাডমিরাল। আমেরিকার ওপর এই আক্রমণ নীরবে ও শান্তিপূর্ণ ভাবে ঘটছে। নিরস্ত্র মানুষের ওপর মিসাইল ছোঁড়ার অনুমতি কিভাবে দিই আমি? ভুলে গেলে চলবে না যারা পাচার হয়ে আসছে তাদের তেমন কোন দোষ নেই, তারা প্রায় সবাই অসহায় ও নিরীহ। এও ভুলে গেলে চলবে না যে তাদের মধ্যে মহিলা আর শিশুরাও আছে।'

'তাহলে সশস্ত্র ফোর্সকে জয়েন্ট অপারেশনে পাঠান,' বললেন হ্যামিলটন। 'আমাদের সীমান্ত সীল করে দিক তারা। তাতে ড্রাগ আসাও বন্ধ হয়ে যাবে।'

'এই চিন্তা আমার চেয়ে উর্বর মাথাতেও এসেছে,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন প্রেসিডেন্ট।

জক ক্লিফোর্ড দৃঢ়কণ্ঠে জানালেন, 'বেআইনী তৎপরতা ঠেকানো পেন্টাগনের মিশন নয়।'

প্রতিবাদ করে হ্যামিলটন কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, তাঁকে বাধা দিয়ে প্রেসিডেন্ট বললেন, 'আমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে রাজনৈতিক কিছু ব্যাপার আছে।' তাঁর চেহারা

হঠাৎ কঠিন হয়ে উঠল।

ক্লিফোর্ড বললেন, 'আমি তাহলে একটু ব্যাখ্যা করি, অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। আপনি হয়তো জানেন, ইউ. এস. ট্রেজারি বন্ডের সবচেয়ে বড় ক্রেতা ছিল জাপানীরা। তাদেরকে সরিয়ে দিয়ে তাইওয়ানিজ চীনারা এখন তালিকার শীর্ষে উঠে এসেছে। কাজেই প্রকাশ্যে ওদের বিরুদ্ধে কিছু করা আমাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে চলে যায়।'

রেডক্লিফ লক্ষ করলেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন শুধু ইতস্তত করছেন না, রীতিমত বিরক্তবোধ করছেন। 'মি. প্রেসিডেন্ট, আমি নিশ্চিত যে অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন আপনার সমস্যা উপলব্ধি করতে পারছেন। কিন্তু দু'জনেই আমরা এখনও বুঝতে পারছি না কিভাবে নুমা সাহায্য করতে পারে।'

'নুমা কিভাবে সাহায্য করতে পারে, অনুমতি পেলে আমি ব্যাখ্যা করতে পারি, জর্জ,' বললেন অ্যাডমিরাল মারভি হোপ।

'প্লীজ ডু,' ভারী গলায় বললেন হ্যামিলটন।

'এটা কোন গোপন ব্যাপার নয় যে কোস্ট গার্ডের সামর্থ্য সীমিত। গত বছর আর চলতি বছরের এই ক'মাস আমরা বত্রিশটা জাহাজ সার্চ করে চার হাজারের ওপর অবৈধ অভিবাসী ধরেছি শুধু ইস্ট কোস্ট, ওয়েস্ট কোস্ট আর হাওয়াই-এ। আমার কথা হলো, রিসার্চ ভেসেলের ছোট একটা বহর রয়েছে নুমার...'

'এখানেই থামো,' বাধা দিলেন হ্যামিলটন। 'অবৈধ অভিবাসী আছে এই সন্দেহে আমি আমার বিজ্ঞানীদের বিদেশী জাহাজে উঠে সার্চ করতে বলতে পারি না।'

'এখানে মেরিন বায়োলজিস্টদের হাতে অস্ত্র তুলে দেয়ার কথা বলা হচ্ছে না,' শান্ত, নরম সুরে বললেন অ্যাডমিরাল মারভি হোপ। 'নুমাব কাছ থেকে আমরা শুধু তথ্য চাইছি–অবৈধ অভিবাসীদের ল্যান্ডিং সাইট, আমাদের কোস্টলাইন বরাবর জিওলজিকাল কন্ডিশন, বিদেশী জাহাজগুলো কোস্ট গার্ডকে ফাঁকি দিয়ে বে বা ইনলেটে ঢুকে পড়ছে কিনা ইত্যাদি সম্পর্কে। তোমার সেরা লোকদের পাঠাও, জর্জ। তারা স্মাগলার হলে হিউম্যান কার্গো কোথায় খালাস করত?'

'নুমার সুবিধে হলো,' বললেন ডীন ফেয়ার, 'আসমানী রঙের জাহাজগুলো প্রায় সারা দুনিয়ায় পরিচিত। সন্দেহজনক কোন ভেসেলের একশো গজের মধ্যে গেলেও স্মাগলাররা সতর্ক হবার প্রয়োজন বোধ করবে না। কাছ থেকে যা দেখবে রিপোর্ট করবে তারা, নিজেদের গবেষণার কাজও চালাবে।'

'নুমার কাজ নুমা করবে, সেটা আমি বন্ধ রাখতে বলতে পারি না,' বললেন প্রেসিডেন্ট। 'তবে এও চাই, অবৈধ অভিবাসন বন্ধ করার কাজে আইএনএস আর কোস্ট গার্ডকে যতটা সম্ভব সাহায্য করুক।'

আইএনএস-এর অ্যাসোসিয়েটেড কমিশনার পিট লুকাস বললেন, 'বিশেষ করে দুটো জায়গায় নুমার সাহায্য দরকার আমাদের।'

'শুনছি আমি,' বিড়বিড় করলেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন, সামান্য হলেও আগ্রহী হয়ে উঠছেন।

'আপনি কি হুয়ান হান নামটার সঙ্গে পরিচিত?' পিট লুকাস জানতে

চাইলেন।

'হ্যাঁ, পরিচিত। শিপিং ব্যবসাতে ওনাসিসকেও ছাড়িয়ে গেছে তার হুয়ান হান ম্যারিটাইম লিমিটেড। শ তিনেক কার্গো শিপের মালিক, অয়েল ট্যাংকার আর ক্রুজ শিপও আছে। তাইওয়ানের রাজধানী তাইপে থেকে ব্যবসা পরিচালনা করা হয়, তবে হংকঙেও বিশাল অফিস বিল্ডিং আছে। একবার এক চীনা হিস্টোরিয়ানের মাধ্যমে নুমার কাছে একটা অনুরোধ করা হয়। একটা শিপরেক-এর হদিস পেতে চায় ওরা, তাই ওটা সম্পর্কে আমাদের ডাটা ফাইল দেখার খুব ইচ্ছে।'

'ইতিমধ্যে রটে গেছে, যা কিছু পানিতে ভাসে, তার মালিক সম্ভবত হুয়ান হানই। দুনিয়ার সমস্ত বড় বন্দরে ডকসাইড ফ্যাসিলিটি আর ওয়্যারহাউস আছে। লোকটা যেমন ধূর্ত, তেমনি নিষ্ঠুর,' বললেন ডীন ফেয়ার।

'এই কি সেই হান, চীনা মোঘল, লুইসিয়ানায় বিশাল পোর্ট ফ্যাসিলিটি তৈরি করেছে?' জানতে চাইলেন রেডক্লিফ।

'হ্যাঁ, তার কথাই বলছি,' জবাব দিলেন অ্যাডমিরাল মারভি হোপ। 'অ্যাচাফালায়া বে, মরগান সিটির কাছে। জলাভূমি আর নালা ছাড়া আর কিছু নেই ওখানে। বহু ডেভলপারকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে, সবচেয়ে কাছের বড় শহর থেকে আশি মাইল দূরে কয়েকশো মিলিয়ন ডলার খরচ করে শিপিং পোর্ট তৈরি করার পিছনে কোন যুক্তি আছে বলে কেউ তারা স্বীকার করে না। ওই পোর্ট ফ্যাসিলিটি থেকে কোন ট্র্যান্সপোর্টেশন নেটওঅর্কও বেরোয়নি।'

'পোর্টটার নাম কি?' রেডক্লিফ জানতে চাইলেন।

'সানগারি।'

'ঈশ্বরই বলতে পারবেন কেন ওটা তৈরি করা হয়েছে,' ডীন ফেয়ারও স্বীকার করলেন। 'এখানে নুমা আমাদেরকে সাহায্য করতে পারে।'

অ্যাডমিরাল মারভি বললেন, 'ঠিক তাই। সানগারিকে বাইরে থেকে যা মনে হচ্ছে, ভেতরটা নিশ্চয়ই তা নয়। গোটা ব্যাপারটার মধ্যে নিশ্চয়ই কোন রহস্য আছে। আর সে রহস্যের সন্ধান পাওয়া যাবে সম্ভবত পানির তলায়।'

ক্ষীণ একটু হেসে প্রেসিডেন্ট অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের দিকে তাকালেন। 'এখন বুঝতে পারছেন তো, নুমার সাহায্য কেন আমাদের দরকার? আন্ডারওয়াটার ইনভেস্টিগেশনে নুমার যে ব্রেন আর টেকনলজি আছে, সরকারী অন্য কোন এজেন্সির তা নেই।'

হ্যামিলটনের চোখে পলক পড়ছে না, দৃষ্টি দেখে বোঝার উপায় নেই ঠিক কি তিনি ভাবছেন। 'মি. প্রেসিডেন্ট, আপনি এখনও পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করেননি হুয়ান হানের সঙ্গে অবৈধ অভিবাসনের কি সম্পর্ক।'

'আমাদের ইন্টেলিজেন্স সোর্সগুলো বলছে, সত্তর দশক থেকে বিভিন্ন শিপিং কোম্পানী আমেরিকায় লোক পাচার শুরু করে। প্রথম দিকে অবৈধ অভিবাসীর সংখ্যা খুব একটা বেশি ছিল না। তারপর হংকং চীনকে ফিরিয়ে দেয়ার দিন যত এগিয়ে আসতে লাগল, অবৈধ অভিবাসীর সংখ্যা গাণিতিক হারে বাড়তে শুরু করল। লোক পাচারের ব্যবসাতে হান সম্ভবত বিরানব্বুই সালে নামে। হংকং

চীনের হাতে ফিরে যাচ্ছে, এটা ব্যবসায়ী আর উঁচু পদের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আতঙ্কিত করে তোলে। ফলে আমেরিকায় পাড়ি জমাবার একটা হিড়িক পড়ে যায়। এই সুযোগটাই কাজে লাগায় হান।

'প্রথম দিকে শুধু হংকং থেকে চীনাদেরকে পাচার করত সে। নিজস্ব জাহাজ বহর থাকায় বিশেষ সুবিধে পায়। তারপর যখন দেখল লাভের পরিমাণ কল্পনাকেও ছাড়িয়ে যায়, গোটা এশিয়া থেকে লোক পাচারের জন্যে একটা বিশাল নেটওঅর্ক গড়ে তোলে সে। এশিয়ার প্রতিটি দেশে তার এজেন্ট আছে, তারা কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে লোকজনকে আমেরিকায় নিয়ে আসার প্রলোভন দেখায়। মানুষও উন্নত জীবনের আশায় জমি-জমা বিক্রি করে এজেন্টদের হাতে মোটা টাকা তুলে দেয়। শুনছি মাথা পিছু দশ থেকে ত্রিশ হাজার ডলার নিচ্ছে হান। এই ব্যবসাতে সে এমনই মজা পেয়ে গেছে যে ঘুষ বা চাঁদা হিসেবে বিলিয়ন ডলার খরচ করতেও পিছপা হচ্ছে না। বর্তমান পরিস্থিতি সত্যি অত্যন্ত খারাপ, রীতিমত ভয়াবহ। কিন্তু আমি শুধু বর্তমান নিয়ে চিন্তিত নই। বরং ভবিষ্যতে কি ঘটতে যাচ্ছে সেটা ভেবেই আমি বেশি আতঙ্কিত হয়ে পড়েছি। হান নিজেকে এমন একটা পর্যায়ে তুলে আনছে, তার শক্তি ও প্রভাব এমন প্রবল হয়ে উঠছে, একটা সময় আসবে যখন তাকে ঠেকানোর কোন উপায় থাকবে না।'

প্রেসিডেন্ট থামতে সিচুয়েশন রূমে নিস্তব্ধতা নেমে এল।

সেই নিস্তব্ধতা ভাঙলেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন, 'মি. প্রেসিডেন্ট, আমার সিদ্ধান্ত আমি পাল্টালাম। নুমা সাধ্যমত সব সাহায্যই করবে।'

'ধন্যবাদ, অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন।'

কমান্ডার রেডক্লিফের মাথায় এরইমধ্যে আইডিয়া আসতে শুরু করেছে, ডীন ফেয়ার আর পিট লুকাসের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হানের অর্গানাইজেশনে আপনাদের একজন এজেন্ট ঢোকানো গেলে খুব ভাল হয়, ভেতর থেকে তথ্য পাঠাতে পারবে।'

আইএনএস কমিশনার অসহায় ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন। 'হানের সিকিউরিটি অসম্ভব রকম টাইট। সাবেক কেজিবি এজেন্টদের নিয়ে একটা বৃত্ত তৈরি করেছে সে, সেটার ভেতর সিআইএ পর্যন্ত এখনও ঢুকতে পারেনি। ওদের পারসোনেল আইডেনটিফিকেশন ও ইনভেস্টিগেশন সিস্টেম সম্পূর্ণ কমপিউটারাইজড, অত্যন্ত আধুনিক। হান তার নিজের প্রতিটি লোকের ওপর সারাক্ষণ নজর রাখার ব্যবস্থা করে রেখেছে।'

'এ-পর্যন্ত,' বললেন পিট লুকাস, 'দু'জন স্পেশাল এজেন্টকে হারিয়েছি আমরা। হানের অর্গানাইজেশনে ঢোকার চেষ্টা করেছিল তারা। শুধু একজন মহিলা এজেন্টকে অবৈধ অভিবাসী হিসেবে হানের একটা জাহাজে তোলা সম্ভব হয়েছে। নিজেদের ব্যর্থতা স্বীকার করতে লজ্জা নেই, কারণ বাস্তবতা মেনে নেয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।'

'আপনাদের এজেন্ট একজন মহিলা?' জানতে চাইলেন হ্যামিলটন।

'হ্যাঁ, এক তরুণী। জন্মসূত্রে সে আমেরিকান, তবে তার মা-বাবা বাংলাদেশী। শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে সে।'

রেডক্লিফ জানতে চাইলেন, 'কোন ধারণা আছে, আপনাদের এজেন্টকে স্মাগলাররা আমেরিকার কোন্ তীরে নামাবে?'

মাথা নাড়লেন লুকাস। 'তার সঙ্গে আমাদের কোন যোগাযোগ নেই। অন্যান্য অবৈধ অভিবাসীর সঙ্গে সান ফ্রানসিসকো থেকে অ্যাংকারিজ-এর মাঝখানে যে-কোন জায়গায় নামানো হতে পারে।'

'বাকি দুই এজেন্টের মত সে-ও ধরা পড়ে যায়নি, এটা জানছেন কিভাবে?'

উত্তর দিতে কিছুক্ষণ সময় নিলেন লুকাস, তারপর শান্তভাবে স্বীকার করলেন, 'সত্যি কথা বলতে কি, জানি না। অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। নিরাপদে তীরে নামতে পারলে ওয়েস্ট কোস্ট ডিস্ট্রিক্ট অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করার কথা তার।'

'যদি কোনদিনই যোগাযোগ না করে?'

এবারও জবাব দিতে সময় নিলেন লুকাস। 'সেক্ষেত্রে তাঁর প্রফেসর মা-বাবার কাছে শোক-বার্তা পাঠাতে হবে আমাকে, তারপর আরেকজনকে হানের অর্গানাইজেশন পেনিট্রেট করতে পাঠাতে হবে।'

মীটিং শেষ হলো ভোর চারটের দিকে। অ্যাডমিরাল তাঁর ক্যাডিলাক নিয়ে বাড়ি ফিরছেন, পথে রেডক্লিফকে তাঁর বাড়ির সামনে নামিয়ে দেবেন। খুক করে কেশে রেডক্লিফ বললেন, 'নুমার সাহায্য চাওয়াটা খুব আশ্চর্যজনকই বটে।'

'সত্যি কথা বলতে কি, প্রেসিডেন্ট আসলে ফেঁসে গেছেন,' মন্তব্য করলেন হ্যামিলটন। 'হোয়াইট হাউসে আমার সোর্স আছে, ফলে জানি হুয়ান হানের সঙ্গে প্রেসিডেন্টের দহরম-মহরম আজ থেকে নয়। উনি যখন ওকলাহোমার গভর্নর ছিলেন, তখন থেকে।'

ঘাড় ফিরিয়ে অ্যাডমিরালের দিকে তাকালেন রেডক্লিফ, 'কিন্তু প্রেসিডেন্ট তো বললেন...'

'মুখে যা-ই বলুন, বোঝাতে চেয়েছেন সম্পূর্ণ অন্য কথা। অবৈধ অভিবাসনের স্রোত অবশ্যই তিনি ঠেকাতে চান, কিন্তু প্রকাশ্যে এমন কোন পদক্ষেপ নেবেন না যাতে তাইওয়ান সরকার বা হুয়ান হান আপসেট হয়ে পড়ে। ইলেকশনের সময় এশিয়া থেকে সবচেয়ে বেশি চাঁদা পেয়েছেন তিনি হানের কাছ থেকে। তাইওয়ান সরকারও চাঁদা দিয়েছে, সেটাও হানের মাধ্যমে। প্রেসিডেন্টের সমর্থক কংগ্রেস ও সিনেট সদস্যরা অনেকেই হানের পক্ষ নিয়ে সারাক্ষণ দেন-দরবারে ব্যস্ত। প্রশাসনের মাথা প্রায় সবগুলোই হান কিনে রেখেছে।'

'তাহলে হানের অপরাধ আমরা প্রমাণ করতে পারলেই বা লাভ কি?' জানতে চাইলেন রেডক্লিফ।

'কোন লাভ নেই,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'হুয়ান হান কোন কালেই ক্রিমিনাল অ্যাকটিভিটির জন্যে আমেরিকার মাটিতে দোষী সাব্যস্ত হবে না। এমনকি তার বিরুদ্ধে অভিযোগ পর্যন্ত দায়ের করা যাবে না।'

'তাহলে কি ভেবে আপনি হানের বিরুদ্ধে তদন্ত চালাতে রাজি হলেন?' রেডক্লিফ বিস্মিত।

'মাসুদ রানার কথা ভেবে,' জবাব দিলেন অ্যাডমিরাল। 'ওকে আমি ভালবাসি কেন জানেন? রানা শুধু ইনভেস্টিগেটর নয়, বিচারকও।'

যা বোঝার বুঝে নিলেন রেডক্লিফ, কোন ব্যাখ্যা চাইলেন না। তবে জিজ্ঞেস করলেন, 'মি. রানাকে আমরা কিভাবে দায়িত্বটা দেব? তিনি কোথায় আছেন তাই তো আমরা জানি না।'

'আমি জানি। ওয়াশিংটন স্টেটেই আছে ও, ওরিয়ন লেকে।'

'জানেন! কিভাবে জানেন?'

'ল্যারি কিং তাকে এক ট্রাক আন্ডারওয়াটার গিয়ার পাঠিয়েছে।'

'ওহ্ গড! ওরিয়ন লেকেও কিছু ঘটছে নাকি?'

'যদি ঘটে, সময় মত জানতে পারব,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'এখন আমার জানা দরকার ববি মুরল্যান্ড কোথায় আছে বা কি করছে।'

'মুরল্যান্ড হাওয়াইয়ে হাওয়া খাচ্ছে,' বললেন রেডক্লিফ।

'তদন্তের দায়িত্বটা ওদের দু'জনকেই দেব আমি,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'টীম হিসেবে ওরা চমৎকার।'

'আপনি চান মুরল্যান্ডকে ডেকে পাঠাই আমি, ব্রিফ করি, তারপর তাকে রানার কাছে ওরিয়ন লেকে পাঠিয়ে দিই? রানাকে নিয়ে ওয়াশিংটন ডিসিতে ফিরে আসুক সে?'

'গুড আইডিয়া। আমাদের রিসার্চ শিপ সী গালকেও দরকার হবে। পুরানো একটা রিসার্চ শিপ, ক্রু হিসেবে থাকবে বায়োলজিস্টরা–হানের পোর্ট ফ্যাসিলিটি ইনভেস্টিগেট করতে সুবিধে হবে।'

পরাজয়ের গ্লানিতে ভুগছে শাকিলা। উপলব্ধি করতে পারছে মিশনটা ব্যর্থ হলো ওর নিজের দোষেই। আচরণ ঠিক ছিল না, প্রশ্নের জবাব দিয়েছে ভুল। হতাশা তো আছেই, বেপরোয়া একটা ভাব আরও অসুস্থ করে তুলছে ওকে। স্মাগলারদের অপারেশন সম্পর্কে বহু তথ্য জানতে পেরেছে ও, কিন্তু সে-সব তথ্য এখন আর আইএনএস-কে জানানোর কোন উপায় নেই, কাজেই স্মাগলারদের ধরার কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে না।

ক্ষতগুলো ব্যথা ও জ্বালা করছে। ক্লান্তি আর খিদেতে দুর্বল হয়ে পড়ছে শরীর। ইস্পাতের ডেকের কম্পন স্তিমিত হয়ে আসায় শাকিলা বুঝতে পারল এঞ্জিনগুলো থেমে যাচ্ছে। সম্মুখগতি হারিয়ে ঢেউয়ের তালে তালে দোল খাচ্ছে জাহাজ। কোস্ট গার্ডদের নাগাল থেকে বাইরে থাকার জন্যে যুক্তরাষ্ট্রের সমুদ্রসীমার বাইরে নোঙর ফেলছে সান বার্ড।

ইন্টারোগেশনের সময় শাকিলার হাতঘড়িটা কেড়ে নেয়া হয়েছে। সময়টা মাঝরাত বলে আন্দাজ করল ও। কার্গো হোল্ডের চারদিকে তাকিয়ে আরও আট-দশজনকে দেখতে পেল। ইন্টারোগেশনের পর এদেরকেও এখানে ঢোকানো হয়েছে। সবাই তারা উত্তেজিত গলায় এক সঙ্গে কথা বলছে। সবার ধারণা, অবশেষে আমেরিকায় পৌঁছেছে তারা, প্রাচুর্যময় নতুন জীবন শুরু হতে যাচ্ছে। কিন্তু শাকিলা জানে, কার্গো হোল্ডের সবাইকে হতাশ হতে হবে। অন্যায়ভাবে

দ্বিতীয়বার যে টাকা এনফোর্সাররা দাবি করেছিল সেটা যারা দিতে পারেনি বা যারা আমেরিকার মাটিতে পা রাখার পর ড্রাগ বিক্রি করতে কিংবা দেহ-ব্যবসা করতে রাজি হয়নি, শুধু তাদেরকেই এই কার্গো হোল্ডে আটকে রাখা হয়েছে। পরিণতি সম্পর্কে এখানকার সবারই একটা ধারণা থাকার কথা, কিন্তু বোকার মত আশা করছে আমেরিকায় তারা পৌঁছুতে পারবে।

দুই তরুণী, পাঁচ বছরের এক শিশু আর এক বৃদ্ধাকে নিয়ে যে পরিবারটি এখানে রয়েছে তাদের জন্যে খুব মায়া হচ্ছে শাকিলার। মেয়ে দুটোকে দেহ-ব্যবসাতে রাজি করানো যায়নি, কার্গো হোল্ডে স্থান পাবার সেটাই কারণ, তবে একমাত্র কারণ নয়। দুই বোনের মধ্যে বড়টার বয়েস হবে ছাব্বিশ, সে বেইজিং ইউনিভার্সিটি থেকে কমপিউটর সায়েন্স নিয়ে অনার্স করেছে। মূল চীনের বাসিন্দা বা নাগরিক সে, শুধু এই কারণে তাকে চাইনীজ ইন্টেলিজেন্সের এজেন্ট বলে সন্দেহ করা হয়েছে। তাকে সন্দেহ হওয়ায় তার পুরো পরিবারটিকে আটকে রাখা হয়েছে কার্গো হোল্ডে।

এদিকের সাগরে হুয়ান হান ম্যারিটাইম কোম্পানীর ফিশিং ফ্লীট আছে, সেই ফ্লীটের ট্রলারে অবৈধ অভিবাসীদের জাহাজ থেকে স্থানান্তর করতে ঘণ্টা দুয়েক সময় লাগল। ট্রলারগুলো যখন মানুষ পাচারের কাজ করে না তখন বৈধ কাগজ-পত্র সহ গভীর সাগরে মাছ ধরে। মাদারশিপ থেকে মানুষ নিয়ে ছোটখাট হারবার আর কোভ-এ চলে যায় ওগুলো, অলিম্পিক পেনিনসূলা উপকূল বরাবর। ওখানে বাস আর কার্গো ট্রাক অপেক্ষা করে, আরোহীদের নিয়ে চলে যায় যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজ্যে।

দু'নম্বর কার্গো হোল্ড থেকে সবার শেষে তুলে আনা হলো শাকিলাকে। ভালভাবে হাঁটতে পারছে না, এনফোর্সাররা টেনে-হিঁচড়ে আউটার ডেকে নিয়ে এল। র‍্যাম্পের পাশে দাঁড়িয়ে আছে চুয়াং চু, হাত তুলে এনফোর্সার আর শাকিলাকে দাঁড় করাল সে। 'শেষ একটা কথা, দীপালি সেন,' নিচু, ঠাণ্ডা সুরে বলল সে। 'আমার প্রস্তাবটা আরেকবার ভেবে দেখবে?'

'তোমার ক্রীতদাসী হবার প্রস্তাব যদি মেনে নিই,' ফোলা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে কোন রকমে কথা বলতে পারছে শাকিলা, 'তারপর কি হবে?'

ধূর্ত শিয়ালের মত হাসল চুয়াং চু। 'তারপর বলে কিছু থাকবে না। একটু বাজিয়ে দেখলাম মাত্র। ক্রীতদাসী হবার সুযোগও এখন আর নেই তোমার।'

'তাহলে কি চাও তুমি আমার কাছে?'

'তোমার সহযোগিতা। যাবার আগে শুধু বলে যাও সান বার্ডে তোমার সঙ্গে আর কে কাজ করছে?'

'তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না।'

পকেট থেকে একটা কাগজ বের করল চুয়াং চু। 'এটা পড়ো,' বলল সে। 'তোমার সম্পর্কে আমার সন্দেহ যে মিথ্যে ছিল না, এটাই তার প্রমাণ।'

'তুমি পড়ো,' বিড়বিড় করল শাকিলা।

'ডেক লাইটের নিচে দাঁড়িয়ে কাগজের লেখাটা পড়ল চুয়াং চু, 'স্যাটেলাইটের মাধ্যমে যে ফিঙ্গারপ্রিন্ট আর বর্ণনা তুমি পাঠিয়েছ তা অ্যানালাইজ আর

আইডেনটিফাই করা হয়েছে। দীপালি সেন আসলে দীপালি সেন নয়, তার আসল নাম শাকিলা সুলতান, এবং সে আমেরিকার ইমিগ্রেশন অ্যান্ড ন্যাচারালাইজেশন এজেন্সির একজন এজেন্ট। তার পরিণতি এমন হওয়া উচিত যাতে ভবিষ্যতে আর কোন হুমকি হয়ে দেখা না দেয়।'

বেঁচে যাওয়ার ক্ষীণ যে আশাটুকু ছিল, সেটুকুও উবে গেল শাকিলার মন থেকে। যখন জ্ঞান ছিল না তখন ওর আঙুলের ছাপ সংগ্রহ করেছে ওরা। কিন্তু চীনা স্মাগলারদের একটা গ্রুপ মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ওর পরিচয় কিভাবে জেনে ফেলল? একমাত্র ওয়াশিংটন ডি.সি.-র এফবিআই হেডকোয়ার্টার থেকে এই তথ্য ফাঁস হতে পারে। এর অর্থ দাঁড়ায় আইএনএস-এর এজেন্ট হিসেবে শাকিলা ও অন্যান্য ফিল্ড ইনভেস্টিগেটররা স্মাগলারদের সম্পর্কে যে ধারণা পেয়েছে, সেটা ভুল; তার চেয়ে অনেক বেশি জটিল আর সফিসটিকেটেড তাদের এই অর্গানাইজেশন। 'আমি দীপালি সেন। আমার আর কিছু বলার নেই।'

'তাহলে আমারও কিছু বলার নেই।' হাসল চুয়াং চু। 'বিদায়, শাকিলা।'

'তোমার সময় ঘনিয়ে এসেছে, চুয়াং চু,' হিসহিস করে বলল শাকিলা। 'খুব তাড়াতাড়ি তুমি মারা যাবে।'

'উঁহুঁ,' মাথা নেড়ে বলল চীফ এনফোর্সার, 'আমি না, তুমি।'

অটোনোমাস আন্ডারওয়াটার ভেহিকেল-এর ক্যামেরা থেকে পাওয়া ছবি দেখার পর এখনও অসুস্থবোধ করছে, দিনের শেষ এক ঘণ্টার আলোটুকু অপচয় হতে না দিয়ে টেলিস্কোপের সাহায্যে হান রিট্রিটের দিকে তাকিয়ে আছে রানা। মানুষ বলতে এখনও সেই তিনজনকে দেখা যাচ্ছে–চাকরানীটা আসা-যাওয়া করছে গেস্টহাউসে, গলফার দু'জন কোন দিকে না তাকিয়ে নিজেদের খেলা নিয়ে ব্যস্ত। খুবই আশ্চর্য লাগছে রানার। কোন ডেলিভারি ট্রাক বা প্রাইভেট কারকে আসতে বা যেতে দেখা যাচ্ছে না। সিকিউরিটি গার্ডরাও আর কুঁড়েগুলো থেকে বেরোয়নি। কোন পালা বদল ছাড়া জানালাবিহীন খুদে ঘরে তারা থাকছে কিভাবে?

আর কিছু দেখার নেই ভেবে টেলিস্কোপ সরিয়ে রাখল রানা। ল্যারি কিং-এর পাঠানো বড় আকৃতির দ্বিতীয় কার্টনটা বোটহাউসে নিয়ে এল ও। জিনিসটা এত ভারী আর বড় যে ছোট একটা হ্যান্ড ট্রাকের সাহায্যে ডকের ওপর দিয়ে গড়িয়ে আনতে হলো। ঢাকনি খুলে একটা কমপ্যাক্ট পোর্টেবল ইলেকট্রিক কমপ্রেসর বের করল, ওটার কর্ড ঢোকাল ওভারহেড লাইট সকেটে, তারপর জোড়া এইটি-কিউবিক-ফুট ডাইভার'স এয়ার সিলিন্ডারের ডুয়াল ম্যানিফোল্ড এয়ার ভালভের সঙ্গেও সংযোগ দিল। যান্ত্রিক যে গুঞ্জনটা শোনা গেল, অলস কার এঞ্জিনের চেয়ে কমই হবে।

কেবিনে ফিরে এসে ওরিয়ন লেক আর সাগরের মাঝখানে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকা পাহাড় সারির পিছনে সূর্যটাকে ঢলে পড়তে দেখল রানা। লেক অন্ধকার হয়ে যেতে ডিনার খেয়ে স্যাটেলাইট টেলিভিশন দেখল। দশটার দিকে বিছানা ঠিকঠাক করল, শোয়ার প্রস্তুতি নিয়ে নিভিয়ে দিল আলো। কেবিনের সার্ভেইল্যান্স ক্যামেরা ইনফ্রারেড নয় ধরে নিয়ে কাপড়চোপড় ছাড়ল, নিঃশব্দ পায়ে বেরিয়ে এল

কেবিন থেকে, ক্রল করে পানিতে নামল, সাঁতার কেটে চলে এল বোটহাউসের ভেতর। পানি বরফ বললেই হয়, তবে মাথাটা এত ব্যস্ত যে খেয়ালই করল না। তোয়ালে দিয়ে গা মুছে নাইলন আর পলিয়েস্টার দিয়ে তৈরি এক প্রস্থ আন্ডারগারমেন্ট পরল। সিলিন্ডারগুলো প্রয়োজনীয় এয়ার প্রেশার সাপ্লাই পাবার পর নিজে থেকেই বন্ধ হয়ে গেছে কমপ্রেসর। ম্যানিফোল্ড ভালভে একটা ইউ.এস. ডাইভারস মাইক্রো এয়ার রেগুলেটর জোড়া দিল ও, চেক করল ব্যাকপ্যাকের স্ট্র্যাপ। এরপর হুড, গ্লাভস আর ট্র্যাকশন-সোলড বুট সহ ভাইকিং ভলকানাইজড-রাবার ড্রাই সুট পরল। সঙ্গে আরও থাকছে একটা ইউ.এস. মিলিটারি বয়ান্সি কমপেনসেটর, একটা সিগমা সিস্টেম কনসোল—ডেপথ গজ, এয়ার প্রেশার গজ, কমপাস আর ডাইভ টাইমার। ওজন বাড়াবার জন্যে ওয়েট বেল্টেও ভারী কিছু জিনিস ভরতে হলো। গোড়ালির ওপর স্ট্র্যাপ দিয়ে আটকাল একটা ডাইভ নাইফ। হুডে আটকাল আন্ডারওয়াটার মাইনার'স টাইপ লাইট।

সবশেষে একদিকের কাঁধে একটা বেল্ট পরল রানা, ওটার হোলস্টারে একটা কমপ্রেস্ড্-এয়ার গান আছে, খুদে বর্শা ছোঁড়া যায়। বেল্টের খাঁজে বিশটা বর্শা আছে।

রওনা হবার জন্যে অস্থির হয়ে আছে রানা। বহু দূর সাঁতরাতে হবে ওকে। অনেক কিছু দেখার আছে। করার কাজও কম নয়। ডকের কিনারায় বসে ফিন পরে নিল। তারপর ভাবল, শুধু শুধু শরীরটাকে খাটানোর কি দরকার। ট্যাংকের বাতাসও অপব্যয় করার কোন মানে হয় না। কাজেই পাশ থেকে একটা কমপ্যাক্ট, ব্যাটারিচালিত স্টিংরে ডাইভার-প্রপালশন ভেহিকেল তুলল, হ্যান্ডগ্রিপ ধরে টেনে লম্বা করল সেটাকে, চাপ দিল 'ফাস্ট স্পীড' সুইচে। সঙ্গে সঙ্গে বোটহাউসের ফ্লোটগুলোর নিচে থেকে ওকে নিয়ে বেরিয়ে এল ভেহিকেলটা।

আকাশে চাঁদ না থাকলেও পথ হারাবার কোন ভয় নেই। লেকের ওপারে ওর গন্তব্য ফুটবল স্টেডিয়ামের মত আলোকিত। আশপাশের বনভূমি দিনের উজ্জ্বলতা নিয়ে উদ্ভাসিত হয়ে আছে। আলোর এই ছটা প্রদর্শনের কারণ কি? সিকিউরিটির প্রয়োজনে আলো দরকার, তাই বলে এত? শুধু ডকে কোন আলো নেই, তবে ওখানে আলোর দরকারও নেই, তীর থেকে যথেষ্ট আভা আসছে।

সার্ভেইলান্স ক্যামেরা ইনফ্রারেড-এর সাহায্যে অন্ধকার ভেদ না করলে চোখে নাইট গ্লাস নিয়ে কোথাও একজন গার্ড অবশ্যই অপেক্ষা করছে। তবে সেজন্যে খুব একটা চিন্তিত নয় রানা। অনেক দূরে রয়েছে ও, টার্গেট হিসেবে খুবই ক্ষুদ্র। আরও আধ মাইল সামনে হলে চিন্তার কারণ ছিল।

স্টিংরে-র জোড়ামোটর তিন নট স্পীডে ছুটছে। পাঁচ মিনিটেরও কম সময়ে মাঝামাঝি দূরত্বে পৌঁছে গেল। ফেস মাস্ক অ্যাডজাস্ট করল, পানির নিচে মাথা ডুবিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ সারল স্নরকেলের মাধ্যমে। আরও চার মিনিট পার হলো। রিট্রিট-এর বোট ডক আর মাত্র একশো গজ দূরে। ওঅর্ক বোটটা এখনও নিখোঁজ, তবে মুরিং লাইনের সঙ্গে বাঁধা রয়েছে ইয়ট।

পানির ওপর দিয়ে এর বেশি এগোনোটা স্পর্ধা দেখানো হয়ে যাবে। মুখ থেকে স্নরকেল ফেলে দিয়ে ব্রিদিং রেগুলেটরের মাউথপীসে দাঁত বসাল রানা।

স্টিংরেকে নিচু করে পানির গভীরে ডাইভ দিল, লেকের তলা দশ ফুট নিচে থাকতে সিধে করে নিল আবার, নিউট্রাল বয়াঙ্গি পাবার জন্যে ড্রাই সুটে বাতাস ভরছে। রিট্রিট-এর আলো পানির নিচেটা সামান্য আলোকিত করে রেখেছে। ডকের দিকে যত এগোচ্ছে, দৃষ্টিসীমা ততই বাড়ছে–শূন্য থেকে ত্রিশ ফুটে পৌঁছে গেল। লেকের তলায় গোরস্থান, ইচ্ছে করেই সেদিকে তাকাচ্ছে না। পানি অত্যন্ত স্বচ্ছ হলেও, ওপর থেকে ওকে দেখতে পাবার কথা নয়, কারণ আলো পড়ায় সারফেস চকচক করছে।

স্টিংরে-র স্পীড কমিয়ে ধীরে ধীরে ইয়টটার খোলের তলায় চলে এল রানা। খোলটা পরিষ্কার, গায়ে জলজ কিছুই জন্মায়নি। ছোট মাছগুলো ঝাঁক বেঁধে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাছাড়া আর কিছু দেখার নেই। ভাসমান লগ কুঁড়েটার দিকে সাবধানে এগোল ও, কাল বিকেলে যেটা থেকে তাইওয়ানে তৈরি পারসোনাল ওয়াটারক্রাফট নিয়ে বেরিয়ে এসেছিল গার্ডরা। ধরা পড়ার আশঙ্কা দেখা দিলে পালাবার সুযোগ পাবে কিনা ভাবতে গিয়ে পালস্ রেট বেড়ে গেল। সুযোগ পাবার প্রশ্নই ওঠে না। ওয়াটারক্রাফটের স্পীড ত্রিশ নট, একজন সুইমার ওটার সঙ্গে পারে কিভাবে। কাজেই অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে ওকে। কুঁড়ের ভেতর পানির সারফেসে আলোর কোন প্রতিফলন থাকবে না। শান্ত পানির ওপর অন্ধকার কামরায় বসে থাকা কোনও লোক পরিষ্কার দেখতে পাবে ওকে। এক ঝাঁক মাছের অপেক্ষায় থাকল রানা, ঝাঁকের ভেতর ঢুকে নিজেকে আড়াল করবে, কিন্তু এদিকে ওগুলোর দেখা পাওয়া গেল না। একে ঝুঁকি নেয়া বা বোকামি বলে না, এ স্রেফ পাগলামি হয়ে যাচ্ছে। এখনও ধরা পড়েনি, কাজেই সময় থাকতে কেটে পড়াই উচিত। কেবিনে ফিরে স্থানীয় পুলিসকে খবর দিক। যে-কোন সুস্থ মানুষ তাই করবে।

তবে রানা ভয় পাচ্ছে না। হঠাৎ দেখতে পাবে একটা অটোমেটিক রাইফেল ওর দিকে তাক করা হয়েছে, ওর এই আশঙ্কা সত্যি হয় কিনা দেখার খুব কৌতূহল জাগছে মনে। সেই সঙ্গে দৃঢ় একটা প্রতিজ্ঞা আছে, জানতে হবে এতগুলো মানুষকে খুন করা হলো কেন। জানতে হলে এখনই, পরে আর হয়তো সুযোগ পাওয়া যাবে না। হোলস্টার থেকে এয়ার গানটা বের করে হাতে নিল, ব্যারেল আর বর্শা ওপর দিক তাক করা। ধীরে ধীরে, অত্যন্ত সাবধানে, স্টিংরের জোড়া মোটরের স্পীড সুইচ রিলিজ করল, ফিন ঝাপটে কুঁড়ের ফ্লোটগুলোর নিচে চলে এল। মুখ তুলে পানির ভেতর দিয়ে ওপর দিকে, বোটহাউসের ভেতরে তাকাল, দম আটকে রেখে বুদ্বুদ তৈরি হতে দিচ্ছে না।

দুটো ওয়াটারক্রাফট ছাড়া ভেতরটা অন্ধকার আর খালি বলে মনে হলো। হুডের ডাইভ লাইট রিসেট করল রানা, পানির ওপর মাথা তুলে ভাসমান কুঁড়ের চারদিকে আলো ফেলল। জোড়া ডকের সামনের দিকটা খোলা, মাঝখানে ওয়াটারক্রাফটের ফাইবার গ্লাস খোল দুটো জায়গা করে নিয়েছে। কুঁড়ের দরজা খুলে গেলে ওগুলোর রাইডাররা সরাসরি লেকে বেরিয়ে যেতে পারবে। হাত লম্বা করে দরজায় বাড়ি মারল ও, ফাঁপা একটা আওয়াজ হলো। দরজাটা কাঠ দিয়ে তৈরি নয়, প্লাইউড-এর পাতলা শিট রঙ করা। ইকুইপমেন্ট সহ একটা ডকে উঠে

পড়ল ও। এয়ার ট্যাংক, ফিন আর ওয়েট বেল্ট খুলে ফেলল, জড়ো করে রাখল একটা ওয়াটারক্রাফটে ডকের পাশে স্টিংরেটা ভাসছে।

হাতে এয়ার গান, কুঁড়েটার পিছনের দরজার দিকে নিঃশব্দে এগোল রানা। ল্যাচে আঙুল ছোঁয়াল, ধীরে ধীরে ঘোরাল সেটা, আধ ইঞ্চি ফাঁক করল দরজা। সামনে প্যাসেজওয়ে, লম্বা র‍্যাম্পের দিকে চলে গেছে। প্যাসেজ ধরে সাবধানে এগোচ্ছে ও। র‍্যাম্পে উঠে দেখল সেটা সরু একটা কংক্রিট প্যাসেজওয়েতে নেমে গেছে, চওড়ায় ওর এক কাঁধ থেকে আরেক কাঁধ পর্যন্ত। দেয়ালের মাথার দিকে শেলফ আছে, শেলফের ভেতর আলো জ্বলছে, প্যাসেজ-ওয়েটা সম্ভবত পানির তলা দিয়ে তীরের দিকে চলে গেছে। রানা আন্দাজ করল, বোটহাউস থেকে মেইন বিল্ডিঙের বেসমেন্টে পৌঁছেছে ওটা। সেজন্যেই এইউভি দেখার পর ওয়াটারক্রাফট নিয়ে সাড়া দিতে গার্ডদের অতটা সময় লেগেছিল। প্যাসেজওয়ে সরু হওয়ায় বাইসাইকেল চালানোও সম্ভব নয়, প্রায় দুশো গজ দৌড়ে পার হতে হয়েছে তাদেরকে।

সার্ভেইল্যান্স ক্যামেরার খোঁজে চারদিকে চোখ বুলাল রানা। নেই। অন্তত চোখে পড়ছে না। সরু প্যাসেজ ধরে এগোল ও, খানিকটা আড়াআড়ি ভঙ্গিতে। ঠিকাদার এটা তৈরি করার সময় বেঁটে-খাট চৈনিক কাঠামোর কথাই শুধু ভেবেছে, ভেবে হাসি পেল ওর। প্যাসেজটা শেষ হলো আরেকটা র‍্যাম্পের গোড়ায়। ওপর দিকে উঠে গেছে সেটা, একটা খিলানের ভেতর দিয়ে ক্রমশ চওড়া হয়ে। সামনে একটা করিডর, দু'পাশে দরজা।

প্রথম দরজার দিকে এগোল রানা। সামান্য ফাঁক হয়ে আছে কবাট। ফাঁকে চোখ রেখে নিচু বিছানা দেখতে পেল, স্কালক্যাপ পরা এক লোক ঘুমাচ্ছে। ঝুলে থাকা কাপড়চোপড় সহ একটা ক্লজিট দেখা যাচ্ছে। কয়েকটা দেরাজ সহ একটা ড্রেসার আছে, এক পাশে একটা নাইটস্ট্যান্ড ও ল্যাম্প। দেয়ালে একটা র‍্যাক, তাতে বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র-স্কোপ সহ একটা স্নাইপার'স রাইফেল, দুটো আলাদা অটোমেটিক রাইফেল, চারটে আলাদা ক্যালিবারের অটোমেটিক পিস্তল। দ্রুত উপলব্ধি করল রানা, সিংহের আস্তানায় ঢুকে পড়েছে ও। এখানে সিকিউরিটি গার্ডরা থাকে।

করিডরের সামনের একটা কামরা থেকে লোকজনের গলা ভেসে আসছে, মশার কয়েলের গন্ধও ঢুকল নাকে। এগোল রানা। এই কামরার দরজাও সামান্য খোলা। করিডরের মেঝেতে শুয়ে পড়ল ও, মেঝের কাছে মুখ, দরজার সরু ফাঁক দিয়ে কামরার ভেতর তাকাল। চারজন চীনা টেবিলে বসে তাস খেলছে। আঞ্চলিক চীনা ভাষায় কথা বলছে, কিছুই বোঝা গেল না। আরও দু'একটা কামরা থেকে নানারকম আওয়াজ ভেসে আসছে–কোনটায় ক্যাসেট প্লেয়ার বাজছে, কোনটায় রেডিও।

একে একে অনেকগুলো দরজা পার হয়ে এল রানা। গলা শুকিয়ে কাঠ, কারণ জানে যে-কোন মুহূর্তে ওরা কেউ করিডরে বেরিয়ে আসতে পারে। করিডরের শেষ মাথায় প্যাঁচানো একটা সিঁড়ি পাওয়া গেল। এখনও কোন চিৎকার-চেঁচামেচি বা গুলির শব্দ হচ্ছে না। কোথাও কোন অ্যালার্মও বাজছে না। মনে মনে একটা কথা

ভেবে খুশি রানা—হানের লোকজন বাইরের সিকিউরিটি সম্পর্কে খুবই স্পর্শকাতর, ভেতরের সিকিউরিটি সম্পর্কে মোটেও সতর্ক নয়।

সিঁড়ি ধরে দুটো লেভেল পার হয়ে এল রানা, দুটোই খালি—বিশাল খোলা জায়গা, কোথাও কোন পাঁচিল বা দেয়াল নেই। দেখে মনে হচ্ছে ঠিকাদার কাজ শেষ হবার আগেই লেবারদের নিয়ে ফিরে গেছে। অবশেষে টপ ল্যান্ডিঙে পৌঁছুল ও, থামল প্রকাণ্ড এক ইস্পাতের দরজার সামনে, যেন কোন ব্যাংক-এর ভল্ট থেকে খুলে এনে বসানো হয়েছে। দরজায় কোন টাইম বা কমবিনেশন লক নেই, শুধু একটা মোটা হাতল। নিঃশব্দে পুরো এক মিনিট দাঁড়িয়ে কান পেতে থাকল। তারপর হাতলটা ধরে ধীরে ধীরে ঘোরাতে শুরু করল। ড্রাই সুটের ভেতর শরীরে ঘাম গড়াচ্ছে। সিদ্ধান্ত নিল, বিল্ডিঙের ভেতরটা দ্রুত একবার দেখে নিয়ে ফিরে যাবে।

হাতলটা পুরোপুরি ঘোরাবার পর কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করল রানা, তারপর ভারী দরজার কবাট একটু একটু করে সামান্য ফাঁক করল। ফাঁকের ভেতর তাকিয়ে আরেকটা দরজা দেখতে পেল, বার লাগানো।

এটা স্রেফ একটা জেলখানা। অন্তত লোহার বার লাগানো দ্বিতীয় দরজাটা সেই কথাই বলে। রিট্রিটটা হানের ধনী ক্লায়েন্টদের এন্টারটেইন করানোর জন্যে বানানো হয়েছে, এ সম্পূর্ণ মিথ্যে প্রচারণা। ফার্নিচারবিহীন কামরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার জন্যে চাকরানীর দরকার হয় না, সে আসলে অভিনয় করছিল। অভিনয় করছিল গলফার দু'জনও। গোটা রিট্রিট-এর সিকিউরিটি সিস্টেম এমনভাবে ডিজাইন করা, কেউ যাতে ভেতর থেকে বাইরে বেরুতে না পারে, বাইরের কাউকে ভেতরে ঢুকতে না দেয়াটা প্রধান লক্ষ্য নয়। এখন আরও একটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে, কপার-টিনটেড সোলার গ্লাস দিয়ে তৈরি বহিরাবরণের পিছনে আছে রিইনফোর্সড কংক্রিট ওয়াল।

চৌকো একটা খোলা চত্বরের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে তিন সারি জেল সেল, চত্বরের মাঝখানে কলাম-এর ওপর একটা খাঁচা। খাঁচার ভেতর এক সারি ভিডিও স্ক্রীনের সামনে বসে রয়েছে দু'জন গার্ড, পরনে খাকি ইউনিফর্ম। সেলগুলোর সামনে উঁচু ওয়াকওয়ে দেখা যাচ্ছে, চত্বর থেকে তারের জাল দিয়ে আলাদা করা। সেলের দরজাগুলো নিরেট, ছোট প্লেট আর কাপ ঢোকানোর জন্যে দু'মুখ খোলা খোপ আছে নিচের দিকে। অর্থাৎ এখানে একবার কেউ বন্দী হলে তার আর পালাবার কোন উপায় নেই।

সেলগুলোর ভেতর কতজন বন্দী আছে আন্দাজ করা সম্ভব নয়। কি তাদের অপরাধ তা-ও জানার কোন উপায় নেই। রানার মনে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগল, এখানে যাদেরকে বন্দী করে রাখা হয়েছে তাদের সবাইকেই হাত-পা বেঁধে লেকে ফেলে দেয়া হবে কিনা।

আতঙ্কে ঠাণ্ডা লাগছে রানার, অথচ শরীর ও মুখ ঘামছে। এখানে আর এক সেকেন্ডও থাকা উচিত নয়। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে গিয়ে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে রিপোর্ট করতে হবে। অত্যন্ত সাবধানে ইস্পাতের দরজাটা আবার লাগাল ও, হাতল ঘুরিয়ে আগের জায়গায় নিয়ে এল। ভাগ্য ওর নিতান্তই ভাল। লোহার বার

লাগানো ভেতরের দরজাতেই শুধু অ্যালার্ম সিস্টেম আছে, সিকিউরিটি মনিটরের সামনে বসে থাকা গার্ডদের অনুমতি ছাড়া ওটা কেউ খুলতে চেষ্টা করলে সঙ্গে সঙ্গে বেজে উঠবে। সিঁড়ি বেয়ে নামছে রানা। মাত্র চার ধাপ নেমেছে, শুনতে পেল নিচে থেকে কেউ ওপরে উঠে আসছে।

একজন নয়, দু'জন। সম্ভবত পালা বদলের সময় এটা। খাঁচার ভেতর যারা ডিউটি দিচ্ছে তাদের পালা শেষ, ডিউটি দিতে নতুন লোক আসছে। কিছুই সন্দেহ করেনি, গল্প করতে করতে উঠে আসছে, চোখ নামিয়ে লক্ষ রাখছে ধাপে ঠিকমত পা পড়ছে কিনা। দু'জনের কাছেই শুধু একটা করে অটোমেটিক পিস্তল, হোলস্টারে ভরা।

পালাবার বা লুকাবার কোন জায়গা নেই। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা আর আত্মহত্যা করার মধ্যেও নেই কোন পার্থক্য। বিস্মিত করার সুযোগটা নিতে চাইলে যাই করুক, দ্রুত করতে হবে। বোকামি যদি হয় হোক, সরাসরি লাফ দিল রানা। কামানের গোলার মত ধাক্কা খেলো সামনের গার্ডের গায়ে। কিসের আঘাত, বুঝতেই পারেনি লোকটা, রানার ধাক্কা খেয়ে সঙ্গীর ওপর পড়ল। বন্দীদের হুমকি-ধামকি দিতে অভ্যস্ত চীনা গার্ড দু'জন আকারে তাদের প্রায় দ্বিগুণ ও রাবার সুট পরা উন্মাদ এক লোকের বেপরোয়া হামলায় হতভম্ব। ভারসাম্য হারিয়ে দু'জনেই ছিটকে পড়ল সিঁড়িতে, শেষ মুহূর্তে কিছু আঁকড়ে ধরার চেষ্টায় পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। জড়িয়ে এক হওয়া লোক দু'জনের ওপর পড়ল রানা, ধাপ থেকে গড়িয়ে তিনজনই নিচে নেমে যাচ্ছে। দ্বিতীয় ল্যান্ডিঙে পড়ার পর তিনজনের এক হওয়া শরীর ধাক্কা খেলো রেইলিঙে। একজন গার্ডের মাথা ধাপের সঙ্গে জোরালো বাড়ি খেয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারিয়েছে সে। তার সঙ্গীর জখম তেমন গুরুতর না হলেও, বিস্ময়ের ধাক্কাটা সামলে উঠতে সময় নিচ্ছে। স্তূপ থেকে নিজেকে আলাদা করার সময় রানা খেয়াল করল, লোকটা হোলস্টারে হাত দিচ্ছে। ইচ্ছে করলে দু'জনকেই মেরে ফেলতে পারে ও, খুদে বর্শা দিয়ে ফুটো করে দিতে পারে মাথা দুটো। বাধ্য না হলে খুন-খারাবির মধ্যে যেতে রাজি নয়, তাই এয়ার গানটা উল্টো করে, অর্থাৎ ব্যারেলের দিকটা ধরল, দ্বিতীয় গার্ডের মাথার পাশে আঘাত করল বাঁট দিয়ে।

ওদেরকে খালি সেকেন্ড লেভেলে টেনে আনল রানা, ছায়ার ভেতর দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বসিয়ে রাখল। ইউনিফর্ম খুলে ফালি করল, সেই ফালি দিয়ে হাত আর পা বাঁধল, মুখেও খানিকটা করে গুঁজে দিল। যেহেতু ডিউটি দিতে যাচ্ছিল, পাঁচ কি দশ মিনিটের মধ্যে খোঁজ পড়বে ওদের। এখানে এই অবস্থায় যখন পাওয়া যাবে দু'জনকে, মহা হুলস্থূল শুরু হয়ে যাবে গোটা বিল্ডিঙে। এত ব্যয়বহুল ও কড়া সিকিউরিটি ভেদ করে কেউ একজন ভেতরে ঢুকতে পেরেছে জানার পর হুয়ান হান বা তার পরামর্শদাতারা কি করবে ভাবতে গিয়ে মনে মনে শিউরে উঠল রানা। আইনের লোকজন পৌঁছানোর আগে অপরাধের সমস্ত চিহ্ন তারা মুছে বা ধ্বংস করে ফেলার সিদ্ধান্ত নেবে। এখানে কি ঘটছে বন্দীরা নিশ্চয়ই তা জানে, কাজেই তাদেরকে মেরে ফেললে অবাক হবার কিছু নেই।

অর্থাৎ সেলে বন্দী লোকগুলোকে বাঁচানোর দায়িত্ব রানার ঘাড়ে চাপল। একা

যেহেতু কিছুই করা যাবে না, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কেবিনে ফিরে গিয়ে স্থানীয় পুলিসকে ফোন করাই একমাত্র উপায়।

গার্ডদের লিভিং কোয়ার্টার পেরিয়ে এল রানা, যেন নিঃশব্দ বিড়াল। বেরিয়ে যাবার সময়ও ভাগ্য সহায়তা করছে। সরু প্যাসেজওয়েটাও পার হয়ে এল কোন বিপদ ছাড়াই। ভাগ্য এভাবে সাহায্য করলে সাহস তো বাড়তেই পারে, ইচ্ছে হলো ওয়াটারক্রাফটের মোটরগুলোর ওপর একটু কারিগরি ফলায়। সময় নষ্ট করা হবে ভেবে চিন্তাটা বাতিল করে দিল। দিনের আলোয় যখন ওর এইউভি দেখতে পায়নি ওরা, অন্ধকারে ত্রিশ ফুট পানির নিচে কিভাবে দেখতে পাবে।

দ্রুত ডাইভ গিয়ার পরে নিয়ে পানিতে নামল রানা, ডক ঘুরে সাঁতরে চলে এল স্টিংরের কাছে। লেকের তলা ঘেঁষে একশো গজও এগোয়নি, এঞ্জিন এগজস্ট ও প্রপেলারের আওয়াজ শুনতে পেল–অন্ধকার থেকে একটা বোট ছুটে আসছে। শব্দের গতি বাতাসের চেয়ে পানিতে বেশি, শুনে মনে হলো বোটটা প্রায় ওর মাথার ওপর চলে এসেছে, অথচ আসলে সেটা এই মাত্র নদীর মুখ থেকে লেকে ঢুকল। স্টিংরের নাক ওপর দিকে তুলে সারফেসে উঠে এল রানা। নদীর দিকটা অন্ধকার, সেই অন্ধকার থেকে তীরের আলোয় বেরিয়ে আসতে দেখল বোটটাকে। ভেসেলটা চিনতে পারল, এ সেই কালো রঙ করা জোড়া খোল লাগানো ক্যাটাম্যারান, কাল যেটাকে দেখেছিল।

কালো পানিতে ভেসে থাকা প্রায়-অদৃশ্য একটা মাথা বোট থেকে দেখতে পাবার কথা নয়। রানা অপেক্ষা করছে, বোটটা ওকে পাশ কাটিয়ে চলে যাবে। কিন্তু তা ঘটল না।

অজ্ঞাত কোন কারণে মোটর থেমে গেল। ধীরে ধীরে গতি হারাল বোট, তারপর পঞ্চাশ ফুট দূরে স্থির হয়ে গেল।

রানার উচিত এখন বোটটাকে পাশ কাটিয়ে কেবিনের দিকে ফিরে যাওয়া। কারণ স্থানীয় পুলিসকে দ্রুত জানানো দরকার যে রিট্রিটের ভেতর অজ্ঞাত সংখ্যক মানুষকে বন্দী করে রাখা হয়েছে। পুলিস পৌঁছুতে দেরি করলে বন্দীদের হয়তো বাঁচানো যাবে না। এ-সব ওর মাথায় আছে, তারপরও অদ্ভুতদর্শন ক্যাটাম্যারানটার তীব্র আকর্ষণ এড়াতে পারছে না। রাতের আলো-আঁধারিতে ওটাকে অত্যন্ত বিপজ্জনক আর কুৎসিত দেখাচ্ছে। ডেকে লোকজন নেই, কোথাও কোন আলোও জ্বলছে না।

কি করছে, নিজেও ভাল করে জানে না, স্টিংরের নাক পানির নিচের দিকে তাক করল রানা। ডাইভ দিয়ে অনেক নিচে চলে এল ও, তারপর একটা অর্ধ-বৃত্ত তৈরি করে উঠে আসছে রহস্যময় জলযানটার জোড়া খোলের নিচে।

পাঁচ

কালো বোটের চৌকো কমপার্টমেন্টে সব মিলিয়ে বারোজন মানুষকে আটকে রাখা হয়েছে। কোন জানালা নেই, দরজা বন্ধ, অক্সিজেনের অভাবে কষ্ট পাচ্ছে সবাই।

বারোজনের মধ্যে দু'জন বৃদ্ধা, একটা পাঁচ বছরের বাচ্চা ছেলে, বাকি সবাই যুবতী মেয়ে। দুই বৃদ্ধার দুটো করে চারটে মেয়ে। শাকিলা একা, ওর মত আরও চারটে মেয়েও একা, তাদের সঙ্গে কোন আত্মীয়স্বজন নেই। একা শুধু শাকিলাকে ইন্টেলিজেন্স এজেন্ট হিসেবে আটক করা হয়েছে, বাকি মেয়েগুলোর অপরাধ তারা দেহ-ব্যবসায় নাম লেখাতে রাজি হয়নি। মেয়েদের এই অপরাধের শাস্তি ভোগ করছে দুই বৃদ্ধা আর মাসুম একটা বাচ্চা ছেলে। কেউই ওরা জানে না ওদেরকে নিয়ে কি করা হবে।

কমপার্টমেন্টে দাঁড়িয়ে আছে শাকিলা, কান পেতে এঞ্জিনের আওয়াজ শুনছে, শুনছে বোটের খোলে ঢেউ আছড়ে পড়ার শব্দ, আর ভাবছে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ওদেরকে। যেখানেই পৌঁছে থাকুক বোট, এদিকের পানি শান্ত মনে হচ্ছে তার। প্রায় বিশ মিনিট হলো সাগরের উত্তাল ঢেউগুলোকে পিছনে ফেলে এসেছে ওরা। শাকিলা আন্দাজ করল, ওরা কোন বে বা নদীতে ঢুকেছে। প্রায় নিশ্চিতভাবে ধরে নিয়েছে, আমেরিকারই কোথাও ফিরে এসেছে ও ভ রমানে, এটা তার নিজস্ব এলাকা–জন্মভূমি। যতই দুর্বল আর আচ্ছন্ন বোধ করুক, লড়াই করে অস্তিত্ব রক্ষার মনোবল ধীরে ধীরে ফিরে আসছে। ওর বেঁচে থাকাটা খুব জরুরী। স্মাগলিং সিন্ডিকেট সম্পর্কে প্রচুর মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করছে ও, সেগুলো আইএনএস কর্তৃপক্ষের হাতে পৌঁছে দিতে পারলে অকাট্য প্রমাণ সহ অপরাধী চক্রকে ধরা সময়ের ব্যাপার মাত্র। ও যদি মারা যায়, তথ্য ও প্রমাণগুলো কোন কাজেই লাগবে না, স্মাগলিং সিন্ডিকেটের মানুষ পাচারের ব্যবসা আগের মতই চলতে থাকবে, নিরীহ নারী ও শিশুদের খুন হওয়াও বন্ধ হবে না।

কমপার্টমেন্টের ওপর হুইলহাউস, সেখানে দাঁড়িয়ে স্মাগলার-দের দু'জন এনফোর্সার রশি কাটছে, কাটা রশি দিয়ে বন্দীদের হাত-পা বাঁধা হবে, কোমরে বাঁধা হবে ভারী লোহা। হেলমে রয়েছে ক্যাপটেন, অন্ধকার ওরিয়ন নদীর ওপর দিয়ে বোট চালাচ্ছে। আলোর উৎস বলতে শুধু নক্ষত্র, তার চোখ রাডার স্ক্রীন থেকে মুহূর্তের জন্যেও সরছে না। আরও দশ মিনিট পর হুইলহাউসে উপস্থিত বাকি সবাইকে সতর্ক করে দিল সে, নদী থেকে লেকে ঢুকছে বোট। লেকের তীরে প্রচুর আলো, সেই আলোর আভায় বোট ঢুকতেই ফোন তুলে চীনা ভাষায় কার সঙ্গে যেন কথা বলল ক্যাপটেন। ফোন রেখে দিয়ে এঞ্জিনগুলোকে অলস করে দিল সে। ধীরে ধীরে স্থির হয়ে গেল বোট। তারপর, অকস্মাৎ, রিট্রিটের মেইন বিল্ডিং ও তীরের সমস্ত আলো এক সঙ্গে নিভে গেল, গোটা লেককে গ্রাস করল নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। শুধু একটা বয়ার খুদে লাল আলোয় চোখ রেখে ক্যাটাম্যারানকে নিয়ে ইয়টটাকে পাশ কাটাল ক্যাপটেন, উল্টোদিকের ডক পাইলিং-এর পাশে চলে এল। লাফ দিয়ে ডকে নামল দু'জন এনফোর্সার, গোঁজ বা খোঁটায় মুরিং লাইন জড়াল।

এক কি দুই মিনিট কমপার্টমেন্টের বাইরে কোন শব্দ নেই। শাকিলা আর আতঙ্কিত অবৈধ অভিবাসীদের মনে কত রকম প্রশ্ন জাগছে, কেউই তারা পরিস্থিতি সম্পর্কে এখনও কিছু জানে না। দীর্ঘ সমুদ্র পথ পাড়ি দিয়ে এসে সবাই তারা ক্লান্ত, বিধ্বস্ত ও অসুস্থ। চিন্তা-ভাবনা জট পাকিয়ে যাচ্ছে।

তারপর হঠাৎ কমপার্টমেন্টের ওপর অনেক লোকজনের পায়ের আওয়াজ শোনা গেল। ওদের বারোজনকে রাখা হয়েছে ছোট্ট কম্পার্টমেন্টে, বাকি চল্লিশজনের মত অভিবাসীকে ঠাসা হয়েছে কার্গো হোল্ডে। সেই হোল্ড থেকে বের করে ডেকে তোলা হচ্ছে তাদের, ডেক থেকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ডকে। শাকিলা জানে না, ওদেরকে রিট্রিটে বন্দী করা হবে। উদ্দেশ্য নির্যাতন করে দেহ-ব্যবসা বা ড্রাগ বিক্রি করতে রাজি করানো।

বোট আবার রওনা হলো দশ মিনিট পর। পঞ্চাশ গজের মত এসে থেমে গেল আবার। একটু পরেই কম্পার্টমেন্টের পিছনের দেয়াল খুলে গেল। পাহাড় থেকে আসা তাজা বাতাস জাদুর মত কাজ করল। যেন এক নিমেষে সমস্ত অসুস্থতা দূর হয়ে গেল ওদের। বাইরে অন্ধকার, কিছুই দেখা যাচ্ছে না। তারপর দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল কয়েকজন এনফোর্সার। টর্চ জ্বালল তারা, বন্দীদের চোখ ধাঁধিয়ে গেল।

চোখে আলো সয়ে আসতে শাকিলা দেখল লোকগুলো কমপার্টমেন্টে ঢুকে পড়েছে। সংখ্যায় তারা চারজন, কারও হাতে রশি, কারও হাতে আঙটা লাগানো লোহার বল। ভেতরে ঢুকেই কাজ শুরু করে দিল তারা—বন্দীদের হাত-পা বাঁধছে, কোমরেও জড়াচ্ছে রশি, সেই রশির সঙ্গে ভারী বল ঝুলছে। কেউ তারা কোন কথা বলছে না, অভ্যস্ত হাতে দ্রুত কাজ করে যাচ্ছে। প্রথমেই বন্দীদের মুখে টেপ লাগিয়ে দিয়েছে, ফলে সামান্য ধস্তাধস্তি হলেও, কোন চিৎকার-চেঁচামেচি নেই।

শাকিলা ভাবল, তাহলে ডুবে মারা যাচ্ছি। এক কোণে ছিল বলে এখনও ওর পালা আসেনি। নিজেকে জিজ্ঞেস করল, শেষ একটা চেষ্টা করে দেখবি না? চিন্তাটা মাথায় আসতেই দরজার দিকে ছুটল, উদ্দেশ্য ডেকে বেরিয়ে গিয়ে লাফ দেবে পানিতে, সাঁতরে তীরে গিয়ে উঠবে। কিন্তু দরজার কাছে পৌঁছানোর আগেই ব্যর্থ হয়ে গেল তার চেষ্টা। জানা ছিল না কতখানি দুর্বল হয়ে পড়েছে, ছোটার বদলে হোঁচট খেতে শুরু করল। দেখতে পেয়ে একজন এনফোর্সার ছুটে এসে লাথি মারল নিতম্বে, ছিটকে ডেকে পড়ে গেল শাকিলা। পড়ার পরও হাত-পা ছুঁড়ে, ধস্তাধস্তি করে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করল, কিন্তু এনফোর্সারদের সঙ্গে পারল না। ওর মুখেও টেপ আটকানো হলো, কোমরে বাঁধা হলো লোহার বল।

আতঙ্কে বিস্ফারিত চোখে শাকিলা দেখল মেঝে বা ডেকের একটা হ্যাচ কাভার তুলে ফেলা হলো। ঢাকনি তোলার পর কালো একটা ফাঁক বা গর্ত দেখা যাচ্ছে ওখানে। প্রথম বন্দীকে সেই ফাঁক দিয়ে নিচের পানিতে ফেলে দেয়া হলো।

স্টিংরে-র স্পীড সুইচ থেকে আঙুল তুলে নিল রানা, ক্যাটামারান-এর সেন্টার কেবিন থেকে দশ ফুট নিচের পানিতে ভাসছে। ওর প্ল্যান হলো জোড়া খোলের মাঝখানে পানির ওপর মাথা তুলে বোটের তলাটা পরীক্ষা করবে। কিন্তু তার আগেই হঠাৎ করে ওর ওপর দিকে একটা আলো দেখা গেল, সেই সঙ্গে ঝপাৎ করে কি যেন একটা পড়ল পানিতে। প্রথমে একটা, তারপর আরেকটা, তারপর আরও একটা।

হতভম্ব রানা বুঝতে পারছে না কি ঘটছে। তবে দেখতে পাচ্ছে ওর চারপাশে

টপ টপ করে মানুষ ঝরছে বোট থেকে। সংবিৎ ফিরে পেতে এক কি দেড় সেকেন্ড লাগল ওর। আকস্মিক যে-কোন পরিস্থিতিতে দ্রুত ইতি-কর্তব্য স্থির করতে পারা একজন স্পাই-এর অন্যতম গুণ, ট্রেনিং-এর মাধ্যমে গুণটাকে আরও উন্নত করা হয়। শরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল—নড়ে ওঠার পর কোন বিরতি ছাড়াই কাজগুলো সারল রানা—স্টিংরে ছেড়ে দিল, ডাইভ লাইটের সুইচ অন করল, খাপ থেকে বের করল ডাইভ নাইফ। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সচল হয়ে উঠেছে, বোট থেকে খসে পড়া শরীরগুলো ধরে ফেলছে, হাত-পা আর কোমরে বাঁধা রশিগুলো ঘ্যাঁচ ঘ্যাঁচ করে কাটছে। বন্ধন মুক্ত করতে পারলেই অচেনা মানুষটাকে ঠেলে দিচ্ছে পানির ওপর দিকে, সাঁতরে চলে আসছে আরেকজনের কাছে। উন্মত্ত ব্যস্ততার সঙ্গে কাজ করছে রানা, তীক্ষ্ণ খেয়াল রাখছে কেউ যাতে ওকে পাশ কাটিয়ে লেকের গভীর অন্ধকারে তলিয়ে যেতে না পারে। অথচ প্রথম দিকে নিশ্চিতভাবে বুঝতেও পারল না দুর্ভাগ্যের শিকার মানুষগুলো এরইমধ্যে মারা গেছে কিনা। নিজের বিপদের কথাও এই মুহূর্তে চিন্তা করতে রাজি নয় ও। তারপর বুঝতে পারল, যে না, ওরা জীবিত—পাঁচ কি ছ'বছরের একটা বাচ্চা ছেলেকে ধরতেই নিজেকে ছাড়াবার জন্যে ধস্তাধস্তি শুরু করল, চোখ দুটো আতঙ্কে বিস্ফারিত হয়ে আছে, চেহারা দেখে মনে হলো চীনা। রাতের ঠাণ্ডা বাতাসের দিকে তাকে ঠেলে দেয়ার সময় রানা আশা করল, নিশ্চয়ই সাঁতার জানে। কিন্তু না, ছেলেটা আবার নেমে আসছে। শরীরে যেন আগুন জ্বলে উঠল, ভাবল এতটা নির্মম মানুষ কি করে হয়! ছেলেটাকে হাতের ভাঁজে আটকাল ও, তারপর ফিন ছুঁড়ে উঠে এল ভাসমান স্টিংরের কাছে। ছেলেটার হাত দুটো ওটার চারদিকে জড়াল, তারপর ছেড়ে দিল।

ডাইভ লাইট নিভিয়ে দ্রুত বোটের ওপর চোখ বুলাল রানা, বুঝতে চাইছে ক্রুরা টের পেল কিনা তাদের শিকার পানির নিচে থেকে সারফেসে উঠে আসছে। বোটের ওপর পরিবেশ একদম শান্ত। কোথাও কোন অস্থিরতা বা চিৎকার নেই। আবার পানির নিচে ডুব দিল ও। ডাইভ লাইট অন করতেই আরেকটা মানুষকে বোটের তলা থেকে খসে পড়তে দেখল, ধারণা করল এটাই বোধহয় শেষ। সাঁতরে এসে নাগাল পাবার আগেই সারফেস থেকে বিশ ফুট নেমে গেছে সে। আগেই জেনেছে ও, বাচ্চা ছেলেটা ছাড়া পানির ওপর যাদেরকে তুলে দিতে পারা গেছে তারা সবাই মেয়ে। এটাও তাই, তবে শাড়ি পরা এই একজনই।

ওর পালা আসার ঠিক আগের মুহূর্তে বড় করে শ্বাস টেনে ফুসফুস ভরে নিয়েছিল শাকিলা। একজন এনফোর্সার পিছন থেকে লাথি মারল ওকে, হ্যাচ গলে নিচের পানিতে পড়ে গেল ও। পানিতে পড়ার পরও দম আটকে রাখল, হাত-পায়ের বাঁধন থেকে মুক্ত হবার ব্যর্থ চেষ্টায় নিজের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছে। বড় জোর এক মিনিট, কিংবা দু'মিনিট, তারপরই ফুসফুসের অক্সিজেন শেষ হয়ে যাবে। যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু হবে ওর।

অকস্মাৎ ওর কোমর জড়িয়ে ধরল একজোড়া কঠিন হাত। শাকিলা অনুভব করল, ওর কোমর থেকে ভারী লোহাটা খসে পড়ল। তারপর মুক্ত হয়ে গেল হাত দুটো। পুরুষালি. শক্ত একটা হাত ওকে ধরে ওপর দিকে টেনে নিয়ে চলেছে। মনে

হলো স্বপ্ন দেখছে। নাকি কোন ফেরেশতা সাহায্য করছে ওকে? অথবা মারা যাবার পর পৃথিবী থেকে অন্য কোন জগতে চলে এল না তো? পানির ওপর মাথা উঁচু হতেই টান পড়ল মুখের টেপে, ব্যথা পেয়ে চোখ-মুখ কোঁচকাল শাকিলা। চোখ মেলতেই প্রথমে দেখতে পেল ফেস মাস্ক সহ একটা হুড, হুডের কপাল থেকে বেরিয়ে আসছে আলো।

'আপনি আমার কথা বুঝতে পারছেন?' ইংরেজিতে জানতে চাওয়া হলো।

'পারছি।'

'সাঁতার জানেন?'

মাথা ঝাঁকাল মেয়েটা।

'গুড,' বলল রানা। 'যদি পারেন, আমাকে সাহায্য করুন–সবাইকে এক জায়গায় জড়ো করতে হবে। ওদেরকে আমার আলোর পিছু পিছু আসতে বলুন। তীর ঘেঁষে এগোব আমরা, অগভীর পানিতে পৌছুতে চাই।'

মেয়েটাকে পিছনে রেখে বাচ্চা ছেলেটার কাছে চলে এল রানা। ছেলেটা শক্ত হাতে স্টিংরে আঁকড়ে ধরে আছে, ঠাণ্ডায় হোক বা আতঙ্কে থরথর করে কাঁপছে সারা শরীর। তাকে পিঠে তুলে নিল ও, খুদে হাত দুটো নিজের গলার চারদিকে জড়াল। স্পীড সুইচে চাপ দিতেই পানি কেটে ছুটল স্টিংরে।

বোটের হুইলহাউসে ঢুকল দু'জন এনফোর্সার। 'সবাই ডুবে গেছে,' ক্যাপটেনকে বলল একজন। 'আমাদের কাজ শেষ।'

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকিয়ে জোড়া থ্রটল ধীরে ধীরে সামনের দিকে ঠেলল ক্যাপটেন। পানির নিচে ঘুরতে শুরু করল প্রপেলার, কালো ক্যাটামারান ডকের দিকে এগোল। বোট একশো ফুটও এগোয়নি, ফোনটা বেজে উঠল।

'চিয়ান ফেঙ?'

ক্যাপটেন জবাব দিল, 'বলছি।'

'ল্যাঙ ওয়ান, কমপাউন্ড সিকিউরিটি চীফ। তুমি নির্দেশ অমান্য করছ কেন?'

'কোথায়? সব কাজ প্ল্যান মতই হয়েছে। কার্গো হোল্ডে যারা ছিল, চল্লিশজন, তাদেরকে ডকে নামিয়ে দিয়েছি। আর কমপার্টমেন্টের বারোজন ইমিগ্র্যান্টকে ফেলে দিয়েছি পানিতে। তোমার সমস্যাটা কি?'

'তুমি আলো জ্বেলে রেখেছ।'

হুইল থেকে সরে এসে বোটের চারদিকে চোখ বুলাল ক্যাপটেন চিয়ান ফেঙ। 'ডিনারে বসে বেশি মুরগী খাওয়া হয়ে গেছে, তাই তোমার পেট চোখ দুটোকে মিথ্যে কথা বলছে। আমাদের বোটে কোন আলো জ্বলছে না।'

'তাহলে পুব তীরে কি দেখছি আমি?'

ক্যাপটেন চিয়ান ফেঙের কাজ হলো মাদার শিপ থেকে অবৈধ অভিবাসীদের নিয়ে এসে ওরিয়ন লেকের ডকে নামিয়ে দেয়া। তার আরেকটা দায়িত্ব হলো এনফোর্সারদের বাছাই করা লোকজনকে পানিতে ফেলে দেয়ার কাজটা সুষ্ঠুভাবে শেষ হলো কিনা দেখা। রিট্রিটে বন্দী অভিবাসীদের ব্যাপারটা দেখে কমপাউন্ড সিকিউরিটি চীফ ল্যাঙ ওয়ান। দু'জনেই নির্দয় পাষণ্ড, দম্ভ আর অহমিকা কারও

চেয়ে কারও কম নয়, ফলে বনিবনা হয় না।

ল্যাঙ ওয়ান বেঁটে, তবে চওড়ায় দু'জন মানুষের সমান। শক্তিতে সে অসুর, স্বভাবে পাগলা কুকুর, চোখ দুটো সব সময় লাল আলোর মত জ্বলছে। ঘাড় ফিরিয়ে চিয়ান ফেঙ পুব তীরের দিকে তাকাল। পানির কাছাকাছি সত্যি একটা আলো জ্বলছে দেখল সে। 'হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি। স্টারবোর্ডের দিকে, দুশো গজ দূরে। নিশ্চয়ই স্থানীয় কোন জেলে হবে।'

'কোন ঝুঁকি নেয়া চলবে না,' কঠিন সুরে বলল ল্যাঙ ওয়ান। 'তদন্ত করে দেখে রিপোর্ট করো।'

'দেখছি।'

'সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়লে সঙ্গে সঙ্গে জানাবে আমাকে,' নির্দেশ দিল ল্যাঙ ওয়ান। 'সেক্ষেত্রে তীরের সব আলো আবার জ্বেলে দেব আমি।'

'ঠিক আছে,' বলে ফোন রেখে দিল চিয়ান ফেঙ। হুইলে হাত রাখল, স্টারবোর্ডের দিকে ঘুরিয়ে নিচ্ছে ক্যাটামারান্যানকে। লেকের সারফেসে দোল খাচ্ছে অস্পষ্ট আলোটা, বোটের জোড়া বো সেদিকে তাক করল সে। তারপর দু'জন এনফোর্সারকে নির্দেশ দিল, 'মেইন ডেকের কিনারায় চলে যাও, ভাল করে দেখো সামনের পানিতে ওটা কিসের আলো।'

খর্বকায় প্রথম এনফোর্সার, চোখে শ্বাপদের ঠাণ্ডা দৃষ্টি, মেশিন পিস্তলে হাত বুলিয়ে জানতে চাইল, 'আপনি কিছু সন্দেহ করছেন, ক্যাপটেন?'

চিয়ান ফেঙ কাঁধ ঝাঁকাল। 'কিছুই সন্দেহ করছি না। নিশ্চয়ই কোন জেলে হবে। এর আগে অনেকবারই তো রাতে ওদেরকে স্যামন ধরতে দেখা গেছে।'

'কিন্তু যদি জেলে না হয়?'

ঘাড় ফিরিয়ে বত্রিশ পাটি দাঁত বের করল চিয়ান ফেঙ। 'সেক্ষেত্রে ওদেরকেও লেকের তলায় পাঠিয়ে দেবে।'

বোটটাকে এগিয়ে আসতে দেখে যা বোঝার বুঝে নিল রানা। ক্রুরা ওদেরকে দেখে ফেলেছে। বো থেকে ভেসে আসা তাদের চিৎকারও শুনতে পাচ্ছে ও। সন্দেহ নেই, ক্যাপটেনকে জানাচ্ছে, লেকের পানিতে কারা যেন সাঁতরাচ্ছে। ডাইভ লাইটটাই দায়ী, বুঝতে অসুবিধে হলো না। তবে সেজন্যে নিজেকে রানা তিরস্কার করল না। ওটা জ্বেলে রাখায় স্মাগলারদের চোখে ধরা পড়ে গেছে, কিন্তু জ্বেলে না রাখলে পানির নিচে থেকে তোলার পর সবাইকে এক জায়গায় জড়ো করতে পারত না, দিকভ্রান্ত হয়ে একেকজন একেক দিকে চলে যেত—বেশিরভাগ ডুবেই মরত, ভাগ্যক্রমে কেউ কাছাকাছি তীরে পৌঁছাতে পারলেও কমপাউন্ড সিকিউরিটিকে ফাঁকি দিতে পারত না।

দুই বৃদ্ধাকে নিয়েই সমস্যা, তাদের দায়িত্ব তরুণী মেয়েদের ওপর ছেড়ে দিয়ে বোটটার দিকে ফিরল রানা। পিঠে এখনও সেঁটে আছে ছেলেটা। ডাইভ লাইট নিভিয়ে দিল ও। বোটটাকে সামনে ঝুলতে দেখল, আকাশের তারাগুলোকে আড়াল করে ফেলছে। আন্দাজ করল, বোটটা ওকে তিন ফুট দূর দিয়ে পাশ কাটাবে। কেবিন থেকে দুটো ছায়ামূর্তিকে মই বেয়ে বো প্ল্যাটফর্মে নামতে দেখা

গেল। একজন পানির দিকে ঝুঁকল, দেখতে পেয়ে হাত লম্বা করল রানার দিকে।

দ্বিতীয় এনফোর্সার টর্চ তাক করার আগেই, রানার এয়ার গান থেকে খুদে একটা বর্শা বেরিয়ে গেল, লোকটার ঠিক কানের পাশে কপালে বিঁধল সেটা। তার সঙ্গী বুঝতেই পারল না কি ঘটেছে। বর্শার ডগা উল্টোদিকের কানের পাশে বেরিয়ে এসেছে, মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে সময় নেয়নি। রানার মনে কোন রকম ইতস্তত ভাব বা দয়ামায়া নেই। স্মাগলাররা অসংখ্য নিরীহ মানুষকে খুন করেছে। ওদেরকে সাবধান হবার বা আত্মরক্ষা করার সুযোগ দেয়া যায় না। দ্বিতীয় বর্শাটাও লক্ষ্যভেদ করল। দু'জনেই নিঃশব্দে ঢলে পড়ল ক্যাটাম্যারান-এর ফরওয়ার্ড ডেকে। এয়ার গান রিলোড করল রানা, চিৎ সাঁতার দিয়ে সরে আসছে। ওর কাঁধে মুখ গুঁজে দিয়ে গলাটা হাতের সবটুকু শক্তি দিয়ে জড়িয়ে ধরে আছে বাচ্চাটা।

পাশ কাটিয়ে চলে যাবার সময় বোটটার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল রানা। খানিক দূর এগিয়ে ইউ টার্ন নিল, ফিরে যাচ্ছে ডকের দিকে, যেন কিছুই ঘটেনি। ফরওয়ার্ড ডেকে দুটো লাশ পড়ে আছে, এখনও বোধহয় জানে না ক্যাপটেন। তবে খানিক পরই জানতে পারবে, তখন আবার ফিরে আসবে এদিকে। খুব বেশি হলে চার কি পাঁচ মিনিট সময় পাবে রানা, তার বেশি নয়। তাকিয়ে আছে ও, অন্ধকারে ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে ক্যাটাম্যারান। তারপর ওটার আকৃতি বদলাতে শুরু করল, রানা বুঝতে পারল ঘুরছে ওটা, বৃত্ত তৈরি করছে ফিরে আসার জন্যে।

আশ্চর্যই বটে যে তীরের আলোগুলো এখনও জ্বলে উঠছে না। কথাটা মনে হবার পর দশ সেকেন্ডও পেরোয়নি, অকস্মাৎ রিট্রিট বা জেলখানার সমস্ত আলো আবার জ্বলে উঠল, ক্যাটাম্যারানের তৈরি ঢেউয়ের গায়ে সেই আলো নাচতে শুরু করল।

পানিতে ভাসমান অসতর্ক হাঁসের মত ধরা পড়ে যাওয়া, এরচেয়ে বিপজ্জনক কিছু হতে পারে না। তীরে পৌঁছেছে কিন্তু এখনও আড়াল পাওয়া সম্ভব হয়নি, তুলনায় এটা একটু কম বিপজ্জনক। তবে হঠাৎ করেই অগভীর পানিতে পৌঁছে গেল স্টিংরে, লেকের তলায় পা ঠেকল রানার। তীরে উঠে ছেলেটাকে পাড়ে বসিয়ে দিল, সেটা পানি থেকে মাত্র আঠারো ইঞ্চি উঁচু। পানিতে আবার ফিরতে হলো, শুকনো তীরে উঠতে সাহায্য করছে সবাইকে। শুধু বৃদ্ধা দু'জন নয়, তরুণীদের দু'একজনও এতক্লান্ত হয়ে পড়েছে যে গাছপালার দিকে ক্রল করে এগোল। শাড়ি পরা মেয়েটা এক বৃদ্ধাকে সাহায্য করছে, তাকে ডেকে ছেলেটার দায়িত্ব নিতে বলল রানা।

'কেন, আপনি…আপনি আমাদের সঙ্গে থাকছেন না?' জিজ্ঞেস করল শাকিলা।

ঘাড় ফিরিয়ে বোটটার দিকে আরেকবার তাকাল রানা। 'আমার কাজ আছে,' বলে অন্ধকার পানিতে নেমে অদৃশ্য হয়ে গেল।

চিয়ান ফেঙ ভয়ে কাঁপছে। দু'জন এনফোর্সার কিভাবে বা কখন মারা গেল, অন্ধকারে সে দেখতে পায়নি। খোল দুটো লেকের তলায় ঠেকে যেতে পারে, এই

আশঙ্কায় খুব মনোযোগ দিয়ে বোট চালাচ্ছিল, তখনই ওরা খুন হয়েছে। লাশ পাবার পর আতঙ্কিত বোধ করছে সে। ডকে ফিরে রিপোর্ট করা সম্ভব নয় যে তার অগোচরে অজ্ঞাত পরিচয় আততায়ী দু'জন এনফোর্সারকে মেরে ফেলেছে। তার বস্ অস্পষ্ট ব্যাখ্যা বা ব্যাখ্যার অতীত কোন অজুহাত শুনতে পর্যন্ত রাজি হবে না। সে নিশ্চিতভাবে জানে, তার বিরুদ্ধে অদক্ষতার অভিযোগ তোলা হবে। আরও জানে, এ-ধরনের অদক্ষতা ক্ষমা করা হয় না।

প্রতিপক্ষ দশজন হোক বা একশোজন, তাদের সামনে দাঁড়াতে হবে তাকে। এছাড়া তার কোন উপায় নেই। সে ধরে নিল, এনফোর্সাররা খুন হয়েছে প্রফেশনালদের পরিকল্পিত একটা অপারেশনে। বাকি দুই এনফোর্সারকে সতর্ক করে দিল সে, একজনকে পাঠাল জোড়া খোলের মাঝখানে স্টার্ন ডেকের পিছনে, আরেকজনকে ফরওয়ার্ড ডেকে। তারপর ফোনে ল্যাঙ ওয়ানকে অনুরোধ করল আলো জ্বালতে। আলো জ্বালতেই কয়েকটা মেয়েকে দেখতে পেল, পড়িমরি করে লেকের পাড়ে উঠছে। বিপদ ও সর্বনাশের আসল চেহারাটা এতক্ষণে পরিষ্কার হলো। পাড়ে ওরা যারা উঠে যাচ্ছে তারা সবই ইমিগ্র্যান্ট, যাদেরকে ডুবিয়ে মারাই ছিল তার দায়িত্ব। অবাক বিস্ময়ে আড়ষ্ট হয়ে গেল সে। মেয়েগুলো বাঁচল কিভাবে? কেউ সাহায্য না করলে এ সম্ভব নয়। আর সে সাহায্য নি[illegible]ই ট্রেনিং পাওয়া এজেন্টদের নিয়ে গঠিত স্পেশাল ফোর্স থেকে এসেছে।

পালিয়ে যাওয়া ইমিগ্র্যান্টদের ধরতে না পারলে হুয়ান হান নির্দেশ দেবেন তাকেও যেন লেকের তলায় ডুবিয়ে মারা হয়। মেয়েগুলো যদি মার্কিন কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছুতে পারে, হুয়ান হানের মানুষ পাচারের ব্যবসাই হয়তো বন্ধ হয়ে যাবে। এমনকি জেল বা ফাঁসিও হয়ে যেতে পারে।

লেকের পানিতে ফেলা হয়েছে সব মিলিয়ে বারোজনকে, তীরের আলোয় দেখা গেল জঙ্গলের দিকে এগোচ্ছে এগারোজন। বেশিরভাগই হামাগুড়ি দিচ্ছে, দু'একজন হাঁটছে বা ছুটছে। ক্যাটাম্যারান একটু ঘুরিয়ে নিল চিয়ান ফেঙ, তটরেখার একটা নিচু পাড়ের দিকে বোট নিয়ে এগোল। 'ওই যে, ওদিকে ওরা!' চিৎকার করে ফরওয়ার্ড ডেকের এনফোর্সারকে বলল সে। 'গুলি করে ফেলে দাও! গুলি করে ফেলে দাও!' সে জানে, অভিবাসী মেয়েগুলো জঙ্গলে একবার ঢুকে পড়লে খুঁজে বের করা কঠিন হবে।

চিয়ান ফেঙ দেখল এনফোর্সার তার মেশিন পিস্তল তাক করছে। কিন্তু হঠাৎ এই সময় বোটের সামনের পানি থেকে মাথা তুলল, দুঃস্বপ্নে দেখা কিম্ভূতকিমাকার প্রাণীর মত গাঢ় একটা আকৃতি। কারণটা বোঝা গেল না, এনফোর্সার একটা ঝাঁকি খেলো। হাতের মেশিন পিস্তল ফেলে দিয়ে নিজের একটা কাঁধ চেপে ধরল সে। তিন সেকেন্ড পর চিয়ান ফেঙ দেখল, এনফোর্সারের বাম চোখে কুৎসিত একটা বর্শা ঢুকেছে। হাঁ হয়ে গেল সে। ঝপাৎ করে পানিতে পড়ে গেল এনফোর্সার।

কোন জলযানে জোড়া ক্যাটাম্যারান খোল থাকলে অনেক সুবিধে। তবে অসুবিধে হলো মেইন কেবিনের সামনে বিস্তৃত প্ল্যাটফর্ম ডেক পানি থেকে মাত্র আঠারো

ইঞ্চি ওপরে থাকায় কিনারা ধরে যে-কেউ বোটে উঠতে পারবে, উঁচু বো থাকলে যা সম্ভব নয়। ক্যাটাম্যারান ঠিক যখন চাপা দিতে যাচ্ছে, স্টিংরে ছেড়ে দিয়ে ফরওয়ার্ড ডেকের কিনারা এক হাতে ধরে ফেলল রানা। দ্রুতগামী বোটের টান ও ঝাঁকি অনুভব করল ও, মনে হলো হাতটা কাঁধ থেকে ছিঁড়ে যাবে। ঝাঁকিটা সামলে নিয়েই এয়ার গানের ট্রিগার টেনে দিল। একজন লোক তীরের দিকে মেশিন পিস্তল তাক করছিল। মাত্র তিন সেকেন্ডে রিলোড করল রানা, চোখ দিয়ে ঢুকে মগজ ভেদ করল দ্বিতীয় বর্শাটা।

ক্যাটাম্যারান সরাসরি তীর লক্ষ্য করে ছুটছে। তীর আর মাত্র ত্রিশ ফুট দূরে। ফরওয়ার্ড ডেকের কিনারা ছেড়ে দিয়ে বোটের পিছনে চলে এল রানা, এয়ার গান রিলোড করল। ওর সামনে লেকের পাড়ের সঙ্গে ধাক্কা খেলো ক্যাটাম্যারান, প্রচণ্ড ঝাঁকি খেয়ে স্থির হয়ে গেল, কয়েক সেকেন্ড পর থেমে গেল এঞ্জিনগুলো। পিছনের প্ল্যাটফর্মের এনফোর্সার সংঘর্ষের ধাক্কায় ছিটকে পড়েছিল কেবিনের গায়ে, ঘাড়টা ভেঙে যাওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে মারা গেছে। পিঠের এয়ার সিলিন্ডার আর ওয়েট বেল্ট খুলে পিছনের প্ল্যাটফর্মে উঠে পড়ল রানা। হুইলহাউসের ভেতর কাউকে দেখা যাচ্ছে না। মই বেয়ে উঠল ও, লাথি মেরে দরজা খুলল।

ডেকে পড়ে আছে এক লোক, দু'হাতে বুক খামচে ধরে গোঙাচ্ছে। বোট ঝাঁকি খাওয়ায় জখম হয়েছে সে, সম্ভবত বুকের কয়েকটা হাড় ভেঙে গেছে। এয়ার গান তুলল রানা, একই সঙ্গে ছোট একটা অটোমেটিক রিভলবার তুলল চিয়ান ফেঙ–বুকের ওপর ছিল ওটা, হাত দিয়ে আড়াল করে রেখেছিল। রানার বর্শা আর চিয়ানের গুলি পরস্পরকে পাশ কাটাল। বুলেটটা রানার নিতম্বের বাইরের মাংস খুদে একটা ফুটো তৈরি করল। বর্শাটা ঢুকল চিয়ানের কপালে।

নিজের জখমটাকে রানা কোন গুরুত্বই দিল না। জানে রক্ত ঝরবে, ব্যথাও করবে, তবে ওর শারীরিক তৎপরতায় বিঘ্ন সৃষ্টি করবে না। হুইলহাউস থেকে বেরিয়ে এল ও, মই বেয়ে ফরওয়ার্ড ডেকে নামল, সেখান থেকে লাফ দিয়ে লেকের পাড়ে। খানিকটা ছুটে এসে ইমিগ্রান্টদের দেখতে পেল একটা ঝোপের ভেতর।

'শাড়ি পরা মেয়েটি কোথায়? আপনি কোথায়?' রানার গলায় জরুরী তাগাদা, উদ্বেগ ও উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে।

'আমি এখানে,' জবাব দিল শাকিলা। ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসে রানার সামনে দাঁড়াল।

'আপনারা সবাই তীরে পৌঁছুতে পেরেছেন?' জানতে চাইল রানা।

মাথা নাড়ল শাকিলা। ক্লান্ত সুরে বলল, 'না। আমরা বারোজন ছিলাম। একটা মেয়ে সাঁতার জানত না। কিছুক্ষণ খুঁজেছি, কিন্তু তাকে আমি পাইনি।'

কাতর দেখাল রানাকে। 'ওহ্ গড! আমি ভেবেছিলাম সবাইকে উদ্ধার করতে পেরেছি।'

'পেরেছিলেনই তো,' বলল শাকিলা। 'মেয়েটা ডুবে গেছে তীরে আসার সময়।'

'আমার আরও সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। সত্যি আমি দুঃখিত,' আন্তরিক সুরে

বলল রানা।

'দুঃখিত? কি বলছেন! আমাদের একজনের উদ্ধার পাওয়াও তো সম্ভব ছিল না!'

'আপনারা হাঁটতে পারবেন? সবাই?'

'মনে হয় পারব।'

'লেকের দিকে মুখ করে দাঁড়ালে বাম দিকে যে পাড় দেখতে পাবেন সেটা ধরে হাঁটতে থাকুন,' নির্দেশ দিল রানা। 'তিনশো গজের মত এগোবার পর একটা কেবিন দেখতে পাবেন। ভেতরে ঢুকবেন না, বাইরের জঙ্গলে লুকিয়ে থাকুন সবাই। আবার বলছি, কেবিনের ভেতরে ঢুকবেন না।'

'আপনি?'

'ওদেরকে বোকা বানানো যাবে না,' বলল রানা। 'বোট ডকে না ফিরলেই লেকের পাড় ধরে ছুটে আসবে ওরা। হয়তো এরই মধ্যে রওনা হয়ে গেছে। আমি একটা ডাইভারশন তৈরি করতে যাচ্ছি।'

'একা?'

'একাই। আপনাদের এই অবস্থার জন্যে যে দায়ী তার খানিকটা ক্ষতি করতে না পারলে মনটাকে শান্ত করতে পারব না।' হঠাৎ ইস্পাতের মত কঠিন হয়ে উঠল রানার চেহারা।

'সঙ্গে থাকলে আমি হয়তো আপনাকে সাহায্য করতে পারতাম,' বলল শাকিলা। 'এ-সব ব্যাপারে কিছুটা ট্রেনিং নেয়া আছে আমার...'

'ট্রেনিং নেয়া আছে? কে আপনি?'

'আমি শাকিলা সুলতান, আইএনএস-এর এজেন্ট।'

'মাসুদ রানা, নুমার স্পেশাল প্রজেক্ট ডিরেক্টর,' বলল রানা, যখন যে পরিচয়টা কাজে লাগে সেটাই ব্যবহার করে ও। 'আপনি কি বাঙালী?' শেষ প্রশ্নটা বাংলাতেই করল।

শাকিলাও বাংলাতে জবাব দিল, 'আমি আমেরিকান-বাঙালী। আপনি?'

'আমি বাংলাদেশী। নুমায় কিভাবে কেন আছি, সেটা ব্যাখ্যা করতে সময় লাগবে।'

'আমি কি আপনার সঙ্গে যাচ্ছি?' জানতে চাইল শাকিলা।

'না। আপনার কাজ আপনি করুন, অবৈধ অভিবাসীদের সঙ্গে থাকুন।'

ক্যাটাম্যারানের হুইলহাউসে ফিরে এল রানা। ভেতরে মাত্র ঢুকছে, ফোনটা বেজে উঠল। রিসিভার তুলে কানে ঠেকাল ও, আঞ্চলিক চীনা ভাষায় কেউ কিছু বলছে। সাড়া না দিয়ে রিসিভারটা নামিয়ে রাখল ব্রিজ কাউন্টারে। হুডের ডাইভ লাইট জ্বেলে বোটের ইগনিশন সুইচ আর থ্রটল খুঁজে নিল। স্টার্টার এনগেজ করার পর থ্রটলটা বারবার সামনে ঠেলে দিল আর পিছনে টেনে আনল, কিছুক্ষণ খক খক কাশি দিয়ে দুটো এঞ্জিনই আবার জ্যান্ত হয়ে উঠল।

ক্যাটাম্যারানের বো পাড়ের কাদায় গেঁথে গেছে। থ্রটল পুরোপুরি রিভার্স করে দিয়ে হেলম ঘোরাল রানা, বোটের জোড়া স্টার্ন আগুপিছু করছে সামনের

অংশটাকে কাদা থেকে বের করার জন্যে। এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে বেরিয়ে আসছে বো, তারপর এক সময় পুরোটা মুক্ত হয়ে গভীর পানিতে সরে এল বোট। ইউ টার্ন নিল রানা, থ্রটল সামনের দিকে ঠেলে দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত বো তাক করল ডক আর হুয়ান হানের ইয়টের দিকে। ইয়টের প্রতিটি সেলুন খালি মনে হলো, তবে ভেতরে আলো জ্বলছে।

হুইলের একজোড়া স্পোকের মাঝখানে ডাইভ নাইফ ঢোকাল রানা, ছুরির ডগাটা কাঠের কমপাস বক্সের গায়ে গাঁথল। বোটে এখন কেউ না থাকলেও কোর্স বদলাবে না। থ্রটল পো পজিশনে রেখে হুইলহাউস থেকে বেরিয়ে এল ও, মই বেয়ে নেমে স্টারবোর্ড খোলের ভেতর এঞ্জিন কমপার্টমেন্টে চলে এল। বোমা তৈরি করার সময় নেই হাতে, কাজেই প্যাঁচ ঘুরিয়ে ফুয়েল ট্যাংকের রিফুয়েলিং ক্যাপটা খুলে ফেলল। এঞ্জিন ফিটিংস মোছার কাজে লাগে, এমন প্রচুর তেলে-ভেজা ন্যাকড়া পড়ে আছে মেঝেতে, কয়েক প্রস্থ তুলে নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে গিঁট দিল, তারপর ভিজিয়ে নিল ডিজেলে। বেঁধে এক করা ন্যাকড়ার একটা মুখ থাকল ট্যাংকের ভেতর, অপরপ্রান্তটাকে টেনে নিয়ে এল এঞ্জিন-কমপার্টমেন্টের ডেকে। তারপর আরও এক গাদা ন্যাকড়া জড়ো করে বৃত্তাকার একটা বাঁধ তৈরি করল, ভেতরে ডিজেল ঢালল উদারহস্তে। হুইলহাউসে ফিরে এসে স্টোরেজ কেবিনেট সার্চ করল। যা খুঁজছিল পেয়েও গেল। ইমার্জেন্সী ফ্লেয়ার গান লোড করে হেলমের সামনে কাউন্টারের ওপর ফোনের পাশে রাখল সেটা। স্পোকের ফাঁক থেকে এতক্ষণে ছুরিটা বের করে হাত দিয়ে হুইল ধরল।

ডক আর ইয়ট আর মাত্র দুশো গজ দূরে।

লেকের পাড়ের সঙ্গে ধাক্কা খাওয়ায় ক্যাটাম্যারানের বো কয়েক জায়গায় ফেটে গেছে, ফাটলগুলো থেকে পানি ঢুকছে দ্রুত, জোড়া খোলের ফরওয়ার্ড সেকশন ধীরে ধীরে ডুবে যাচ্ছে। বিরতিগুলোয় না থেমে থ্রটল ঠেলে দিল রানা, প্রপেলারের শক্তি বেড়ে যাওয়ায় পানি থেকে উঁচু হয়ে উঠল বো। পনেরো, আঠারো, বিশ নট–ক্যাটাম্যারানের স্পীড বাড়ছে, দেখে মনে হচ্ছে পানি না ছুঁয়ে বোট যেন উড়ছে। বোটটা সরাসরি ইয়টের পোর্ট বীম-এর ওপর তাক করল ও।

দূরত্ব যখন আর মাত্র পঞ্চাশ গজ, হুইলহাউস থেকে বেরিয়ে এসে লাফ দিয়ে পিছনের ডেকের প্ল্যাটফর্মে পড়ল রানা, এঞ্জিন কমপার্টমেন্টের খোলা হ্যাচের ভেতর দিয়ে ফ্লেয়ার তাক করল ফুয়েলে ভেজা ন্যাকড়ায়, তারপর ট্রিগার টেনে দিল। লক্ষ্যভেদে ব্যর্থ হবে না ধরে নিয়ে একটা লাফ দিয়ে পানিতে পড়ল।

সংঘর্ষের বিকট আওয়াজ শোনা গেল চার সেকেন্ড পর। ইয়টের খোল গুঁড়িয়ে দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়েছে ক্যাটাম্যারান। বিস্ফোরণটা ঘটল আরও এক সেকেন্ড পর, রাতের আকাশ ভরে উঠল অগ্নিশিখা আর উড়ন্ত আবর্জনায়। ক্যাটাম্যারান আক্ষরিক অর্থেই বিস্ফোরিত হয়েছে, পানিতে ভাসছে শুধু তেল, আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। প্রায় চোখের পলকে ইয়টের প্রতিটি পোর্ট দরজা থেকে আগুনের লেলিহান শিখা বেরিয়ে আসতে দেখা গেল। গোটা ইয়ট এত দ্রুত একটা মশালে পরিণত হলো দেখে হতভম্ব হয়ে গেল রানা। চিৎ সাঁতার দিয়ে পিছিয়ে আসছে ও, তাকিয়ে আছে হুয়ান হানের সৌখিন ও বিলাসবহুল ইয়টটার

দিকে, ধীরে ধীরে পানির তলায় তলিয়ে যাচ্ছে। এক সময় সবটুকু ডুবে গেল, পানির ওপর শুধু রাডার অ্যান্টেনার ওপরের অর্ধেকটা দেখা যাচ্ছে।

তৎপর হতে সময় নিল সিকিউরিটি গার্ডরা। রানা ভাসমান কুঁড়েতে পৌঁছেছে, এই সময় মোটর বাইকে চড়ে রিট্রিট থেকে বেরিয়ে এল তারা, ছুটছে ডকের দিকে। ইতিমধ্যে ডকটাও দাউ দাউ করে জ্বলতে শুরু করেছে। গত এক ঘণ্টায় দ্বিতীয় বারের মত পানির নিচে থেকে কুঁড়ের তলায় মাথা তুলল রানা। প্যাসেজওয়ে থেকে ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ ভেসে আসছে। কুঁড়ের দরজা বন্ধ করে দিল ও, তবে তালা খুঁজে না পেয়ে বিশ্বস্ত ডাইভ নাইফটা দরজার ফ্রেম আর বাইরের কিনারার মাঝখানে আটকে দিল, শক্তভাবে জ্যাম হয়ে গেল দরজা।

লাফ দিয়ে একটা ওয়াটারক্রাফটে চড়ল রানা, চাপ দিল স্টার্টার বাটনে। থ্রটলে হাত দিতেই জ্যান্ত হয়ে উঠল মোটর। ভঙ্গুর দরজা ভেঙে লেকে বেরিয়ে এল ওয়াটারক্রাফট। ভেজা, শীতার্ত ও ক্লান্ত রানা; নিতম্বের ক্ষতটা থেকে রক্ত গড়াচ্ছে; তাসত্ত্বেও এতটাই উল্লাস অনুভব করছে, যেন এইমাত্র লটারিতে কয়েক কোটি টাকা জিতেছে। যদিও ডকের পাশে নিজের কেবিনে পৌঁছানোর পর এই অনুভূতি বদলে গেল।

বাস্তব পরিস্থিতি উপলব্ধি করতে পারল রানা। বিপদের আরও ভয়ঙ্কর চেহারা দেখতে হবে ওকে।

ছয়

মোবাইল সিকিউরিটি ভেহিকেলে বসে মনিটর স্ক্রীনগুলোর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে ল্যাঙ ওয়ান। স্বচক্ষে দেখেও বিশ্বাস করতে পারছে না ছুটে এসে ইয়টটাকে আঘাত করল ক্যাটাম্যারান, বিস্ফোরিত হয়ে আগুন ধরিয়ে দিল ইয়ট আর ডকে। বিস্ফোরণের ঝাঁকি খেয়ে সাময়িক অচল হয়ে পড়ল সার্ভেইল্যান্স সিস্টেম। বাইরে বেরিয়ে তীরের দিকে ছুটল ল্যাঙ ওয়ান, কি ঘটছে চামড়ার চোখে দেখতে চায়।

ইয়টটা ডুবে যাচ্ছে দেখে আতঙ্ক অনুভব করল সে। তাদের বস্ হুয়ান হান এই ক্ষতি মেনে নেবেন না। চারটে ইয়টের মধ্যে এটাই ছিল তাঁর সবচেয়ে প্রিয়। ওয়ান ভাবল, সব দোষ চিয়ান ফেঙের ওপর চাপাতে হবে। রহস্যময় আলোটা সম্পর্কে তদন্ত করার নির্দেশ দিয়েছিল সে, কিন্তু পরে আর ক্যাটাম্যারানের ক্যাপটেন ফেঙ তার সঙ্গে কোন রকম যোগাযোগ করেনি। এর একটাই কারণ হতে পারে, মদ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল ক্যাটাম্যারানের ক্যাপটেন ও ক্রুরা। তা না হলে কি কারণে এই আত্মহত্যা করতে যাবে?

দু'জন গার্ড ছুটে এসে রিপোর্ট করল। ওয়াটারক্রাফট নিয়ে লেকে বেরুতে পারছে না তারা, কারণ ভাসমান কুঁড়ের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। প্রশ্ন হলো, তালা লাগানোর ব্যবস্থাই যেখানে নেই, সেখানে দরজা বন্ধ থাকে কিভাবে?

এরপর সেকেন্ড ইন কমান্ড চাও চুয়ার গলা ভেসে এল রেডিওর এয়ারপীসের মাধ্যমে। রিপোর্ট করল সে। পালা বদলের জন্যে রওনা হবার পর দু'জন সেল-

ব্লক সিকিউরিটি গার্ডকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। এই মাত্র বিল্ডিঙের সেকেন্ড লেভেলে তাদেরকে রক্তাক্ত ও অচেতন অবস্থায় পাওয়া গেছে, হাত-পা বাঁধা, মুখে কাপড় গোঁজা। 'সন্দেহ নেই, কোন প্রফেশনালের কাজ।'

'তারমানে কি আমাদের সিকিউরিটিকে ফাঁকি দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়েছে কেউ?' উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে ওয়ান নির্দেশ দিল, 'বিল্ডিঙের চারপাশে সার্চ পার্টি পাঠাও।'

'এরইমধ্যে সে নির্দেশ দিয়েছি আমি।'

রেডিওটা পকেটে রেখে দিয়ে জ্বলন্ত ডকের দিকে তাকাল ওয়ান। ইয়টের সঙ্গে ক্যাটাম্যারানের সংঘর্ষ আর প্রিজন বিল্ডিঙে সেল-ব্লক সিকিউরিটি গার্ডদের আক্রান্ত হওয়া, দুটো ঘটনার সঙ্গে নিশ্চয়ই কোন যোগাযোগ আছে। অবৈধ অভিবাসীদের প্রাণ বাঁচিয়েছে রানা, এ বিষয়ে অজ্ঞ ওয়ান বিশ্বাস করতে পারছে না হুয়ান হানের অপারেশন ধ্বংস করার জন্যে আমেরিকান ল-এনফোর্সমেন্ট এজেন্সি আন্ডারকাভার এজেন্টদের কোন টীমকে ওরিয়ন লেকে পাঠিয়েছে। এফবিআই বা আইএনএস কখনোই নির্বিচারে মানুষ খুন করে না। তাছাড়া, ওরা সাধারণত ট্যাকটিকাল টীম পাঠায়। এতক্ষণে লেকের চারদিকে গিজগিজ করতে দেখা যেত তাদেরকে। না, ওয়ান ভাবল, এটা প্রফেশনালদের পরিকল্পিত কোন হামলা নয়। চুপিসারে ক্ষতি করতে এসেছে এক কি বড়জোর দু'জন লোক।

কিন্তু সে বা তারা কার স্বার্থে কাজ করছে? কে তাদেরকে টাকা দিচ্ছে?

কাল লেকে এক লোক মাছ ধরছিল, মনে পড়ে গেল ওয়ানের। লোকটাকে ছুটি কাটাতে আসা ব্যবসায়ী বলে মনে হয়েছিল, আসলে হয়তো তা সে নয়। একটা কথা ভেবে খানিকটা স্বস্তিবোধ করল সে, একশো মাইলের মধ্যে ওই একজন লোকই সন্দেহজনক। রেডিও বের করে চাও চুয়াকে ডাকল সে। জিজ্ঞেস করল, 'কোন সন্দেহজনক ভেহিকেল দেখা যাচ্ছে?'

'রাস্তা আর আকাশ একদম খালি,' চাও চুয়া আশ্বস্ত করল।

'লেকে কোন অস্বাভাবিক তৎপরতা?'

'আমাদের ক্যামেরায় খানিকটা নড়াচড়া ধরা পড়েছে, কেবিনটার পিছনে গাছপালার ভেতর, তবে ভেতরে যে লোকটা থাকে তার কোন হদিস নেই।'

'কেবিনে হানা দাও। আমাকে জানতে হবে কাদের সঙ্গে লাগতে যাচ্ছি আমরা।'

'হানা দেয়ার জন্যে প্রস্তুতি দরকার, সময় লাগবে,' বলল চাও চুয়া।

'একজন লোককে পাঠাও, গাড়িটা ধ্বংস করে দিয়ে আসুক, লোকটা যাতে পালাতে না পারে।'

'কোথাও যদি কিছু কেঁচে যায়, স্থানীয় পুলিসকে সামলানো যাবে তো?'

'যখনকার কথা তখন ভাবা যাবে,' জবাব দিল ওয়ান। 'আমার মন খুঁত-খুঁত করছে। লোকটা খুব সম্ভব বিপজ্জনক। বসের জন্যে একটা মারাত্মক ঝুঁকি বলে মনে হচ্ছে।'

'পেলে তাকে কি…'

'হ্যাঁ, শত্রুর জড় রাখতে নেই। তবে সাবধান, কোন ভুল হওয়া চলবে না।

হুয়ান হান রেগে গেলে তাইওয়ানে আমাদের গোটা পরিবার ধ্বংস হয়ে যাবে।'

'মাসুদ রানা?' অন্ধকারে শাকিলার ডাক এত অস্পষ্ট, কোন রকমে শোনা গেল। 'মি. রানা?'

'আসছি,' বলল রানা। ছোট একটা ইনলেটে ওয়াটারক্রাফট থামিয়েছে রানা, সেটা কেবিনের পাশে লেকের সঙ্গে মিশেছে। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে হেঁটে এসে শাকিলার কাছে পৌঁছেছে ও। 'সবাই ভাল আছে তো?'

'বেঁচে আছে। ভাল থাকে কি করে?' বিড়বিড় করল শাকিলা। 'সবাই ঠকঠক করে কাঁপছে। শুকনো কাপড় আর চিকিৎসা দরকার।'

নিতম্বের ক্ষতটায় আলতোভাবে আঙুল ছোঁয়াল রানা। 'আপনার প্রস্তাব আমি সমর্থন করি।'

'ওদেরকে আপনার কেবিনের ভেতর নিয়ে যেতে অসুবিধে কি? মুখে কিছু দিতে পারত, ঠাণ্ডা থেকেও বাঁচত।'

মাথা নাড়ল রানা। 'উচিত হবে না। বরং চলুন ওদেরকে নিয়ে বোটহাউসে যাই। তারপর দেখব খাবারদাবার আর কম্বলের কি ব্যবস্থা করা যায়।'

'কারণটা তো বলবেন। কেন উচিত হবে না? কেবিনে ওরা আরাম পেত। বোটহাউসের দুর্গন্ধে...'

মেয়েটা দেখা যাচ্ছে খুব জেদি, ভাবল রানা। 'ওখানে সার্ভেইল্যান্স ক্যামেরা আছে। ওদের ধারণা আপনারা সবাই মারা গেছেন, তাই না? এখন যদি কেবিনে আপনাদের দেখে, মেশিন পিস্তল নিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটে আসবে।'

'ওহ্! তারমানে আপনার ওপর ওরা নজর রাখছে?'

'রাখছে,' বলে একটা গাছের কাছে হেঁটে এল রানা, হাত উঁচু করে একটা শাখা ছুঁলো, তারপর ফিরে এল শাকিলার সামনে। ইরিডিয়াম স্যাটেলাইট ফোনটা তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, 'আপনি আইএনএস এজেন্ট, তাই না? এখানে কি ঘটছে বসকে জানান। বলুন লেকের ধারে বিল্ডিঙটা আসলে একটা জেলখানা, অবৈধ অভিবাসীদের আটকে রাখা হয়। কেন আটকে রাখা হয়, তা আমি বলতে পারব না। আরও জানান, লেকের তলায় প্রচুর কঙ্কাল ছড়িয়ে আছে–কয়েকশো-ও হতে পারে। নতুন লাশও আছে। বলুন, সিকিউরিটি খুব কড়া, গার্ডরা সবাই সশস্ত্র। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পৌঁছুতে বলুন, অপরাধের সমস্ত প্রমাণ ওরা নষ্ট করে ফেলার আগেই। তারপর একটা অনুরোধ করুন। এই একই রিপোর্ট ওঁরা যেন নুমা হেডকোয়ার্টারে পৌঁছে দেন।'

দু'সেকেন্ড রানার মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল শাকিলা। 'নুমার একজন প্রজেক্ট ডিরেক্টর? মাসুদ সাহেব, তাহলে আপনার তো একজন মেরিন সায়েনটিস্ট হবার কথা। নুমা আজকাল বিজ্ঞানীদের এই সব ট্রেনিংও দিচ্ছে নাকি–মানুষ মারার, আগুন লাগানোর?'

'আমি স্পেশাল,' বলল রানা, 'প্রজেক্ট ডিরেক্টর। ফোনটা তাড়াতাড়ি করুন, প্লীজ। আমি জানি, ওরা যে-কোন মুহূর্তে এসে পড়বে। আর শুধু নাম ধরলেই চলবে, সাহেব বলতে হবে না।'

দশ মিনিট পর খাবার ভর্তি ছোট একটা বাক্স আর দশটা কম্বল নিয়ে বাড়িটা থেকে ফিরে এল রানা। দ্রুত হাত চালিয়ে পরনের কাপড়ও পাল্টে এসেছে। গুলির শব্দ শুনতে পায়নি, নিশ্চয়ই সাইলেন্সার লাগানো ছিল–একজোড়া বুলেট ওর রেন্টাল কারের রেডিয়েটর ফুটো করে দিয়েছে। টের পেল কেবিন পর্চে জ্বালিয়ে রেখে যাওয়া ফ্লাডলাইটের আলো ফ্রন্ট বাম্পারের নিচে ঝরে পড়া অ্যান্টিফ্রিজে প্রতিফলিত হতে দেখে। 'গাড়ি চালিয়ে কেটে পড়ার কথা ভুলে যান,' মৃদুকণ্ঠে বলল ও। অল্প করে খাবার পরিবেশন করছে শাকিলা, ইতিমধ্যে সবাইকে একটা করে কম্বল দিয়েছে রানা।

'কেন, কি হয়েছে?' জানতে চাইল শাকিলা।

'আপনার বন্ধুরা আমার রেডিয়েটর ফুটো করে দিয়েছে। হাইওয়েতেও পৌঁছুতে পারব না, তার আগেই এঞ্জিন গরম হয়ে যাবে, ফেঁসে যাবে বিয়ারিং।'

'ওদেরকে আমার বন্ধু বলবেন না তো!' চাপাস্বরে অসন্তোষ প্রকাশ করল শাকিলা।

'দুঃখিত।'

'আমি তো কোন সমস্যা দেখছি না। আর এক ঘণ্টার মধ্যে আইএনএস আর এফবিআই এজেন্ট চারদিকে গিজগিজ করবে।'

'হানের লোকজন তার আগেই পৌঁছে যাবে,' ভারী গলায় বলল রানা। 'হানা দেয়ার জন্যে প্রস্তুতি দরকার, সময় পাবার জন্যে গাড়িটা অচল করে দিয়েছে। ওরা সম্ভবত রাস্তা বন্ধ করে দিচ্ছে, কেবিনটা ঘিরে ফেলছে চারদিক থেকে।'

'জঙ্গলের ভেতর আমাদের কেউ হাঁটতে পারবে না,' স্পষ্ট করে বলল শাকিলা। 'সবাই এত ক্লান্ত যে বলার নয়। নিরাপদ কোথাও সরিয়ে নেয়ার নিশ্চয়ই কোন উপায় আছে। চিন্তা করে বের করুন।'

'চিন্তাটা সব সময় আমাকেই করতে হবে কেন?'

'কারণ আপনিই আমাদের একমাত্র সম্বল।'

মেয়েলি যুক্তি, সকৌতুকে ভাবল রানা। 'এখন যদি রোমান্টিক পরিবেশ পান, কেমন লাগবে আপনার?' জিজ্ঞেস করল ও।

'কি বললেন? রোমান্টিক পরিবেশ?' প্রায় চমকে উঠল শাকিলা। 'ঠাট্টা করছেন? নাকি পাগল হলেন?'

'ঠাট্টা বা পাগলামি, কোনটাই করছি না,' বলল রানা। 'যা সত্যি তাই বলছি। আপনি যদি নীরসও হন, তবু স্বীকার করতে হবে তারা ভরা আকাশের নিচে বোট নিয়ে লেকে ঘুরে বেড়ানো দারুণ রোমান্টিক একটা ব্যাপার।'

চোখে সন্দেহ নিয়ে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল শাকিলা।

রানাকে ওরা খুন করতে এল ভোর হবার কিছুক্ষণ আগে। প্রথমে কেবিনটাকে ঘিরে ফেলল ওরা, তারপর বৃত্তটাকে ধীরে ধীরে ছোট করে আনল। পোর্টেবল রেডিওতে নিচু গলায় কথা বলছে চাও চুয়া, কে কোথায় আছে জেনে নিচ্ছে, নির্দেশ দিচ্ছে কিভাবে এগোতে হবে। তাইওয়ানিজ ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিতে কাজ

করেছে সে, সরকার-বিরোধী সশস্ত্র রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের বাড়িতে হানা দেয়ার অভিজ্ঞতা আছে। জঙ্গলের ভেতর থেকে কেবিনটা দেখে ভাল লাগল না তার। পর্চের চারধারে ফ্লাডলাইটগুলো জ্বলছে। শুধু তাই নয়, প্রতিটি কামরাও আলোকিত। ফুল ভলিউম দেয়া একটা রেডিও থেকে ভেসে আসছে ওয়েস্টার্ন মিউজিক।

গাড়ির রেডিয়েটর ফুটো করে দেয়া হয়েছে, অ্যাডভান্সড স্কাউট রেডিও যোগে এই রিপোর্ট পাঠানোর পর বিশজনের টীমটা রওনা হয়—একদল রাস্তা ধরে এগোয়, আরেক দল জঙ্গলের ভেতর দিয়ে। চাও চুয়া নিশ্চিত, পালাবার সমস্ত পথ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, তার কর্ডন ভেদ করে লোকটা বেরিয়ে যেতে পারবে না। কেবিনে যেই বসবাস করুক, ওখানেই তার থাকার কথা। অথচ তবু সন্দেহ হচ্ছে, মনে হচ্ছে প্ল্যান অনুসারে সব কিছু ঘটছে না।

কেবিনের বাইরে আলো জ্বলছে, এটা স্বাভাবিক বলে মেনে নেয়া যায়। কিন্তু ভেতরের প্রতিটি কামরায় কেন আলো জ্বলবে? রেডিওটাই বা ফুল ভলিউমে বাজবে কেন? টীমের লোকজনকে সাবধানে এগোতে হচ্ছে, কেবিনের দেয়ালগুলোকে আড়াল হিসেবে না পাওয়া পর্যন্ত নিরাপদ নয় তারা। খোলা উঠানে ঢুকলেই কেউ যদি ভেতর থেকে অটোমেটিক আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে ব্রাশ ফায়ার করে, সবগুলোকে পটল তুলতে হবে। কেবিনের চারপাশে বারবার পজিশন বদল করল সে, চোখে বিনকিউলার লাগিয়ে প্রতিটি ঘরের জানালা দিয়ে ভেতরে তাকাচ্ছে।

শুধু কিচেনে এক লোক বসে আছে। আর শুধু এই কিচেনের সার্ভেইলান্স ক্যামেরাটা অচল। লোকটার মাথায় একটা বেসবল ক্যাপ, চোখে রীডিংগ্লাস, টেবিলের ওপর এমন ভঙ্গিতে ঝুঁকে আছে, যেন কোন বই বা ম্যাগাজিন পড়ছে।

একটা কেবিন ভেতরে ও বাইরে আলোর বন্যায় ভেসে যাচ্ছে। রেডিও বাজছে ফুল ভলিউমে। পুরোদস্তুর কাপড়চোপড় পরা এক লোক ভোর সাড়ে পাঁচটায় বই পড়ছে? নাক কুঁচকে বাতাস টানল চাও চুয়া। রাতের বাতাস নির্মল ও তাজা, তবে একটা ফাঁদের গন্ধ পাচ্ছে সে।

রেডিও অন করে একজন লোককে ডাকল চাও চুয়া। লোকটা এল স্কোপ লাগানো স্নাইপার রাইফেল নিয়ে, মাজলে লম্বা সাপ্রেসর। 'কিচেনের ভেতর দেখছ ওকে?' জিজ্ঞেস করল চুয়া। লোকটা মাথা ঝাঁকাতে নির্দেশ দিল, 'গুলি করে ফেলে দাও।'

দূরত্ব একশো গজেরও কম, গুলি না লাগার প্রশ্নই ওঠে না। হাত ভাল হলে হ্যান্ডগান দিয়েও লোকটাকে ফেলে দেয়া যায়। স্কোপের সাইটে চোখ না রেখে আয়রন সাইটে চোখ রাখল স্নাইপার, লক্ষ্যস্থির করল টেবিলে বসা লোকটার ওপর। হাততালি দেয়ার মত একটা আওয়াজ হলো, প্রায় একই সঙ্গে শোনা গেল কাচ ভাঙার শব্দ। চোখে বিনকিউলার লাগিয়ে তাকিয়ে আছে চুয়া। জানালার কাচে ছোট একটা গর্ত তৈরি করেছে বুলেট, কিন্তু লোকটা এখনও টেবিলে এমন খাড়াভাবে বসে আছে যেন কিছুই ঘটেনি।

'ব্যাটা গাধা!' গাল দিল সে। 'লাগল তো না!'

স্নাইপারকে বিহ্বল দেখাল। 'এত কাছ থেকে না লাগার প্রশ্নই ওঠে না।'

'আবার গুলি করো।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে আবার লক্ষ্যস্থির করল স্নাইপার। ট্রিগার টানার পর দেখা গেল টেবিলে আগের মতই বসে আছে লোকটা। 'টার্গেট হয় এরইমধ্যে মারা গেছে, নয়তো সে কোমায় আছে। আমার বুলেট তার নাকের ব্রিজে লেগেছে। গর্তটা আপনি নিজেই দেখুন।'

কিচেনে বসা লোকটার মুখে বিনকিউলার ফোকাস করল চুয়া। রীডিং গ্লাসের ওপর, নাকের ব্রিজে, সত্যি সত্যি নিখুঁত একটা ফুটো দেখা যাচ্ছে, কিন্তু সেটা থেকে রক্ত বেরুচ্ছে না। 'ধোঁকা! ফাঁকি!' গোপনীয়তার আর কোন প্রয়োজন নেই, রেডিও বাদ দিয়ে গর্জে উঠল সে, নির্দেশ দিচ্ছে নিজের লোকজনকে, 'ভেতরে ঢোকো! ভেতরে ঢোকো!'

কালো পোশাক পরা সশস্ত্র লোকজন জঙ্গলের ছায়া থেকে বেরিয়ে এল। খোলা উঠান ধরে ছুটে ঢুকে পড়ল কেবিনের ভেতর। তাদের সঙ্গে চুয়াও আছে। কয়েকজনকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে কিচেনে চলে এল সে। 'কোন জাতের শয়তান এটা?' চেয়ারে বসিয়ে রাখা ডামিটাকে ধরে মেঝেতে আছাড় মারল। বেসবল হ্যাটটা ছিটকে পড়ল, ভেঙে গেল রীডিং গ্লাস, খুলে গেল ভেজা খবরের কাগজ দিয়ে তৈরি মানুষের একটা রঙ করা মুখ। সার্চ শেষ করে চুয়ার সেকেন্ড ইন কমান্ড কিচেনে ঢুকে রিপোর্ট করল, 'কেবিন খালি। শিকার পালিয়েছে।'

মাথা ঝাঁকাল চুয়া, অবাক হয়নি। রেডিও অন করে ল্যাঙ ওয়ানকে রিপোর্ট করল সে, 'পালিয়েছে।'

এক মুহূর্ত পর ওয়ান জানতে চাইল, 'কিভাবে পালায়?'

'জানি না। আমাদের কর্ডন একটা ইঁদুরও ভেদ করতে পারবে না।'

'আশ্চর্য! কেবিনে নেই, জঙ্গলে নেই, গেল কোথায়?'

জানালা দিয়ে বোটহাউসের দিকে তাকাল চুয়া। তার লোকজন ওটা সার্চ করছে। 'লেক,' জবাব দিল সে। 'তা না হয়েই যায় না, লোকটা লেকে আছে।'

কিচেন থেকে বেরিয়ে পর্চে চলে এল চুয়া, সেখান থেকে ছুটতে ছুটতে ডকে। লোকজনকে ঠেলে বোটহাউসে ঢুকে পড়ল। ক'দিন আগে ব্যক্তিগতভাবে একা এসে কেবিন আর বোটহাউস সার্চ করে গেছে সে। ক্রেডলে সেইলবোটটা ঝুলছে। ক্যানুগুলোও রয়েছে ওয়াল র‍্যাকে। নেই শুধু ক্রিস-ক্র্যাফট রানঅ্যাবাউটটা। চুয়ার ইচ্ছে হলো নিজেকে কষে একটা চড় মারে। লোকটা বোট নিয়ে নদীর দিকে পালাতে পারে, এই কথাটা কেন তার মাথায় ঢোকেনি?

রানাকে নিয়ে বারোজন ওরা। কেবিন থেকে দু'মাইল দূরে সরে এসেছে ওদের বোট। বোটটার ডিজাইন ভারি সুন্দর। পুরো খোলটা মেহগনি দিয়ে তৈরি। এঞ্জিন কমপার্টমেন্ট জোড়া ককপিটের পিছনে। ককপিটেই সবার জায়গা হয়ে গেছে। প্রায় সত্তর বছরের পুরানো বোট, একশো পঁচিশ হর্সপাওয়ারের ক্রিসলার মেরিন এঞ্জিন ওটাকে ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল গতিতে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বন্ধু ডানকান মনরোর ক্রিস-ক্র্যাফট রানঅ্যাবাউট রানার হাতে পড়ে যেন নতুন জীবন ফিরে পেয়েছে। ওর কোলে নাক চ্যাপ্টা চীনা বাচ্চাটা আঙুল চুষছে। বোট ছুটে চলেছে

গ্রেপভাইন বে-র দিকে।

রওনা হবার আগে গাড়ির ট্যাংক থেকে গ্যাস বের করে রানঅ্যাবাউটের ট্যাংকে তা ভরতে হয়েছে রানাকে। বোটহাউস থেকে বেরুবার সময় এঞ্জিন স্টার্ট দেয়নি ওরা, ক্যানুর বৈঠা ব্যবহার করেছে। পানিতে বেশি আওয়াজ না তুলে কিভাবে বৈঠা চালাতে হবে, মেয়েদেরকে হাতে-কলমে শেখাতে হয়েছে রানার। বোটহাউস থেকে বেরিয়ে তীরের ছায়া ধরে সিকি মাইল এগোবার পরই ক্লান্ত হয়ে পড়ল সবাই। একা রানা বৈঠা চালিয়েছে, নদীর মুখে না পৌঁছানো পর্যন্ত এঞ্জিন স্টার্ট দিতে রাজি ছিল না।

কিন্তু একা আর কতক্ষণ পারা যায়। এঞ্জিন স্টার্ট দেয়ার পর বারবার পিছন দিকে তাকিয়েছে রানা। তবে লেকের তীর থেকে কোন চিৎকার শুনতে পায়নি, কোন সার্চ লাইটও জ্বলে উঠতে দেখেনি।

বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে বোট চালাচ্ছে রানা, পুব সারির পাহাড়ের মাথায় সূর্যের প্রথম আলো পড়তে শাকিলার দিকে ফিরল ও। পাশেই বসে আছে মেয়েটা, এক বৃদ্ধার আগুনের মত গরম কপালে জলপট্টি দিচ্ছে।

পরিষ্কার আলোয় এই প্রথম শাকিলাকে দেখছে রানা। চেহারাটা সুন্দর, কিন্তু এমনভাবে ক্ষতবিক্ষত করা হয়েছে যে চমকে উঠতে হলো। এত নির্যাতন সহ্য করার পর সবাইকে নিয়ে বেঁচে থাকার শক্তি আর সাহস কোত্থেকে পায়, চিন্তা করে বিস্মিত হলো রানা। প্রচণ্ড রাগে হঠাৎ গরম হয়ে উঠল শরীর। 'মাই গড, শাকিলা, ওরা আপনার এ কি অবস্থা করেছে!'

'আয়নায় এখনও দেখিনি নিজেকে,' শান্তকণ্ঠে বলল শাকিলা, 'তবে জানি দিন কয়েক মানুষজনকে মুখ দেখানো যাবে না।'

'মেডেল দেয়ার নিয়ম থাকলে আইএনএস আপনাকে সবগুলো দিতে বাধ্য।'

'ফাইলে একটা সার্টিফিকেট অভ মেরিট পেলেই আমি খুশি,' বলল শাকিলা। 'নদীতে পৌঁছাবার পর কি হবে?' জানতে চাইল সে।

'গ্রেপভাইন বেতে পৌঁছুতে পারলে আশা করছি আঙুরের বাগান দেখতে পাব,' বলল রানা। 'বাগান থাকলে সেখানে মানুষও থাকবে। লোকজনের সামনে হানের খুনীরা হামলা করবে বলে মনে হয় না।'

'আমি কি একবার আইএনএস ফিল্ড এজেন্টদের সঙ্গে যোগাযোগ করব? বলা দরকার না লেক ছেড়ে চলে এসেছি আমরা, কিংবা কোথায় পৌঁছুতে চাইছি?'

'দরকার।' ফোনটা শাকিলার হাতে ধরিয়ে দিল রানা।

এঞ্জিনের গতি বাড়ল, সেই সঙ্গে বোটের গতি। যান্ত্রিক গুঞ্জনকে ছাপিয়ে উঠল শাকিলার গলা, 'নুমা কি আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করেছে?'

'ওরা আমাদেরকে গ্রেপভাইন বে থেকে তুলে নিতে আসছে।'

'নুমা কি হলুদ রঙের হালকা আর খোলা এয়ারক্রাফট ব্যবহার করে?'

মাথা নাড়ল রানা। 'নুমার জেট আর হেলিকপ্টার সব আসমানী রঙের। কেন জিজ্ঞেস করছেন?'

রানার কাঁধে টোকা দিয়ে স্টার্নের দিকে হাত লম্বা করল শাকিলা। নদীর ওপর আকাশ পথে ছুটে আসছে একটা আলট্রালাইট। 'ওরা যদি বন্ধু না হয়,

তাহলে নিশ্চয়ই শত্রু।'

দ্রুত ঘাড় ফিরিয়ে চট করে পিছনটা দেখে নিল রানা। আলট্রালাইট মনোপ্লেনটাকে চিনতে পারল। ট্রাইসাইকেল ল্যান্ডিং গিয়ার, মাত্র একজোড়া সীট, পাইলট বসে সামনের দিকে খোলা জায়গায়, পিছনের প্যাসেঞ্জার সীটটা সামান্য একটু উঁচু। এয়ারফ্রেম স্রেফ অ্যালুমিনিয়ামের একটা টিউব, গায়ে কেবল জড়ানো লাইটওয়েট, রিডাকশন-টাইপ ফিফটি-হর্সপাওয়ার এঞ্জিন। রানা আন্দাজ করল, ঘণ্টায় একশো বিশ মাইল স্পীড।

নদীর ঠিক মাঝখান দিয়ে ছুটে আসছে প্লেনটা, পানি থেকে মাত্র চল্লিশ ফুট ওপরে। দক্ষ পাইলট, মনে মনে স্বীকার করল রানা। দু'পাশে গায়ে গায়ে লেগে থাকা উঁচু পাহাড়, মাঝখানে এই সরু গিরিখাদে জোরাল দমকা বাতাস বইছে, কিন্তু পাইলট আলট্রালাইটকে সরল একটা রেখার ওপর একই লেভেলে ধরে রেখেছে। কোন রকম ইতস্তত ভাব নেই, যেন ভাল করেই জানে কি করতে যাচ্ছে। তার উদ্দেশ্যটা রানার কাছেও স্পষ্ট হয়ে গেল যখন দেখল পাইলটের পিছনে বসা লোকটার হাতে একটা মেশিন পিস্তল রয়েছে।

'সবাইকে মাথা নিচু করতে বলুন,' শাকিলাকে নির্দেশ দিল রানা।

রানার নির্দেশ চীনা ভাষায় জানিয়ে দিল শাকিলা। আরোহীরা সবাই যে যার সীটের নিচে যতটা সম্ভব গা ঢাকা দিল।

'সর্বনাশ!' আঁতকে উঠল শাকিলা। 'প্রথমটার মাইলখানেক পিছনে আরও দুটো দেখা যাচ্ছে, রানা!'

'আমাকে না জানালেও পারতেন,' বলল রানা, হুইলের ওপর ঝুঁকে আছে, যেন ইচ্ছা শক্তির সাহায্যে বোটটাকে আরও জোরে ছোটাতে চাইছে। 'ওরা জানে আমরা পালাতে পারলে ওদের সমস্ত অপরাধ ফাঁস হয়ে যাবে।'

প্রথম আলট্রালাইট ছুটন্ত রানঅ্যাবাউটের এত কাছ দিয়ে সগর্জনে উড়ে গেল, প্রপেলার ব্লেডের তৈরি বাতাসের প্রবল আঘাতে নদীর পানি উথলে উঠল, মেঘের মত শূন্যে উঠে ছড়িয়ে পড়ল বোট আরোহীদের ওপর। গুলির আওয়াজ শোনার অপেক্ষায় রয়েছে রানা, দেখতে পাবে মেহগনি খোলের গায়ে সারি সারি গর্ত তৈরি হবে। কিন্তু হামলা না করে চলে গেল আলট্রালাইট, ট্রাইসাইকেল ল্যান্ডিং হুইল আর পাঁচ ফুট নিচে থাকলে রানঅ্যাবাউটের উইন্ডশীল্ডে ঘষা খেত।

পাইলটের পিছনের সীটে বসে আছে চাও চুয়া। রানঅ্যাবাউটের ওপর দিয়ে সামনে চলে এসে হেলমেটের সঙ্গে লাগানো ট্র্যান্সমিটারে কথা বলল সে, 'বোটটাকে আমরা নাগালের মধ্যে পেয়ে গেছি।'

'হামলা করছ না কেন?' অপরপ্রান্ত থেকে ল্যাঙ ওয়ান জানতে চাইল।

'সমস্যা দেখা দিয়েছে, ওয়ান,' বলল চুয়া।

'গত বারো ঘণ্টা থেকে শুধু তো সমস্যাই দেখা দিচ্ছে। নতুন আবার কি ঘটল?'

'বোটে দশ বারোজন মেয়ে রয়েছে,' বলল চুয়া। 'ওরা সম্ভবত অবৈধ

অভিবাসী, যাদেরকে আমরা লেকের তলায় ফেলে দিই।'

'তা কি করে সম্ভব!'

'কি করে সম্ভব জানি না। তবে আমার সন্দেহ হচ্ছে। এখন কি করব বলে দাও।'

জবাব দিতে দু'সেকেন্ড সময় নিল ওয়ান। 'কি ঘটেছে না ঘটেছে জানার দরকার নেই। যে-কোন মূল্যে বসের ব্যবসা নির্বিঘ্ন রাখতে হবে। তা না হলে, জানোই তো, তাইওয়ানে আমাদের সবার পরিবার ধ্বংস হয়ে যাবে–আগেই জানিয়ে দেয়া হয়েছে দায়িত্ব পালনে গাফিলতি প্রমাণিত হলে এই শাস্তিই প্রাপ্য হবে আমাদের। কাজেই, বোটের আরোহীরা চীনা হোক বা আমেরিকান, কিছু আসে যায় না, সব ক'টাকে খুন করো!'

'বেশ। তাহলে হামলার নির্দেশই দিচ্ছি আমি।'

'তবে চোখ খোলা রাখো। কোন প্রত্যক্ষদর্শী যেন না থাকে।'

'ওরা গুলি করল না কেন?' জানতে চাইল শাকিলা, সকালের রোদ নদীর পানিতে প্রতিফলিত হওয়ায় চোখ কুঁচকে আছে।

'ওরা ভেবেছিল আমি একা। আপনাদেরকে দেখে বসকে রিপোর্ট করছে।'

'গ্রেপভাইন বে আর কত দূর?'

'আরও বারো কি তেরো মাইল।'

'তীরে বোট ভিড়িয়ে জঙ্গলের ভেতর লুকানো যায় না?'

'ফাঁকা জায়গায় প্লেন নামিয়ে খুঁজে বের করে ফেলবে ওরা,' বলল রানা। 'নদী পথই আমাদের একমাত্র আশা, যতই ক্ষীণ হোক।'

আরও দু'মাইল এগোল রানঅ্যাবাউট। তারপর দেখা গেল প্রথম আলট্রালাইট ঘুরে গিয়ে আবার পিছন দিক থেকে ফিরে আসছে। এবার গতি আরও বেশি। 'খেলা শেষ, এবার ওরা কাজ দেখাবে,' সাবধান করে দিল রানা। 'হ্যান্ডগানে আপনার হাত কেমন?'

'পুরুষ এজেন্ট যাদের চিনি, তাদের চেয়ে আমার কোয়ালিফাইং স্কোর বেশিই,' সহজ সুরে বলল শাকিলা।

সীটের তলা থেকে তোয়ালে দিয়ে জড়ানো কিছু একটা বের করল রানা, শাকিলার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, 'কোল্ট ফরটি-ফাইভ। আগে কখনও ব্যবহার করেছেন?'

তোয়ালের ভেতর থেকে অটোমেটিক পিস্তলটা বের করল শাকিলা। 'না। প্রয়োজনে আমরা বেরেটা ফরটি-ক্যালিবার অটোমেটিক ব্যবহার করি।'

'ওখানে দুটো স্পেয়ার ক্লিপও আছে। এঞ্জিন বা ফুয়েল ট্যাংকে গুলি করে শেল নষ্ট করবেন না। টার্গেট করবেন পাইলট আর গানারকে। নিখুঁত একটা বডি শট প্লেন ধ্বংস করে দেবে, নয়তো ঘাঁটিতে ফিরে যেতে বাধ্য করবে ওদেরকে।'

ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল শাকিলা, সেফটি অফ করে কক করল হ্যামার। 'মাথার ওপর চলে আসছে!' চেঁচিয়ে সতর্ক করল রানাকে।

'আমাদের যে-কোন এক পাশে থাকবে প্লেন,' বলল রানা। 'তা না হলে

নিচের দিকে গুলি করে লাগাতে পারবে না গানার। খেয়াল রাখুন। কোন দিকে সরে যায় জানাবেন আমাকে, আমি যাতে দিক বদলে প্লেনের ঠিক নিচে থাকতে পারি।'

কোল্টটা দু'হাতে ধরল শাকিলা, ব্যারেল তুলে সাইটে আনল ডানা আর এঞ্জিনের সামনে বসে থাকা লোক দু'জনকে। ট্রিগারে আঙুল চেপে বসছে, চেহারায় ভয়ের চেয়ে মনোযোগের ছাপই বেশি। 'বাঁ দিকে সরুন!' চিৎকার করল।

দ্রুত বাম দিকে সরে এসে আলট্রালাইটের নিচে থাকল রানা। মাজলে সাপ্রেসর লাগানো অটোমেটিক আগ্নেয়াস্ত্রের ভোঁতা আওয়াজ ঢুকল কানে, আওয়াজটা চাপা পড়ে গেল কোল্টের গর্জনে। খোলের মাত্র তিন ফুট দূরে পানিতে সেলাইয়ের ফোঁড় দিয়ে গেল এক সারি বুলেট। বোট বাম দিকে সরে না এলে গানার অবশ্যই লক্ষ্যভেদে ব্যর্থ হত না।

সগর্জনে সামনের দিকে ছুটে যাচ্ছে আলট্রালাইট, পাইলট বা কোপাইলট কেউই আহত হয়নি। দেখে মনে হলো দু'জনেই খুব মজা পাচ্ছে। 'মিস করেছেন!' বলল রানা। 'আপনার বোধহয় আকাশ থেকে হাঁস ফেলার অভিজ্ঞতা নেই।'

'কেন আমি নিরীহ পাখি মারতে যাব!' প্রতিবাদ করল শাকিলা, দক্ষ হাতে খালি ক্লিপ ইজেক্ট করে কোল্টের হ্যান্ডগ্রিপে নতুন একটা ভরল।

সামনে বাঁক ঘুরছে আলট্রালাইট, আবার হামলা চালাবে। বাকি দুটো প্লেন অনেক পিছনে আকাশের গায়ে ঝুলে আছে। পাইলট এবার সামনের দিক থেকে ছুটে আসছে, তাকে আর গানারকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে রানা। সরে গিয়ে ফাঁকি দেয়ার সুযোগ শেষ, নতুন কৌশল খাটাতে হবে ওকে।

কোল্ট ধরা হাত দুটো লম্বা করে দিল শাকিলা, মনে হলো উইন্ডশীল্ড কিনারা ছুঁয়ে বাইরে বেরিয়ে যাবে। আলট্রালাইট বোটের ওপর চলে আসার আগেই গানার হামলা শুরু করে দিল, ছলকে উঠল বোটের সামনের পানি। বন বন করে স্টিয়ারিং হুইল ঘুরিয়ে ডান দিকে সরে এল রানা। সরে গিয়ে পাইলটও গানারের সুবিধেজনক পজিশনে থাকার চেষ্টা করল। তবে দেরি করে ফেলেছে। ডানে সরে, পরমুহূর্তে আবার বামে সরে এসেছে রানা, ফলে গানার আবারও লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো।

বোট আর প্লেন এখনও পরস্পরের দিকে ছুটছে। কৌশল বদলে গুলি করছে গানার, পানিতে যেন একটা ইংরেজি এস হরফ আঁকতে চায়। তবে শাকিলাও এতক্ষণে গুলি করছে।

গানারের বুলেট বোটের মেহগনি বোতে লাগল। ফুল স্পীডে রয়েছে বোট, দু'হাতে গিয়ার লিভার ধরে হ্যাঁচকা টান দিল রানা। গিয়ার বক্স প্রতিবাদ করায় কর্কশ আওয়াজ উঠল। অকস্মাৎ স্থির হয়ে গেল রানঅ্যাবাউট। পরমুহূর্তে লাফ দিল পিছন দিকে, একই সঙ্গে বৃত্তাকারে ঘুরে যাচ্ছে। কয়েকটা বুলেট ভেঙে চুরমার করে দিল উইন্ডশীল্ড, তবে প্রায় অলৌকিকই বলতে হবে যে কেউ আহত হয়নি। ঝাঁক ঝাঁক ফোঁটার মত বুলেট বৃষ্টি বোটের পিছন দিকে সরে গেল। সাইটে টার্গেট ধরে রেখে একের পর এক গুলি করে যাচ্ছে শাকিলাও, যতক্ষণ না

চেম্বার খালি হলো।

পিছন দিকে তাকাতে তৃপ্তিতে ভরে উঠল রানার মন। আলট্রালাইট নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। এঞ্জিনটা কাতর যান্ত্রিক শব্দে গোঙাচ্ছে, টুকরো টুকরো হয়ে শূন্যে ছড়িয়ে পড়ছে প্রপেলার। প্রায় স্থির হয়ে গেল প্লেন, নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাবার জন্যে ব্যর্থ চেষ্টা করছে পাইলট। এক মুহূর্ত পর প্লেনের নাক নিচু হলো, গোত্তা খেয়ে পড়ে গেল মাঝ নদীতে। ডুবে গিয়ে আবার ভাসল ওটা, কয়েকবার দোল খেয়ে শেষবারের মত তলিয়ে গেল।

'নাইস শূটিং,' প্রশংসা করল রানা। 'আপনাকে নিয়ে গর্ব হচ্ছে আমার।'

'ঝড়ে বক,' বলল শাকিলা, যদিও এটা তার বিনয়।

'বাকি দুই পাইলটের মনে আল্লার ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছেন। বন্ধুর মত একই ভুল করবে বলে মনে হচ্ছে না।'

'গিরিখাদ থেকে আমরা বেরুব কখন?' জানতে চাইল শাকিলা।

'আরও চার কি পাঁচ মাইল পার হয়ে।'

মুখ শুকিয়ে গেল শাকিলার। 'ভেবে দেখেছেন, বোটের দু'দিক থেকে দুটো প্লেনই যদি ছুটে আসে, আমার কিছু করার থাকবে না?'

'সময় নিয়ে পালা করে দুটোকেই গুলি করবেন,' বলল রানা। 'গুলি লাগাতে পারেন বা না পারেন, পাল্টা আক্রমণের অভিনয়টা চালিয়ে যেতে হবে। আপনার অভিনয়ই ব্যর্থ হতে সাহায্য করবে গানারদের। আর আমি তো আছিই, বোট নিয়ে ছুটোছুটি করব নদীতে।'

পরবর্তী তিন মাইল কৌশলটা কাজে লাগল। রানঅ্যাবাউটের দু'পাশ থেকে কাছে সরে এসে হামলা চালাল আলট্রালাইট দুটো, দুটোই আঁকাবাঁকা পথ ধরে ছুটছে শাকিলার গুলি এড়াবার জন্যে, ফলে গানাররা কোন সুবিধে করতে পারছে না।

রানাও রানঅ্যাবাউট ছোটাচ্ছে ঘন ঘন দিক বদলে, কখনও ডানে আবার কখনও বামে। মাঝে মধ্যে সুযোগ পেলে দু'একটা গুলি করছে শাকিলা, তবে একটাও লাগাতে পারছে না। ওদের চারপাশের পানিতে ঝাঁক-ঝাঁক বুলেট বৃষ্টি হচ্ছে। হঠাৎ আড়ষ্ট হয়ে গেল রানা পিছনের এঞ্জিন কমপার্টমেন্টের হ্যাচ কাভার এক পশলা বুলেট লাগায়। তবে এঞ্জিনের গর্জনে কোন পরিবর্তন ঘটল না। ইন্সট্রুমেন্ট প্যানেলে চোখ বুলাল ও, অমনি ছ্যাঁৎ করে উঠল বুক। অয়েল প্রেশার গজের কাঁটা লাল ঘরের দিকে নেমে আসছে।

আরও দু'মাইল পথ পাড়ি দিতে হবে। এঞ্জিন কমপার্টমেন্ট থেকে পোড়া তেলের গন্ধ ভেসে আসছে। ধীরে ধীরে কমে আসছে এঞ্জিনের গতি। বিয়ারিং পুড়ে গিয়ে এঞ্জিন জ্যাম হয়ে যাওয়াটা এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। স্থির হয়ে যাবে রানঅ্যাবাউট, মাথার ওপর প্লেন নিয়ে চক্কর দেবে পাইলটরা, আর গানাররা বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে টার্গেট প্র্যাকটিস করবে।

আবার আসছে প্লেন দুটো। এবার সামনে থেকে। ছুটছে একসঙ্গে, দুটো প্লেনের একটা করে ডানা পরস্পরকে যেন ছুঁয়ে আছে। বোঝা গেল পাইলটদের ধৈর্যে ফাটল ধরেছে, তা না হলে এতটা নিচে নামার ঝুঁকি নিত না।

আগের মতই সুযোগের অপেক্ষায় আছে শাকিলা। তবে ভাগ্য যে বারবার সহায়তা করে না, হঠাৎ কথাটা মনে হওয়ায় ভয় পেয়েছে। অনেকটা সেই ভয়ের কারণেই সময়ের আগে ট্রিগার টেনে দিল ও।

রানা যেন জাদু দেখছে। রানঅ্যাবাউটের বাম দিকে সরে গেল একটা আলট্রালাইট, গানারকে গুলি করার সুযোগ করে দেয়াই উদ্দেশ্য। হঠাৎ দেখা গেল সীটে নেতিয়ে পড়েছে পাইলট, হাত ঝুলে পড়ল দু'পাশে। শাকিলার বুলেট বুক ফুটো করে ছিঁড়ে নিয়ে গেছে হার্ট। তির্যক ভঙ্গিতে আড়াআড়ি ছুটল প্লেন, পানিতে ডানা দিয়ে পড়ল, স্যাঁৎ করে ডুবে গেল নদীর গভীরে।

উল্লসিত হবার মত একটা ঘটনা, অথচ পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে উঠল। কারণ ওই একটা গুলিই করতে পেরেছে শাকিলা, শেষ স্পেয়ার ক্লিপের শেষ বুলেট ছিল ওটা।

শেষ আলট্রালাইটের পাইলট দেখল, বোটের এঞ্জিন কমপার্টমেন্ট থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে, বোট থেকে কেউ আর গুলিও করছে না। সাহস বেড়ে গেল তার। পানি থেকে মাত্র পাঁচ ফুট ওপরে থাকল সে, অসহায় শিকারের দিকে মরিয়া হয়ে ছুটে আসছে।

রানঅ্যাবাউটের গতি এখন ঘণ্টায় দশ মাইল। প্রতিযোগিতায় হেরে গেছে রানা। মুখ তুলে গানারকে দেখতে পেল ও। চোখ দুটো সানগ্লাসে ঢাকা, প্রসারিত ঠোঁটে আঁটসাঁট হাসি। হাত তুলে বিদায় সূচক স্যালুট করল রানাকে, তারপর মেশিন পিস্তল তাক করল, ট্রিগারে চেপে বসছে আঙুল।

রানা অসহায়, তবে রাগটাই বোধহয় বেশি, তা না হলে মুঠো করা হাত ওপরে তুলে মারবে বলে গানারকে শাসাত না। পরমুহূর্তে শাকিলা আর ছেলেটার ওপর ঝুঁকে পড়ল, টেনে নিজের শরীরের নিচে নিয়ে এল ওদেরকে। ঘাড় আর পিঠের পেশী আড়ষ্ট হয়ে গেল, অপেক্ষা করছে মেশিন পিস্তলের বুলেট পিঠটা ঝাঁঝরা করে দেবে।

সাত

কিন্তু গুলির নয়, সমস্ত আওয়াজকে ছাপিয়ে রোটর ব্লেডের শব্দ ঢুকল রানার কানে। প্রাগৈতিহাসিক যুগের অতিকায় একটা পাখির ছায়া দেখতে পেল বোটের আরোহীরা, মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাবার সময় এলোমেলো করে দিয়ে গেল সবার চুল। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই দেখা গেল লেজে নুমা লেখা আসমানী রঙের একটা হেলিকপ্টার ধাওয়া করছে আলট্রালাইটকে।

'ওহ্ গড, নো!' গুঙিয়ে উঠল শাকিলা।

'ভয় নেই!' আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল রানা। 'ওটা আমাদের দলে।' ম্যাকডোনেল ডগলাস এক্সপ্লোরার, চিনতে পারল ও। জোড়া এঞ্জিন, টপস্পীড ঘণ্টায় একশো সত্তর মাইল। এই হেলিকপ্টার বহুবার চালিয়েছে ও।

'আমাদের? মানে, আপনাদের?'

'নুমার,' হাসছে রানা। 'আরও পরিষ্কার করে বললে, আমারই বাহন ওটা। সময়ের একটু আগে পৌঁছে গেছে, এই আর কি।'

নদীর ওপরই ধাওয়া করে আলট্রালাইটকে ধরে ফেলল হেলিকপ্টার। ধরে ফেলল মানে, প্লেনটার ডানার ওপর দিয়ে উড়ে গেল নুমার পাইলট। কপ্টারের ল্যান্ডিং স্কিড আলট্রালাইটের পাতলা ও ভঙ্গুর ডানা স্রেফ গুঁড়িয়ে দিল। পরমুহূর্তে ডিগবাজি খেতে শুরু করল প্লেনটা। পানিতে নয়, আছড়ে পড়ল বোল্ডার ছড়ানো তীরে, তবে বিস্ফোরিত হলো না। ধুলো, ধোঁয়া আর আবর্জনার ছোট একটা মেঘ তৈরি হলো ওদিকটায়। বাতাস পরিষ্কার হবার পর দেখা গেল প্লেনের কাঠামোটা দুমড়ে মুচড়ে একদম ছোট হয়ে গেছে, ভেতরে রক্তাক্ত দুটো লাশ।

ফিরে এসে রানঅ্যাবাউটের মাথার ওপর ঝুলে থাকল হেলিকপ্টার। পাইলট আর কোপাইলট, দু'জনেই জানালা দিয়ে মুখ বের করে ওদের উদ্দেশে হাত নাড়ছে।

উত্তরে শুধু হাত নয়, চুমো ছুঁড়ে দিল শাকিলা। 'পরিচয় নাই বা জানলাম, ওরা আমাদের প্রাণ বাঁচিয়েছে!'

'ববি মুরল্যান্ড আর জর্জ রেডক্লিফ,' বলল রানা।

'আপনার বন্ধু?'

'বহু বছর ধরে,' বলল রানা, হাসিটা দুশো পাওয়ারের বালবকেও বোধহয় ম্লান করে দেবে।

তেলের অভাবে এঞ্জিনের বিয়ারিং আর পিস্টন অচল হয়ে পড়ল, ডক থেকে দুশো গজ দূরে থেমে গেল রানঅ্যাবাউট। গ্রেপভাইন গ্রামটা সাগরের ধারেই, গ্রামের প্রধান সড়ক ডকে এসে মিশেছে। এক কিশোর তার আউটবোর্ড বোটের সাহায্যে ডকে টেনে এনেছে ওদেরকে। ডকে বেশ কয়েকজন ট্যুরিস্টকে দেখা গেল, গ্রামবাসীরাও ভিড় করেছে। ভিড়ের মধ্যে, ডকের কিনারায়, তিনজন আইএনএস এজেন্ট দাঁড়িয়ে আছে, অবৈধ অভিবাসীদের দায়িত্ব নেয়ার জন্যে।

রানার প্রশ্নের উত্তরে শাকিলা জানাল, 'আমার সঙ্গে ভদ্রলোকের পরিচয় নেই, তবে জানি তিনজনের মধ্যে একজন ডিস্ট্রিক্ট ডিরেক্টর অভ ইনভেস্টিগেশন।'

কোলে বসে থাকা বাচ্চা ছেলেটাকে দেখিয়ে রানা জানতে চাইল, 'এদেরকে নিয়ে এখন কি করা হবে?'

'ওরা অবৈধ অভিবাসী। আইন অনুসারে তাইওয়ানে ফেরত পাঠাতে হবে।'

'এত নির্যাতন সহ্য করার পর ফেরত পাঠানোটা অন্যায় হবে,' ভারী গলায় বলল রানা।

'মানলাম,' জবাব দিল শাকিলা। 'কিন্তু আমার হাত বাঁধা। আমি বড়জোর সুপারিশ করতে পারি ওদেরকে থাকতে দেয়া হোক। কিন্তু সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার আমার নেই।'

'শুধু সুপারিশ করে দায়িত্ব এড়াতে চান?' রেগে গেল রানা। 'তাইওয়ানে পা দেয়া মাত্র ওদেরকে হানের লোকজন খুন করবে। নিয়মটা আপনার জানা আছে– কারও প্রাণ বাঁচালে তার দায়িত্ব চিরকাল আপনাকেই নিতে হবে। আপনি

আলট্রালাইটগুলো গুলি করে ফেলে না দিলে ওরা একজনও বাঁচত না।'

'আপনি আমাকে ভুল বুঝছেন। দায়িত্ব এড়াবার কোন ইচ্ছে আমার নেই। কথা দিচ্ছি, আমার সাধ্যমত আমি করব।'

'যদি কোন সমস্যা হয়, প্লীজ নুমার মাধ্যমে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন,' বলল রানা। 'আমিও আমার সাধ্যমত চেষ্টা করব ওরা যাতে আমেরিকায় থেকে যেতে পারে।'

ডকে নেমে বাচ্চা ছেলেটাকে একজন আইএনএস এজেন্টের হাতে তুলে দিল রানা। নির্ঘাত মৃত্যুকে ফাঁকি দিয়ে এসেছে, বৃদ্ধা ও তরুণীরা অপার আনন্দে কলকলিয়ে হাসছে, ভাগ্যে এরপর কি আছে সে বিষয়ে এই মুহূর্তে চিন্তিত নয়।

দীর্ঘদেহী এক প্রৌঢ়, চোখে কৌতুকের ঝিলিক, এগিয়ে এসে শাকিলার কাঁধে একটা হাত রাখলেন, মুখের ক্ষতগুলো খুঁটিয়ে দেখে বললেন, 'মিস শাকিলা সুলতান, আমি হিলার–টমাস হিলার, অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিস্ট্রিক্ট ডিরেক্টর।'

'জ্বী,' বলল শাকিলা। 'কেবিন থেকে ফোনে আপনার সঙ্গেই আমার কথা হয়।'

'আপনাকে জীবিত দেখে আমি যে কতখানি আনন্দিত, এবং তথ্যগুলো পেয়ে কি পরিমাণ কৃতজ্ঞ…'

'আমার মত আনন্দিত নিশ্চয়ই আপনি নন,' বলে হাসতে গেল শাকিলা, ব্যথা পেয়ে 'উফ' করে উঠল।

'মাইকেল পার্কার, ডিস্ট্রিক্ট ডিরেক্টর স্বয়ং আপনাকে অভ্যর্থনা জানাতে আসতেন, কিন্তু তিনি ওরিয়ন লেকে ক্লিনআপ অপারেশনে ব্যস্ত থাকায়…'

'এরই মধ্যে শুরু হয়ে গেছে?'

'আট মিনিট হলো আমাদের হেলিকপ্টার লেকের তীরে নেমেছে,' হাতঘড়ির ওপর চোখ রেখে বললেন টমাস হিলার।

'বিল্ডিঙের ভেতর বন্দীদের কি অবস্থা?' দ্রুত জানতে চাইল শাকিলা।

'সবাই বেঁচে আছে, তবে প্রত্যেকেরই চিকিৎসা দরকার।'

'সিকিউরিটি গার্ডদের খবর?'

'সবাইকে ধরা হয়েছে। কেউ প্রতিরোধ করেনি। শেষ যে খবর পেয়েছি, শুধু ওদের হেডম্যানকে এখনও খোঁজা হচ্ছে।'

ঘাড় ফেরাল শাকিলা। রানঅ্যাবাউট থেকে সবার শেষে অসুস্থ বৃদ্ধাকে নামাতে ব্যস্ত রানা। 'মি. হিলার, আসুন, নুমার স্পেশাল প্রজেক্ট ডিরেক্টর মাসুদ রানার সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিই–সব কৃতিত্ব ওঁর, এমনকি আইএনএস যে এই মুহূর্তে হানা দিচ্ছে ওরিয়ন লেকে, তা-ও সম্ভব হয়েছে এই ভদ্রলোকের জন্যে।'

রানার সঙ্গে করমর্দন করলেন টমাস হিলার। 'মিস শাকিলা বিস্তারিতভাবে সব কিছু এখনও জানাননি, তবে ধারণা করতে পারছি যে বিরাট একটা সাফল্য অর্জন করেছেন আপনি।'

'ঠিক সময় ঠিক জায়গায় হাজির ছিলাম, প্রায় কাকতালীয় একটা ব্যাপার,' স্মিত হেসে বলল রানা।

'ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় উপযুক্ত মানুষটিকেই থাকতে হয়। আমি বলতে

চাইছি, আপনি বিনয় করছেন, এর মধ্যে কাকতালীয় কিছু নেই।' সকৃতজ্ঞ হাসি দেখা গেল হিলারের ঠোঁটে। 'কিছু যদি মনে না করেন, আপনার গত দু'দিনের তৎপরতা সম্পর্কে একটা বিস্তারিত রিপোর্ট পেলে আইএনএস-এর আমরা ভারি খুশি হই।'

মাথা ঝাঁকাল রানা, তারপর অবৈধ অভিবাসীদের দিকে একটা হাত তুলল। ডকের শেষ মাথায় একটা মাইক্রোবাস দাঁড়িয়ে আছে, সবাইকে তোলা হচ্ছে তাতে। 'ওদের ওপর সাংঘাতিক ধকল গেছে। আপনি একটু দেখবেন ওদের যেন অযত্ন না হয়। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি, ওদেরকে আমেরিকা থেকে বের করে দিলে একজনও বাঁচবে না, হানের গুণ্ডারা মেরে ফেলবে।'

'চিন্তা করবেন না, মি. রানা। সব দিক বিবেচনা করেই সিদ্ধান্ত নেব আমরা।'

'ধন্যবাদ, মি. হিলার।'

শাকিলাকে হিলার বললেন, 'দুঃখিত, মিস শাকিলা। আমার বস্ আপনাকে রিট্রিটে পেলে খুশি হবেন, ওখানে একজন দোভাষী দরকার আমাদের।'

'আরও কিছুক্ষণ থাকতে পারলে খুশি হতাম,' মন খারাপ করে বলল শাকিলা। রানার দিকে ফিরল ও, ঠোঁটে ম্লান হাসি। 'এবার তাহলে বিদায় নিতে হয়, রানা।'

'বোট জার্নিটা রোমান্টিক হয়নি, সেজন্যে সত্যি আমি দুঃখিত এবং লজ্জিত,' সহাস্যে বলল রানা।

'রোমান্টিক না হলেও, উত্তেজনাকর ছিল,' ব্যথা পাবে জেনেও গ্রাহ্য করল না শাকিলা, নিঃশব্দে হাসল। হাসতে হাসতেই রানার পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বুলিয়ে নেয়ার লোভটা সামলাতে পারল না।

'কথা দিচ্ছি, পরেরবার যখন দেখা হবে, প্রাপ্য থেকে আপনাকে বঞ্চিত করা হবে না।'

'প্রাপ্য? আমার আবার কি প্রাপ্য হলো?' শাকিলা অবাক।

'অনেক কিছুই–মনোযোগ, প্রশংসা, ডিনারে দাওয়াত।'

চেহারাটা লালচে হয়ে উঠছে, বুঝতে পেরে শাকিলা তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি ওয়াশিংটনে ফিরে যাচ্ছেন, নুমা হেডকোয়ার্টারে?'

'এখনও ঠিক বলতে পারছি না। শুধু নুমায় নয়, আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে কিছু কিছু দায়িত্ব পালন করতে হয় আমাকে। কিন্তু আপনি? আপনার সার্ভিস আপনাকে কোথায় পাঠাবে?'

'আমি সান ফ্রান্সিসকোয় অফিস করি, এখন বোধহয় ওখানেই যেতে হবে। আসি, রানা। হঁয়ে, ভাল কথা, আপনাকে ফোনে পাওয়া যাবে তো?'

'হ্যাঁ, নুমা হেডকোয়ার্টারে। ওখানে আমি যদি না-ও থাকি, ওরা বলতে পারবে কোথায় আমাকে পাওয়া যাবে।'

'ধন্যবাদ,' বলে হিলারের সঙ্গে একটা প্রাইভেট কারে উঠে পড়ল শাকিলা।

বোটের পাশে একা দাঁড়িয়ে আছে রানা। রাস্তার বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল গাড়িটা। মিনিট দুয়েক পর ওই একই বাঁক ঘুরে জর্জ রেডক্লিফ আর ববি মুরল্যান্ডকে ছুটে আসতে দেখা গেল, দু'জনেই পাগলের মত চেঁচামেচি করছে।

রানঅ্যাবাউট নিরাপদে গ্রেপভাইন ডকে না ভেড়া পর্যন্ত আকাশে ছিল ওরা। শহরের উত্তর প্রান্তের একটা মাঠে নামতে গিয়ে দেখে ওখানে আগে থেকেই বসে আছে আইএনএস-এর একটা হেলিকপ্টার। ডকের কাছাকাছি একটা পার্কিং লটে হেলিকপ্টার নামায় মুরল্যান্ড, সেখান থেকে ছুটতে ছুটতে চলে এসেছে ডকে।

লম্বায় মাত্র পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি মুরল্যান্ড, যতটুকু লম্বা প্রায় ততটুকুই চওড়া সে–আলিঙ্গন করার সময় শূন্যে তুলে ফেলল রানাকে। 'তোমার ব্যাপারটা কি বলো তো?' জানতে চাইল সে, রানাকে জীবিত দেখে উল্লাস ধরে রাখতে পারছে না। 'চোখের আড়াল করার উপায় নেই, সঙ্গে সঙ্গে বিপদে পড়ে যাও!'

'সম্ভবত ন্যাচারাল ইন্সটিঙ্কট,' পীড়ন বা পেষণ যাই বলা হোক, নীরবে সহ্য করে যাচ্ছে।

রেডক্লিফ, নুমার অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর (অপারেশন্স), রানার কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'আবার দেখা হওয়ায় আমি খুশি, মি. রানা।'

মুরল্যান্ডের আলিঙ্গন থেকে মুক্তি পেয়ে হাঁপ ছাড়ল রানা। 'আপনারা সবাই আছেন কেমন, মি. রেডক্লিফ?'

'ভাল। ধন্যবাদ, মি. রানা।'

'আলট্রালাইটে ওরা কারা ছিল?' জানতে চাইল মুরল্যান্ড।

'স্মাগলার, আদমবেপারি,' বলল রানা। 'তোমরা যদি পৌঁছাতে আর দু'মিনিট দেরি করতে, বোটের কেউ আমরা বাঁচতাম না। কিন্তু হঠাৎ কোত্থেকে হাজির হলে বলো তো? আমি তো শুনেছিলাম তুমি আছ হাওয়াইয়ে, আর মি. রেডক্লিফ আছেন ওয়াশিংটনে।'

'বলতে হয় আপনার ভাগ্য,' বললেন রেডক্লিফ। 'আমাদের প্রেসিডেন্ট অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনকে জরুরী একটা অ্যাসাইনমেন্ট গছিয়ে দিয়েছেন। অ্যাসাইনমেন্ট পেয়েই আমাকে আর ববিকে সিয়াটলে মিলিত হবার নির্দেশ দেন তিনি। কাল রাতে পৌঁছেছি আমরা, অ্যাডমিরালের নির্দেশে নুমার সায়েন্স-সেন্টার থেকে একটা হেলিকপ্টার ধার করি আপনাকে ওরিয়ন লেক থেকে তুলে নেয়ার জন্যে। আজ সকালে অ্যাডমিরালকে ফোন করেন আপনি। যে-ই শুনলাম নদী ধরে জান বাঁচাবার জন্যে ছুটছেন, ববিকে নিয়ে আমরাও আকাশে উঠে পড়লাম। পৌঁছুতে মাত্র পঁয়তাল্লিশ মিনিট লেগেছে আমাদের...'

'প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে পাওয়া অ্যাসাইনমেন্টটা আমার ঘাড়ে চাপাবার জন্যে অ্যাডমিরাল আপনাদেরকে এক হাজার মাইল দৌড় খাটালেন?'

রেডক্লিফ হাসলেন। 'অ্যাডমিরাল বললেন, আপনাকে দেখলে তাঁর মায়া লাগবে, নতুন কোন দায়িত্ব নিতে বলতে পারবেন না।'

'ছুটি কাটাতে এসে কি ঝামেলায় পড়েছিলাম, সে তো দেখলেনই?' বলল রানা। 'তাছাড়া, এখনও আমি পুরোপুরি সুস্থ নই। দুঃখিত, অ্যাডমিরালকে গিয়ে বলুন নতুন কোন অ্যাসাইনমেন্ট নেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

'জানতে চাইবেন না, অ্যাসাইনমেন্টটা কি?' নরম সুরে প্রশ্ন করলেন রেডক্লিফ।

মাথা নাড়ল রানা। 'আমার সত্যি কোন আগ্রহ নেই।'

'কিন্তু তোমার গুরু জেনারেল রাহাত খানের আছে,' বলল মুরল্যান্ড, ইচ্ছে করে চেহারাটা নির্লিপ্ত করে রেখেছে।

তাকিয়ে থাকল রানা। 'কি বলতে চাও?'

রেডক্লিফ তাড়াতাড়ি বললেন, 'অ্যাসাইনমেন্ট হলো মরগান সিটি, লুইযিয়ানার রহস্যময় একটা শিপিং পোর্টে আন্ডারওয়াটার ইনভেস্টিগেশন চালাতে হবে।'

'শিপিং পোর্টে আবার রহস্য কি?'

'ওটার তিন দিকে শুধু জলাভূমি, এটা একটা রহস্য। আরেকটা রহস্য, ওই শিপিং ফ্যাসিলিটির মালিক অবৈধভাবে মানুষ পাচারে জড়িত আন্তর্জাতিক একটা ক্রাইম সিন্ডিকেটের হেড।'

'ওহ্ গড! এ নিশ্চয়ই সত্যি নয়!' অসহায় দেখাল রানাকে।

'কেন, তোমার কোন সমস্যা আছে?' জানতে চাইল মুরল্যান্ড।

'বুঝতে পারছ না? কাল রাত থেকে এটাই তো আমার একমাত্র সমস্যা ছিল।'

'ভালই হলো। আসল কাজ শুরু করার আগে খানিকটা বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করেছ।'

কঠিন দৃষ্টিতে তাকাল রানা। 'তোমাদের সরকার নিশ্চয়ই সন্দেহ করছে, ওই পোর্ট ফ্যাসিলিটি বেআইনীভাবে মানুষ পাচারের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে?'

'পোর্টটা এত বড় যে শুধু মানুষ পাচারের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে, এ আমি বিশ্বাস করি না,' বলল মুরল্যান্ড। 'আমার ধারণা, আরও অনেক কিছু হচ্ছে ওখানে। এই একটাই নয়, এরকম পোর্ট ফ্যাসিলিটি আরও বেশ কয়েকটা আছে লোকটার, গোটা মার্কিন উপকূল জুড়ে।'

'ব্যক্তি-মালিকানায় শিপিং পোর্ট? অদ্ভুত না? তা-ও আবার অনেকগুলো? কে সে, কার এত টাকা আছে?'

'লোকটা তাইওয়ানিজ। কোম্পানীর নাম হুয়ান হান ম্যারিটাইম লিমিটেড। হংকঙেও অফিস আছে।'

রানার চোখে পলক পড়ছে না। 'হুয়ান হান?' বিড়বিড় করল শুধু।

'হ্যাঁ, একজন আধুনিক সম্রাটের নাম। লোকটা শুধু শিপিং লাইনে সাম্রাজ্য স্থাপন করেনি। নারী-ব্যবসা, ড্রাগ, সন্ত্রাস, মানুষ পাচার–অর্থাৎ অপরাধ জগতের প্রতিটি শাখায় একক আধিপত্য বিস্তার করেছে সে। মাফিয়া ডনরা তার কাছে দুগ্ধপোষ্য শিশু। শ্রেষ্ঠ ধনীদের তালিকায় তার নাম চার নম্বরে। আপনার প্রতিক্রিয়া দেখে মনে হচ্ছে আপনি তাকে চেনেন।'

'কখনও দেখা হয়নি, তবে জানি সে আমাকে ঘৃণা করে,' বলল রানা।

'তুমি ঠাট্টা করছ,' বলল মুরল্যান্ড।

'কেন, আপনাকে কেন সে ঘৃণা করবে?' রেডক্লিফ বিস্মিত।

'কারণ,' নিঃশব্দে হাসল রানা, 'আমি তার ইয়টটা পুড়িয়ে দিয়েছি।'

হাততালি দিল মুরল্যান্ড। 'আমি বাজি ধরে বলতে পারি, এই অ্যাসাইনমেন্ট নেবে রানা। ব্যক্তিগত শত্রুকে ধ্বংস করার এই সুযোগ ও ছাড়বে না।'

'আমার বস্ আগ্রহী, এ-ধরনের কি যেন তখন বলছিলে তুমি?'

'বিস্তারিত জানি না,' বলল মুরল্যান্ড, 'তবে কানে এল, তোমার গুরুর সঙ্গে অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন একটা মৌখিক চুক্তিতে এসেছেন—আমেরিকায় যে-সব বাংলাদেশী বেআইনীভাবে বসবাস করছে, তাদের ব্যাপারে। এ-ব্যাপারে নিশ্চয়ই ঢাকা থেকে খবর পাবে তুমি।'

'আপনি কি আমাদের সঙ্গে কপ্টারে উঠছেন, মি. রানা?' সুর নরম করে জানতে চাইলেন রেডক্লিফ।

'তার আগে আমার কিছু কাজ আছে,' বলল রানা। 'প্রথম কাজ, বন্ধু ডানকান মনরোর বোটটাকে কাছাকাছি বোট ইয়ার্ডে পাঠানো, মেরামতের জন্যে। দ্বিতীয় কাজ, একজন ডাক্তারকে খুঁজে বের করা, যে কোন প্রশ্ন না তুলে নিতম্ব সেলাই করে দেবে। আরেকটা কাজ, ক্ষুধা নিবারণ। ব্রেকফাস্ট না সেরে কোথাও আমি যাব না।'

'তুমি আহত?' মুরল্যান্ড উদ্বিগ্ন।

'প্রাণ-সংহারী কোন ব্যাপার নয়, সামান্য একটা ফুটো; তবে চাই না গ্র্যাংগ্রিন হোক।'

মুরল্যান্ড গম্ভীর সুরে বলল, 'মি. রেডক্লিফ, আপনি একজন ডাক্তারের ব্যবস্থা করুন। আমি বোটটাকে কোথায় পাঠানো যায় দেখছি। তারপর আমরা কাছাকাছি কোন রেস্তোরাঁয় গিয়ে বসব। ঠিক আছে তো, রানা?'

'না,' বলল রানা। 'সব ঠিক থাকলেও আমি ঠিক নেই। আমি অসুস্থ এবং ক্লান্ত। সেবা ও বিশ্রাম দরকার, তাই কংগ্রেস সদস্যা মিস লরেলির বাড়িতে যাচ্ছি। পনেরো দিন পর যোগাযোগ কোরো, তখনও যদি আমাকে তোমাদের প্রয়োজন হয়।'

কথা ছিল রানঅ্যাবাউট ধ্বংস হওয়া মাত্র রিপোর্ট করবে চাও চুয়া। রিপোর্ট তো সে পাঠাচ্ছেই না, দীর্ঘক্ষণ চেষ্টা করেও তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে ব্যর্থ হলো ল্যাঙ ওয়ান। যা বোঝার বুঝে নিল সে—তার বিশ্বস্ত সহকারী পাঁচজন সঙ্গীকে নিয়ে মারা গেছে। সেই সঙ্গে এ-ও উপলব্ধি করল এত শোক আর ক্ষতির জন্যে দায়ী সেই অজ্ঞাত-পরিচয় শত্রু পালিয়েছে।

মোবাইল সিকিউরিটি ভেহিকেলে একা বসে আছে ল্যাঙ ওয়ান। কেন কি ঘটল বোঝার চেষ্টা করছে সে, কালো চোখে শূন্য দৃষ্টি, মুখের পেশী টান-টান আর ঠাণ্ডা। চাও চুয়া রিপোর্ট করেছিল রানঅ্যাবাউটে অবৈধ অভিবাসীদের দেখা গেছে। কিন্তু তা কিভাবে সম্ভব? হঠাৎ একটা চিন্তা প্রায় বিস্ফোরিত হলো মাথার ভেতর। চিয়ান ফেঙ। ওই গাধাটা নিশ্চয়ই কোনভাবে ক্যাটাম্যারান থেকে অভিবাসীদের পালাতে দিয়েছে, যাদেরকে পানিতে ডুবিয়ে মেরে ফেলার কথা ছিল। এ না হয়েই যায় না, কারণ অন্য কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে না। যে লোকটা অভিবাসীদের ছোট্ট দলটাকে উদ্ধার করে নিয়ে গেছে সে নিশ্চয়ই আমেরিকান কোন ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির এজেন্টই হবে।

অন্যমনস্কভাবে ভিডিও মনিটরগুলোর দিকে তাকাল ওয়ান। সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠল সে। রিট্রিট বিল্ডিঙের সামনে বিশাল আকৃতি এক জোড়া হেলিকপ্টার

নামছে। হাইওয়ের সঙ্গে মিশেছে যে রাস্তাটা, ওটার মাঝামাঝি জায়গায় ব্যারিকেড খাড়া করা হয়েছিল, দেখা গেল কয়েকটা আর্মারড কার সেই ব্যারিকেড গুঁড়িয়ে দিয়ে বিল্ডিঙের দিকে ছুটে আসছে। ভেহিকেল ও হেলিকপ্টার থেকে পিলপিল করে সশস্ত্র লোকজন নেমে আসছে, আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে ঘিরে ফেলছে বিল্ডিংটা। থামাথামি নেই, আত্মসমর্পণ করার ঘোষণা নেই, গোটা বিল্ডিঙ দখল করে নিল তারা। ওয়ানের গার্ডরা কি ঘটছে বুঝে ওঠার আগেই জেলখানা বেদখল হয়ে গেল। আইএনএস-এর এজেন্টরা যেন জানে বাইরে থেকে আক্রমণ শুরু হলে বন্দীদেরকে মেরে ফেলা হবে। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, বিল্ডিঙের ভেতর কোথায় কি আছে তা তারা প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ থেকে আগেই জেনে এসেছে।

ল-এনফোর্সমেন্ট এজেন্সির বড়সড় একটা দলের বিরুদ্ধে বিনা প্রস্তুতিতে লড়তে যাওয়া বৃথা, এটা বুঝতে পেরে ওয়ানের সিকিউরিটি ফোর্স অস্ত্র ফেলে দিয়ে আত্মসমর্পণ করল। পরাজয় প্রত্যক্ষ করে অবশ হয়ে গেল ওয়ান, চেয়ারে হেলান দিয়ে স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন সিস্টেমের কয়েকটা বোতামে চাপ দিল, তারপর তাইওয়ান থেকে জবাবের অপেক্ষায় থাকল।

তিন সেকেন্ড পর চীনা ভাষায় বলা হলো, 'সানফ্লাওয়ার থ্রীর সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে তোমার।'

'আমি এখানে ড্যাফোডিল সিক্স,' বলল ওয়ান। 'অপারেশন ওরিয়ন থেমে গেছে।'

'আবার বলো।'

'আমেরিকান এজেন্টরা অপারেশন ওরিয়ন বন্ধ করে দিচ্ছে।'

'এ-ধরনের দুঃসংবাদ শোনার জন্যে আমরা প্রস্তুত নই,' অপরপ্রান্ত থেকে বলা হলো।

'সত্যি দুঃখিত। অন্যান্য পোর্ট ফ্যাসিলিটিতে, বিশেষ করে লুইযিয়ানায় অপারেশন শুরু না হওয়া পর্যন্ত ব্যবসা আপাতত বন্ধ রাখার সুপারিশ করছি আমি।'

'তোমার সুপারিশ বসের কাছে পৌঁছে দেয়া হবে। বন্দীদের ব্যবস্থা করা হয়েছে, তারা যাতে কথা বলতে না পারে?'

'না। অকস্মাৎ আক্রান্ত হয়েছি আমরা। কিছুই করার ছিল না।'

'আমাদের চেয়ারম্যান তোমার এই ব্যর্থতা খুব খারাপভাবে নেবেন।'

'মিসম্যানেজমেন্টের সমস্ত দায়-দায়িত্ব আমি আমার নিজের কাঁধে নিচ্ছি।'

'তুমি কি পালাতে পারবে?'

'না, অনেক দেরি হয়ে গেছে,' শান্ত সুরে জানাল ওয়ান।

'তোমার গ্রেফতার হওয়া চলবে না, ড্যাফোডিল সিক্স। তোমারও নয়, তোমার সহকারীদেরও নয়। আমেরিকানরা যেন কোন সূত্র না পায়।'

'আমাদের সংশ্রব সম্পর্কে যারা সচেতন ছিল তারা মারা গেছে। সিকিউরিটি গার্ডরা ছিল মার্সেনারি, কাজেই ভেতরের কোন খবর বা তথ্য জানে না। বেতন পেয়েছে আমার কাছ থেকে, টাকাটা কোত্থেকে এসেছে বলা হয়নি।'

'তাহলে তুমিই একমাত্র লিঙ্ক,' অপরপ্রান্তে লোকটার গলা বরফের মত ঠাণ্ডা।

'আমি দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছি, কাজেই মূল্য দিতেও প্রস্তুত আছি।'

'তুমি গ্রেফতার হলে ওরা তোমাকে টরচার করে সমস্ত তথ্য বের করে নেবে। সেজন্যেই, যদি গ্রেফতার হও, এখানে তোমার দুই ছেলে আর এক মেয়ে, স্ত্রী, বুড়ো মা—কেউ বাঁচবে না।'

'আমি জানি।'

'তাহলে এটাই আমাদের শেষ কমিউনিকেশন।'

'হ্যাঁ। আমার আর শুধু একটা কাজ বাকি থাকল।'

'সেটায় ব্যর্থ হয়ো না।'

'বিদায়, সানফ্লাওয়ার থ্রী।'

'বিদায়।'

মনিটরের দিকে তাকিয়ে ওয়ান দেখল একদল সশস্ত্র লোক তার মোবাইল সিকিউরিটি ভেহিকেলের দিকে ছুটে আসছে। তালা দেয়া দরজা ভাঙার চেষ্টা করছে তারা, এই সময় ডেস্কের দেরাজ থেকে একটা রূপোলি রিভলবার বের করে মুখে পুরল ব্যারেলটা। দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকল লোকগুলো। গুলির আওয়াজ হলো, ঝাঁকি খেয়ে চেয়ারে নেতিয়ে পড়ল ল্যাঙ ওয়ান। হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল লোকগুলো।

কেউ যদি হাজার হাজার নিরীহ মানুষকে খুন করে তার চেহারায় কি পাপ, অপরাধ বা নৃশংসতার ছাপ ফোটে? পাইকারীভাবে মানুষ খুন করেছে এমন লোক সর্বকালেই ছিল, আজও আছে, প্রায় নিশ্চিতভাবে ধরে নেয়া চলে ভবিষ্যতেও থাকবে; কিন্তু চেহারা দেখে কি বোঝা যাবে যে তারা মাস-মার্ডারার? হিটলারের আচরণে অস্থিরতা ছিল, ছিল পাগলামি, কিন্তু পাপ বা অপরাধবোধের কোন চিহ্ন ছিল না। পলপটকে তো রীতিমত নিরীহদর্শন ভদ্রলোক বলে মনে হত, বলে দিলেও বিশ্বাস করা কঠিন যে লোকটা বিশ লাখ মানুষকে খুন করেছে। কথাটা হুয়ান হান সম্পর্কেও পুরোপুরি সত্যি। তাকে দেখে মনে হবে না যে সে মাস-মার্ডারার। তার ফণা নেই, সরু চোখে আগুন নেই, জিভও মাঝখানে চেরা নয়। দেখে মনেই হবে না যে কোন রকম শয়তানি আছে তার মনে। তাইওয়ানের রাজধানীতে, কাঁচ-মোড়া পঞ্চাশতলা টাওয়ার-বিল্ডিঙের চারতলা বিশিষ্ট পেন্টহাউসে, একটা ডেস্কে বসে আছে সে, আধবোজা চোখের দৃষ্টি জানালা দিয়ে সাগরে গিয়ে পড়েছে, ঠোঁটে সরল হাসি। বিল্ডিংটা হুয়ান হান ম্যারিটাইম লিমিটেডের। বৈধ শিপিং ব্যবসার নামে এখান থেকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যত রকম বেআইনী ব্যবসা আছে সবই পরিচালনা করা হয়, যদিও তা প্রমাণ করার জন্যে কোন কাগজ-পত্র বা দলিল-দস্তাবেজ পাওয়া যাবে না। তাইওয়ানিজ অন্যান্য ব্যবসায়ীরা দেখতে যেমন হয়, হুয়ান হানও সেরকম দেখতে; ইতিহাসের আর সব মাস-মার্ডারারের মতই সে যখন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যায় কেউ তাকে বিশেষভাবে খেয়াল করে না বা কিছু সন্দেহ করে না।

তবে চীনাদের তুলনায় একটু বেশি লম্বা হুয়ান হান, পাঁচ ফুট এগারো ইঞ্চি। সুস্বাদু চাইনীজ খাবার প্রচুর পরিমাণে খেলে শরীরে তো তার প্রভাব পড়বেই-

কোমরটা বেশ ভারী, দুশো দশ পাউন্ড ওজন। মাথার কালো চুল খুব ঘন, ছোট করে ছাঁটা, সিঁথিটা মাঝখানে। মাথা আর মুখ দেখতে লাগে প্রায় বিড়াল বা চিতার মত, ওগুলোর সঙ্গে মিল রেখে হাত দুটোও খুব লম্বা আর সরু। ঠোঁটে সারাক্ষণ স্থির হয়ে আছে ক্ষীণ হাসি। বাইরে থেকে দেখে জুতোর দোকানের সেলসম্যানের মতই নিরীহ আর ভীরু মনে হবে হুয়ান হানকে।

তবে একবার দেখলে তার চোখ দুটো কেউ ভুলতে পারবে না। নির্ভেজাল পান্নার মত সবুজ ওগুলো, তবে সবুজের ভেতর দিকে কালো গভীরতা আছে, নরম স্বভাবের কোন মানুষের চোখে যা সাধারণত দেখা যায় না। চোখ নয়, যেন সবুজ আগুন, সেই অগ্নিদৃষ্টি এতই প্রখর যে তার পরিচিত লোকজন কসম খেয়ে বলতে রাজি আছে হান যে-কারও খুলি ভেদ করে স্টক মার্কেটের সর্বশেষ দর পড়ে নিতে পারে। চোখের পিছনে ভেতরের মানুষ সম্পূর্ণ আলাদা এক কাহিনী। হুয়ান হান একটা স্যাডিস্টিক পশু, একটা হায়েনা। তার একটা অদ্ভুত দর্শন হলো ঈশ্বর নরমের যম, শক্তের ভক্ত। তার ধারণা, যারা আনাড়ী, অদক্ষ, বোকা, নিজেকে বঞ্চিত হতে দেয় তারাই নরকে যাবে; আর স্বর্গে যাবে চতুর, শোষক, স্বার্থপর, নির্দয় ও ঠকতে রাজি নয় এমন সব সফল ব্যক্তিরা। এতিম শিশু হুয়ান হানের জীবন সংগ্রাম শুরু হয় তাইপে শহরের রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা করার মধ্যে দিয়ে, সেই তখন থেকেই মানুষকে ঠকিয়ে লাভবান হবার বিস্ময়কর সব কৌশল আয়ত্ত করে সে। দশ বছর বয়েসেই একটা সাম্পান কেনার টাকা জমিয়ে ফেলে হান, সেই সাম্পান শুধু মানুষ পারাপার করত না, যার যে-কোন মাল নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে দেয়ার কাজও করত–বিশেষ করে আফিম।

দু'বছর পর হানের দশটা সাম্পান হলো। তখনও আঠারোয় পড়েনি, সাম্পানের ছোট বহরটা বিক্রি করে দিয়ে মান্ধাতা আমলের একটা ইন্টার-কোস্টাল ট্র্যাম্প স্টীমার কিনল সে। ক্লান্ত ও মরচে ধরা পুরানো এই বালতিটাই হলো হুয়ান হানের অতিকায় শিপিং সাম্রাজ্যের ভিত্তি। পরবর্তী দশকে তার ফ্রেইট সার্ভিস অসামান্য সাফল্য অর্জন করল, কারণ ওই একই ব্যবসাতে হানের যারা প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল একে একে প্রায় সবাই তারা ডক এলাকায় অজ্ঞাত আততায়ীর হাতে খুন হয়ে যায়, এবং তাদের অনেকের জাহাজ কোন চিহ্ন না রেখে নিখোঁজ হয়ে যায় সাগরে, সমস্ত ক্রু সহ। ব্যবসায় লাভ হচ্ছে না দেখে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা তাদের অবশিষ্ট জলযান বিক্রি করে দিতে চাইলে ক্রেতা হিসেবে সব সময় হাজির হলো ইয়োকোহামা শিপ সেলস অ্যান্ড স্ক্র্যাপ করপোরেশন নামে একটা কোম্পানী। জাপানী কোম্পানী, কিন্তু জাপানে ওটার কোন ব্যবসায়িক তৎপরতা তখন ছিল না। বাস্তবে ওটা ছিল হুয়ান হান ম্যারিটাইম লিমিটেডেরই একটা অঙ্গ প্রতিষ্ঠান। পরে অবশ্য জাপান, কোরিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, মালয়েশিয়া থেকে শুরু করে এশিয়ার সমস্ত ব্যস্ত পোর্টে নিজেদের ব্যবসা সম্প্রসারণ করে ইয়োকোহামা এসএসএসসি। আর ও দিকে হুয়ান হান ম্যারিটাইম লিমিটেড তাইপে থেকে সমুদ্রগামী জাহাজের বিশাল বহরকে ইউরোপ আর আমেরিকায় পাঠিয়ে দেয় কার্গো আর প্যাসেঞ্জার পরিবহনের কাজে।

চীন ব্রিটিশদের কাছ থেকে হংকং ফিরে পাবার পাঁচ বছর আগে নতুন

ব্যবসায় নাম লেখায় হান। হংকং চীনের হাতে ফিরে যাচ্ছে, কাজেই হংকঙের ব্যবসায়ীরা ভবিষ্যতের কথা ভেবে খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। ঠিক এই সময় হংকঙে দ্বিতীয় হেডকোয়ার্টার তৈরি করে হান। চল্লিশতলা একটা অফিস বিল্ডিং কিনে ইউরোপের বড়বড় পুঁজি বিনিয়োগ সংস্থা আর ওয়েস্টার্ন এক্সপোর্ট-ইমপোর্টারদের সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক গড়ে তোলে সে। সমুদ্রগামী জাহাজ ব্যবসাতে সারা বিশ্বে তার জুড়ি নেই, কাজেই প্রতিটি মহাদেশের অসংখ্য বড় বড় ব্যবসায়ী ও সরকার হানের সঙ্গে ব্যবসায়িক সুযোগ-সুবিধে বিনিময়ে সাগ্রহে রাজি হলো। একই সঙ্গে অবৈধভাবে মানুষ পাচারের ব্যবসাতেও নাম লেখাল হান। হংকঙের ব্যবসায়ীরা সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছিল, তাদের মধ্যে একটা আতঙ্ক ছড়িয়ে দিল হান–হংকং চীনের হাতে ফিরে গেলে এখানে আর স্বাধীন ব্যবসা বলে কিছু থাকবে না। একই সঙ্গে প্রচার করল, হুয়ান হান ম্যারিটাইম লিমিটেড হংকঙের ব্যবসায়িক সম্প্রদায়কে ইউরোপ-আমেরিকায় পৌঁছে দেয়ার কাজে সম্ভাব্য সব রকম সহযোগিতা করবে, এমন কি তারা যৌথ শিল্প প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী হলে ইউরোপিয়ান ও আমেরিকান উদ্যোক্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটিয়ে দিতেও রাজি। ফল হলো আশাতীত। হাজার হাজার ব্যবসায়ী ইউরোপ-আমেরিকায় যাবার জন্যে আক্ষরিক অর্থেই প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল চল্লিশতলা বিল্ডিংটার ওপর।

তারপর যেন চোখ খুলে গেল হানের। একটা হিসাব তাকে রীতিমত স্তম্ভিত করে দিল। হংকং থেকে কত লোক পশ্চিমা দুনিয়ায় যেতে চায়? কয়েকশো? কয়েক হাজার? নাকি কয়েক লাখ? কমপিউটরের মাধ্যমে যত বেশি তথ্য আসছে ততই যেন চোখ খুলে যাচ্ছে হানের। তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আমেরিকায় লোক পাঠাচ্ছে, এ-খবর ছড়িয়ে পড়ার পর চীন থেকে পালিয়ে হাজার হাজার লোক হংকঙে চলে আসছে, তারাও আমেরিকায় যেতে চায়। এশিয়ার এমন কোন দেশ নেই যেখান থেকে আদম ব্যবসার দালালরা তার সঙ্গে যোগাযোগ করল না, লোক যোগাড় করে দেয়ার বিনিময়ে কমিশন চায় তারা। বলতে গেলে প্রায় রাতারাতি নতুন একটা জগৎ খুলে গেল হানের চোখের সামনে। 'সব পেয়েছির দেশ' আমেরিকায় যাবার জন্য মানুষ পাগল। জমি-জমা, সোনা-দানা, ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান, সব কিছু বেচে দিয়ে হলেও যাওয়া চাই। এদের সংখ্যা গুনে শেষ করা যাবে না। হানের মাথায় নানা ধরনের ব্যবসায়িক কুবুদ্ধি গজাতে শুরু করল। তার সমুদ্রগামী জাহাজের বিশাল এক বহর আছে, কাজেই মানুষ পাচার করা কোন সমস্যা নয়। তবে ব্যবসাটাকে নিরাপদ করতে হলে আমেরিকায় নিজস্ব পোর্ট ফ্যাসিলিটি থাকা দরকার তার। আমেরিকা প্রকাণ্ড একটা দেশ, তুলনায় লোক সংখ্যা খুব বেশি নয়, কাজেই আগামী পঞ্চাশ বা একশো বছরে সেখানে দু'চার কোটি লোক ঢুকুক না। পারলে তাইওয়ানের সব লোককে আমেরিকায় পাঠিয়ে দেবে হান। মূল চীন থেকে যারা যেতে চায় তাদেরকেও সুযোগ দেবে। কোন কালে আমেরিকায় যদি চীনারা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে ওঠে, সেটাই বা মন্দ কি! মাফিয়া ডনরা ওখানে একচেটিয়াভাবে ড্রাগ আর নারী-ব্যবসা করছে, নিজস্ব একটা সশস্ত্রবাহিনী গড়ে তুলে এই দুটো ব্যবসাও সে করতে পারে।

হানের এসব চিন্তা অলস মস্তিষ্কের বিলাসিতা নয়। সে শুধু ভাবছে আর

কল্পনা করছে না, কাজেও হাত দিয়ে ফেলেছে। আমেরিকায় নিজস্ব পোর্ট ফ্যাসিলিটি গড়ার অনুমতি পাবার জন্যে যুক্তরাষ্ট্রের একশো কংগ্রেস ও একশো সিনেট সদস্যকে কিনে নিল হান। কাউকে লাখ ডলার দামের অ্যান্টিকস উপহার পাঠাল, কারও নামে সুইস ব্যাংকে জমা করল অবিশ্বাস্য মোটা অঙ্কের টাকা। সামনে ছিল প্রেসিডেন্ট নির্বাচন, সম্ভাব্য বিজয়ী প্রার্থীকে প্রচারণা চালাবার চাঁদা হিসেবে দান করল প্রায় পঞ্চাশ মিলিয়ন ডলার। শুধু তাই নয়, ফেডারেল সরকারের অধীনে যত এজেন্সি আছে প্রত্যেকটার একশো কর্মকর্তাকে মাসিক ঘুষ দেয়ার ব্যবস্থাও করল সে। এরপর কি আর পোর্ট ফ্যাসিলিটি গড়ে তোলার অনুমতি পেতে বেগ পেতে হয় কাউকে?

হুয়ান হান বীমায় বিশ্বাসী। নিজের নিরাপত্তা নিয়ে তার কোন দুশ্চিন্তা নেই, তবু সাবধানের মার নেই ভেবে বডিগার্ড আর পেশাদার খুনীদের নিয়ে ছোটখাট একটা বাহিনী গড়ে তুলেছে সে। এদের প্রায় সবাইকেই সে ব্রিটেন ইসরায়েল আর আমেরিকান ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি থেকে ভাগিয়ে এনেছে।

ডেস্কে চোখ ফিরিয়ে এনে খবরের কাগজটা টেনে নিল হান, আরেক হাতে পট থেকে কফি ঢালল কাপে। কাপে মাত্র চুমুক দিয়েছে, জলতরঙ্গের মত কোমল একটা শব্দ জানিয়ে দিল তার প্রাইভেট সেক্রেটারি সুজি সুং আসছে। অফিস কামরায় ঢুকে সরাসরি এগিয়ে এল সুজি সুং। হানকে 'মাস্টার' বলে সম্বোধন করল মেয়েটা, হান যেমন পছন্দ করে। 'মাস্টার, যে-সব তথ্য আপনি আপনার এফবিআই এজেন্টের কাছে চেয়েছিলেন, সব এই ফাইলে আছে।'

'সুজি, এক মিনিট অপেক্ষা করো। একটা বিষয়ে তোমার মতামত জানতে চাইব।'

ফাইলটা খুলল হান। প্রথমেই একটা ফটোগ্রাফ পেল সে। 'নুমা' লেখা একটা আসমানী রঙের হেলিকপ্টারের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক তরুণ, ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে। সুপুরুষ, সুদর্শন, দাঁড়ানোর ভঙ্গির মধ্যে ঋজু একটা ভাব প্রথমেই চোখে পড়ে। চোখ দুটোয় কিছু আছে, সম্ভবত সম্মোহনী শক্তি। ঠোঁটের হাসিটা ঠিক বোঝা যায় না, একবার মনে হলো লাজুক, তারপর মনে হলো বিষণ্ণ। রোদে পোড়া চেহারা। ব্যাকব্রাশ করা চুল। পরনে প্যাকস, গলফ শার্টের ওপর স্পোর্টস্ কোট চড়িয়েছে। ফটোটা সাদা-কালো, পিছনে লেখা তারিখ দেখে বোঝা গেল বছর দুয়েক আগে তোলা।

ফটো রেখে দিয়ে ফাইলটা পড়ায় মন দিল হান। সুজি সুংকে এক মিনিট অপেক্ষা করতে বলা হয়েছে, কিন্তু আধ ঘণ্টা পর ফাইল থেকে মুখ তুলল মাস্টার। 'সুজি, এই ছবিটা দেখো। পুরুষদের সম্পর্কে তোমার মধ্যে একটা ইনার সেন্স আছে। লোকটার ভেতর কি আছে দেখার চেষ্টা করো, তারপর বলো কি দেখলে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে মুখ থেকে লম্বা চুল সরাল সুং, হানের কাঁধের ওপর দিয়ে ঝুঁকে ফটোটার দিকে তাকাল। 'লোকটার চেহারায় কোমল ভাব যেমন আছে, তেমনি আছে কঠোর ভাব, বোধহয় সেজন্যেই সে সুন্দর। আমি একটা আকর্ষণ অনুভব করছি, সব মেয়েই করবে। মাস্টার, এই লোকের দুর্বলতা হলো বিবেক। অজানাকে জানার কৌতূহল এত বেশি, সম্ভবত এই একটা ক্ষেত্রে নিজেকে সে

নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। বিশ্বস্ত সে, তবে কোন্ অর্থে ব্যাখ্যা করতে পারছি না। কিছু অর্জন করার জন্যে প্রাণের ওপর ঝুঁকি নিতে হলেও দ্বিধা করে না। চ্যালেঞ্জ ভালবাসে। পরাজয় পছন্দ করে না, তবে ব্যর্থতা মেনে নিতে জানে। মাস্টার, চোখে শুধু সম্মোহনী শক্তি নয়, ঠাণ্ডা আরও কি যেন একটা আছে–সম্ভবত খুনের নেশা বা ধ্বংসের নেশা, আমি নিশ্চিত নই। বন্ধুর জন্যে আশ্রয়, শত্রুর জন্যে আতঙ্ক। সব মিলিয়ে, মাস্টার, এই লোকের উচিত ছিল অন্য কোন কালে জন্ম নেয়া।'

'অর্থাৎ তুমি বলতে চাইছ অতীত থেকে উঠে আসা একটা চরিত্র?'

মাথা ঝাঁকাল সুং। স্পাইরেট শিপের ডেকে তাকে চমৎকার মানিয়ে যেত। কিংবা পুরানো আমেরিকান ওয়েস্টে, মরুভূমির ওপর স্টেজকোচ নিয়ে ছুটছে।'

'ধন্যবাদ, সুজি, তোমার অন্তর্ভেদী দৃষ্টির জন্যে।'

'আপনার সেবা করাতেই আমার আনন্দ, মাস্টার।' মাথা নত করল সুং, তারপর নিঃশব্দে অফিস কামরা থেকে বেরিয়ে গেল।

ফাইলটা আরেক বার পড়তে শুরু করল হান। এবার সময় নিয়ে পড়ছে। 'মাসুদ রানা,' মাঝে মাঝে বিড়বিড় করছে সে। 'বিসিআই।' একবার আপন মনে হাসল সে। 'বাংলাদেশ তো পচা ডোবার একটা কিনারা মাত্র, সেখানে মাসুদ রানা ব্যাঙের একটা ছাতা হিসেবে নতুন গজিয়েছে। একটা ছাগল পাঠিয়ে দিলেই হবে, মুড়িয়ে খেয়ে নেবে।'

কিন্তু কিছুক্ষণ পর দেখা গেল অস্বাভাবিক গম্ভীর হান। ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলছে। 'আরে, এ তো দেখছি একাই একশো!' কেউ শুনলে ভাবত প্রশংসা করছে।

এফবিআই-এ হানের যে বেতনভুক এজেন্ট আছে সে একটা তালিকাও পাঠিয়েছে, রানার হাতে যারা খুন হয়েছে। কয়েকটা নাম দেখে রীতিমত ঘাবড়ে গেল হান। সে উপলব্ধি করল, শুধু সাধারণ অপরাধী বা পেশাদার খুনীদেরই নয়, ধনী ও ক্ষমতাবান অনেক মানুষকেও দুনিয়ার বুক থেকে সরিয়ে দিয়েছে রানা। সবচেয়ে বিস্মিত করল তাকে রানার যোগাযোগ ও কর্মক্ষেত্রের পরিধি। শুধু 'নুমা'-র সঙ্গে নয়, এরকম আরও বহু সংস্থার সঙ্গে জড়িত ও।

প্রায় এক ঘণ্টা পর ফাইলটা বন্ধ করল হান। কপালে চিন্তার রেখা, ফটোটা আরেকবার হাতে নিল। 'আচ্ছা, আপনিই তাহলে সেই ব্যক্তি, মি. মাসুদ রানা, ওরিয়ন লেকে আমার ব্যবসা বন্ধ করে দিয়েছেন। ইমিগ্র্যান্ট স্টেজিং এরিয়া আর ইয়ট ধ্বংস করার পিছনে রহস্যটা কি আমি জানি না। আমার শুধু আপনাকে একটা কথাই বলার আছে–আপনার কিছু গুণ আছে, সেজন্যে আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি; তবে এও বলে রাখি যে আপনি আপনার জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছেন। এই ফাইলে এরপর শুধু আপনার মৃত্যু সংবাদই যোগ হবে।'

আট

ওয়াশিংটন থেকে নির্দেশ এল স্পেশাল এজেন্ট শাকিলা সুলতানকে সিয়াটল থেকে

বিশেষ বিমানে সান ফ্রান্সিসকোয় নিয়ে এসে চিকিৎসার জন্যে হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে। ডাক্তাররা ওকে পরীক্ষা করে দেখলেন থেঁতলে বা ছড়ে যায়নি এমন এক ইঞ্চি জায়গাও নেই শরীরে। পাঁজরের হাড় ভেঙেছে তিনটে। আর মুখের কথা না বলাই ভাল—নার্সরা ওকে অন্তত এক হপ্তা আয়না দেখতে নিষেধ করে দিয়েছে।

এক হপ্তা পর হাসপাতালে ওর সঙ্গে দেখা করতে এলেন আইএনএস সান ফ্রান্সিসকো ডিস্ট্রিক্ট অফিস-এর ডিরেক্টর এরিক হবসন। নাদুসনুদুস প্রৌঢ়, গোল মুখে শিশুর মত সরল হাসি। তাঁর সঙ্গে এসেছেন পিট লুকাস, ইমিগ্র্যান্ট অ্যান্ড ন্যাচারালাইজেশন সার্ভিসের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার। তিনি এসেছেন ওয়াশিংটন থেকে, শাকিলার কাছ থেকে রিপোর্ট নেবেন, তারপর ব্রিফও করবেন।

পিট লুকাসের সঙ্গে এই প্রথম পরিচয় হচ্ছে শাকিলার। চল্লিশের মত বয়েস, চোখে সরু ফ্রেমের চশমা, মাথায় এলোমেলো সোনালি চুল। তাঁর মুখে হাসি নেই, চোখে নেই সহানুভূতি। ভাব দেখে মনে হচ্ছে শাকিলাকে তিনি ইনশিওরেন্স পলিসি গছাবার জন্যে এসেছেন।

ওঁদের সঙ্গে একজন বয়স্কা মহিলা স্টেনোগ্রাফার আছেন, শাকিলার মৌখিক রিপোর্ট শর্টহ্যান্ডে লিখে নেবেন। 'আমেরিকায় যাবার সুবর্ণ সুযোগ', ঢাকার একটা দৈনিক পত্রিকায় এই শিরোনামে বিজ্ঞাপন দেখে আবেদন করেছিল শাকিলা, তারপর যা যা ঘটেছে সব সে ধীরে ধীরে বলে গেল। ওকে থামিয়ে দিয়ে মাঝে মধ্যে দু'একটা প্রশ্ন করলেন পিট লুকাস, কোন কোন ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা শুনতে চাইলেন। শর্টহ্যান্ডে সব লিখে নেয়া হচ্ছে। পুরো কাহিনীটা শেষ করতে দেড় ঘণ্টা সময় লাগল শাকিলার। সবশেষে মাসুদ রানা সম্পর্কে বলল ও, জানাল, 'ওই ভদ্রলোক সময়মত সাহায্য না করলে আজ আমি এখানে থাকতাম না।'

'হ্যাঁ, সে তো বোঝাই যাচ্ছে,' মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিলেন পিট লুকাস। 'তাঁর কাছে প্রপার চ্যানেলে আমরা কৃতজ্ঞতা জানাব। আপনাকে আমার বলার কথা হলো, আপনি আমাদের একটা ক্রেডিট, আইএনএস-এর একটা অ্যাসেট। মানুষ পাচারের গুরুত্বপূর্ণ একটা লিঙ্ক আপনার জন্যেই ধ্বংস করা সম্ভব হয়েছে।'

'ওরা আবার অন্য কোথাও কাজ শুরু করবে,' বলল শাকিলা। ক্লান্ত বোধ করছে ও, হাত দিয়ে মুখ ঢেকে হাই তুলল একটা।

'দুঃখের বিষয় হলো,' বললেন এরিক হবসন, 'যথেষ্ট প্রমাণের অভাবে আন্তর্জাতিক আদালতে হুয়ান হানের বিরুদ্ধে আমরা কোন অভিযোগ দায়ের করতে পারছি না।'

হঠাৎ আড়ষ্ট হয়ে গেল শাকিলা। 'কি বলছেন? যথেষ্ট প্রমাণ নেই মানে? আমার কাছে প্রমাণ আছে ভুয়া ক্রুজ শিপ সান বার্ড হুয়ান হান ম্যারিটাইম লিমিটেডের নামে রেজিস্টার করা। জাহাজটা অবৈধ অভিবাসীতে ভর্তি ছিল। তাছাড়া, ওরিয়ন লেকের তলায় লাশগুলো? ওগুলো তার অপরাধের প্রমাণ নয়?'

পিট লুকাস মাথা নাড়লেন। 'আমরা চেক করেছি, শাকিলা। জাহাজটা ঠিকানাবিহীন এক শিপিং কোম্পানীর, কোরিয়ায় রেজিস্ট্রি করা। সমস্ত রিয়েল-এস্টেট ট্র্যানজ্যাকশন হানের নিযুক্ত প্রতিনিধিরা সারলেও, ওরিয়ন লেক প্রপার্টি

কেনা হয়েছে কানাডার একটা হোল্ডিং কোম্পানীর নামে। বাংচিন ইনভেস্টমেন্ট। মূলত ট্যাক্স ফাঁকি দেয়ার জন্যেই একটা মাদার কোম্পানী থেকে অনেকগুলো সিস্টার কোম্পানী গজায়, সেগুলো আবার কয়েকটা করে করপোরেশনের জন্ম দেয়; ফলে মালিক, ডিরেক্টর ও শেয়ার হোল্ডারদের আসল পরিচয় বের করা খুব কঠিন বা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। শুনতে যত খারাপই লাগুক, আন্তর্জাতিক কোন আদালতই হুয়ান হানকে দোষী সাব্যস্ত করতে পারবে না।'

জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকল শাকিলা, চোখে শূন্য দৃষ্টি। কয়েক সেকেন্ড পর বিড়বিড় করে বলল, 'সব তাহলে বৃথা? লেকে কয়েকশো লোক মারা গেছে। আমি এত ভুগলাম। মাসুদ রানা জীবনের ওপর ঝুঁকি নিলেন। রিট্রিট হানা দেয়া হলো। শুধু শুধু? হান নিশ্চয়ই বেআইনী কাজ আবার শুরু করবে, অথচ তার বিরুদ্ধে কারও কিছু করার নেই?'

মাথা নাড়লেন লুকাস, আইএনএস-এর অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার। 'কে বলল নেই? আপনি মূল্যবান তথ্য দিয়েছেন, সেগুলো আমরা ভবিষ্যতে অবশ্যই কাজে লাগাব। একটা মহীরুহের জড় তুলে ফেলতে সময় লাগে। একদিন আমরা ঠিকই হানের ব্যবসা বন্ধ করে দেব।'

'সত্যি কথা বলতে কি, বিশাল এক অক্টোপাসের একটা শুঁড় মাত্র কাটা সম্ভব হয়েছে। সমস্ত কৃতিত্ব আপনার। এখন আমরা জানি হান তার পোর্ট ফ্যাসিলিটিগুলোয় কি ব্যবসা করবে বলে ভাবছে। কোথায় চোখ রাখতে হবে জানি, কাজেই প্রমাণসহ তাকে ধরা এখন স্রেফ সময়ের ব্যাপার মাত্র।' এরিক হবসন হাসছেন।

ব্রীফকেস হাতে নিয়ে লুকাস বললেন, 'আপনি বিশ্রাম নিন, শাকিলা। আমরা আসি।'

'আমার একটা অনুরোধ আছে,' বলল শাকিলা।

'বলুন।'

'হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে দু'একদিনের জন্যে বাড়িতে যাব আমি, আব্বু-আম্মুর সঙ্গে থাকব। তারপর আমি আবার একই কাজে ফিরতে চাই–হানের বিরুদ্ধে তদন্তটা চালিয়ে যাব।'

হবসন ঘাড় ফিরিয়ে লুকাসের দিকে তাকালেন। লুকাস বললেন, 'বলাই বাহুল্য। অবশ্যই আপনি হানের বিরুদ্ধে তদন্তটা চালিয়ে যাবেন। হানের স্মাগলিং ব্যবসা সম্পর্কে আপনার চেয়ে বেশি আর কেউ জানে? আগামী হপ্তার শুরুতেই আপনাকে আমরা ওয়াশিংটনে দেখতে চাই।'

ওঁরা বিদায় নেয়ার পর শেষ আরেকবার চোখ থেকে ঘুম তাড়াবার চেষ্টা করল শাকিলা। বিছানার পাশের নিচু টেবিল থেকে ফোনের রিসিভার তুলে আউটসাইড লাইন পাবার জন্যে ডায়াল করল, তারপর এরিয়া কোড জানিয়ে লং-ডিসট্যান্স ইনফরমেশন চাইল। নম্বর পাবার পর ওয়াশিংটনে, নুমার হেডকোয়ার্টার বিল্ডিঙের সঙ্গে যোগাযোগ করল। বলল, মাসুদ রানাকে চাই তার।

ফোন ধরল একটা মেয়ে, পাবলিক রিলেশন্স অফিসারের সহকারিণী। মাসুদ রানা ছুটিতে আছে, বলে যোগাযোগ কেটে দিল সে।

রিসিভার রেখে দিয়ে বালিশে মাথা নামাল শাকিলা। কেন যেন মনে হচ্ছে, তার রূপান্তর ঘটেছে। যেচে পড়ে কোন পুরুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে চাওয়া তার স্বভাব নয়, অথচ ঠিক তাই হতে চাইছে। মাসুদ রানা কে? ওকে তো ভাল করে আমি চিনিও না! তারপর ভাবল, এত থাকতে ওর মত একজন জাদুকর কেন এল তার জীবনে?

বেড়াতে আসা খুব কম লোকই জানে যে হংকঙের আশপাশে ছড়িয়ে আছে দুশো পঁয়ত্রিশটা ছোটখাট দ্বীপ। চেয়াং চাউ, লামা, লানটাউ, এই সব দ্বীপে আট থেকে পঁচিশ হাজার লোক বাস করে। বাকি বেশির ভাগ দ্বীপ খালি পড়ে আছে, আসা-যাওয়া করার সহজ কোন পরিবহন ব্যবস্থাও গড়ে ওঠেনি।

রিপালস বে-র তীরে অ্যাবারডীন শহর, ওটার চার মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে টাইয়া নান দ্বীপটা। ছোট্ট একটা জায়গা, ডায়ামিটারে এক মাইলের বেশি হবে না। সাগর থেকে দুশো ফুট উঁচু একটা পাহাড় আছে ওখানে, তার চূড়ায় সম্পদ আর ক্ষমতার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা মনুমেন্ট।

ওই জায়গায় প্রথম যে তাওয়িস্ট মঠটা ছিল সেটা তৈরি করা হয় সতেরোশো উননব্বই সালে। প্রধান মন্দিরকে ঘিরে রেখেছে আরও তিনটে ছোট মন্দির, সবগুলোই উনিশশো উনপঞ্চাশ সালে খালি হয়ে যায়। নব্বই সালে দ্বীপটা কিনে নেয় হুয়ান হান, কেনার পর ওখানে এমন একটা প্রাসাদ তৈরি করে যা দেখে ধনী ব্যবসায়ী আর বাটপার রাজনীতিকরা ঈর্ষান্বিত না হয়ে পারেন না।

গেটগুলোয় সতর্ক প্রহরা আছে, চারদিক উঁচু পাঁচিল দিয়ে সুরক্ষিত, ভেতরের বাগান শৈল্পিক ডিজাইনে তৈরি, সাজানো হয়েছে সারা দুনিয়া থেকে বিরল প্রজাতির ফুল আর গাছ এনে। দক্ষ শিল্পীরা প্রাচীন ডিজাইন মোটিফ ডুপ্লিকেট করেছেন। মঠটাকে চাইনীজ কালচারের মিউজিয়ামে পরিণত করার জন্যে সারা দুনিয়া থেকে নামকরা চীনা কারিগরদের ভাড়া করে আনা হয়। প্রাচীন মঠের ভেতরের নকশা ও রঙ যতটুকু পারা যায় না বদলে কয়েক ভাগে বিভক্ত গ্যালারি তৈরি করা হয়েছে, হুয়ান হানের বিশাল আর্ট ট্রেজার প্রদর্শন করার উদ্দেশ্যে। ত্রিশ বছর ধরে প্রাচীন আর্টিফ্যাক্ট সংগ্রহ করছে সে। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে শুরু, মিং সাম্রাজ্যের সমাপ্তিকাল অর্থাৎ ষোলোশো চুয়াল্লিশ সালে এসে শেষ, এই সময়কালের চৈনিক শিল্প সামগ্রী যেখানে যত পাওয়া গেছে সব সংগ্রহ করা হয়েছে। চীনা মূল ভূখণ্ডের আমলাদের গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে, ঘুষ খাইয়ে, অথবা প্রাণে মেরে ফেলার ভয় দেখিয়ে অমূল্য সব অ্যান্টিক ও শিল্পকর্ম কিনেছে হান। কোথাও কোন চীনা কালচারাল ট্রেজার আছে শুনলেই সে-সব হাতে পাবার জন্যে মাথা খারাপ হয়ে যায় তার।

হানের এজেন্টরা ইউরোপ-আমেরিকার অকশন হাউসগুলোয় নিয়মিত চিরুনি চালায়, চীনা সামগ্রীর সমস্ত প্রাইভেট কালেকশন কেনা চাই তাদের। কোন কারণে কেনা সম্ভব না হলে চুরি করে তারা, গোপনে পাঠিয়ে দেয় হানের প্রাসাদে। জায়গার অভাবে বা চুরি করে আনার কারণে যে-সব আর্টিফ্যাক্ট মঠের গ্যালারিতে সাজানো সম্ভব হয় না, সেগুলো সিঙ্গাপুরের ওয়্যারহাউসে রাখা হয়।

হুয়ান হান ধনী ও বিখ্যাত ব্যক্তিদের জীবনযাপন পদ্ধতি অনুসরণ করে না। বিপুল বিত্ত-বৈভব আর সুনাম-সুখ্যাতি অর্জনের পর বেশির ভাগ মানুষই পরিতৃপ্ত আর সন্তুষ্ট বোধ করে, জীবনের শেষ পর্যায়টা কঠিন পরিশ্রমের কাজ এড়িয়ে অপূর্ণ স্বপ্ন-সাধগুলোর কথা ভুলে থাকতে চেষ্টা করে। কিন্তু হুয়ান হান এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। জীবনের প্রথম খুচরো পয়সাটা রোজগার করার সময় টাকার প্রতি তার যে লোভ ছিল, ব্যাংকে তৃতীয় বিলিয়ন ডলার জমা হবার পরও সেই লোভ এতটুকু কমেনি; বরং আরও বেড়েছে। সেই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে প্রাচীন শিল্পকর্ম সংগ্রহ করার বাতিক।

মঠটা কেনার পর ছোট্ট হারবার থেকে মন্দিরে ওঠার সরু পথটা চওড়া করার কাজে প্রথম হাত দেয় হান। পাহাড় বেয়ে এঁকেবেঁকে উঠে গেছে পথটা, চওড়া হবার পর এখন দুটো ট্রাক পাশাপাশি উঠতে বা নামতে পারে।

মন্দিরগুলো ভেঙে ফেলা হয়নি, তবে ভেতর আর বাইরের দেয়াল সোনা আর রূপোর পাত দিয়ে মোড়া হয়েছে, গায়ে বসানো হয়েছে বিভিন্ন দেশ থেকে সংগ্রহ করা মূল্যবান পাথর। সমস্ত কাজ শেষ করতে পাঁচ বছর সময় নেয় ওস্তাদ কারিগররা। আরও ছ'মাস লাগে অমূল্য আর্ট ট্রেজার সাজাতে। প্রধান মন্দিরটাকে বানানো হয় হানের বসতবাটি ও এনটারটেইনমেন্ট কমপ্লেক্স, সেখানে সুসজ্জিত একটা বিলিয়ার্ড রূম ও ইনডোর/আউটডোর সুইমিং পুল আছে। কমপ্লেক্সের লাগোয়া আরও আছে একজোড়া টেনিস কোর্ট ও একটা নাইন-হোল গলফ কোর্স। বাকি তিনটে মন্দিরকে অলঙ্কৃত গেস্টহাউস বানানো হয়েছে। প্রাচীন মন্দিরকে প্রাসাদে রূপান্তরিত করার পর হান ওটার নাম দিয়েছে 'হাউস অভ তিন হাউ'। তিন হাউ চীনা জেলে ও নাবিকদের কাছে দেবী হিসেবে পরিচিত।

গ্যালারিগুলোয় সব মিলিয়ে চোদ্দ হাজার আর্টিফ্যাক্ট রাখা হয়েছে, সারা দুনিয়ার আর কোন মিউজিয়ামে এত জিনিস আছে কিনা সন্দেহ। বিভিন্ন দেশের মিউজিয়াম প্রস্তাব পাঠায়, এটা-সেটা কিনতে চাওয়া হয়, কিন্তু সব প্রস্তাবই প্রত্যাখ্যান করে হান; সে শুধু কেনে, কিছুই বেচে না।

এশিয়া আর ইউরোপের বহু রাজা, বিশ্ব নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন সমাজের প্রখ্যাত ব্যক্তিবর্গ, টাকার কুমীর, খেলা ও ছায়াছবি জগতের সুপারস্টাররা হাউস অব তিন হাউ-এ বেড়িয়ে গেছেন হানের আমন্ত্রণ পেয়ে। হঙকঙ ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট থেকে তার বিশাল হেলিকপ্টার অতিথিদের তুলে নেয়, সরাসরি উড়ে এসে নামিয়ে দেয় মন্দির কমপ্লেক্সের সামনে ল্যান্ডিং প্যাডে। সরকারী কোন কর্মকর্তা, রাষ্ট্রপ্রধান বা অসম্ভব ধনী কোন মেহমান হলে তাঁর জন্যে পাঠিয়ে দেয়া হয় হানের দুশো ফুট লম্বা ভাসমান ম্যানসন, আসলে ওটা ছোট আকৃতির একটা ক্রুজ শিপ, হান তৈরি করেছে নিজের শিপইয়ার্ডে। পৌঁছাবার পর এক ঝাঁক চাকরবাকর মেহমানদের দায়িত্ব গ্রহণ করে, বিলাসবহুল ভ্যানে তুলে পৌঁছে দেয় পীপিং কোয়ার্টারে, ওখানে তাদের জন্যে ব্যক্তিগত চাকরানী আর চাকররা যে-কোন নির্দেশ পালন করার জন্যে এক পায়ে খাড়া হয়ে থাকে।

আজ সন্ধ্যায় হুয়ান হানের মেহমান হয়ে এসেছেন প্রবীণ ঝার্ড মিয়াং। তাইওয়ানিজ পণ্ডিত তিনি, বয়েস সত্তর, চীনাদের সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় ইতিহাসবিদ।

মানুষটা ছোটখাট, মুখে হাসি, বাদামী রঙের চোখে পাতাগুলো খুব ভারী। মোটা গদি মোড়া কাঠের চেয়ারে বসতে দেয়া হয়েছে তাঁকে, চেয়ারটার আকৃতি গর্জনরত সিংহের মত। হাতে ধরিয়ে দেয়া হয়েছে মিং সাম্রাজ্যের ছোট একটা কাপ, তাতে আঙুরের নির্যাস থেকে তৈরি ব্র্যান্ডি।

হুয়ান হান মৃদু হাসল। 'আসতে পারায় আপনাকে আমি ধন্যবাদ দিতে চাই, ঝাউ মিয়াং।'

'আপনার আমন্ত্রণ পেয়ে আমি কৃতজ্ঞ,' জবাব দিলেন ঝাউ মিয়াং। 'আপনার কালেকশন দেখার সুযোগ পেয়ে আমি সম্মানিত বোধ করছি।'

'প্রাচীন চীনা ইতিহাস আর কালচার সম্পর্কে আপনি আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ। আমি আপনার উপস্থিতি কামনা করেছি সম্ভাব্য একটা ভেনচার সম্পর্কে আলোচনা করার জন্যে।'

'আপনি নিশ্চয়ই কোন বিষয়ে গবেষণা করতে বলবেন আমাকে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে হান বলল, 'হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন।'

'বলুন, বিষয়টা কি?'

'ইতিমধ্যে আপনি কি আমার কিছু ট্রেজার খুঁটিয়ে দেখার সুযোগ পেয়েছেন?' জানতে চাইল হান।

'হ্যাঁ, দেখলাম তো,' জবাব দিলেন মিয়াং। 'স্বদেশের প্রাচীন ও মহৎ শিল্পকর্ম দেখার সুযোগ পেয়ে সত্যি আমি ধন্য। আমাদের অতীতের এত অসংখ্য টুকরো আজও অস্তিত্ব হারায়নি, এ আমার জানা ছিল না। আমি জানতাম, এ-সব বেশিরভাগই চিরকালের জন্যে হারিয়ে গেছে। ব্রোঞ্জের তৈরি ধূপদানী, গায়ে সোনার ওপর দামী রত্ন বসানো, ওটা চৌ ডাইনাস্টির সময়কার। ব্রোঞ্জের রথ, চালক ও ঘোড়া চারটে প্রমাণ সাইজের, ওটা হান ডাইনাস্টির সম্পদ...'

'ভুয়া, হুবহু নকল!' অকস্মাৎ যেন কাতরে উঠল হান। 'আপনি যেগুলোকে আমাদের পূর্ব-পুরুষদের মহৎ শিল্পকর্ম বলে ভাবছেন ওগুলো আসল জিনিসের ফটোগ্রাফ দেখে নকল করা হয়েছে।'

নিজের ভুল বুঝতে পেরে হতভম্ব হয়ে গেলেন মিয়াং। 'কিন্তু দেখতে তো একদম নিখুঁত। আমি একেবারে বোকা বনে গেছি।'

'ল্যাবরেটরিতে নিয়ে গিয়ে দেখলে ঠিকই ধরে ফেলতেন।'

'আপনার শিল্পীরা অসাধারণ, হাজার বছর আগের শিল্পীদের মতই গুণী। নকল হলেও, আজকের বাজারে আপনার এই শিল্প অনেক দামে বিকোবে।'

মিয়াঙের সামনে একটা চেয়ারে ধপ করে বসে পড়ল হান। 'তা সত্যি, তবে রিপ্রোডাকশন রিপ্রোডাকশনই, আসল জিনিসের মত অমূল্য নয়। সেজন্যেই আপনি আমার আমন্ত্রণ গ্রহণ করায় আমি খুশি হয়েছি। আপনাকে যে কাজের জন্যে অনুরোধ করব, তা হলো, উনিশশো আটচল্লিশ সালের আগে পর্যন্ত অস্তিত্ব ছিল, কিন্তু তারপর হারিয়ে গেছে, এরকম আর্ট ট্রেজারের একটা তালিকা প্রস্তুত করবেন আপনি।'

'এ-ধরনের তালিকার জন্যে আপনি নিশ্চয়ই মোটা টাকা ব্যয় করবেন?' মিয়াঙের দৃষ্টি একটু তীক্ষ্ণ হলো।

'অবশ্যই।'

'সেক্ষেত্রে এক হপ্তার মধ্যে তালিকাটা পেয়ে যাবেন আপনি। পঞ্চাশ বা ষাট বছর হলো হারিয়ে গেছে, জানা এমন আর্ট ট্রেজারের প্রতিটি আইটেমের তালিকা হবে সেটা।'

'এ আপনি কি বলছেন!' হানকে রীতিমত হতভম্ব দেখাল। 'এত অল্প সময়ে কিভাবে সম্ভব?'

'ত্রিশ বছর হলো হারিয়ে গেছে, এমন ট্রেজারের তালিকা এরই মধ্যে তৈরি করে ফেলেছি আমি,' ব্যাখ্যা করলেন ঝাউ মিয়াং। 'এই খাটনিটা আমি ব্যক্তিগত সন্তুষ্টির জন্যে খেটেছি। পড়ার মত করে সাজাতে মাত্র কয়েক দিন লাগবে। ওটা আমি আপনাকে কোন পয়সা ছাড়াই দিয়ে দেব।'

'এ আপনার উদারতা, কিন্তু বিনা মূল্যে কিছু গ্রহণ করার মানুষ আমি নই।'

'টাকা আমি নেব না, তবে একটা শর্ত আছে।'

'আপনার যে-কোন শর্তই আমি পূরণ করব।'

'আমার সবিনয় অনুরোধ, আপনি আপনার বিশাল ক্ষমতা আর সুযোগ-সুবিধে কাজে লাগিয়ে আমাদের হারানো ট্রেজার খুঁজে বের করুন, তারপর সেগুলো চীনা জনসাধারণকে ফিরিয়ে দিন। আপনিও নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে একমত হবেন, সবই তাইওয়ানের প্রাপ্য?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই,' বলল হান। 'আপনাকে আমি কথা দিলাম, ঝাউ মিয়াং। কিন্তু আপনি যেমন ত্রিশ বছর ধরে খাটছেন, আমিও তেমনি পনেরো বছর ধরে খাটছি-কই, কি লাভ হলো? কোন ট্রেজারই তো খুঁজে পেলাম না। নিখোঁজ পিকিং ম্যান-এর মতই রহস্য আরও শুধু দুর্ভেদ্য হয়ে উঠছে।'

একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে মিয়াং বললেন, 'আপনিও তাহলে কোন সূত্র পাননি?'

'আমার এজেন্টরা সম্ভাব্য একটা মাত্র সমাধানের কথা বলতে পারছে, সেটা হলো, প্রিন্সেস হিয়া লিয়েন।'

'জাহাজটা ছবির মত আমার চোখের সামনে ভাসে। যখন ছোট ছিলাম, ওটায় চড়ে বাবা-মার সঙ্গে সিঙ্গাপুরে গেছি। ভারি সুন্দর ছিল দেখতে। যতদূর মনে পড়ে, মালিক ছিল ক্যান্টন লাইনস। বছর কয়েক আগে আমিও জাহাজটার নিখোঁজ হওয়া সম্পর্কিত সূত্র খুঁজে পাবার চেষ্টা করেছি। হারানো আর্ট ট্রেজারের সঙ্গে প্রিন্সেস হিয়া লিয়েনের কি সম্পর্ক?'

'চিয়াং কাই-শেক যে আমাদের জাতীয় মিউজিয়াম ছাড়া যেখানে যত প্রাইভেট কালেকশন ছিল সব নিজের দখলে নিয়ে আসেন, এ তো সবারই জানা। আমাদের সমস্ত প্রাচীন আর্ট ট্রেজার প্রিন্সেস হিয়া লিয়েনে তোলা হয়, তারপর অজ্ঞাত গন্তব্যের উদ্দেশে পাঠিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু সেখানে জাহাজটা পৌঁছুতে পারেনি। আমার এজেন্টরা আজ পর্যন্ত একজন প্রত্যক্ষদর্শীরও খোঁজ পায়নি।'

'কিন্তু চিয়াং কাই-শেক জাতীয়তাবাদী নেতা ছিলেন, তিনি কেন আমাদের আর্ট ট্রেজার বিদেশে কোথাও পাচার করতে চাইবেন?'

'নেতার দেশপ্রেম সম্পর্কে আমার মনে কোন সন্দেহ নেই,' বলল হান। 'তিনি আমাদের আর্ট ট্রেজার কমিউনিস্টদের হাত থেকে উদ্ধার করেন, তারপর

ওদের নাগালের বাইরে কোথাও পাঠিয়ে দেন। সময় বা সুযোগ পেলে অবশ্যই আবার সব ফিরিয়ে আনতেন তিনি।'

'তা যদি সত্যি হয়, তাহলে অনেক প্রশ্নের উত্তর মেলে। তবে প্রিন্সেস হিয়া লিয়েন সম্পর্কে আমি যে রেকর্ড পেয়েছি তাতে দেখা যায় জ্যাপারদের হাতে তুলে দেয়ার জন্যে সিঙ্গাপুরে নিয়ে যাবার সময় নিখোঁজ হয় ওটা।'

'আসল ঘটনা হলো, জাহাজটার শেষ খবর পাওয়া যায় চিলির পশ্চিম উপকূল থেকে। প্রিন্সেস হিয়া লিয়েনের নামে প্রচারিত একটা ডিসট্রেস সিগন্যাল শোনা গেছে ওখানে। ভয়াবহ এক ঝড়ে সমস্ত ক্রুসহ ডুবে যাবার আগে ডিসট্রেস সিগন্যালটা পাঠানো হয়।'

'আপনি তো দেখছি বেশ অনেক দূর এগিয়েছেন,' বললেন ঝাউ মিয়াং। 'এবার বোধহয় রহস্যটা ভেদ করতে পারবেন।'

বিষণ্ন ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল হান। 'বলার চেয়ে করা কঠিন। চারশো বর্গ মাইলের মধ্যে যে-কোন জায়গায় ডুবে থাকতে পারে ওটা।'

'এ কিন্তু কঠিন বলে ফেলে রাখার মত কাজ নয়। তল্লাশী একটা চালাতেই হবে। চীনের অমূল্য জাতীয় সম্পদ অবশ্যই উদ্ধার করা দরকার।'

'আপনার সঙ্গে আমি একমত। এই উদ্দেশ্যেই তো একটা সার্চ-অ্যান্ড-সার্ভে শিপ তৈরি করিয়েছি আমি। সাইটে চিরুনি চালাচ্ছে আমার স্যালভেজ ক্রুরা, তা-ও তো ছ'মাস হয়ে গেল। কিন্তু না, প্রিন্সেস হিয়া লিয়েনের কাঠামোর সঙ্গে মেলে এমন কিছু সাগরের তলায় পাওয়া যাচ্ছে না।'

'প্রার্থনা করি, আপনি আশা ছাড়বেন না,' ভারী গলায় বললেন মিয়াং। 'এই ট্রেজার উদ্ধার করতে পারলে চীনা জনগণের হৃদয়ে আপনি অমর হয়ে থাকবেন।'

'ঠিক এই কারণেই আজ আপনাকে আমি ডেকেছি। আমি চাই জাহাজটার খোঁজ পাবার জন্যে আপনি আপনার মেধা আর সময় দেবেন। যে-কোন তথ্যের জন্যে যোগ্য মূল্য দেব আমি।'

'আপনার দেশপ্রেম সত্যি প্রশংসনীয়, হুয়ান হান।'

কথা না বলে মনে মনে হাসল হুয়ান হান।

বিছানায় শুয়ে ব্যবসায়িক কাগজ-পত্রের ওপর চোখ বুলাচ্ছে হুয়ান হান, পাশের টেবিলে ফোনটা টুং-টাং করে উঠল। হান চিরকুমার, সাধারণত একাই ঘুমায়। নারীদেহের সৌন্দর্য উপভোগ করে সে, দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সুন্দরী হবার যোগ্যতা আছে এমন মেয়েদের তালিকা ও ফোন নম্বর আছে তার কাছে, মাঝে মধ্যে তাদের কাউকে ডেকে পাঠায়। তবে এ-ব্যাপারে তার মধ্যে কোন বাড়াবাড়ি নেই। তার সার্বক্ষণিক ধান্ধা হলো কিভাবে আরও টাকা কামানো যায়, আর কোথায় কি আর্টিফ্যাক্ট আছে তার খোঁজ নেয়া। ধূমপান আর মদ্যপানের মতই, মেয়ে পটানোটাকে সময়ের অপচয় বলে মনে করে সে।

ফোনের রিসিভার তুলল হান। 'ইয়েস?'

'মাস্টার, আমি সুজি সুং। আপনি বলেছিলেন তথ্য পাওয়া গেলে রাতের যে-কোন সময় আপনাকে আমি জানাতে পারব।'

'হ্যাঁ, বলো।'

'এফবিআই আর সিআইএ থেকে আপনার ইনফর্মাররা একই খবর পাঠিয়েছে, মাস্টার,' বলল সুং। 'মাসুদ রানা ওয়াশিংটন পৌঁছেছে।'

'ভেরি গুড।'

'কংগ্রেস সদস্যা মিস লরেলির বাড়িতে উঠেছে সে। বাড়িটা সুরক্ষিত। তবে মিস লরেলি বাড়িতে নেই।'

'রাসকি রুমানভকে বলো,' হান নির্দেশ দিল, 'ওই বাড়িতেই যেন মাসুদ রানাকে খতম করা হয়।' রাসকি রুমানভ তার সিকিউরিটি চীফ। 'শুধু রানাকে খতম করলে হবে না, কংগ্রেস সদস্যার বাড়িটাও যেন পুড়িয়ে ফেলা হয়।' মনে পড়ে গেছে, বছরখানেক আগে তার পাঠানো উপহার সামগ্রী প্রত্যাখ্যান করেছিল লরেলি। 'বলা যায় না, ঘটনাটা যখন ঘটবে, আমি ওখানে উপস্থিত থাকতে পারি।'

'কিন্তু মাস্টার, চলতি বা আগামী হপ্তায় আপনার তো ওয়াশিংটনে থাকার কথা নয়,' অবাক হয়ে বলল সুং। 'আগে থেকেই ঠিক হয়ে আছে বেইজিং থেকে আসা কয়েকজন আমলার সঙ্গে হংকঙে মীটিং করবেন আপনি।'

'ও-সব বাতিল,' হাত নেড়ে বলল হান। 'কংগ্রেসে আমার যারা বন্ধু, তাদের সঙ্গে ওয়াশিংটনে আমার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করো। আমি প্রেসিডেন্টের সঙ্গেও দেখা করতে চাই। সানগারি সহ আমার অন্যান্য পোর্ট ফ্যাসিলিটি সম্পর্কে ওদের মনে কোন সন্দেহ দেখা দিয়ে থাকলে এখনই তা দূর করার সময়।'

'জ্বী, মাস্টার। আপনি যা বলেন।'

নুমার ড্রাইভার গাড়িটা থামাতে যা দেরি, সঙ্গে সঙ্গে রানার মাথার ভেতর বিপদসঙ্কেত বেজে উঠল, সড়সড় করে দাঁড়িয়ে গেল ঘাড়ের পিছনে চুলগুলো। কি যেন একটা যেভাবে থাকার কথা সেভাবে নেই।

আজ দশ দিন হলো কংগ্রেস সদস্যা, দীর্ঘদিনের বান্ধবী লরেলির এই বাড়িটায় রয়েছে রানা। বাড়িটা শহর থেকে বেশ খানিকটা দূরে। চারপাশে ফাঁকা জলাভূমি, খানিক পরপর বেশ কয়েকটা মাটির ঢিবি মাথা চাড়া দিয়ে আছে, ঘন জঙ্গলে ঢাকা। পঞ্চাশ গজ দূরে উঁচু একটা হাইওয়ে আছে, সেখানে দ্রুতগতি যানবাহনের সংখ্যা কম নয়, তবে আশপাশে আর কোন বাড়ি-ঘর না থাকায় পরিবেশটা নির্জন ও নিরিবিলি। মাত্রা ছাড়ানো কাজের চাপ আর নাছোড়বান্দা সাক্ষাৎপ্রার্থীদের এড়াবার জন্যে মাঝে মধ্যেই শহর ওয়াশিংটন থেকে এখানে পালিয়ে আসে লরেলি, বলা যায় লুকিয়ে থেকে বিশ্রাম নেয়।

ওরিয়ন লেক থেকে নুমার হেলিকপ্টারে চড়ে সরাসরি ওয়াশিংটনে ফেরে রানা, অ্যান্ড্রুজ এয়ার ফোর্স বেস থেকে নুমার একটা কার নিয়ে লরেলির ফ্ল্যাটে পৌঁছায়। এয়ার ফোর্স বেস থেকে ফোন করে আগেই জেনে নিয়েছিল লরেলি ফ্ল্যাটে আছে কিনা। 'আমার বিশ্রাম দরকার, তোমার অসুবিধে না হলে ক'দিন থাকতে চাই,' লরেলিকে জানায় ও। লরেলি এক সেকেন্ড ইতস্তত করে উত্তর দিয়েছে, 'ঠিক আছে, আগে আসো তো।'

ফ্ল্যাটে পৌঁছে লরেলির ইতস্তত করার কারণটা বুঝতে পারল রানা। ব্যাগ-

ব্যাগেজ গুছিয়ে তৈরি হয়ে আছে সে, প্লেন ধরার জন্যে আধ ঘণ্টার মধ্যে বেরিয়ে পড়বে। রানার মুখের হাসি ম্লান হয়ে যেতে দেখে সংক্ষেপে পরিস্থিতিটা ব্যাখ্যা করল লরেলি। বাংলাদেশে প্রচুর তেল আর গ্যাস ফিল্ড আবিষ্কৃত হবার খবর পেয়ে বড় বড় আমেরিকান কোম্পানীগুলো ঢাকায় ভিড় জমিয়েছে, গ্যাস ও তেল আহরণের টেন্ডারগুলো যাতে শুধু তারাই পায়, সে-ব্যাপারে সুপারিশ করার জন্যে সরকারী কর্মকর্তা ও কংগ্রেস সদস্যদের একটা দল ঢাকায় যাচ্ছে। তাঁরা প্রায় সবাই কোন না কোন মার্কিন কোম্পানীর পক্ষে তদবির করবে। বাংলাদেশ সম্পর্কে প্রচুর অভিজ্ঞতা ও পড়াশোনা আছে লরেলির, সে জানে অভিজ্ঞতার অভাবে বিএনপি সরকার মার্কিন কোম্পানী কেয়ার্ন এনার্জির সঙ্গে যে চুক্তি করেছিল সেটা পুরোপুরি বাংলাদেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে চলে গেছে। চুক্তি অনুসারে উত্তোলিত গ্যাসের শতকরা চুয়াত্তর ভাগ পাবে কেয়ার্ন এনার্জি, বাকি ছাব্বিশ ভাগ পাবে বাংলাদেশ। কোন সন্দেহ নেই এটা একটা অসম চুক্তি। কিন্তু বিপজ্জনক দিক আরও আছে। চুক্তিতে বলা হয়েছে, কেয়ার্ন এনার্জির প্রাপ্য সমস্ত গ্যাস বাংলাদেশ সরকারকে আন্তর্জাতিক দরে কিনে নিতে হবে। প্রশ্ন হলো, যে দেশে গ্যাসচালিত শিল্প প্রায় নেই-ই, সে-দেশের সরকার বিপুল পরিমাণ গ্যাস কিনে রাখবে কোথায়, তা নিয়ে করবেই বা কি? বেশি দরে গ্যাস কিনে দেশের মানুষকে সস্তায় তা কতদিন একটা সরকার সরবরাহ করতে পারবে? বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারও এ-ব্যাপারে অনভিজ্ঞ, কোন কোম্পানীর সঙ্গে কি শর্তে চুক্তি করতে হবে ভাল বোঝে না। সরকারের একটা মহল গ্যাস ও তেলের মজুদ সম্পর্কে অতিরঞ্জিত গুজব ছড়াচ্ছে। কেউ কেউ এমন কথাও বলছে যে গ্যাস বা তেল মাটির তলায় বেশিদিন ফেলে রাখলে পরে আর তা বিকোবে না, কারণ ততদিনে নাকি তেল ও গ্যাসের বিকল্প জ্বালানী বাজারে চলে আসবে। এই সব কথাবার্তা যে-কোন শর্তে বিদেশী কোম্পানীগুলোকে তেল বা গ্যাস তুলতে দেয়ার তদবির ছাড়া আর কিছুই নয়। ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হওয়ার জন্যেই এসব কথা বলা হচ্ছে। এখন যদি বর্তমান সরকারকে সাবধান করা না হয়, বহুজাতিক কোম্পানীগুলোর সঙ্গে যে-সব অসম চুক্তি সম্পাদিত হবে, তার ফলে দু'হাজার দশ সালের মধ্যে দেশটার সমস্ত তেল ও গ্যাস ভাণ্ডার নিঃশেষ হয়ে যাবে।

বাংলাদেশের দরিদ্র অবস্থা সম্পর্কে লরেলি সচেতন। শুধু রানার সঙ্গে দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বের কারণে নয়, মানবিক ও নৈতিক কারণেও দেশটার প্রতি তার সহানুভূতি আছে। সরকারী কর্মকর্তা ও কংগ্রেস সদস্যদের সঙ্গে সে-ও বাংলাদেশে যেতে চায়, এটা জানার পর প্রভাবশালী অনেকেই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির চেষ্টা করেছিল। তাদের বিরোধিতার কারণ একটাই, লরেলি কোন মার্কিন কোম্পানীর তথা মার্কিন স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করছে না। লরেলি সে-সব তোয়াক্কা না করে সরাসরি প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ব্যাপারটা নিয়ে আলাপ করে, তাঁকে বোঝাতে সমর্থ হয় যে প্রচুর গ্যাস ও তেল সম্পদ থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ যদি গরীব থেকে যায় সেটা শেষ পর্যন্ত মার্কিন স্বার্থের বিরুদ্ধেই যাবে। প্রেসিডেন্টও এ-ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে সচ্ছল ও প্রাচুর্যময় বাংলাদেশই ভবিষ্যতে মার্কিন স্বার্থের অনুকূল হবে। সংশ্লিষ্ট সবাইকে কথাটা তিনি জানিয়েও দিয়েছেন। ফলে স্বভাবতই

লরেলির যাওয়া নিয়ে আর কেউ প্রকাশ্যে কোন বাধা দেয়নি।

রানা যে কৃতজ্ঞতাবোধ করছে, সেটা বোঝা গেল ওর সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে পড়তে। 'তাহলে আমার কি হবে?' সকৌতুকে জানতে চাইল ও।

'সত্যি যদি বিশ্রাম নিতে চাও, এই ফ্ল্যাটে তোমার থাকা ঠিক হবে না,' বলল লরেলি। 'শহরতলিতে আমার যে খামার বাড়িটা আছে, তুমি সেখানে চলে যাও। এখানে থাকলে দিনে অন্তত এক হাজার ফোন ধরতে হবে। ওখানে বাড়িটা খালি পড়ে আছে, কেউ তোমাকে বিরক্ত করবে না। পাঁচ-সাতটা গাড়ি আছে, যেটা খুশি চালাতে পারবে। ছোট দুটো প্লেন আছে, ইচ্ছে হলে আকাশেও উড়ে বেড়াতে পারবে। আর তোমার মত এসপিওনাজ এজেন্টের যেটা একান্ত দরকার, নিরাপত্তা, তা-ও তুমি ওখানে পাবে। ওখানকার সিকিউরিটি সিস্টেম তোমার নিজের হাতে তৈরি।'

অগত্যা তাতেই রাজি হয়ে এখানে চলে এসেছে রানা।

খামার বাড়িটা আসলে মূল বাড়ির পিছন দিকে। প্রায় পরিত্যক্তই বলা যায়। আর সামনের দিকে রয়েছে বিশাল একটা হ্যাঙ্গার। চারদিকে চক্কর দিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেও বোঝার উপায় নেই যে আধুনিক আরাম-আয়েশের সুব্যবস্থা সহ ভেতরে একটা বাড়ি আছে।

হ্যাঙ্গারটাকে সারি সারি ফ্লাডলাইট আলোকিত করে রাখেনি। লরেলি চেয়েছে সবাই যাতে ধরে নেয় এখানে কেউ বাস করে না, পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। কাঁকর ছড়ানো মেঠো একটা পথ এসে হ্যাঙ্গারের ফটকে থেমেছে, ইলেকট্রিক পোলের মাথায় লাগানো একটা বালব হলদেটে আলো ছড়াচ্ছে নিচে। ঘাড় ফিরিয়ে গাড়ির জানালা দিয়ে ইলেকট্রিক পোলের মাথার দিকে তাকাল রানা। ওখানে লুকানো একটা সিকিউরিটি ক্যামেরা আছে, সেটা থেকে লাল একটা রশ্মি বেরুনোর কথা, অথচ বেরুচ্ছে না। মাথার ভেতর বিপদ সঙ্কেত বাজার কারণটা বোঝা গেল। ভয়ানক খারাপ কিছু ঘটেছে, এ তারই স্পষ্ট আভাস।

সিকিউরিটি সিস্টেম রানার নিজের হাতে তৈরি, লরেলির এই কথাটা অতিরঞ্জিত। সিস্টেমটার ডিজাইন রানার মাথা থেকে বেরুলেও, স্থাপনার কাজটা করে দিয়ে গেছে রানা এজেন্সির এক্সপার্টরা। দক্ষ একজন প্রফেশনাল ছাড়া এই সিস্টেমের কোড ভাঙা সম্ভব নয়। ফাঁকা ও নির্জন জায়গাটার চারদিকে চোখ বুলাল রানা। পটোম্যাক নদীতে প্রতিফলিত হচ্ছে শহরের আলো, তার আভায় অস্পষ্টভাবে একটা ভ্যানের ছায়া দেখা গেল পঞ্চাশ গজ দূরের হাইওয়েতে। জ্যোতিষীর কাছে যাবার প্রয়োজন নেই, এমনিতেই বোঝা যাচ্ছে যে কেউ একজন বা কয়েকজন হ্যাঙ্গারে ঢুকে ওকে অভ্যর্থনা জানাবার প্রস্তুতি নিয়ে অপেক্ষা করছে।

'তোমার নাম কি?' ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'স্টিভ হলারম্যান।'

'স্টিভ, তোমার কাছে কি স্যাটেলাইট ফোন আছে?'

'ইয়েস, স্যার, আছে,' জবাব দিল হলারম্যান।

'অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের সঙ্গে যোগাযোগ করো। বলবে, অবাঞ্ছিত অতিথি এসেছে বাড়িতে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সিকিউরিটি ফোর্স দরকার এখানে।'

স্থানীয় 'ভার্সিটিতে ওশেনোগ্রাফী পড়ছে হলারম্যান, বয়েস এখনও বিশ পার হয়নি, পড়াশোনার ফাঁকে নুমার মেরিন এডুকেশনাল প্রোগ্রামে নাম লিখিয়ে হাত-খরচার টাকা তুলছে। নুমার অ্যাসাইনমেন্ট ও হুয়ান হান সম্পর্কে ব্রিফ করার জন্যে আজ রানাকে ডেকেছিলেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। হলারম্যানই ওকে নিয়ে যায়, পৌঁছেও দিল। 'স্যার, পুলিসকে খবর দেয়া উচিত নয়?'

বুদ্ধিমান ছেলে, ভাবল রানা, পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝতে সময় নেয়নি। 'স্থানীয় পুলিসের কাজ নয় এটা। এখুনি এই জায়গা ছেড়ে পালাও তুমি, তারপর অ্যাডমিরালের সঙ্গে যোগাযোগ করো। তিনি বুঝবেন কি করতে হবে।'

'আপনি একা ভেতরে ঢুকবেন?' রানাকে গাড়ি থেকে নেমে যেতে দেখে জিজ্ঞেস করল হলারম্যান।

নিচে নেমে গাড়ির ভেতর তাকাল রানা। হাসিমুখে বলল, 'আর কোন উপায় নেই।' কি বুঝল কে জানে, গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে চলে গেল ছেলেটা। গাড়ির লাল টেইললাইট অস্পষ্ট হয়ে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করল রানা। আসলে চিন্তা করছে। ওর সঙ্গে কোন অস্ত্র নেই। একটাই কাজ করার আছে, বোকা সাজা। এমন ভঙ্গিতে হ্যাঙ্গারে ঢুকতে হবে যেন কিছুই সন্দেহ করেনি। ভেতরে ঢোকার পর লরেলির একটা গাড়ির নাগাল পেতে হবে। কয়েকটা গাড়ি আছে, ওর দরকার নীল ক্যাডিলাকটা। রানা জানে, ওটার ভেতর একটা ওয়ালনাট কেবিনেটে লরেলির শটগানটা লুকানো আছে। কেবিনেটটা তৈরি করা হয়েছিল ছাতা রাখার জন্যে।

পকেট থেকে ছোট একটা রিমোট ট্র্যান্সমিটার বের করল রানা, ঠোঁটের সামনে তুলে শিস দিয়ে জাতীয় সঙ্গীতের সুর বাজাল পাঁচ সেকেন্ড। সাউন্ড-রিকগনিশন সিগন্যাল পেয়ে ইলেকট্রনিকগুলো সিকিউরিটি সিস্টেম বন্ধ করে দিল, সেই সঙ্গে খুলে দিল মান্ধাতা আমলের একটা দরজা, দেখে মনে হচ্ছে শেষবার খোলা হয়েছে উনিশশো পঁয়তাল্লিশ সালে। রিমোটে সবুজ একটা আলো জ্বলল পরপর তিনবার। চারবার জ্বলার কথা, জানে রানা। সিকিউরিটি সিস্টেম নিউট্রালাইজ করার কাজে ওস্তাদ কোন লোক ওর কোড ভাঙতে সফল হয়েছে। চোখ বুজে এক মুহূর্ত নড়ল না রানা, বুক ভরে বাতাস টানল। ক্যাঁচ-ক্যাঁচ আওয়াজ তুলে দরজা যখন খুলে যাচ্ছে, মাটিতে কনুই আর হাঁটু ঠেকাল ও, শুধু হাতটা ফ্রেমকে ঘুরে হ্যাঙ্গারে ঢুকে গেল, জ্বেলে দিল ভেতরের আলোটা।

ভেতরের দেয়াল, মেঝে আর ছাদে উজ্জ্বল সাদা রঙ চকচক করছে। বিভিন্ন রঙের পাঁচটা গাড়ি তো আছেই, আরও রয়েছে লাল ও সবুজ রঙের দুটো প্লেন। আলোটা জ্বেলে প্রতিপক্ষের চোখ ধাঁধিয়ে দেয়াই রানার উদ্দেশ্য। নিজেকে আরেকবার মনে করিয়ে দিল, নীল ক্যাডিলাকটার কাছে পৌঁছুতে হবে ওকে। দরজার কাছ থেকে তৃতীয় গাড়িটাই ক্যাডিলাক।

অতিথি যে বন্ধু নয়, সেটা নিশ্চিত হওয়া গেল এক পশলা গুলি হওয়ায়। ভোঁতা আওয়াজ, বুলেটগুলো দোরগোড়ায় ছড়িয়ে পড়ল। অস্ত্রে সাপ্রেসর লাগানো থাকায় গুলির আওয়াজ বলে চেনাই গেল না। এক মাইলের মধ্যে কেউ নেই, তাসত্ত্বেও সাইলেন্সার ব্যবহার করছে ওরা। রানা আবার ঝট করে হাত ঢোকাল হ্যাঙ্গারের ভেতর, নিভিয়ে দিল আলোটা।

থেমে থেমে গুলি হচ্ছে, লক্ষ্য দোরগোড়া। গুলির ধরন ও ছন্দ আঁচ করে নিয়ে সাপের মত ক্রল করে ভেতরে ঢুকে পড়ল রানা, আড়াল পেল প্রথম দুটো গাড়ির নিচে। ও কোথায় রয়েছে প্রতিপক্ষ জানে না, অক্ষত অবস্থায় ক্যাডিলাকের পাশে পৌঁছুতে কোন অসুবিধে হলো না। দরজা খুলে পিছনের সীটে উঠল রানা, সামনের সীটের পিছনে তৈরি কেবিনেটের দরজা খুলে হাতে নিল অ্যাসারমা টুয়েলভ-গজ বুলডগ সেলফ-ইজেক্টিং শটগানটা, ভেতরে গুলি ধরে বারোটা।

হ্যাঙ্গারের ভেতরটা পাহাড়ী গুহার মত অন্ধকার। রানা ধারণা করল, লোকগুলো যেহেতু প্রফেশনাল, ওদের সঙ্গে নিশ্চয়ই নাইটভিশন স্কোপ আর ইনফ্রারেড লেযার সাইট আছে। অকস্মাৎ আলোটা নিভে যাওয়ায় প্রথম কয়েক সেকেন্ড সম্ভবত অ্যাডজাস্ট করতে বেরিয়ে গেছে, যে কারণে রানাকে ভেতরে ঢুকতে দেখতে পায়নি ওরা। দোরগোড়ার ওপর ও চারপাশে এখনও গুলি হচ্ছে। রানা আন্দাজ করল, ভেতরে সম্ভবত দু'জন আততায়ী আছে পুরোপুরি অটোমেটিক মেশিন পিস্তল নিয়ে। গুলির তৈরি পথ লক্ষ করলে বোঝা যায় একজন আছে মেঝেতে কোথাও। আরেকজন আছে হ্যাঙ্গারের এক কোণে ত্রিশ ফুট ওপরের ক্যাটওয়াকে।

গুলি থেমে গেল। দরজার দিকে এগোচ্ছেও না কেউ। তারমানে খুনীরা ধরে নিয়েছে রানা এখন ভেতরে, হ্যাঙ্গারের মেঝেতে কোথাও আছে। শিকার বিপদ আঁচ করার পরও ভেতরে ঢুকেছে, এটা ওদেরকে সতর্ক ও অস্থির করে তুলবে।

রানার যাবার কোন জায়গা নেই, নিঃশব্দে ক্যাডিলাকের পিছনের দুই দরজা খুলে অন্ধকারে উঁকি মারছে, বোঝার চেষ্টা করছে এরপর প্রতিপক্ষ কি করবে। শ্বাস-প্রশ্বাসের আওয়াজ কমিয়ে আনল, অস্পষ্ট কোন শব্দ হচ্ছে কিনা শোনার জন্যে কান দুটো সজাগ। পাঁজরে হৃৎপিণ্ডের বাড়ি অনুভব করছে, সেটাই বাজছে কানে, অন্য কোন আওয়াজ নেই। মৃত্যু ভয় ওকে গ্রাস করছে না, হতাশ বা অসহায় বোধও নেই, তবে দু'জন পেশাদার খুনীর টার্গেট হওয়ায় যে-কোন মানুষ ভয় পাবে, না পেলে সে মানুষ নয়। সুবিধে হলো, এই পরিবেশ রানার পরিচিত। হ্যাঙ্গারের ভেতর কোথায় কি আছে চোখ বুজে বলে দিতে পারবে ও। বাড়ির ভেতর ঢুকতে হলে প্রথমে হ্যাঙ্গারে ঢুকতে হবে, এটা জেনেই এখানে ওত পেতে অপেক্ষা করছে লোক দু'জন। প্ল্যানটা ছিল, ঢোকার মুখেই ঝাঁঝরা করে দেবে ওকে। রানা হ্যাঙ্গারে ঢোকার আগে যে সুবিধেটুকু ওরা পাচ্ছিল, সেটা নষ্ট হয়ে গেছে। এখন ওদেরকে অন্ধকারের ভেতর রানাকে খুঁজে নিতে হবে। রানার এখন একটাই কাজ, ওরা কখন ভুল করবে তার অপেক্ষায় ক্যাডিলাকের ভেতর বসে থাকা।

চিন্তা করছে, কারা ওরা? কে পাঠিয়েছে? প্রথমেই হুয়ান হানের নামটা মনে পড়ল। বর্তমানে সেই ওর সবচেয়ে বড় শত্রু।

বুকের ওপর শটগানটা ফেলে রেখে হাত দিয়ে কান দুটোকে কাপ বানাল রানা, কিছু শোনার আশায় গভীর মনোযোগী। হ্যাঙ্গারটা মাঝরাতের গোরস্থানের মত নিস্তব্ধ। খালি বা মোজা পরা পায়ের নরম খসখস শব্দও হচ্ছে না। তবে খালি বা মোজা পরা পা যদি সাবধানে ফেলা হয় কংক্রিটে, কোন শব্দ হবেও না। ওরাও

সম্ভবত রানা ভুল করবে এই আশায় কান পেতে অপেক্ষা করছে। দেয়ালের গায়ে কিছু একটা ছুঁড়ে মারলে সেদিকে ওরা গুলি করবে, পুরানো সিনেমার এই কৌশলটা বাতিল করে দিল রানা। শব্দ হলেই অকস্মাৎ গুলি করে পাকা খুনী আজকাল নিজের পজিশন ফাঁস করে না।

এক মিনিট পার হলো। তারপর দু'মিনিট। তিন মিনিট। বোধহয় আরও বেশি। সময় যেন নরম আর আঠালো গুড়ের একটা অলস ধারা, গতি থাকলেও টের পাওয়া যায় না। চোখ তুলে লাল লেযারের রশ্মি দেখতে পেল রানা, ক্যাডিলাকের উইন্ডশীল্ড ছুঁয়ে সরে গেল। ওরা বোধহয় সন্দেহ করছে ফাঁদটাকে ফাঁকি দিয়ে শিকার হ্যাঙ্গার থেকে বেরিয়ে গেছে কিনা। ফেডারেল মার্শালদের সঙ্গে নিয়ে অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন পৌঁছুতে কতক্ষণ নেবেন, বলা কঠিন। তবে প্রয়োজনে সারারাত অপেক্ষা করবে রানা। ওদের কোন শব্দ না পেয়ে বা কোন ছায়া না দেখে গাড়িটা থেকে বেরুবে না।

তারপর একটা বুদ্ধি এল মাথায়। গাড়ির হেডলাইট জ্বেলে হ্যাঙ্গারের মেঝে আলোকিত করা যায়।

একটা চোখ থাকল লেযার রশ্মির ওপর, খুদে গার্ড-টাওয়ার লাইটের মত হ্যাঙ্গারের চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে ওটা। ব্যাকরেস্টের ওপর দিয়ে গড়িয়ে নিঃশব্দে সামনের সীটে চলে এল রানা। শটগানটা তাক করল জানালার ফাঁক দিয়ে। হেডলাইট দুটো যেদিকে মুখ করে আছে, ত্রিশ ফুট দূরের ক্যাটওয়াকে আলো যদি সরাসরি নাও পড়ে, ওখানে কেউ থাকলে আলোর আভায় পরিষ্কার দেখা যাবে তাকে।

সুইচ অন করল রানা। কালো নিনজা সুট পরা এক লোক ক্যাটওয়াকের রেইলিং ধরে বসে আছে, সুটের হুড ঢেকে রেখেছে মাথা আর মুখ, অপর হাতে একটা ট্যাকটিকাল মেশিন পিস্তল। আভা নয়, আলোটা সরাসরি পড়ায় ধাঁধিয়ে গেল চোখ; হাত তুলল ওগুলো ঢাকার জন্যে। পর পর দুটো গুলি করেই দেরি নয়, হেডলাইট নিভিয়ে দিল রানা। ধাতব দেয়ালের ভেতর কামানের গোলার মত শোনাল আওয়াজ দুটো। কংক্রিটের মেঝেতে ভারী কিছু পতনের শব্দ দারুণ তৃপ্তিকর লাগল কানে। রানা আন্দাজ করল দ্বিতীয় খুনী ধরে নেবে গাড়ির নিচে আত্মগোপন করেছে ও। আত্মরক্ষার জন্যে চওড়া রানিং বোর্ডে লম্বা করে দিল শরীরটা, এক ঝাঁক বুলেটের অপেক্ষায় দম বন্ধ করে থাকল।

কোন গুলি হলো না।

হ্যাঙ্গারের এক পাশে একজোড়া রেললাইন আছে, তার ওপর রয়েছে একটা অ্যান্টিক পুলম্যান কোচ। কোচ বা কারটা ম্যানহাটন লিমিটেড নামে প্রসিদ্ধ এক্সপ্রেস ট্রেনের একটা অংশ, উনিশশো বারো থেকে উনিশশো চোদ্দ সাল পর্যন্ত নিউ ইয়র্ক আর কানাডার কুইবেকের মধ্যে চলাচল করত। কোচটাকে একটা গুহা থেকে রানাই উদ্ধার করে উপহার হিসেবে লরেলিকে দিয়েছিল। দ্বিতীয় খুনী ওই কোচের ভেতর খুঁজছে ওকে, ফলে শটগানের আওয়াজ শুনতে পেলেও পুলম্যানের জানালা দিয়ে আলোর ঝলক পরিষ্কার দেখতে পায়নি। ছুটে পিছনের প্ল্যাটফর্মে যখন বেরিয়ে এল, হ্যাঙ্গার আবার অন্ধকার হয়ে গেছে। বেরিয়ে আসতে দেরি

করায় মেঝেতে প্রথম আততায়ীর পতন সম্পর্কেও তার কোন ধারণা নেই, জানে না কোথায় কাকে টার্গেট করতে হবে। পুরানো একটা রোলস-রয়েসের পিছনে গুঁড়ি মেরে বসে থাকল সে, সামনের গাড়িগুলোর চারপাশে আর তলায় তাকাচ্ছে নাইট-ভিশন গগলসের ভেতর দিয়ে। সিঙ্গেল একটা অবজেকটিভ লেন্সের সঙ্গে বিনকিউলার আইপীস লাগানো আছে, ফলে অন্ধকার হ্যাঙ্গারের প্রতিটি জিনিস সবুজ দেখতে পাচ্ছে চোখে। বিশ ফুট সামনে সঙ্গীর দোমড়ানো কাঠামোটা দেখতে পেল সে, মাথা থেকে বেরিয়ে মেঝেতে রক্ত জমা হচ্ছে। স্বেচ্ছায় এবং সব জেনে ফাঁদে কেন পা দিয়েছে শিকার, পরিষ্কার হয়ে গেল। শিকার হতে রাজি নয় শিকার, রুখে দাঁড়িয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী হতে চায়। গোপনীয়তা আর চালাকির জবাব দিতে চায় ওই একই নিয়মে। শক্ত ওস্তাদের পাল্লায় পড়েছে বাপ, খালি হাতে ভেতরে ঢুকে নিজেকে সশস্ত্র করে নিয়েছে। আগেই ওদেরকে এই বলে সাবধান করে দেয়া হয়েছিল যে টার্গেট অত্যন্ত বিপজ্জনক, কিন্তু কথাটা হালকাভাবে নেয় ওরা।

সুবিধে যখন একটা আছে, রানার জন্যে চাল দেয়াটা এখন জরুরী, ওর পজিশন প্রতিপক্ষ স্পষ্টভাবে টের পাবার আগেই। নিজের নড়াচড়া গোপন করার দরকার নেই। গুরুত্ব শুধু ক্ষিপ্রতার। রোলস-রয়েসের নিচে নেমে হামাগুড়ি দিয়ে হ্যাঙ্গারের দরজার দিকে এগোল ও। দরজাটা খুলেই ডাইভ দিল পিছন দিকে, ফিরে এল একটা গাড়ির পিছনে। দরজা খোলার শব্দ থামতে না থামতে হ্যাঙ্গারের ভেতর থেকে এক পশলা বুলেট বাইরে বেরিয়ে গেল। হ্যাঙ্গারের দেয়াল ঘেঁষে নিঃশব্দে এগোচ্ছে রানা, থামল একটা মার্সিডিজ-বেঞ্জের চাকার পাশে, পলকহীন চোখে দরজার দিকে তাকিয়ে আছে।

নিঃসঙ্গ আততায়ী ধরে নিয়েছে হ্যাঙ্গার ছেড়ে পালাবার চেষ্টা করেছে রানা, খোলা দরজা লক্ষ্য করে গুলি করার অন্য কোন কারণ নেই। কংক্রিটের মেঝেতে রাবার সোল লাগানো জুতোর নরম আওয়াজ ঢুকল কানে। তারপর কালো কাপড়ে মোড়া একটা মূর্তি উদয় হলো দোরগোড়ায়, ইলেকট্রিক পোলের হলদেটে আলোর গায়ে কাঠামোটা স্পষ্ট। যুদ্ধে আর প্রেমে সব চলে, ট্রিগার টানার সময় ভাবল রানা। লোকটার ডান কাঁধের নিচেটা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল।

হাত দুটো সামনে ও ওপর দিকে উড়তে চাইছে, হ্যাঙ্গারের সামনের পথের ওপর পড়ে ধাতব শব্দ তুলল মেশিন পিস্তলটা। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকল সে, খামচে চোখ থেকে খুলে আনল নাইট-ভিশন গগলস, তারপর ধীরে ধীরে ঘুরল। চোখে অবিশ্বাস, রানাকে এগিয়ে আসতে দেখছে–শিকারী নিজেই এখন শিকার-ভয়ালদর্শন শটগানটা সরাসরি বুকের দিকে তাক করা। উপলব্ধি করল সংশোধনের অযোগ্য ভুল হয়ে গেছে, আর মাত্র কয়েক সেকেন্ড পরই নির্ঘাত মৃত্যু। ভয় নয়, রাগটাই মাত্রায় বেশি। নগ্ন চোখে সেই রাগ, তার সঙ্গে ক্ষোভ, ঘৃণা আর হিংস্র ভাবটুকু এখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে রানা; ওর সারা শরীর শিরশির করে উঠল। এ দৃষ্টি মৃত্যুভয়ে কাতর কোন লোকের নয়, ব্যর্থতা মেনে নিতে নারাজ একজন বেপরোয়া পশুর। এগোবার সময় হোঁচট খাচ্ছে, প্রতিটি হোঁচট সামলে নেয়ার ব্যর্থ চেষ্টার মধ্যে মর্যাদা রক্ষা আর শক্তি প্রদর্শনের ইচ্ছেটুকু স্পষ্ট হয়ে উঠল, ভাবটা যেন এখনও সে খালি হাতে শত্রুর সামনে দাঁড়াতে পারবে।

রানা গুলি করল না। শটগানটাকে উল্টো করেও ধরল না। সামনে এগিয়ে ঝেড়ে একটা লাথি মারল পায়ে। ছিটকে মেঝেতে পড়ল লোকটা।

মেশিন পিস্তলটা তুলে পরীক্ষা করল রানা। পঞ্চাশ রাউন্ড গুলি ধরে ম্যাগাজিনে, টেলিস্কোপিক কার্টিজগুলো রাইফেল শেলের মত। নতুন উদ্ভাবিত অত্যাধুনিক একটা অস্ত্র।

পিছিয়ে এসে হ্যাঙ্গারের আলোটা আবার জ্বালল রানা। সম্পূর্ণ শান্ত ও নির্লিপ্ত দেখাচ্ছে ওকে। প্যাঁচানো সিঁড়ি বেয়ে ক্যাটওয়াকে উঠে এল, ওপর থেকে তাকাল মেঝেতে পড়ে থাকা প্রথম আততায়ী লাশের দিকে। ওর একটা বুলেট লাগেনি, দ্বিতীয় বুলেটটা খুলি উড়িয়ে দিয়েছে। এসব ডিনার টেবিলে স্মরণ করার মত কোন দৃশ্য নয়।

ক্যাটওয়াক থেকে আরেক প্রস্থ সিঁড়ি বেয়ে লরেলির অ্যাপার্টমেন্টে উঠে এল রানা। এখন আর নাইন-ওয়ান-ওয়ান-এ ফোন করে কোন লাভ নেই। যে-কোন মুহূর্তে ফেডারেল মার্শালরা পৌঁছে যাবে। এক গ্লাস পানিতে লেবুর ক ফোঁটা রস ফেলল, সামান্য লবণ মিশিয়ে খেয়ে ফেলল ঢকঢক করে। একটা সোফায় বসে গা এলিয়ে দিল।

পাঁচ মিনিট পর পৌঁছুলেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন, সঙ্গে মার্শালদের একটা টীম। হাতে আরেক গ্লাস পানি, হ্যাঙ্গারে নেমে এল রানা। 'গুড ইভনিং, অ্যাডমিরাল।'

উত্তরে কিছু একটা বিড়বিড় করে বললেন অ্যাডমিরাল, তারপর মেঝেতে পড়ে থাকা লাশ দুটোর দিকে ইঙ্গিত করলেন। 'যেখানেই যাও সেখানেই ওরা তোমার পিছু নেয়,' তিক্ত কণ্ঠে বললেন তিনি, তবে চোখের দৃষ্টিতে উদ্বেগ।

মৃদু হেসে কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'কিছু লোকের খুন হবার দরকার আছে, সেজন্যেই ওরা পিছু নেয়।'

'গল্পটা শোনা যাক,' ভারী গলায় বললেন অ্যাডমিরাল। 'কোত্থেকে এল ওরা?'

'কি করে বলব। ওরা আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল।'

'তাহলে তো ওদের বদলে তোমার বেঁচে থাকাটা মিরাকল।'

'আমি প্রস্তুতি নিয়ে ভেতরে ঢুকব, এটা ওরা আশা করেনি। সিকিউরিটি সিস্টেমে হাত দেয়া হয়েছে দেখে সতর্ক হই।'

রানার দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকালেন অ্যাডমিরাল। 'মার্শালদের নিয়ে আমার না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারতে।'

দরজার দিকে হাত তুলে রাস্তা আর ফাঁকা এলাকাটা দেখাল রানা। 'পালাবার চেষ্টা করলে পঞ্চাশ গজও যেতে পারতাম না, ওরা বাধা দিত। ভ্যানটা আপনি দেখেননি? অফেন্সিভে যাওয়াটাই ভাল মনে হলো। দ্রুত কিছু একটা করে ওদেরকে হতভম্ব করে দিতে চেয়েছি।'

চোখ কুঁচকে তাকালেন অ্যাডমিরাল। তাঁর ভাল করেই জানা আছে যে নিরেট কোন কারণ ছাড়া রানা কিছু করে না। ক্ষতবিক্ষত দরজার দিকে তাকালেন তিনি। 'ভাল একজন কাঠমিস্ত্রী দরকার হবে।'

দীর্ঘদেহী এক লোক ঢুকল ভেতরে, ব্যালিস্টিক আর্মার ভেস্টের ওপর একটা

উইন্ডব্রেকার চাপিয়েছে, শোল্ডার হোলস্টারে স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন রিভলভার। এক হাতে হুড লাগানো মাস্ক, দরজার সামনে পড়ে থাকা খুনী যেটা পরে ছিল। 'সনাক্ত করা সহজ হবে না। খুন করানোর জন্যে ওদেরকে সম্ভবত অন্য কোথাও থেকে আমদানী করা হয়েছে।'

অ্যাডমিরাল পরিচয় করিয়ে দিলেন, 'রানা, ইনি পিট লুকাস, ইমিগ্রেশন অ্যান্ড ন্যাচারালাইজেশন সার্ভিস-এর অ্যাসোশিয়েট কমিশনার।'

রানার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করলেন ভদ্রলোক। 'আ প্লেজার টু মীট ইউ, মি. রানা। আমাদের আইএনএস এজেন্ট শাকিলা সুলতানের মুখে আপনার কৃতিত্বের কথা শুনেছি। অপেক্ষায় ছিলাম, সাক্ষাতে কৃতজ্ঞতা জানাব। আপনি ওকে মৃত্যুর মুখ থেকে ছিনিয়ে এনেছেন।'

'শাকিলা কেমন আছেন?' তাড়াতাড়ি জানতে চাইল রানা, কেউ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে অস্বস্তিবোধ করে।

'জানি না কিভাবে এত দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠল,' বললেন লুকাস, যেন সত্যি বিস্মিত।

'আমি খুশি,' বলল রানা, তারপর অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল। 'বাইরে একটা ভ্যান...'

'এরইমধ্যে ওটা আমরা চেক করেছি,' বললেন লুকাস। 'একটা রেন্টাল-কার এজেন্সি থেকে আনা হয়েছে। চুক্তিপত্রে ভুয়া নাম।'

'এর পিছনে কে আছে বলে তোমার ধারণা?' জানতে চাইলেন অ্যাডমিরাল।

'একটা নামই মনে আসছে—হুয়ান হান,' বলল রানা। 'শুনেছি সে নাকি প্রতিশোধ নিতে ছাড়ে না।'

'তার নামই বলবে সবাই,' একমত হলেন অ্যাডমিরাল।

'আততায়ীরা ব্যর্থ হয়েছে শোনার পর আরও রেগে যাবে সে,' মন্তব্য করলেন লুকাস।

চতুর শিয়ালের হাসি ফুটল অ্যাডমিরালের ঠোঁটে। 'একটা কাজের কাজ হয় রানা যদি খবরটা তাকে ব্যক্তিগতভাবে জানায়।'

মাথা নাড়ল রানা। 'দুঃখিত, আইডিয়াটা পছন্দ হলো না। আমার সময় কোথায় যে তাইওয়ান বা হংকঙে যাব?'

হ্যামিলটন আর লুকাস দৃষ্টি বিনিময় করলেন। তারপর অ্যাডমিরাল বললেন, 'কষ্ট করে তোমাকে কোথাও যেতে হবে না। মাত্র কয়েক দিন হলো ওয়াশিংটনে পৌঁছেছে সে, ওরিয়ন লেকের সঙ্গে নিজের সমস্ত যোগাযোগ মুছে ফেলার জন্যে। চেভি চেজ-এ তার বাড়িতে আজ পার্টি আছে, কংগ্রেস সদস্য আর তাদের স্টাফকে খুশি করার জন্যে। কাপড় পরতে দেরি না করলে সময় মতই পৌঁছুতে পারবে।'

রানা বিশ্বাস করছে না। 'আপনি ঠাট্টা করছেন।'

'না, আমি সিরিয়াস।'

'আইডিয়াটা আমিও সমর্থন করি,' বললেন লুকাস। 'হান আর আপনি মুখোমুখি হন।'

'কিন্তু কেন? এরপর যাদেরকে পাঠাবে তাদেরকে যাতে আমার চেহারার বর্ণনা দিতে পারে সে?'

'না,' জবাব দিলেন অ্যাডমিরাল। 'তোমাকে আমি এ বিষয়ে আগেই ব্রিফ করেছি, রানা। নির্বাচনী তহবিলে মোটা টাকা দিয়ে প্রেসিডেন্টকে পর্যন্ত নিজের পক্ষে রাখতে পারছে হান। তোমাকে যে কথাটা বলা হয়নি, প্রভাবশালী কংগ্রেস সদস্যদেরকে হাতে রাখার জন্যে এক বিলিয়ন ডলার খরচ করেছে সে। আমি চাই ন্যায়, সততা ও বিশ্ববিবেকের প্রতিনিধি হিসেবে তার সামনে দাঁড়াও তুমি, বুঝিয়ে দাও টাকা আর ক্ষমতা যতই থাক, অপরাধ করায় শাস্তি তাকে পেতেই হবে।'

আর লুকাস বললেন, 'আপনাকে দেখে ভূত দেখার মত চমকে উঠবে হান। এই শক ভবিষ্যতে তাকে দিয়ে ভুল করাবে। আর ঠিক তখনই তাকে আমরা খপ করে ধরব।'

যুক্তিগুলো বুঝল রানা। 'ঠিক আছে, যাব। কিন্তু আমন্ত্রণ ছাড়া কিভাবে?'

'সব ব্যবস্থা করাই আছে,' ব্যাখ্যা করলেন লুকাস। 'এজেন্ট হিসেবে সুনাম বজায় রাখতে হলে আমন্ত্রণ-লিপি ছাপে এমন কোম্পানীর সঙ্গে সদ্ভাব রাখতে হয়।'

'আপনার দেখছি নিজের ওপর আস্থা খুব বেশি।'

'না, আমার নয়,' বললেন লুকাস। 'অ্যাডমিরালই আমাকে জানালেন যে বিনা পয়সায় ভাল খাবারদাবার সাধা হলে কখনোই আপনি তা প্রত্যাখ্যান করেন না।'

রানার চোখে অস্বস্তি, অ্যাডমিরালের দিকে তাকিয়ে বলল, 'অ্যাডমিরাল অন্যায়ভাবে একটা আর্ট ফর্মকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছেন।'

'আমি এমনকি আপনার জন্যে একজন এসকর্ট-এর ব্যবস্থাও করেছি,' বললেন লুকাস। 'বিপদ দেখা দিলে খুবই সুন্দরী এক ভদ্রমহিলা আপনাকে সাহায্য করবেন।'

'সুন্দরী ভদ্রমহিলা? শুধু হাত-পা ছুঁড়বেন, নাকি লাথি-টাথি মারতে জানেন?'

'আমাকে বলা হয়েছে, ওরিয়ন লেকে তিনি দু'দুটো প্লেন গুলি করে নামিয়েছেন।'

'শাকিলা।' চওড়া হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে।

নয়

পিট লুকাসের দেয়া ঠিকানা মিলিয়ে একটা অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের তিনতলায় উঠল রানা, নক করল ফ্ল্যাটের দরজায়। একটু পর আবার নক করতে যাবে, দরজা খুলল শাকিলা। সাদা একটা সিল্ক কাশ্মীরী ড্রেসে ঝলমল করছে মেয়েটা। ড্রেসের নিচের অংশ হাঁটু পর্যন্ত ঢেকেছে, পুরো কাঁধ আর পিঠের খানিকটা ঢাকেনি, শরীরের সঙ্গে ওটাকে আটকে রেখেছে গলায় জড়ানো সরু এক স্ট্র্যাপ। ঘন কালো সমস্ত চুল মস্ত একটা খোঁপায় পরিণত হয়েছে। অলঙ্কার বলতে কোমরে পেঁচানো সরু একটা সোনার চেন আর একটা সোনার কাফ নেকলেস। পা

অনাবৃত, খোলা সোনালি জুতোর ভেতর পায়ের পাতা দেখা যাচ্ছে।

চোখ দুটো বড় হলো। 'রানা, মাসুদ রানা!' বিড়বিড় করল শাকিলা।

'হ্যাঁ, আর তো কাউকে দেখছি না।' রানার ঠোঁটে শব্দহীন শয়তানি হাসি।

ভেস্ট আর গোল্ড ওয়াচ চেন সহ টকসিডো পরা রানাকে সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে প্রথমে বিহ্বল হয়ে পড়ল শাকিলা, তারপর সেটা কাটিয়ে উঠে ঝোঁকের মাথায় বা আবেগের বশে স্যাঁৎ করে রানার এত কাছে চলে এল, প্রায় ধাক্কা খেতে যাচ্ছিল দুটো শরীর। খপ করে ওর একটা হাত ধরে টান দিল শাকিলা, ফলে আরও কাছাকাছি হলো দু'জন। রানা কিছুটা হতভম্ব, কারণ ঠিক এ-ধরনের স্বতস্ফূর্ত অভ্যর্থনা আশা করেনি ও। যেন রানার মনোভাব বুঝতে পেরেই হাতটা ছেড়ে দিল মেয়েটা, পটলচেরা কালো চোখ দুটো নত করল।

'আপনি কি সব ব্লাইন্ড ডেটকেই এভাবে প্রশ্রয় দেন?' কৌতুক করল রানা।

চোখ তুলল শাকিলা। 'হঠাৎ আমার কি হলো বলতে পারব না। আপনাকে দেখে একটা ধাক্কা খেয়েছি। হুয়ান হানের পার্টিতে কে আমার এসকর্ট জানতাম না। পিট লুকাস আমাকে শুধু বলেছেন যে আমার ব্যাকআপ হিসেবে সুদর্শন এক ভদ্রলোক থাকবেন।'

'ভদ্রলোক নাট্য পরিচালক হলে ভাল করতেন,' বলল রানা। 'আমরা দু'জন এমন একটা জোড়া, একসঙ্গে দেখলে হান না বেহুঁশ হয়ে যায়। আচ্ছা, আপনি আছেন কেমন?'

'দেখতেই তো পাচ্ছেন কি পরিমাণ মেকআপ ব্যবহার করেছি—ক্ষতের দাগ ঢাকার জন্যে। না জানি কেমন দেখাচ্ছে। আমি সঙ্গে থাকছি, আপনার খারাপ লাগবে না তো?'

শাকিলার চিবুকে একটা আঙুল রেখে মুখটা একটু উঁচু করল রানা। 'লাগবে, হীরের একটা খনি আবিষ্কারের পর যেমন লাগে।'

'ও-মা,' প্রলম্বিত সুরে বলল শাকিলা, 'আপনি এত সুন্দর কথা বলতেও পারেন!'

'শুধু সুন্দরীদের মনোরঞ্জনের জন্যে আরও অনেক কিছু পারি।'

'মিথ্যুক,' হেসে ফেলে বলল শাকিলা।

'মিষ্টি-মধুর আলাপচারিতার এখানেই সমাপ্তি,' বলল রানা, শাকিলার চিবুকটা ছেড়ে দিল। 'দেরি করে গেলে দেখব খাবার শেষ।'

পার্স আর কোট নিয়ে রানার সঙ্গে নিচে নামল শাকিলা, ক্যাডিলাকে চড়ার পর বলল, 'উইন্ডশীল্ডে কিসের ফুটো এটা? বুলেটের মনে হচ্ছে?'

'হ্যাঁ। হান দু'জন লোক পাঠিয়েছিল।'

'আপনাকে মারার জন্যে?' ফুটোর দিকে সম্মোহিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে শাকিলা। কোথায়?'

'আমার এক বন্ধুর বাড়িতে,' ইচ্ছে করেই বান্ধবীর বদলে বন্ধু শব্দটা ব্যবহার করল রানা।

'কি ঘটল?'

'ভদ্রতা দেখাতে ব্যর্থ হয় তারা, কাজেই যেখানে তাদের থাকা দরকার সেখানে পাঠিয়ে দিয়েছি।' স্টার্ট দিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল রানা।

আর কোন তথ্য পাওয়া যাবে না, বুঝতে পেরে চওড়া লেদার সীটে পা এলিয়ে দিল শাকিলা, ওয়াশিংটনের রাস্তা-ঘাট দেখছে।

কলম্বিয়া ডিস্ট্রিক্ট থেকে বেরিয়ে এসে উইসকনসিন এভিনিউ ধরে খানিক দূর এগোল রানা, মোড় ঘুরে আবাসিক এলাকায় ঢুকল। রাস্তার দু'পাশে সারি সারি গাছ, বসন্তের শুরুতে নতুন পাতা গজিয়েছে। আরেকটা বাঁক ঘুরে একটা গেটে পৌছুল গাড়ি, পথের শেষ মাথায় হুয়ান হানের চেভী চেজ ম্যানসন। লোহার গেটে বারগুলোর সঙ্গে জড়িয়ে তৈরি করা হয়েছে একটা চীনা ড্রাগন। চকচকে নীল ক্যাডিলাকের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল দু'জন ইউনিফর্ম পরা গার্ড, বুলেটের তৈরি উইন্ডশীল্ডের ফুটোটাই সেজন্যে দায়ী। তারপর এগিয়ে এল তারা, আমন্ত্রণ-লিপি দেখতে চাইল। খোলা জানালা দিয়ে এনভেলাপে ভরা দুটো কার্ড বের করে দিল রানা। অতিথিদের তালিকা পরীক্ষা করছে গার্ডরা, রানা আর শাকিলা সত্যি আমন্ত্রিত অতিথি কিনা নিশ্চিত হতে চাইছে। তালিকায় নাম আছে দেখে হলদেটে চেহারায় হাসি ফুটল, কুর্নিশ করার ভঙ্গিতে মাথা নোয়াল, তারপর রিমোট ট্র্যান্সমিটারে চাপ দিয়ে খুলে দিল গেট। গাড়ি নিয়ে লম্বা পথটুকু দ্রুত পেরিয়ে এল রানা, থামল বাড়ির পোর্টিকোর নিচে। বাড়ির ভেতরটা ফুটবল স্টেডিয়ামের মত আলোকিত।

'আপনার বসের প্রশংসা করতে হয়,' বলল রানা। 'শুধু ইনভিটেশন কার্ড যোগাড় করেননি, কিভাবে কে জানে অতিথিদের তালিকায় আমাদের নামও ঢুকিয়ে দিয়েছেন।'

শাকিলাকে দেখে মনে হলো কিশোরী একটা মেয়ে তাজমহল দেখতে এসেছে। 'ওয়াশিংটনের বড় কোন পার্টিতে আগে কখনও আসিনি আমি। আপনাকে না বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে দিই।'

'ফেলবেন না,' আশ্বস্ত করল রানা। 'নিজেকে বলুন এটা স্রেফ একটা সামাজিক নাটক। ওয়াশিংটনের এলিটরা এ-ধরনের পার্টিতে আসেন, কারণ হয় তাঁরা কিছু বিক্রি করতে চান, নয়তো কিছু কিনতে। হাস্য-রসাত্মক কথাবার্তা হবে, মদ্যপান চলবে, চাল-চলনে নিজেকে প্রভাবশালী হিসেবে জাহির করার চেষ্টা থাকবে, তারই ফাঁকে হবে তথ্য বিনিময়।'

'বোঝা যাচ্ছে আপনি বহুবার এ-সব পার্টিতে এসেছেন।'

লম্বা এক লিমো থেকে হানের কয়েকজন অতিথি নামছেন, শাকিলার দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকালেন তাঁরা। একটা করে গাড়ি থামছে, পার্কিং অ্যাটেনড্যান্টরা ছুটে এসে দরজা খুলে দিচ্ছে। এক লোককে একপাশে অটল দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল রানা, নতুন যারা আসছেন শুধু তাদের ওপর চোখ বুলাচ্ছে। রানা আর জুলিয়া ক্যাডিলাক থেকে নামতেই নড়ে উঠল সে, ঘুরে বাড়ির ভেতরে চলে গেল। সন্দেহ নেই, বসকে সতর্ক করতে গেল—এমন দু'জন অতিথি এসেছেন, স্বাভাবিক প্যাটার্ন-এর সঙ্গে মানায় না।

পরস্পরের হাত ধরে বিশাল দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল ওরা। রানার কানে

ফিসফিস করল শাকিলা, 'শয়তান খুনীটাকে দেখে আমার না মাথায় রক্ত চড়ে যায়। যদি দেখেন মুখে থুথু ফেলতে যাচ্ছি, বাধা দেবেন, কেমন?'

'তবে জানাতে ভুলবেন না যে তার জাহাজে চড়ে আনন্দভ্রমণটা আপনি উপভোগ করেছেন।'

'আরও বলব যে আবার ওই আনন্দ উপভোগ করতে চাই।'

'তবে মনে রাখবেন যে এখানে একজন আইএনএস এজেন্ট হিসেবে এসেছেন আপনি।'

'আর আপনি?'

হেসে উঠল রানা। 'আমি এসেছি স্রেফ আপনাকে সঙ্গ দিতে।'

'দায়িত্ব এড়াবার চেষ্টা করছেন না তো?' শাকিলার চোখে সন্দেহ। 'কে জানে ঘাড়ে মাথা সহ এখান থেকে বেরুতে পারব কিনা।'

'ভিড়ের মধ্যে যতক্ষণ থাকব ততক্ষণ নিরাপদ। সমস্যা দেখা দেবে এখান থেকে বেরিয়ে যাবার পর।'

'চিন্তার কিছু নেই,' আশ্বস্ত করল শাকিলা। 'আমার বস্ বাইরে একটা সিকিউরিটি টীম রেখেছেন, সাবধানের মার নেই ভেবে।'

'হান অভদ্র ব্যবহার করলে আকাশে ফ্লেয়ার ছুঁড়ব আমরা?'

'ওদের সঙ্গে আমার সারাক্ষণ যোগাযোগ আছে,' বলল শাকিলা। 'রেডিওটা পার্সের ভেতর।'

খুদে পার্সটার দিকে চট করে একবার তাকাল রানা। 'অস্ত্রও কি আছে?'

মাথা নাড়ল শাকিলা। 'না।' তারপর হাসল। 'আপনি ভুললেও, আমি ভুলিনি–আপনাকে আমি অ্যাকশনে দেখেছি। জানি বিপদ হলে আপনি আমাকে রক্ষা করবেন।'

ক্ষয়া হয়ে চীনা শিল্পকর্মে বোঝাই বিশাল হলওয়েতে ঢুকল ওরা, মধ্যমণি হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে ছয় ফুট লম্বা ব্রোঞ্জের ধূপদানী, গায়ে সোনার কাজ করা। ধূপদানীর ওপরের অংশ শিখার ছবি, যেন লাফ দিয়ে আকাশ ছুঁতে চাইছে, তারই ফাঁকে ফাঁকে নগ্ন নারীমূর্তি প্রসাদ বিতরণের ভঙ্গিতে হাতগুলো সামনে বাড়িয়ে রেখেছে। ওটার সামনে দাঁড়িয়ে কাজগুলো খুঁটিয়ে দেখল রানা। 'ভারি সুন্দর, তাই না?' জিজ্ঞেস করল শাকিলা।

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'ইউনিক।'

'আমার বাবার কাছে যেটা আছে সেটা এরচেয়ে অনেক ছোট, এত প্রাচীনও নয়।'

শাকিলার হাত ধরে বড়সড় একটা কামরায় ঢুকল রানা, ওয়াশিংটনের ধনী আর প্রভাবশালী লোকজনে ভর্তি। মেয়েরা সবাই ডিজাইনারের তৈরি পোশাক পরে এসেছে, প্রায় সবাই রোগা-পাতলা। কংগ্রেস সদস্য, সিনেট সদস্য, প্রখ্যাত অ্যাটর্নি, লবিইস্ট, পাওয়ার ব্রোকার, ব্যাংক ও বীমা কোম্পানীর ডিরেক্টর, আমলা, সবার পরনে ফরমাল ইভনিং ড্রেস। সবাই কথা বলছে, তবে গলা চড়িয়ে নয়।

বেশিরভাগ ফার্নিচারই রেডউড-এর তৈরি, দাম বিশ মিলিয়ন ডলারের কম হলে বুঝতে হবে হান এ-সব নিউ জার্সির ডিসকাউন্ট হাউস থেকে কিনেছে

দেয়াল আর সিলিঙের কারুকাজে জ্যামিতিক নকশা ফুটে আছে। শুধু কার্পেটটা বুনতেই বিশটা মেয়েকে কৈশোর কাল পুরোটা ব্যয় কবতে হয়েছে। নীল আর সোনালি রঙের প্রবাহ দেখে মনে হবে ঠিক যেন সূর্যাস্তের সময় একটা সমুদ্র, আর কোমল গভীরতা এত বেশি যে হাঁটার সময় ডুবে যাবার অনুভূতি হয়। চারদিকে যে পর্দা ঝুলছে, দেখার সুযোগ পেলে ব্রিটিশ রাজপ্রসাদের পর্দাগুলো লজ্জা পাবে। একসঙ্গে এত সিল্ক আগে কখনও দেখেনি শাকিলা। গদি মোড়া চেয়ার আর সেটিগুলো যেন বাড়ির চেয়ে মিউজিয়ামেই বেশি মানাবে।

বুফে লাইনের পিছনে দাঁড়িয়ে আছে বিশজন স্টুয়ার্ড; তাদের সামনে লবস্টার, ক্র্যাব আর অন্যান্য সী ফুডের পাহাড়; সম্ভবত মাছ শিকারী নৌকার পুরো একটা বছর যা ধরতে পেরেছিল সবই তুলে আনা হয়েছে। ভিনটিজ ওয়াইনের সঙ্গে শুধু বিশুদ্ধ ফ্রেঞ্চ শ্যাম্পেন পরিবেশন করা হচ্ছে, লেবেল পড়লে বোঝা যাবে কোনটাই উনিশশো পঞ্চাশ সালের পরে তৈরি নয়। অলঙ্কৃত কামরার কোণে পঁচিশজনের একটা অর্কেস্ট্রা টীম বিখ্যাত একটা সিনেমায় পরিবেশিত গানের সুর বাজাচ্ছে। মা-বাবা খুব ভাল বেতনে সান ফ্রান্সিসকোয় চাকরি করেন, শাকিলা বলা যায় প্রাচুর্যের মধ্যেই মানুষ, তবু এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে তুলনা করা চলে এমন কোথাও আগে কখনও যায়নি সে। এক সময় শুধু বলতে পারল, 'আমার বস্ বলছিলেন, হুয়ান হানের নিমন্ত্রণ পাবার জন্যে ব্যাকুল নয় এমন লোক ওয়াশিংটনের প্রভাবশালী মহলে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। কথাটা তখন বিশ্বাস করিনি, এখন করি।'

রানা মন্তব্য করল, 'ফ্রেঞ্চ দূতাবাসের পার্টিগুলো অনেক বেশি সফিসটিকেটেড হয়।'

'এত সব দামী পোশাকের ভিড়ে নিজেকে আমার অতি সাধারণ লাগছে...'

এক হাতে শাকিলার কোমর জড়িয়ে ধরে মৃদু চাপ দিল রানা। 'নিজেকে ছোট ভাববেন না। রূপ আর গুণে কারও চেয়ে কম নন আপনি। কেন, লক্ষ করছেন না, সবাই আপনার দিকেই তাকাচ্ছে?'

প্রশংসা শুনে লালচে হলো শাকিলা। রানা সত্যি কথা বলছে দেখে আরও বিব্রত বোধ করল। শুধু মেয়েরা নয়, পুরুষরাও তার দিকে খোলাখুলি বা সরাসরি তাকিয়ে আছে। পুরুষ অতিথিদের মধ্যে বিশ-বাইশজন চীনা তরুণীকেও ঘুরে বেড়াতে দেখল সে, সবার পরনে সিল্ক ড্রেস। 'ওরা আসলে কারা?' রানাকে জিজ্ঞেস করল।

'আনন্দদাত্রী।'

'মাফ করবেন।'

'বড়শি।'

'ঠিক কি বলতে চান?'

'যারা সস্ত্রীক আসেননি তাদেরকে গাঁথার জন্যে ওদেরকে ভাড়া করেছে হান,' বলল রানা। 'কোন প্রভাব যদি সে কিনতে ব্যর্থ হয়, তা আদায় করে নেয় সম্ভোগের সুবিধে দিয়ে।'

হতভম্ব দেখাল শাকিলাকে। 'গভর্নমেন্ট লবিইং সম্পর্কে এখনও অনেক কিছু

শিখতে হবে আমাকে।'

'মেয়েগুলো সত্যি সুন্দরী, তাই না? ভাগ্য ভাল বলতে হবে যে আমার সঙ্গে যে রয়েছে তার সামনে লজ্জা পাচ্ছে ওরা, তা না হলে আমাকেও গাঁথার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠত।'

'আপনার কাছে এমন কিছু নেই যা হানের দরকার,' বলল শাকিলা। 'এখনও কি সময় হয়নি, খুঁজে বের করে আমাদের উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন করি তাকে?'

এমনভাবে তাকাল রানা, যেন ধাক্কা খেয়েছে। 'মানে, আপনি কি চান এত ভাল ভাল খাবার থেকে নিজেদেরকে বঞ্চিত করি? অসম্ভব! আগের কাজ আগে। চলুন প্রথমে ঠাণ্ডা কিছু খাই, তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ি বুফেতে। পরে কফি খাব। সবশেষে খলনায়কের সঙ্গে করমর্দন করা যাবে।'

'আপনি অত্যন্ত জটিল, পাগলাটে আর বেপরোয়া টাইপের মানুষ,' মন্তব্য করল শাকিলা।

'আকর্ষণীয় আর আহ্লাদী, এই দুটো বাদ পড়ে গেল।'

হেসে ফেলল শাকিলা। তাকে নিয়ে বার-এর সামনে চলে এল রানা। ওদেরকে শ্যাম্পেন সাধা হলো, নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকিয়ে কাউন্টার থেকে শ্যাম্পেন ভর্তি গ্লাস তুলে নিল ওরা, একটা করে চুমুক দিয়ে রেখে দিল আবার। বুফে টেবিলে এসে নিজেদের প্লেট ভরছে, প্রায় বিলুপ্ত হতে চলেছে এমন প্রজাতির শেলফিশ প্রচুর পরিমাণে দেখে রানার চোখ কপালে উঠে গেল। ফায়ারপ্লেসের পাশে খালি একটা টেবিল দেখে শাকিলাকে নিয়ে সেদিকে এগোল ও। শাকিলা বিশাল কামরার চারদিকে ঘন ঘন চোখ না বুলিয়ে থাকতে পারছে না। 'চীনা অনেক লোককেই তো দেখছি, কিন্তু বুঝতে পারছি না এদের মধ্যে হান কে। বস্ আমাকে তার চেহারার বর্ণনা দিতে পারেননি।'

'ইনভেস্টিগেটিভ এজেন্ট হিসেবে,' লবস্টারে কামড় দিয়ে বলল রানা, 'আপনার দৃষ্টি যথেষ্ট ধারাল নয়।'

'সে কেমন দেখতে আপনি জানেন?'

'জীবনে কখনও দেখিনি। তবে আপনি যদি পশ্চিম দেয়ালে বসানো দরজার দিকে তাকান, ঐ যেখানে সামন্ত যুগের উর্দি পরে এক দৈত্য পাহারা দিচ্ছে, ভেতরে দেখতে পাবেন হানের প্রাইভেট অডিয়ান্স রুম। আমার ধারণা ওখানে আছে সে পরিষদ নিয়ে।'

চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াতে গেল শাকিলা। 'চলুন, ঝামেলা সেরে ফেলি।'

তার হাত ধরে বাধা দিল রানা। 'এত তাড়া কিসের। এখনও তো কফি খাইনি আমরা।'

'আপনি ইমপসিবল।'

'আমার বিরুদ্ধে মেয়েদের এটা সাধারণ অভিযোগ।' একজন স্টুয়ার্ড ওদের প্লেট নিয়ে গেল, এক মিনিটের জন্যে শাকিলাকে ছেড়ে চলে গেল রানা, ফিরে এল একটা ট্রে নিয়ে, তাতে কাপ, কফি পট ও কনিয়্যাকের একটা ছোট বোতল। কাপে কফি ঢেলে দুধ ও চিনি মেশাল ও, তবে কনিয়্যাক ঢালল না। নিজের কাপে মাত্র চুমুক দিয়েছে, পিছন থেকে নরম একটা গলা ভেসে এল, 'গুড ইভনিং।

আশা করি সময়টা আপনারা উপভোগ করছেন। আমি আপনাদের হোস্ট।'

উজ্জ্বল হাসিতে উদ্ভাসিত হুয়ান হানকে দেখে স্থির হয়ে গেল শাকিলা। যেমন কল্পনা করেছিল তার ধারেকাছেও নয় লোকটা। হান বেঁটে নয়, যথেষ্ট লম্বা, এবং কাঠামোয় ইস্পাতের মত কঠিন ও ধারাল একটা ভাব আছে, পেটমোটা কুমীরের সঙ্গে একেবারেই মেলে না। মুখে কোথাও নিষ্ঠুরতার ছাপ নেই। না জানলে বিশ্বাস করা সম্ভব নয় যে এই লোক ঠাণ্ডা মাথায় মানুষ খুন করতে পারে। গলার সুরে অহঙ্কার বা ক্ষমতার দাপট, কিছুই নেই। নিখুঁতভাবে কাটা একটা টকসিডো পরে আছে, তাতে এমব্রয়ডারি করা সোনালি বাঘ। 'ইয়েস, থ্যাঙ্ক ইউ,' বলল শাকিলা, কোন রকমে বিনয়টুকু ধরে রাখতে পারল। 'আয়োজনটা খুবই চমৎকার হয়েছে।'

রানা দাঁড়াল। 'মে আই প্রেজেন্ট মিস শাকিলা সুলতান।'

'অ্যান্ড ইউ, স্যার?' জানতে চাইল হান।

'আমার নাম মাসুদ রানা।'

লোকটা ঠাণ্ডা, মনে মনে প্রশংসা করল রানা। উজ্জ্বল সরল হাসি এতটুকু ম্লান হলো না। রানা বহাল তবিয়তে বেঁচে আছে দেখে হান যদি অবাক হয়ে থাকে, চেহারা দেখে সেটা বোঝা গেল না। শুধু চোখ দুটো সামান্য নড়ল। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা, কেউ চোখের পাতা ফেলতে বা দৃষ্টি সরাতে রাজি নয়। খোলাখুলি চ্যালেঞ্জ করাটা বোকামি হয়ে যাবে, জানে রানা; চোখের দৃষ্টি হানের ভুরুর ওপর তুলল ও, তারপর কপালে, কপাল থেকে মাথার চুলে। ওর চোখ সামান্য বড় হলো, যেন বিশেষ কিছু দেখতে পেয়েছে, সবশেষে ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি ফুটল।

অভিনয়ে কাজ হলো। ফাটল ধরল হানের মনোযোগে। ওপর দিকে তাকাবার জন্যে চোখের মণি উঁচু করল সে। 'জানতে পারি, মি. রানা, হাসির কি দেখলেন আপনি?'

'না, ভাবছি আপনার হেয়ারস্টাইলিস্ট কে হতে পারে,' শান্ত সুরে জবাব দিল রানা।

'চীনা এক ভদ্রমহিলা, প্রতিদিন একবার করে আমার চুলের যত্ন নেন। আপনাকে আমি তার নাম বলতে পারি, কিন্তু তিনি আমার চাকরি করেন।'

'আপনাকে আমি ঈর্ষা করি। আমার নাপিত প্যারালাইসিসে আক্রান্ত এক পাগল হাঙ্গেরিয়ান।'

হানের চোখে মুহূর্তের জন্যে বরফশীতল দৃষ্টি ফুটল। 'ডোশিয়ের ছবিটা আপনার প্রতি সুবিচার করেনি।'

'প্রশংসা করতে হয়–হোমওঅর্কে পিছিয়ে থাকেন না।'

'আপনার সঙ্গে কি আড়ালে কথা বলতে পারি, মি. রানা?'

ইঙ্গিতে শাকিলাকে দেখাল রানা। 'উনি যদি সঙ্গে থাকেন।'

'আমাদের আলাপ ওঁর ভাল লাগবে বলে মনে হয় না।'

রানা বুঝতে পারল, শাকিলার পরিচয় সম্পর্কে এখনও সচেতন নয় হান। 'বরং উল্টোটা সত্যি,' বলল ও। 'বলতে ভুলে গেছি, শাকিলা ইমিগ্রেশন অ্যান্ড ন্যাচারালাইজেশন সার্ভিসের একজন এজেন্ট। মানুষ পাচারের জন্যে যে

বাটগুলো আপনি ব্যবহার করেন, তার একটায় ছিল ও। ওরিয়ন লেকে আপনার াতিথেয়তার তিক্ত স্বাদও পেয়েছে। আপনি নিশ্চয়ই জানেন ওরিয়ন লেক কাথায়। ওটা ওয়াশিংটন রাজ্যের মধ্যে পড়েছে।'

সবুজ চোখে মুহূর্তের জন্যে লালচে আভা ফুটল, হান মার্বেল পাথরের মূর্তির ত স্থির। গলার আওয়াজ শান্ত ও নরম, 'আপনারা দু'জনেই, প্লীজ, আমার সঙ্গে াসুন।' ঘুরে হাঁটছে, নিঃসন্দেহে জানে রানা আর শাকিলা পিছু নেবে।

'এতক্ষণে আপনার চেয়ার ছাড়ার সময় হয়েছে,' বলল রানা, শাকিলাকে চয়ার ছাড়তে সাহায্য করল।

'আপনি সত্যি ইমপসিবল,' বলল শাকিলা। 'প্রথম থেকেই জানতেন, ও-ই ামাদেরকে খুঁজে নেবে।'

'কৌতূহল না থাকলে এত ওপরে হান উঠতে পারত না।'

উর্দি পরা দৈত্য দরজা খুলে দিল, শাকিলার হাত ধরে ভেতরে ঢুকল রানা। গমরাটা ছিমছাম, ফার্নিচারের বাহুল্য নেই। দেয়ালগুলো হালকা নীল। একটা সটি, দুটো চেয়ার, একটা ডেস্ক; ডেস্কে টেলিফোন ছাড়া আর কিছু নেই। ;দেরকে সেটিতে বসার ইঙ্গিত দিয়ে নিজে ডেস্কের পিছনে বসল হান। ডেস্ক আর পছনের চেয়ারটা উঁচু একটা মঞ্চে ফেলা হয়েছে, হান যাতে তার অতিথির দিকে ;পর থেকে তাকাতে পারে। কৌতুক বোধ করল রানা। 'মাফ করবেন,' স্পষ্ট রে বলল ও, 'মেইন এন্ট্রিতে যে ব্রোঞ্জের ধূপদানীটা দেখলাম, ওটা লিয়াও াইনাস্টির, তাই না?'

'হ্যাঁ, আপনি ঠিক ধরেছেন।'

'আশা করি আপনি জানেন ওটা ভুয়া?'

'আপনার দৃষ্টি খুব তীক্ষ্ণ, মি. রানা,' বলল হান, কিছু মনে করছে না। 'তবে ীসটা ভুয়া নয়, দক্ষ হাতে হুবহু নকল করা। আসলটা উনিশশো আটচল্লিশ সালে দ্ধের সময় হারিয়ে গেছে, মাও সে-তুঙের আর্মি যখন চিয়াং কাই-শেকের ফার্সকে গুঁড়িয়ে দেয়।'

'ধূপদানীটা তাহলে এখনও চীনে, মূল চীনে?'

'না। আমাদের প্রাচীন ট্রেযার নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে আনার জন্যে চিয়াং কাই-শেকের নির্দেশে একটা জাহাজে তোলা হয়েছিল, জাহাজটা সাগরে হারিয়ে ায়। ওই ট্রেজারের সঙ্গে ধূপদানীটাও ছিল।'

'জাহাজটা সাগরে হারিয়ে গেল? তারমানে ব্যাপারটা রহস্য হয়ে আছে?'

'হ্যাঁ, খুবই জটিল রহস্য, মি. রানা,' বলল হান। 'রহস্যটা আমি ত্রিশ বছর রে সমাধানের চেষ্টা করছি। ওই জাহাজ আর আমাদের প্রাচীন ট্রেজার উদ্ধার রাই বর্তমানে আমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা।'

'আমার অভিজ্ঞতা বলে, শিপরেক ধরা না দিলে ধরা যায় না।'

'ভেরি পোয়েটিক,' বলল হান, হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলাল একবার। আমাকে অতিথিদের কাছে ফিরে যেতে হবে, কাজেই আলাপটা সংক্ষেপে সারব। থা শেষ হলে আমার সিকিউরিটির লোকজন আপনাদেরকে দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দবে। প্লীজ, ব্যাখ্যা করুন-নিমন্ত্রণ না করা সত্ত্বেও কেন আপনারা এসেছেন?'

'উদ্দেশ্যটা স্বচ্ছ,' হাসিমুখে বলল রানা। 'যে লোককে আমরা ফাঁসিে ঝোলাব তাকে দেখতে এসেছি।'

'আপনি খুব দুঃসাহসী, মি. রানা। শত্রুর এই গুণ আমি পছন্দ করি। কিন্ত যুদ্ধে আপনারাই পরাস্ত হবেন।'

'কিসের যুদ্ধ ওটা?'

'ব্যবসায়িক, মি. রানা। আমি একটা পুঁজি, গোটা দুনিয়ার বোকা মানু আমার পণ্য। পণ্য কেনাবেচায় যারা আমাকে বাধা দেবে তারা আমার প্রতিপক্ষ মার্কিন প্রশাসন, অর্থাৎ যাদের কথায় এই দেশটা চলে, তারা আমার বন্ধু। ওদে দু'একটা এজেন্সি আমার বিরুদ্ধে লাগতে পারে, কিন্তু তাতে আমার তেমন কো ক্ষতি হবে না, হলেও আমি তা পুষিয়ে নিতে পারব। আমি একজন অ্যামবিশা মানুষ, মি. রানা। টাকা কামানো আর ক্ষমতা অর্জন আমার একমাত্র অ্যামবিশন।'

'লোভ যে-লোকের ঈশ্বর, সত্যিকার দামী কিছু তার থাকতে পারে না।'

'আপনি আমাকে শুধু লোভী বলে ছোট করতে চান?'

'আপনার লাইফস্টাইল অল্প যে-টুকু দেখলাম, অন্য কিছু ভাবা যায় কি?'

'ইতিহাসের সমস্ত বিখ্যাত ব্যক্তিকে এই অ্যামবিশনই শক্তি যুগিয়েছে, মি রানা। অ্যামবিশনের হাত ধরে থাকে ক্ষমতা। সাধারণ মানুষ যাই বলুক, দুনিয়াটা ভাল ও মন্দে বিভক্ত নয়। বিভক্ত করিতকর্মা আর অকর্মার দলে। একদল চক্ষুষ্মান, আরেক দল অন্ধ। একদল বাস্তববাদী, আরেকদল রোমান্টিক। দুনিয়াটা সৎ কর্ম আর আবেগে চলছে না, চলছে সাফল্য আর অর্জনের মাধ্যমে।'

'কবরের ওপর বিরাট একটা ইমারত ছাড়া চরম আর কি প্রাপ্তি আপনি আশ করেন?'

'আপনি আমাকে ভুল বুঝছেন। আমার পরিকল্পনা হলো একজন মানুষ ক বড় হতে পারে তার একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করা। আমি সুসজ্জিত একটা সেনাবাহিনীকে ছাড়িয়ে যাব। আমার তুলনায় চেঙ্গিস খান, কুবলাই খান মুসোলিনী, হিটলারকে মনে হবে দুগ্ধপোষ্য শিশু। আমি, একজন মানুষ, একটা রাষ্ট্রের চেয়ে বড় হতে চাই। সুপারম্যান নয়, আমার স্বপ্ন সুপারপাওয়ার হওয়া।'

'তারমানে আপনি কোথাও থামবেন না? আপনার কোন সীমা নেই?'

'নেই, মি. রানা, কোন সীমা নেই।'

'এত কথাই যখন বলছেন, আপনার নীল-নকশা সম্পর্কেও কিছু বলুন।'

'কমিউনিজম ব্যর্থ হওয়ায় সোভিয়েত রাশিয়া পঙ্গু হয়ে গেছে, সবার মাথা ওপর একা ছড়ি ঘোরাচ্ছে আমেরিকা,' বলল হান। 'বলতে গেলে আমেরিকা এখন একমাত্র সুপারপাওয়ার। নিকট ভবিষ্যতে কোন রাষ্ট্র নয়, একা একটা লোক, এই আমেরিকার প্রতিদ্বন্দ্বী হতে যাচ্ছে। সে আমি।'

'কিভাবে?' হাসি চেপে রাখার ভান করল রানা।

'ওদের আইএনএস-এর হিসেবে বছরে প্রায় এক মিলিয়ন চীনা আমেরিকা ঢুকছে। আসলে সংখ্যাটা দুই মিলিয়ন হবে। চীনা নয় এমন অভিবাসীর সংখ্য ধরুন আরও দুই মিলিয়ন। আমি এই সংখ্যা ক্রমশ বাড়াব। চীনারাই বেশি সুযো পাবে, তবে টাকার বিনিময়ে সব দেশ থেকে সব জাতির লোকজনকেই আন

আমি। বিশেষ করে আমেরিকার উপকূলীয় শহর আর কানাডিয়ান প্রভিন্সগুলো তাইওয়ানের বাড়তি অংশে পরিণত হবে।

'আমেরিকার উপকূল জুড়ে পাঁচটা পোর্ট ফ্যাসিলিটি তৈরি করার অনুমতি পেয়েছি আমি। আমার আছে নিজস্ব জাহাজ বহর। সবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে কিভাবে লোক পাচার করতে হয়, আমি জানি। আগামী বিশ বছর পর রাস্তার পাঁচজন লোকের মধ্যে তিনজনই হবে চীনা। পঞ্চাশ বছর পর কি হবে, আপনার কল্পনার ওপর ছেড়ে দিচ্ছি।'

'আপনি নির্বিঘ্নে সব করে যাবেন, ওরা বাধা দেবে না?'

'কে বাধা দেবে?' হাসল হান। 'সবাই তো আমার পকেটে, মি. রানা। আমি যদি মাসে একশো মিলিয়ন ডলার কামাই, দশ বা বিশ মিলিয়ন ডলার ঘুষ দিতে আপত্তি করব কেন? প্রয়োজনে আমি এমন কি ফিফটি পার্সেন্ট দিতেও রাজি। বুঝতে পারছেন তো? টাকা ঢেলে আমি ওদের সমর্থন আদায় করব।

'আর এভাবেই আমি ভাঙব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে। চীনারা উপকূলীয় শহরগুলোয় সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে উঠবে, এক সময় স্বাধীনতা চাইবে তারা। অন্যান্য এশীয়রাও স্বাধীনতা চাইবে। কয়েক টুকরোয় বিভক্ত যুক্তরাষ্ট্র তারপর আর সুপারপাওয়ার থাকে কিভাবে, বলুন আমাকে।'

'থিওরি হিসেবে চালানো যায়, তবে শুধু থিওরিই,' মন্তব্য করল রানা।

শাকিলা আরও কঠিন ভাষা ব্যবহার করল, 'উনি প্রলাপ বকছেন, রানা। পাগলকে আমার সাংঘাতিক ভয়, যখন তখন কামড়ে দিতে পারে। চলুন পালাই।'

ঝট করে দাঁড়িয়ে পড়ল হান। 'এত স্পর্ধা, আমাকে আপনি ব্যঙ্গ করেন!' খেঁকিয়ে উঠল সে।

'শাকিলা আপনাকে পাগল বলে মারাত্মক ভুল করেছে,' বলল রানা। 'পাগলদের বিচার হয় না। আমি বলতে চাইছি, হান, মাস-মার্ডারার হিসেবে আপনার বিচার করা হবে।' শাকিলার হাত ধরল ও। 'চলে আসুন।'

ওরা দরজার কাছে চলে এসেছে, পিছন থেকে হান বলল, 'হুয়ান হানের সঙ্গে এভাবে কেউ কথা বলে না। আপনি মারাত্মক একটা ভুল করে গেলেন, মি. রানা।'

ঘুরে হাসল রানা। 'ভুল করার কথাটা আমিই আপনাকে বলতে চাইছিলাম। আজ সন্ধ্যায় যে কীট দুটোকে পাঠিয়েছিলেন আমার কাছে, তারা ফিরে না আসায় নিজের ভুল আশা করি ধরতে পেরেছেন আপনি?'

'অন্য কোথাও, অন্য সময়, ভাগ্য আপনাকে সাহায্য নাও করতে পারে।'

'আর বোধহয় আমাদের দেখা হবে না, হান,' বলল রানা। 'আপনার ব্যবস্থা করার জন্যে আমিও একদল পেশাদার আততায়ীকে ভাড়া করেছি।'

অতিথিদের ভেতর দিয়ে শাকিলাকে নিয়ে বাড়িটা থেকে বেরিয়ে আসছে রানা, পার্সটা মুখের সামনে তুলে ভেতরটা হাতড়াবার ভান করছে শাকিলা, নিচু গলায় কথা বলছে রেডিওতে, 'আমি এখানে, ম্যাচিট। আমরা বেরিয়ে আসছি।'

'ম্যাচিট? আর কোন কোডনেম পাননি?'

'কেন, আমার সঙ্গে মানায়নি? আমাকে আপনার যথেষ্ট বিপজ্জনক মনে হয় না?' শাকিলা হাসছে না।

*

ক্যাডিলাকের পিছনে একজোড়া ভ্যানকে দেখা গেল, অনুসরণ করছে। 'আশা করি ওরা আমাদের বন্ধু,' বলল রানা।

'আমার বস্ কাজে কোন খুঁত রাখেন না,' বলল শাকিলা। 'সার্ভিসের বাইরে থেকে বিশেষজ্ঞ ভাড়া করা হয়, তারাই এজেন্টদের নিরাপত্তার দিকটা দেখে। ভ্যানে যারা আছে তারা সবাই খুব বিখ্যাত নয় এমন একটা সিকিউরিটি ফোর্সের সদস্য, সরকারের কোন শাখা থেকে অনুরোধ করা হলে বডিগার্ড পাঠায়।'

'একদিক থেকে ব্যাপারটা স্বস্তিকর, আরেক দিক থেকে হতাশাব্যঞ্জক।'

'মানে?'

'হানের ভাড়াটে খুনীরা পিছু নিতে চাইলেও পারছে না,' বলল রানা। 'আর দুঃসংবাদ হলো, খোশগল্প করার জন্যে আপনাকে আমি নিজের ডেরায় নিয়ে যেতে পারছি না। ওরা উঁকি দিয়ে ঘরের ভেতর তাকাবে।'

'মাথাটায় কি শুধু খোশগল্প করার চিন্তা, নাকি অন্য কিছুও আছে?' আড়চোখে তাকিয়ে জানতে চাইল শাকিলা।

'আমি কাউকে অযাচিতভাবে বিব্রত করি না,' বলল রানা।

'হানের পার্টি থেকে বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে আজকের মত ডিউটি শেষ হয়ে গেছে আমার,' বলল শাকিলা। 'আপনি আমাকে যেখানে খুশি নিয়ে যেতে পারেন।'

'আপনার বন্ধুদের খসাবেন কিভাবে?'

'খসাবার দরকার নেই। ওরা থাকুক।'

'সেক্ষেত্রে আমি যদি ঘুর পথ ধরি, ওরা কিছু মনে করবে?'

'মনে করুক বা না করুক, কাজটা আপনি করবেন–আমি জানি।'

গিয়ার বদলে গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিল রানা। যানবাহনের মিছিল দ্রুত পিছিয়ে পড়ছে। রানার চোখ রিয়ারভিউ মিররে, ভ্যান দুটো পিছু ছাড়ছে না দেখে মনে মনে প্রশংসা করল ড্রাইভারদের। 'টায়ারে গুলি না করলেই হয়,' বিড়বিড় করল ও।

'হানকে বললেন তাকে মারার জন্যে খুনী ভাড়া করেছেন। কেন বললেন?'

নেকড়ের হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে। 'ধাপ্পা দিলাম। হানের মত লোকদের ভয় দেখিয়ে মজা পাই।'

'ঘুরপথে কোথায় যাচ্ছি আমরা?' জিজ্ঞেস করল শাকিলা।

'হানের একটা দুর্বলতা জানা গেছে। সে-ব্যাপারেই একটু খোঁজ-খবর নিতে যাচ্ছি।'

'হানের আবার কি দুর্বলতা জানা গেল?'

'শব্দগুলো এখনও আমার কানে লেগে আছে–জীবনের সবচেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা।'

রানার চোখে কৌতূহল চকচক করতে দেখল শাকিলা, দৃষ্টি রাস্তার ওপর স্থির। 'সে-সময় হান প্রাচীন চীনা ট্রেজা র কথা বলছিল।'

'হ্যাঁ। ওটাই তার দুর্বলতা।'

'দুনিয়ায় তার মত টাকা আর চীনা অ্যান্টিকস আর কারও নেই। প্রাচীন কিছু শিল্পকর্ম আর পুরানো একটা জাহাজ তার দুর্বলতা হতে যাবে কেন?'

'হারানো ট্রেজার খোঁজা কারও কারও জন্যে অবসেশন। একটা দুরারোগ্য ব্যাধি। ওগুলোর জন্যে এতই সে লালায়িত, প্রতিটির অবিকল নকল তৈরি করিয়েছে। দুনিয়ার কারও কাছে যা নেই তা সংগ্রহ করতে পারাটাই হানের মত মানুষকে পরিপূর্ণ তৃপ্তি দিতে পারে। এ-ধরনের ব্যাধিগ্রস্ত মানুষ আগেও দেখেছি আমি। ওই জাহাজ আর ট্রেজারের পিছনে ত্রিশ বছর ধরে লেগে আছে সে।'

'কিন্তু প্রায় ষাট বছর আগে হারানো একটা জাহাজ কিভাবে খুঁজে পাওয়া সম্ভব?' জিজ্ঞেস করল শাকিলা। 'আপনি শুরু করবেন কোত্থেকে?'

'একটা বাড়ি থেকে,' সহাস্যে বলল রানা। 'বাড়িটা এখান থেকে আর আধ মাইল দূরে।'

সরু গাড়িপথ ধরে বিশ-পঁচিশ গজ এগিয়ে ছোট একতলা একটা বাড়ির সামনে ক্যাডিলাক থামাল রানা।

'কে থাকে এখানে?' জানতে চাইল শাকিলা।

'অদ্ভুত এক চরিত্র,' বলে দরজার ব্রোঞ্জ নকারটা ইঙ্গিতে দেখাল রানা, পাল তোলা জাহাজের খুদে সংস্করণ। 'নক করুন, প্লীজ, যদি পারেন।'

'যদি পারি মানে?' শাকিলার হাত ইতস্তত করছে। 'এর মধ্যে কোন কৌশল আছে নাকি?'

'আপনি যা ভাবছেন তা নয়। দেখুন না নক করতে পারেন কিনা।'

কিন্তু শাকিলা নক করার আগেই দরজাটা খুলে গেল। বিশালদেহী এক লোককে দেখা গেল, পরনে ঢোলা সিল্ক আলখেল্লা। প্রায় আঁতকে উঠে এক পা পিছিয়ে এল শাকিলা, ধাক্কা খেলো রানার সঙ্গে। রানা গলা ছেড়ে হাসছে।

'ওর কখনও ভুল হয় না।'

'কি ভুল হয় না?' বিশালদেহী জানতে চাইল।

'কেউ নক করার আগেই দরজা খুলতে।'

'ও, তাই-বলো।' হাত দুটো তুলে নাড়ল লোকটা। 'এর মধ্যে কোন জাদু নেই। গাড়ি পথে কেউ ঢুকলে বাড়ির ভেতর টুংটুং করে বেল বাজে।'

'বিউ মরটন,' বলল রানা। 'এত রাতে আসতে হলো বলে দুঃখিত।'

'ননসেন্স!' হেসে উঠল মরটন। মেদবহুল শরীরটা দুলে উঠল। তার ওজন চারশো পাউন্ডের কম নয়। 'এ-বাড়ির দরজা তোমার জন্যে সারাক্ষণ খোলা। সঙ্গে রূপকথার নায়িকা মনে হচ্ছে, আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে না?'

'শাকিলা সুলতান, আইএনএস এজেন্ট,' বলল রানা। 'আর ও আমার বন্ধু, বিউ মরটন, শিপরেক সম্পর্কিত দুনিয়ার সবচেয়ে বড় লাইব্রেরির মালিক।'

প্রকাণ্ড কাঠামোটা অতি কষ্টে নত করে শাকিলার হাতে চুমো খেলো মরটন। 'রানার বন্ধুর সঙ্গে পরিচিত হওয়া বিরাট সম্মানের ব্যাপার।' সরে গিয়ে পথ ছেড়ে দিল। 'ভেতরে ঢুকুন, ভেতরে ঢুকুন। কফি খাচ্ছিলাম, আপনারাও খান।'

ভেতরে ঢুকে শাকিলা হাঁ হয়ে গেল। শুধু যে ঘরে পা দিয়েছে সে ঘরেই নয়,

খোলা দরজা দিয়ে আরও যে-ক'টা কামরা দেখা যাচ্ছে সবগুলো বই আর বইয়ে ঠাসা। শেলফগুলো মেঝে থেকে সিলিং পর্যন্ত উঁচু, দেয়ালের প্রতি ইঞ্চি দখল করে রেখেছে। দোতলায় ওঠার সিঁড়ির একপাশে রেইলিং, আরেক পাশে বই ভর্তি র‍্যাক। দোতলার বারান্দাতেও তাই। ঘুরে ঘুরে দেখছে শাকিলা। বেডরুম, বাথরুম, কিচেন, বাড়ির এমন কোন জায়গা নেই যেখানে বই রাখার ব্যবস্থা নেই। এমনকি জায়গার অভাবে মেঝেতেও সাজিয়ে রাখা হয়েছে প্রচুর। শিপরেক সম্পর্কিত ইংরেজিতে যেখানে যত বই ছাপা হয়েছে সব এক কপি করে সংগ্রহ করেছে মরটন। যে বই সংগ্রহ করতে পারেনি, কপি করিয়ে আনিয়েছে।

রানার সঙ্গে মরটনের বয়েস না মিললেও, ঐতিহাসিক জাহাজ সম্পর্কে দুজনেরই আগ্রহ প্রায় পাগলামির পর্যায়ে পড়ে, আর সেটাই ওঁদের বন্ধুত্বের আসল রহস্য।

কফি পরিবেশন করে মরটন জানতে চাইল, 'তা, কি মনে করে আসা হলো, রানা?'

'আমি একটা জাহাজের খবর চাই,' বলল রানা। 'উনিশশো আটচল্লিশের দিকে চীন থেকে রওনা হয়, সম্ভবত সাংহাই থেকে। কার্গো হিসেবে ছিল চীনা হিস্টোরিকাল আর্ট ট্রেজার। বহু খুঁজেও জাহাজটার কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।'

চোখ দুটো আধবোজা হয়ে গেল মরটনের, কিছু স্মরণ করার চেষ্টা চলছে মাথার ভেতর। 'জাহাজটার নাম মনে পড়ছে প্রিন্সেস হিয়া লিয়েন। সেন্ট্রাল আমেরিকার কাছাকাছি কোথাও নিখোঁজ হয় সমস্ত ক্রু সহ।'

'তোমার দৃষ্টিতে ঘটনাটা কি?' জানতে চাইল রানা।

'দুনিয়ার সব সাগরই রহস্যময়। নিখোঁজ আর সব জাহাজের মতই প্রিন্সেস হিয়া লিয়েনও সাগরের একটা রহস্য।'

'কার্গো সম্পর্কে কোন রেকর্ড আছে কিনা জানো?'

মাথা নাড়ল মরটন। 'হিস্টোরিকাল চাইনীজ আর্ট ট্রেজার ছিল জাহাজে, এটা অজ্ঞাত সূত্র থেকে জানা গিয়েছিল, দায়িত্বশীল কোন মহল থেকে তথ্যটা সত্যি বলে সমর্থন করা হয়নি। আমি তোমাকে তেমন কোন সাহায্য করতে পারব না। তবে জানি যে ওটা প্যাসেঞ্জার শিপ ছিল, কথা ছিল ভেঙে ফেলার জন্যে স্ক্র্যাপ ইয়ার্ডে পাঠানো হবে।'

'সেন্ট্রাল আমেরিকায় নিখোঁজ হলো কিভাবে?'

'বললামই তো, সাগরের একটা রহস্য।' কাঁধ ঝাঁকাল মরটন।

বিরক্ত হয়ে মাথা নাড়ল রানা। 'আমি তোমার সঙ্গে একমত নই। রহস্য যদি কিছু থাকে, সেটা মানুষেরই তৈরি। একটা জাহাজ যেখানে থাকার কথা সেখান থেকে পাঁচ হাজার মাইল দূরে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে গেল, সেজন্যে সাগরকে তুমি দায়ী করতে পারো না।'

'তাহলে একটু সময় দাও, হিয়া লিয়েনের রেকর্ড ঘেঁটে দেখি। আমার ধারণা, পিয়ানোর নিচে রাখা একটা বইতে কিছু তথ্য পাওয়া যেতে পারে।' চেয়ার ছাড়ল যেন একটা হাতী, মেঝেতে থপথপ করে পা ফেলে ডাইনিং রুমের দিকে এগোল। বিশ সেকেন্ড পর তার হুংকার ভেসে এল, 'পেয়েছি!'

শাকিলা হতভম্ব। 'এত বই, এত হাজার হাজার বই, অথচ ভদ্রলোক জানেন কোনটা কোথায় আছে?'

'শুধু তাই নয়, প্রতিটি বইয়ের মলাট ওর মুখস্থ,' বলল রানা। 'কোন বই কোন শেলফের কত নম্বর সারিতে আছে তাও বলে দেবে।'

চামড়া দিয়ে বাঁধানো একটা বই নিয়ে ফিরে এল মরটন। মলাটে সোনালি হরফে লেখা–'হিস্টরি অব দা ওরিয়েন্ট শিপিং লাইন্স'। 'এটাই আমার একমাত্র প্রিন্সেস হিয়া লিয়েন সম্পর্কে অফিশিয়াল রেকর্ড,' বলল সে। টেবিলে বসে বইটা খুলে পড়তে শুরু করল, সবাই যাতে শুনতে পায়।

জাহাজটা তৈরি করার অর্ডার দেয় সিঙ্গাপুর প্যাসিফিক স্টীমশিপ লাইন্স, তৈরি করে বেলফাস্টের শিপবিল্ডার ফার্ম হারল্যান্ড অ্যান্ড উলফ। উনিশশো উনিশ সালে প্রথম পানিতে নামানো হয়, তখন নাম ছিল 'নানাই'। ওজন প্রায় এগারো হাজার টন, দৈর্ঘ্য চারশো সাতানব্বুই ফুট, প্রস্থ ষাট ফুট।

বইয়ে জাহাজটার একটা ছবি আছে, দেখল ওরা। শান্ত সাগরের বুক চিরে এগোচ্ছে জাহাজ, একমাত্র স্মোকস্ট্যাক থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। খোলটা কালো, সুপারস্ট্রাকচার সাদা, চিমনি সবুজ।

পাঁচশো দশজন প্যাসেঞ্জার বহন করতে পারত। প্রথম শ্রেণীর প্যাসেঞ্জার মাত্র বাহান্ন জন। প্রথম দিকে কয়লার আগুনে চলত ওটা, পরে, উনিশশো বিশ সালে, জ্বালানি হিসেবে তেল ব্যবহার করার ব্যবস্থা করা হয়। টপ স্পীড সেভেনটিন নট। প্রথম যাত্রায় সাউথহ্যামটন থেকে সিঙ্গাপুরে যায়। উনিশশো একত্রিশ সাল পর্যন্ত বেশিরভাগ ভয়েজই ছিল সিঙ্গাপুর আর হনুলুলুর মধ্যে।

'নানাই প্রিন্সেস হিয়া লিয়েন হলো কখন?' জানতে চাইল রানা।

'উনিশশো একত্রিশ সালে সাংহাইয়ের ক্যান্টন লাইন্স জাহাজটা কিনে নেয়, তখনই নতুন নামকরণ করা হয়। তখন থেকে যুদ্ধের আগে পর্যন্ত সাউথ চায়না সীর বিভিন্ন বন্দরে প্যাসেঞ্জার আর কার্গো আনা-নেয়া করেছে। যুদ্ধের সময় অস্ট্রেলিয়ান ট্রুপ ট্র্যান্সপোর্ট হিসেবে কাজে লাগে। উনিশশো বিয়াল্লিশ সালে নিউগিনিতে সৈন্য নামানোর সময় জাপানী বম্বার বোমা ফেলে। প্রচুর ক্ষতি হয়েছিল। সিডনিতে মেরামত করানো হয়। ওঅর রেকর্ড খুবই ভাল, উনিশশো চল্লিশ থেকে উনিশশো পঁয়তাল্লিশ সাল পর্যন্ত আট হাজার মানুষকে পারাপার করে জাহাজটা।

'যুদ্ধের পর হিয়া লিয়েন ক্যান্টন লাইন্সে ফিরে আসে। মেরামত করে আবার ওটাকে প্যাসেঞ্জার শিপ হিসেবে কাজে লাগানো হয়, সাংহাই আর হংকঙের মাঝখানে। তারপর আটচল্লিশ সালে, সার্ভিস থেকে সরিয়ে এনে সিঙ্গাপুরে পাঠানো হয় ভেঙে ফেলার জন্যে।'

'ভেঙে ফেলার জন্যে?' প্রতিধ্বনি তুলল রানা। 'তুমি না বললে সেন্ট্রাল আমেরিকার কাছে ডুবে গেছে?'

'আসলে জাহাজটার ভাগ্যে কি ঘটেছে তা স্পষ্ট নয়,' বলে বইয়ের ভেতর থেকে কয়েক শীট কাগজ বের করল মরটন। 'গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আলাদাভাবে টুকে রেখেছি আমি। নিশ্চিতভাবে শুধু এটুকু জানা গেছে যে সিঙ্গাপুরের স্ক্র্যাপ ইয়ার্ডে

হিয়া লিয়েন পৌঁছায়নি।'

'কিভাবে জানা গেল জাহাজটা...'

হাত তুলে রানাকে থামিয়ে দিল মরটন। 'চিলির ভালপারাইসো-য় ন্যাভাল স্টেশন আছে, ওখানকার রেডিও অপারেটর শেষ খবর দেয়। অপারেটরের রেকর্ড থেকে জানা যায়, প্রিন্সেস হিয়া লিয়েন পরিচয় দিয়ে একটা জাহাজ কয়েকটা ডিসট্রেস সিগন্যাল পাঠিয়েছিল, তাতে বলেছে দুশো মাইল পশ্চিমে ভয়ঙ্কর এক ঝড়ের মধ্যে পড়ে ডুবে যাচ্ছে তারা। বারবার রিপোর্ট চেয়ে সাড়া পেতে ব্যর্থ হয় অপারেটর। তারপর জাহাজের রেডিও ডেড হয়ে যায়। এখানেই শেষ। সার্চ করেও জাহাজটার কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি।'

'এমন কি হতে পারে যে ওই একই নামে আরেকটা জাহাজ ছিল?' জানতে চাইল শাকিলা।

মাথা নাড়ল মরটন। 'ইন্টারন্যাশনাল শিপ রেজিস্ট্রির তালিকায় দেখা যাচ্ছে আঠারোশো পঞ্চাশ থেকে এখন পর্যন্ত হিয়া লিয়েন নামে একটাই জাহাজ ছিল। তবে হিয়া লিয়েনের নামে অন্য কোন জাহাজ থেকেও ডিসট্রেস সিগন্যাল পাঠানো হয়ে থাকতে পারে, যদিও কারণটা কি হতে পারে আমার বোধগম্য হচ্ছে না।'

'ওটায় চীনা আর্ট ট্রেজার আছে, এই গুজব কোত্থেকে ছড়াল?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'সাগরে কিংবদন্তীর কোন অভাব নেই। বিশ্বাস করা না করা ব্যক্তিগত ব্যাপার। ডকওয়ার্কার আর ন্যাশনালিস্ট চীনা সৈনিক, যারা জাহাজটায় কার্গো তোলার দায়িত্বে ছিল, সম্ভবত ওদের মুখ থেকেই গুজবটা ছড়ায়। পরে ওদেরকে কমিউনিস্টরা আটক ও জেরা করে। তখন একজন বলেছিল তোলার সময় বড় একটা বাক্স খুলে বা ভেঙে যায়। ভেতরে নাকি প্রমাণ সাইজের একটা ব্রোঞ্জের তৈরি ঘোড়া ছিল, নৃত্যরত ভঙ্গিতে।'

শাকিলার চোখ কপালে উঠে গেল। 'এত সব তথ্য আপনি কিভাবে যোগাড় করলেন?'

মরটন হাসল। 'চীনা এক বন্ধুর কাছ থেকে। তাইওয়ানে থাকে সে, আমার মতই একজন রিসার্চার। সারা দুনিয়ায় আমার এরকম অনেক উৎস আছে, শিপরেক সম্পর্কে নতুন কোন তথ্য পাওয়া গেলেই তারা আমাকে জানিয়ে দেয়। তারা জানে, মূল্যবান বা নতুন যে-কোন তথ্যের বিনিময়ে ভাল পয়সা দিই আমি। প্রিন্সেস হিয়া লিয়েন সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য আমি আমার এক বৃদ্ধ বন্ধুর কাছ থেকে পেয়েছি। তাঁর নাম ঝাউ মিয়াং, হিস্টোরিয়ান ও রিসার্চার। বহু বছর ধরে তাঁর সঙ্গে তথ্য বিনিময় করছি আমি।'

'ঝাউ মিয়াং তোমাকে আর্ট ট্রেজারের কোন তালিকা দিতে পেরেছেন?' জানতে চাইল রানা।

'না। রিসার্চ করে তিনি শুধু নিশ্চিত হয়েছেন যে মাও সে-তুঙের সৈন্যরা যখন সাংহাইয়ে ঢুকতে যাচ্ছে, চিয়াং কাই-শেক তখন তাড়াহুড়ো করে সমস্ত মিউজিয়াম, গ্যালারি আর প্রাইভেট কালেকশন থেকে চীনা শিল্পকর্ম লুঠ করিয়ে প্রিন্সেস হিয়া লিয়েনে তোলার ব্যবস্থা করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে চীনা

শিল্পকর্ম বা আর্টিফ্যাক্ট সংক্রান্ত কোন রেকর্ড ছিল না বললেই চলে। তবে সবাই জানে যে কমিউনিস্টরা ক্ষমতা দখলের পর শিল্পকর্ম প্রায় কিছুই কোথাও পাওয়া যায়নি। চীনা প্রাচীন শিল্প হিসেবে এখন যা দেখানো হচ্ছে তা প্রায় সবই উনিশশো আটচল্লিশ সালের পরে আবিষ্কৃত হয়েছে বা মাটি খুঁড়ে বের করা হয়েছে।'

'তারমানে হারানো আর্ট ট্রেজারের কিছুই আর উদ্ধার করা যায়নি?'

'আমার অন্তত জানা নেই,' বলল মরটন। 'ঝাউ মিয়াংও জানেন না।'

'তাহলে ধরে নিতে হয় চীনের প্রাচীন সমস্ত শিল্পকর্মই সাগরের তলায় পড়ে আছে।'

শাকিলাকে হঠাৎ কৌতূহলী দেখাচ্ছে। 'সবই খুব ইন্টারেস্টিং লাগছে, কিন্তু এ-সবের সঙ্গে হুয়ান হানের মানুষ পাচার বা আমেরিকাকে ভাঙার কি সম্পর্ক?'

শক্ত করে শাকিলার একটা হাত ধরল রানা। 'সিআইএ, এফবিআই আর তোমাদের আইএনএস হুয়ান হানকে সামনে থেকে আঘাত করবে। প্রাচীন চীনা আর্ট ট্রেজার সম্পর্কে তার যে অবসেশনের কথা আমরা জেনেছি, তাতে তাকে পিছন থেকে আঘাত করার একটা দরজা খুলে গেছে। এই কাজটা করবে নুমা। আমাদের সুবিধে হলো, এদিক থেকে কোন হামলাই সে আশা করছে না। তাছাড়া, হানের চেয়ে ভাল সার্চ টীম গঠন করতে পারব আমরা। তবে আসল কাজটা হলো হানের আগে প্রিন্সেস হিয়া লিয়েনকে খুঁজে বের করা।'

শাকিলার চেহারা সামান্য ম্লান হয়ে গেল। 'কাহিনী দেখছি সম্পূর্ণ অন্য দিকে মোড় নিতে যাচ্ছে। মি. লুকাস আমাকে বলছিলেন, হানের পোর্ট ফ্যাসিলিটি সানগারিতে যাচ্ছেন আপনি। তাই তদন্ত করতে আমিও ওদিকে যাব বলে ভাবছিলাম। কিন্তু এখন দেখছি ট্রেজারের পিছনে ছুটবেন আপনি।'

'ট্রেজারের পিছনে তো ছুটবই,' হেসে উঠে বলল রানা। 'তবে তার আগে হানের পোর্ট ফ্যাসিলিটিতে কি ঘটছে দেখে আসব না? ভেবেছেন ওখানে যদি হানকে কবর দেয়ার ব্যবস্থা করতে পারি, সুযোগটা ছেড়ে দেব?'

'ধন্যবাদ,' কৃতজ্ঞচিত্তে বলল শাকিলা। 'নিজেকে তাহলে আমার একা বলে মনে হবে না।'

***

প্রিন্সেস হিয়া-২

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৯

এক

মীটিংটা শুরু হলো এক নম্বর নর্থওয়েস্ট স্ট্রীটের চেস্টার আর্থার বিল্ডিং, ইমিগ্র্যান্ট অ্যান্ড ন্যাচারালাইজেশন সার্ভিস হেডকোয়ার্টারে। সভাপতিত্ব করছেন আইএনএস-এর অ্যাসোশিয়েট কমিশনার পিট লুকাস। সিআইএ চীফ আসেননি, পাঠিয়েছেন অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টরকে। এফবিআই প্রধানও আসেননি, তাঁর বদলে উপস্থিত রয়েছেন অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর। নুমার ডিরেক্টর অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন সবার আগে পৌঁছেছেন, সঙ্গে আছে তাঁর স্পেশাল প্রজেক্ট ডিরেক্টর মাসুদ রানা, চীফ অভ স্টাফ (অপারেশন্স) জর্জ রেডক্লিফ ও মেরিন বায়োলজিস্ট ববি মুরল্যান্ড। আইএনএস এজেন্ট শাকিলা সুলতানও আছে। সভার কাজ শুরু হবার বেশ খানিক পর হাজির হলেন আইএনএস-এর কমিশনার ডীন ফেয়ার। সিআইএ ও এফবিআই চীফের সঙ্গে ইনিও হোয়াইটহাউসে জরুরী মীটিঙে ছিলেন, সেটা সংক্ষিপ্ত করে তাড়াতাড়ি হেডকোয়ার্টারে ফিরে এসেছেন। টেবিলের মাথায় তাঁর নির্দিষ্ট আসনেই বসলেন তিনি, তবে সভাপতি হিসেবে পিট লুকাসই কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

মীটিঙের শুরুতেই নুমার সঙ্গে বাকি তিন সংস্থার গুরুতর মতপার্থক্য দেখা দিল। ওরিয়ন লেকের তলায় যা যা দেখেছে রিপোর্ট করল রানা, লিখিত রিপোর্টের সঙ্গে ভিডিও ক্যাসেটও জমা দিল। তারপর রিপোর্ট করল শাকিলা। সে তার রিপোর্টে পুরো অ্যাসাইনমেন্টের বিস্তারিত বর্ণনা দিল–'সব পেয়েছির দেশ আমেরিকায় যাবার সুবর্ণ সুযোগ' এই শিরোনামে ঢাকার একটা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেখার পর আবেদন-পত্র জমা দেয় সে। স্থানীয় আদম ব্যবসায়ীরা তার কাছ থেকে মোটা টাকা নিয়ে পৌঁছে দেয় তাইওয়ানে, সেখান থেকে হুয়ান হানের সমুদ্রগামী জাহাজ সান বার্ড-এ চড়ে সে। সব মিলিয়ে ওই জাহাজে আরোহী ছিল বারোশো। জাহাজ মার্কিন উপকূলের কাছাকাছি পৌঁছাবার পর তার কাছ থেকে অতিরিক্ত আরও টাকা চাওয়া হয়। সে টাকা দিতে রাজি না হওয়ায় হুয়ান হানের এনফোর্সাররা আমেরিকায় পৌঁছে দেয়ার বিনিময়ে দেহ-ব্যবসায় নাম লেখানোর প্রস্তাব দেয় তাকে। এতেও সুবিধে করতে না পেরে তার ওপর অকথ্য নির্যাতন চালায়। সে স্পাই, এই অভিযোগ তুলে তাকে একটা বোটে উঠতে বাধ্য করা হয়। শাকিলার ধারণা, বোটে বাহান্নজন আরোহী ছিল। তাদের মধ্যে বারোজনকে ছোট একটা কমপার্টমেন্টে আটকে রাখা হয়, ওরিয়ন লেকে নিয়ে গিয়ে হাত-পা বেঁধে পানিতে ফেলে দেয়ার উদ্দেশ্যে। বাকি চল্লিশজন আরোহীকে নিয়ে যাওয়া হয় ওরিয়ন লেকের রিট্রিটে, শারীরিক নির্যাতনের মাধ্যমে ও মেরে ফেলার ভয় দেখিয়ে দেহ-ব্যবসা ও ড্রাগ বিক্রির কাজে রাজি করানোর জন্যে। তারপর কিভাবে রানা ওদের এগারোজনকে উদ্ধার করল তার বিস্তারিত বিবরণ দিল শাকিলা।

শাকিলা থামতে বক্তব্য রাখলেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন। কংগ্রেস সদস্য মিস লরেলির বাড়িতে রানাকে খুন করার চেষ্টা হয়েছে, এ-সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত একটা রিপোর্ট পড়ার পর তিনি প্রস্তাব রাখলেন, অবৈধভাবে মানুষ পাচার ও পাইকারী

হত্যাকাণ্ডের অভিযোগে হুয়ান হানকে গ্রেফতার করা হোক। প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী হিসেবে রয়েছে রানা ও শাকিলা, ওরা যথেষ্ট প্রমাণও সংগ্রহ করেছে, কাজেই আমেরিকা ছেড়ে পালাবার আগেই হানকে গ্রেফতার করা হলে বিচার এড়াবার কোন উপায় থাকবে না তার, এবং বিচারে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড না হয়েই যায় না।

এরপর একে একে বক্তব্য রাখলেন সিআইএ ও এফবিআই-এর দুই অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর, সবশেষে আইএনএস-এর অ্যাসোশিয়েট কমিশনার। তিনজনই নানারকম যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চাইলেন যে রানা ও শাকিলার যোগাড় করা প্রমাণ যথেষ্ট নয়, এ-সব প্রমাণ দিয়ে হানকে জেলে ভরা যাবে না। তাঁদের যুক্তি হলো, সান বার্ড যুক্তরাষ্ট্রের সমুদ্রসীমায় ঢোকেনি, কাজেই বারোশো আরোহীকে ফিশিং ফ্লিটে তুলে যুক্তরাষ্ট্রের উপকূলে নামিয়ে দেয়ার অভিযোগটা প্রমাণ করা সম্ভব নয়। এ-ও প্রমাণ করা সম্ভব নয় যে ওরিয়ন লেকে যা ঘটেছে তার জন্যে হান দায়ী, কারণ ওখানকার রিট্রিট ও জমি লিজ নিয়েছে কানাডায় রেজিস্ট্রি করা একটা কোম্পানী, হুয়ান হানের ম্যারিটাইম শিপিং কোম্পানী লিমিটেডের সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ কোন সম্পর্ক নেই।

তর্ক-বিতর্কের এক পর্যায়ে সিআইএ, এফবিআই ও আইএনএস-এর তরফ থেকে বলা হলো, অবৈধ অভিবাসী ঠেকানোর জন্যে প্রাথমিক পর্যায়ে প্রেসিডেন্ট নুমার সাহায্য চাইলেও, সমস্যাটা ইতিমধ্যে এত বেশি জটিল হয়ে উঠেছে যে তারা সবাই একযোগে প্রেসিডেন্টের কাছে অনুরোধ করেছেন অর্পিত দায়িত্ব থেকে নুমাকে যেন অব্যাহতি দেয়া হয়।

মীটিঙের এই পর্যায়ে হাজির হলেন আইএনএস-এর কমিশনার ডীন ফেয়ার। সরাসরি হোয়াইট হাউস থেকে আসছেন তিনি। অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের প্রশ্নের উত্তরে ভদ্রলোক জানালেন, প্রেসিডেন্টের সঙ্গে হুয়ান হানের মীটিং হয়েছে, সেই মীটিঙে আইএনএস-এর তরফ থেকে তিনি, সিআইএ চীফ ও এফবিআই চীফ উপস্থিত ছিলেন। হান ওরিয়ন লেকের ঘটনার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক থাকার কথা সরাসরি অস্বীকার করেছে। সে একটা স্মাগলিং সিন্ডিকেটের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রে মানুষ পাচার করছে, এই অভিযোগও সম্পূর্ণ মিথ্যে বলে উড়িয়ে দিয়েছে। তবে একই সঙ্গে আশ্বাস দিয়ে বলেছে, ঘটনাগুলোর জন্যে যে বা যারাই দায়ী হোক, সে তার পঞ্চাশ হাজার কর্মচারীকে চোখ-কান খোলা রাখতে বলবে, এরকম ঘটনা আর যাতে না ঘটে। দ্রুত প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে হান, সারাক্ষণ হাসছিল, রিপাবলিকান দলের আগামী নির্বাচনী ফান্ডে স্বেচ্ছায় পঞ্চাশ মিলিয়ন ডলার চাঁদা দেয়ার প্রস্তাব রাখার সময় ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মত প্রেসিডেন্টের কাঁধে হাত রাখতে দেখা গেছে তাকে। এক পর্যায়ে সে মৃদু অভিযোগ করে, নুমার লোকজন ভিত্তিহীন সন্দেহে তার বৈধ ব্যবসায়িক তৎপরতায় নাক গলাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের একজন বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে সে আশা করে, নুমাকে অন্যায়ভাবে নাক গলাতে নিষেধ করা হবে। এই প্রস্তাব সিআইএ ও এফবিআই চীফ সমর্থন করেন। তবে প্রেসিডেন্ট তখুনি কোন সিদ্ধান্ত দেননি।

হানের সঙ্গে প্রেসিডেন্টের আলাপ তখনও শেষ হয়নি, তার আগেই বাকি সবাই হোয়াইট হাউস থেকে বিদায় নিয়ে চলে এসেছেন। সিআইএ ও এফবিআই

চীফ যে যার হেডকোয়ার্টারে ফিরে গেছেন, তিনি চলে এসেছেন নিজের হেডকোয়ার্টারে। প্রসঙ্গক্রমে জানালেন, তিনি চান নুমা এই অ্যাসাইনমেন্ট থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিক। কারণ হিসেবে বললেন, নুমার কাজ সমুদ্র আর পানির তলা নিয়ে গবেষণা করা, অবৈধভাবে মানুষ পাচার বা পাইকারী হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে তদন্ত করার জন্যে আরও অনেক এজেন্সি ও সার্ভিস আছে। অর্থাৎ তিনিও চান, যে যার নিজের চরকায় তেল দিক।

'এই মীটিং একটা প্রহসন,' বলে চেয়ার ছাড়ল রানা, ওর দেখাদেখি ববি মুরল্যান্ডও। কনফারেন্স রূম ছেড়ে বেরিয়ে আসার সময় শাকিলার চেয়ারের পাশে মুহূর্তের জন্যে থামল ও। 'আবার যদি দেখা হয়, জায়গামতই হবে,' ফিসফিস করল আইএনএস এজেন্টের কানে। ওর পিছু নিয়ে মুরল্যান্ড বেরিয়ে এল।

'সংশ্লিষ্ট সবাইকে আমি শুধু একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই,' ওরা বেরিয়ে যেতে চেয়ার ছাড়লেন জর্জ হ্যামিলটন। 'নুমার ডিরেক্টর হিসেবে প্রেসিডেন্ট ছাড়া আর কারও কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য নই আমি,' রানা আর মুরল্যান্ডের মত তিনিও কনফারেন্স রূম থেকে বেরিয়ে এলেন।

গাড়ি করে নুমা হেডকোয়ার্টারে ফিরছে ওরা, অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনকে অস্বাভাবিক গম্ভীর দেখাচ্ছে। কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। এক সময় রানা জানতে চাইল, 'এখন তাহলে কি করব আমরা?'

'করার কাজ তো একটাই,' ভারী গলায় বললেন অ্যাডমিরাল। 'জর্জ রেডক্লিফের সঙ্গে সানগারিতে দেখা করবে তোমরা দু'জন। ওই টেবিলে যারা বসে আছে, আমি চাই তারা কিছু করার আগেই হুয়ান হানকে ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দেবে তোমরা।'

'খুব হেভি কমপিটিশন হবে বলে মনে হচ্ছে,' মন্তব্য করল রানা।

'আমাদের জন্যে সেটা কোন সমস্যা নয়,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'কারণ, হুয়ান হান ম্যারিটাইম পানিতে অপারেট করে, আর এ-ব্যাপারে আমরা বিশেষজ্ঞ।'

মীটিং ভেঙে যাবার পর শাকিলাকে নিয়ে নিজের অফিসে চলে এলেন পিট লুকাস, ভেতর থেকে বন্ধ করে দিলেন দরজাটা। শাকিলা বসার পর ডেস্ক ঘুরে নিজের চেয়ারে এসে বসলেন। 'শাকিলা, আপনার জন্যে এটা অত্যন্ত কঠিন একটা অ্যাসাইনমেন্ট হতে যাচ্ছে। কোন বাধ্যবাধকতা নেই, ইচ্ছে করলে আপনি না বলতে পারেন। আমি নিজেও নিশ্চিত নই, এত কঠিন পরীক্ষায় আপনাকে ফেলা উচিত হবে কিনা।'

কৌতূহল স্বভাবতই বেড়ে গেল শাকিলার। 'নিই আর না নিই, শুনতে ক্ষতি কি।'

লুকাস একটা ফাইল ফোল্ডার ধরিয়ে দিলেন তার হাতে। ফাইল খুলতেই একটা ফটো দেখল শাকিলা, প্রায় চমকে উঠল। ওর বয়সীই হবে মেয়েটা, মনে হলো বাঙালী বা ভারতীয়। দৈর্ঘ্য, রঙ, দৈহিক গঠন আর চেহারায় ওর সঙ্গে এত মিল, চিবুকে ছোট্ট ও সরু একটা কাটা দাগ না থাকলে আপন বোন বলে অনায়াসে চালিয়ে দেয়া সম্ভব।

মেয়েটার নাম শম্পা মালাকার। জন্ম সিঙ্গাপুরে। ছয় বছর বয়েসে বাবা মারা যায়। বাবা ও মা দু'জনেই বাঙালী, তবে বাবা মারা যাবার পর মা এক মাদ্রাজী ব্যবসায়ীকে বিয়ে করে। শম্পার যখন আঠারো বছর বয়েস, কি কারণে জানা যায়নি ওর মা আত্মহত্যা করে। দু'বছর পর সৎ বাবা বাট বছর বয়েসী এক বন্ধুর সঙ্গে ওর বিয়ে দিতে চায়। আতঙ্কে ও ঘৃণায় হংকঙে পালায় শম্পা, ওখানকার এক রেস্তোরাঁর কিচেনে চাকরি নেয়। প্রথমে থালা-বাসন ধুতো, পরে রান্না শেখে। চাইনীজ আর ভারতীয়, দু'ধরনের রান্নাতেই হাত পাকায় সে। বছর দুই আগে হুয়ান হান ম্যারিটাইম-এ শেফ হিসেবে চাকরি পেয়েছে। সেই থেকে ইউয়েন ফিয়েন নামে একটা কন্টেইনার শিপে কুক হিসেবে কাজ করছে।

শম্পা মালাকার-এর ডোশিয়ে পড়ার সময় শাকিলা লক্ষ করল, তথ্যগুলো পাঠানো হয়েছে সিআইএ হেডকোয়ার্টার থেকে। পড়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত পিট লুকাস চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে থাকলেন। শাকিলা বলল, 'মিলটা অদ্ভুতই বলতে হবে। লম্বায় আমরা এক, ওজনেও তাই। শম্পার চেয়ে মাত্র চার মাসের বড় আমি।' ফাইলটা খোলা অবস্থায় কোলের ওপর ফেলে রাখল সে। 'আপনি চান ওর জায়গায় কাজ করি আমি? এটাই আমার অ্যাসাইনমেন্ট?'

মাথা ঝাঁকালেন লুকাস। 'হ্যাঁ।'

'আমি যখন সান বার্ডে, ওরা আমার পরিচয় জেনে ফেলে,' বলল শাকিলা। 'এফবিআই-এ হুয়ান হানের লোক আছে, সে ফাঁস করে দিয়েছে আমি আইএনএস-এর এজেন্ট।'

'এফবিআইকে আমি জানিয়েছি। ডাবল এজেন্ট লোকটাকে তারা লোকেট করতে পেরেছে। সারাক্ষণ চোখে চোখে রাখা হচ্ছে তাকে।'

'শম্পা মালাকারের পরিচয় নিয়ে ইউয়েন ফিয়েনে যাব অথচ ধরা পড়ব না, এ কি সম্ভব?'

'শম্পা হিসেবে মাত্র চার কি পাঁচ ঘণ্টা জাহাজটায় কাজ করতে হবে আপনাকে। জাহাজের রুটিনে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে হবে, চোখ-কান খোলা রেখে আবিষ্কার করতে হবে কিভাবে হান হিউম্যান কার্গো খালাস করছে তীরে।'

'আপনারা কিভাবে জানলেন ইউয়েন ফিয়েন অবৈধ অভিবাসী নিয়ে আসছে?'

ঘটনাটা ব্যাখ্যা করলেন পিট লুকাস। হংকং থেকে সিআইএ-র একজন আন্ডারকাভার এজেন্ট রিপোর্ট করেছে, লাগেজ সহ তিনশো পুরুষ, মহিলা ও শিশুকে গভীর রাতে কয়েকটা বাসে তুলে জাহাজটার পাশে ডকে আনা হয়, তারপর তাড়াহুড়ো করে একটা ওয়্যারহাউসে ঢোকানো হয়। দু'ঘণ্টা পর ইউয়েন ফিয়েন নোঙর তুলে যাত্রা শুরু করে। সকালে এজেন্ট দেখে ওয়্যারহাউস খালি। তিনশো বা তারও কিছু বেশি মানুষ স্রেফ গায়েব হয়ে গেছে। এজেন্ট খোঁজ নিয়ে দেখেছে, এদের প্রায় সবাই বাংলাদেশী, ঢাকা থেকে সিঙ্গাপুর হয়ে হংকঙে আসে।'

'তার ধারণা ওদেরকে ইউয়েন ফিয়েনে তোলা হয়েছে?'

'ইউয়েন ফিয়েন বড় আকারের কন্টেইনার শিপ, তিন-সাড়ে-তিনশো মানুষকে লুকিয়ে রাখা সম্ভব। ওটার গন্তব্যও লুইযিয়ানার সানগারি। এটাও যে হুয়ান হানের আরেকটা স্মাগলিং ভেসেল, প্রায় নিশ্চিত ভাবেই ধরে নেয়া চলে।'

'এবার আর আমার রক্ষা নেই,' শাকিলাকে চিন্তিত দেখাল। 'ওরা কোন ঝুঁকি নেবে না, ধরতে পারলে সঙ্গে সঙ্গে সাগরে ফেলে দেবে। হাঙরের পেটে চলে যাব।'

'এত ভয় পাবার কোন কারণ নেই,' আশ্বস্ত করলেন লুকাস। 'এবার আপনাকে আমরা একা ছাড়ছি না। আপনার সঙ্গে একটা রেডিও থাকবে, প্রতি মুহূর্তের খবর জানতে পারব আমরা। ব্যাকআপ থাকবে এক মাইলের মধ্যে।'

বিপদে পড়লে রোমাঞ্চ অনুভব করে শাকিলা, অজানাকে জানার একটা নেশা আছে তার মধ্যে। এরইমধ্যে উত্তেজনা বোধ করছে সে, যেন একটা রশির ওপর দিয়ে হাঁটছে। 'কিন্তু একটা সমস্যা আছে,' বলল সে।

'কি?'

'মা আমাকে ভোজনরসিকদের রসনা তৃপ্ত করার কলাকৌশল শিখিয়েছেন,' বলল শাকিলা। 'জেলখানার বা লঙ্গরখানার একগাদা লোককে খুশি করতে পারব কিনা জানি না।'

গাঢ় নীল আকাশে আসমানী রঙের স্কাইফক্স ফ্লাইং বোট একটা সরলরেখার ওপর দিয়ে ছোটার সময় সিধে হলো, সানগারির ডক আর টার্মিনাল বিল্ডিংগুলোর ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। চক্কর দিয়ে কয়েকবার আসা-যাওয়া করল ওটা, দৈত্যাকার ক্রেনগুলোর মাথা থেকে একশো ফুট ওপরে থাকল। সব ডকই খালি, শুধু একটায় নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে আছে ফ্রেইটারটা, ওটারই হোল্ড থেকে কাঠের কার্গো ক্রেট তুলছে ক্রেনগুলো। ফ্রেইটারটা মার্চেন্ট শিপ, ডক আর টো-বোট সহ একটা বার্জের মাঝখানে নোঙর ফেলেছে।

'ব্যবসা নিশ্চয়ই খুব মন্দা যাচ্ছে,' কো-পাইলটের সীট থেকে মন্তব্য করল ববি মুরল্যান্ড।

'যে পোর্ট ফ্যাসিলিটিতে জাহাজের পুরো একটা বহর ভিড়তে পারে, সেখানে একটা মাত্র জাহাজ মাল খালাস করছে,' বলল রানা। 'বার্জটা সম্পর্কে কিছু বলো।'

'আজ বোধহয় আবর্জনা সরানোর দিন। ক্রুরা মনে হচ্ছে জাহাজের কিনারা থেকে প্লাস্টিকের বস্তা ফেলছে বার্জে।'

'সিকিউরিটি?'

'বন্দরটা জলাভূমির মাঝখানে,' জলমগ্ন জলাভূমির চারদিকে চোখ বুলিয়ে বলল মুরল্যান্ড। 'শুনেছি এদিকে শুধু কুমীর শিকার করা হয়। সিকিউরিটি গার্ডরাও বোধহয় তাই করতে গেছে, তা না হলে একজনকেও দেখতে পাচ্ছি না কেন। ফ্রেইটারের গা থেকে টো-বোট আর বার্জ সরে যাচ্ছে, খোলা পানিতে বেরিয়ে এলে ওগুলোর ওপব দিয়ে উড়ে যাও একবার।'

খানিক পর রানা বলল, 'ঘুরছি।' লকহীড স্কাইফক্স টু-সীটার জেট এয়ারক্রাফট ঘুরিয়ে নিল রানা, সরলরেখার ওপর সিধে হয়ে পাঁচতলা উঁচু টো-বোটের ওপর দিয়ে উড়ে এল। টো-বোটের চৌকো বো বার্জের স্টার্নে নাক ঠেকিয়ে রেখেছে। ফ্রেইটারের হুইলহাউস থেকে বেরিয়ে এসে এক লোক ঘন-ঘন

হাত নেড়ে সরে যেতে বলছে প্লেনটাকে।

'ক্যাপটেনের পাগলামি দেখে মনে হচ্ছে অ্যালার্জি আছে, বাজপাখির দৃষ্টি সহ্য করতে পারে না।'

'চিরকুট ফেলে জানতে চাও বিশাখাপত্তম কোন দিকে।' আবার প্লেন ঘুরিয়ে নিয়ে ফ্রেইটারের দিকে ফিরছে রানা। প্লেনটা মিলিটারি জেট ট্রেনার ছিল, নুমা কেনার পর ওয়াটারপ্রুফ খোল আর রিট্র্যাক্ট বল ফ্লোট লাগিয়ে ওয়াটার ল্যান্ডিঙের উপযোগী করা হয়েছে, ককপিট আর ডানার পিছনে ফিউযিলাজে জোড়া জেট এঞ্জিন। নুমার লোকজনকে আনা-নেয়ার কাজে বড় জেট প্লেন পাওয়া না গেলে এই স্কাইফক্সই সাধারণত ব্যবহার করা হয়।

এবার রানা টো-বোটের চিমনি আর ইলেকট্রনিক গিয়ারের পঞ্চাশ ফুটের মধ্যে নেমে এল। গিয়ারগুলো হুইলহাউসের ছাদ থেকে শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে দিয়েছে। বোট আর বার্জের ওপর দিয়ে উড়ে যাবার সময় আবর্জনা ভর্তি ব্যাগের আড়ালে দু'জন লোককে লুকিয়ে পড়তে দেখল মুরল্যান্ড। 'দুই শয়তান অদৃশ্য হবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে, সঙ্গে অটোমেটিক রাইফেল,' শান্ত সুরে রিপোর্ট করল সে।

'আর কিছু দেখার নেই,' বলল রানা। 'চলো সী গালে যাই, মি. রেডক্লিফের সঙ্গে দেখা করি।' নুমার রিসার্চ ভেসেল সী গাল নিয়ে বেশ কয়েক দিন আগেই সানগারিতে পৌঁচেছেন জর্জ রেডক্লিফ, নুমার অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর (অপারেশন্স)। প্লেন অ্যাটচাফালেয়া নদীর দিকে ঘুরে গেল, সুইট বে লেকের দিকে যাচ্ছে। খানিক পরই রিসার্চ ভেসেলটা দৃষ্টিসীমার ভেতর চলে এল, ফ্ল্যাপ নিচু করে আর ফ্লোট নামিয়ে ওয়াটার ল্যান্ডিঙের প্রস্তুতি নিল রানা।

ফ্লোটের ওপর নামল প্লেন, ভাসতে ভাসতে রিসার্চ শিপের পাশে চলে এল। ক্যানোপি তুলে জর্জ রেডক্লিফ আর ক্যাপটেন স্টিভেন পিংকারের উদ্দেশে হাত নাড়ল মুরল্যান্ড, রিসার্চ শিপের রেইলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। পিছন ফিরলেন ক্যাপটেন, গলা চড়িয়ে নির্দেশ দিলেন। জাহাজের ক্রেন সচল হলো, ওটার বুম ঝুলে থাকল প্লেনের ওপর। এরপর কেবল নিচু করা হলো, সেটা ধরে হুক আর লাইন প্লেনের ডানায় লাগানো লিফটিং রিঙে আটকাল মুরল্যান্ড। ক্রেনের এঞ্জিন গিয়ার বদল করল, স্কাইফক্সকে শূন্যে তুলে নিচ্ছে। হেলিকপ্টারের পাশে ল্যান্ডিং প্যাডে নামানো হলো ওটাকে। ককপিট থেকে নেমে এসে রেডক্লিফ আর পিংকারের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল রানা ও মুরল্যান্ড।

'আকাশে চক্কর দিয়ে ইন্টারেস্টিং কিছু দেখলেন?' রানাকে জিজ্ঞেস করলেন রেডক্লিফ।

মাথা নাড়ল রানা। 'ববি শুধু একজোড়া অটোমেটিক রাইফেল দেখেছে।'

'আপনারা তাহলে আমাদের চেয়ে ভাগ্যবান,' বিড় বিড় করলেন পিংকার।

ডানা ভাঁজ করা একটা পেলিকানকে পানিতে ছোঁ মারতে দেখল রানা, ঠোঁটে মাছ নিয়ে আবার আকাশে উঠল। 'অ্যাডমিরাল জানিয়েছেন, ডকের নিচে ল্যান্ডফিল কেসিং-এ আপনারা কোন ফাঁক-ফোকর খুঁজে পাননি, তার আগেই ওরা আপনাদের এইউভি ছিনিয়ে নিয়ে গেছে।'

'কথাটা সত্যি,' স্বীকার করলেন রেডক্লিফ। 'তবে সানগারি দিয়ে লোক

পাচারের কোন প্ল্যান হানের যদি থেকেও থাকে, আন্ডারগ্রাউন্ড টানেলের মাধ্যমে কাজটা করা হচ্ছে না। এদিকে এমন কোন টানেল নেই যার ভেতর কোন বোট ঢুকতে পারবে। কাছেপিঠে কোন ওয়্যারহাউস টার্মিনালও নেই যে পাচার করা লোকজনকে সেখানে জড়ো করবে।'

'আমরা নুমার একটা দামী ইকুইপমেন্ট হারিয়েছি,' বললেন পিংকার। 'সাহস করে ফেরতও চাইতে পারছি না।'

'এখানে আমরা শুধু শুধু বসে আছি,' বললেন রেডক্লিফ। 'প্রায়-খালি ডক আর নির্জন বিল্ডিং ছাড়া দেখার কিছু নেই।'

'মন খারাপ করবেন না, মি. রেডক্লিফ,' বলল রানা। 'হংকং থেকে একদল অবৈধ অভিবাসীকে নিয়ে সানগারিতে পৌঁচেছে একটা জাহাজ, আবর্জনা খালাস করার পর সানগারিতেই রয়েছে ওটা। তবে অবৈধ অভিবাসীদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে স্টেজিং সেন্টারে।'

হতভম্ব হয়ে রানার দিকে তাকিয়ে থাকলেন রেডক্লিফ । 'কি দেখেছেন বলুন আমাকে, প্লীজ।'

'খানিক আগে টো-বোট আর বার্জ সানগারি ত্যাগ করেছে,' বলল রানা। 'বার্জে দু'জন লোককে দেখেছে ববি, সঙ্গে অটোমেটিক রাইফেল ছিল।'

'টো-বোট ক্রুদের কাছে অস্ত্র থাকতেই পারে,' রেডক্লিফ বললেন। 'মূল্যবান কার্গো পরিবহনের সময় প্রয়োজনও হয়।'

'মূল্যবান কার্গো?'

হেসে উঠল রানা। 'দীর্ঘ সমুদ্র যাত্রার শেষে একটা জাহাজে প্রচুর আবর্জনা জমা হয়, সেগুলোই আমরা জাহাজ থেকে বার্জে নামাতে দেখেছি। আবর্জনা পাহারা দেয়ার জন্যে অস্ত্র দরকার হবে কেন? অস্ত্র দরকার হিউম্যান কার্গো যাতে পালাতে না পারে।'

'তা আপনি জানছেন কিভাবে?'

'সম্ভাবনাগুলো এক এক করে বাদ দিয়ে,' বলল রানা, এখানে ঠিক কি ঘটছে আন্দাজ করতে পারায় নিজের ওপর খুশি। 'বর্তমানে সানগারিতে আসা-যাওয়া করার একমাত্র মাধ্যম সমুদ্রগামী জাহাজ আর রিভারবোট। জাহাজগুলো অবৈধ অভিবাসীদের নিয়ে আসছে, কিন্তু গোপনে তাদেরকে স্টেজিং এরিয়ায় নিয়ে গিয়ে দেশের বিভিন্ন অংশে পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না। আপনারা এরইমধ্যে জানতে পেরেছেন যে জাহাজ থেকে গোপন কোন উপায়ে ডকের নিচে বা কোন ওয়্যারহাউসেও তাদেরকে সরানো হচ্ছে না। কাজেই ধরে নিতে হয় বার্জে করেই তাদেরকে পাচার করা হচ্ছে।'

'সম্ভব নয়,' সম্ভাবনাটা সরাসরি নাকচ করে দিলেন ক্যাপটেন স্টিভেন পিনকার। 'জাহাজ ডকে নোঙর ফেলা মাত্র কাস্টমস অ্যান্ড ইমিগ্রেশন এজেন্টরা হাজির হয়, জাহাজের বো থেকে স্টার্ন পর্যন্ত এক ইঞ্চি জায়গাও সার্চ করতে বাকি রাখে না। সমস্ত কার্গো ওয়্যারহাউসে নামানো হয় ইন্সপেকশনের জন্যে। আবর্জনার প্রতিটি ব্যাগ ও বস্তা পরীক্ষা করা হয়। তাহলে বলুন, হুয়ান হানের লোকেরা কিভাবে ইন্সপেক্টরদের চোখে ধুলো দিচ্ছে?'

'আমার ধারণা মার্চেন্ট শিপের খোলের নিচে আলাদা একটা আন্ডারওয়াটার ক্র্যাফট আছে, অবৈধ অভিবাসীদের সেটায় লুকিয়ে রাখা হয়। জাহাজটা পোর্টে নোঙর ফেলার পর যেভাবে হোক জলমগ্ন ক্র্যাফট বার্জের তলায় সরিয়ে দেয়া হয়। বার্জটা সে-সময় জাহাজের পাশেই থাকে, আবর্জনা গ্রহণ করার জন্যে। খোলের নিচে যখন আন্ডারওয়াটার ক্রাফট স্থানান্তরের কাজ চলছে, জাহাজের ওপর তখন কাস্টমস অ্যান্ড ইমিগ্রেশন ইন্সপেক্টররা সার্চ করে কিছুই পাচ্ছে না। খোলের নিচে আটকানো আন্ডারওয়াটার ক্র্যাফট নিয়ে পোর্ট ত্যাগ করছে বার্জ, অ্যাটচাফালেয়ার উজানে একটা ল্যান্ড ফিল-এ আবর্জনা ফেলবে, যাবার সময় পথ থেকে সরে গিয়ে অবৈধ অভিবাসীদের নামিয়ে দেবে কোথাও।'

রেডক্লিফকে দেখে মনে হলো যেন কোন দরবেশ চোখে হাত বুলিয়ে দোয়া করায় এইমাত্র দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছেন। 'আবর্জনা ভর্তি একটা বার্জের ওপর দু'তিনবার চক্কর দিয়ে এত সব ধরে ফেলেছেন আপনি?'

'অন্তত একটা থিওরি তো বটে,' বিনয়ের সঙ্গে বলল রানা।

'আপনার এই থিওরি অনায়াসে যাচাই করা সম্ভব,' বললেন পিনকার।

'সেক্ষেত্রে কথা বলে সময় নষ্ট করছি আমরা।' উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন রেডক্লিফ । 'রিসার্চ শিপ থেকে পানিতে আমরা একটা লঞ্চ নামাব, টোবোটটাকে অনুসরণ করা হবে। আপনি আর মুরল্যান্ড আকাশ থেকে নজর রাখবেন ওটার ওপর।'

মাথা নাড়ল মুরল্যান্ড। 'উচিত হবে না। প্লেন দেখে এরইমধ্যে সতর্ক হয়ে গেছে ওঁরা।'

'ববি ঠিক বলছে। স্মাগলাররা বোকা নয়।' চিন্তা করছে রানা। 'ওয়াশিংটনে ওদের ইন্টেলিজেন্স সোর্স আছে, সেই উৎস থেকে সানগারি সিকিউরিটি ফোর্সকে সী গালের সবার ফটোগ্রাফ স্যাটেলাইটের মাধ্যমে পৌঁছে দেয়া হয়েছে। যা কিছু করার গোপনে করতে হবে আমাদের।'

'অন্তত ইমিগ্র্যান্ট অ্যান্ড ন্যাচারালাইজেশন সার্ভিসকে জানানো উচিত নয়?' পিনকার জিজ্ঞেস করলেন।

'আগে নিরেট প্রমাণ সংগ্রহ করি, তারপর,' বলল রানা।

'সমস্যা আরও একটা আছে,' বলল মুরল্যান্ড। 'প্রেসিডেন্ট কি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন জানা যায়নি, তবে সিআইএ, এফবিআই আর আইএনএস হুয়ান হানের বিরুদ্ধে তদন্ত চালাতে নিষেধ করেছে নুমাকে।'

নিঃশব্দে হাসলেন রেডক্লিফ। 'অ্যাডমিরাল সেটা আমাকে জানিয়েছেন। তারমানে আমরা এখানে হানের বিরুদ্ধে আনঅফিশিয়ালি কাজ করছি, পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত গবেষণার ছুতোয়।'

'এখন তাহলে আমাদের সময় কাটে কিভাবে?' জানতে চাইলেন পিনকার। 'অ্যাকশনেই ব যাব কখন?'

'সী গাল যেখানে আছে সেখানেই থাকুক,' বলল রানা। 'পরে সানগারির যতটা কাছে সম্ভব নোঙর ফেলবেন, লক্ষ রাখবেন কোথায় কি ঘটছে।'

'আর আপনারা? আপনারা কি করবেন?' জানতে চাইলেন রেডক্লিফ।

'নদীর উজানে যাব আমরা, দেখি স্টেজিং সেন্টারটা খুঁজে বার করতে পারি কিনা,' বলল রানা।

'সেক্ষেত্রে আপনাদের একজন গাইড দরকার হবে,' পিনকার বললেন। 'এখান থেকে ব্যাটন রুজ-এর ওপর ক্যান্যাল লক পর্যন্ত হাজারখানেক ইনলেট, কাদাভর্তি ডোবা, খাল, বিল আর গভীর নালা আছে। এই বিশাল জলাভূমি আর নদী সম্পর্কে যার কোন ধারণা নেই, নির্ঘাত হারিয়ে যাবে সে। এরকম হারিয়ে যাওয়া বহু লোককে কোনদিনই আর খুঁজে পাওয়া যায়নি।'

'গাইড লাগবে না,' বলল রানা, 'ডিটেল্ড্ টপগ্রাফিকাল ম্যাপ হলেই চলবে। আমরা কোথায় কিভাবে আছি স্যাটেলাইট ফোনে আপনাদের জানাতে পারব। পরবর্তী জাহাজ থেকে বার্জ আর টৌ-বোট রওনা হলে আপনারা আমাদেরকে জানাবেন।'

ওই একই দিন বিকেলে কোস্ট গার্ড কাটার 'মার্ভেল' উপকূল বরাবর টহল দিচ্ছে, ক্যাপটেন বিল হিউমের নির্দেশে স্পীড কমিয়ে আনা হলো। নির্দেশ দিয়ে চোখে বিনকিউলার তুললেন তিনি। দক্ষিণ দিক থেকে বড় আকৃতির একটা কন্টেইনার শিপ আসছে, এই মুহূর্তে সেটা এক নটিকাল মাইল দূরেও নয়। চেহারায় কোন উত্তেজনা নেই, পেশীতেও টান পড়েনি, চোখ থেকে বিনকিউলার নামিয়ে শাকিলার দিকে তাকালেন তিনি, ব্রিজ উইং-এ তার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে ইউনাইটেড স্টেটস কোস্ট গার্ড-এর ইউনিফর্ম পরে। 'ওটাই আপনার জাহাজ,' নরম সুরে বললেন। 'ভেড়ার পোশাক পরা নেকড়ে।'

রেলিঙের ওপর দিয়ে জাহাজটার দিকে তাকাল শাকিলা, গায়ে সাদা হরফে লেখা রয়েছে ইউয়েন ফিয়েন। 'আল্লাই বলতে পারবেন খোলের ভেতর কতজন লোককে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। আমি যে জাহাজে আসি, তাতে দিনে একবার খেতে দেয়া হত, তা-ও আধপেটা।'

শাকিলা কোন মেকআপ ব্যবহার করেনি, শুধু চিবুকে একটা শুকনো ক্ষতচিহ্ন নকল করা হয়েছে। তবে যে দীর্ঘ কালো চুল নিয়ে ওর অহঙ্কার আর গর্বের অন্ত ছিল না, সেটা কেটে এত ছোট করা হয়েছে, মেয়েদের চেয়ে বরং পুরুষদের মাথায় বেশি মানানসই মনে হবে। কাটার সময় কান্না পেলেও চোখের পানি ফেলেনি শাকিলা, নিজেকে সান্ত্বনা দিয়েছে এই বলে যে শম্পা মালাকারের চেহারার সঙ্গে তার চেহারার অমিল যতটা সম্ভব কমিয়ে আনতে না পারলে পৈত্রিক প্রাণটা বেঘোরে হারাতে হবে। চুল কাটার পর মাথায় একটা ক্যাপ পরেছে ও। নিজের ওপর আস্থা আছে, শম্পার ভূমিকায় নির্বিঘ্নে উতরে যেতে পারবে। ওর ইমিডিয়েট বস্ পিট লুকাস শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সুযোগ দিয়েছেন, ইচ্ছে করলে শাকিলা বিপজ্জনক অ্যাসাইনমেন্টটা থেকে সরে দাঁড়াতে পারত। তা দাঁড়ায়নি হুয়ান হানের প্রতি তীব্র ঘৃণার কারণে। হান একটা মানুষরূপী পশু, তার বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে মরতে হলেও সে রাজি।

ঘুরে সমতল ও সবুজ তটরেখা আর অ্যাটচাফালেয়া নদীর মোহনার দিকে বিনকিউলার ফোকাস করলেন হিউম, মাত্র তিন মাইল দূরে। দু'চারটে ছোট বোট

চিংড়ি ধরছে, পানিতে আর কিছু নেই। আরেক পাশে দাঁড়ানো তরুণ অফিসারের দিকে ফিরলেন তিনি। 'লেফটেন্যান্ট টাফিন, সিগন্যাল দিয়ে থামতে বলো ওদেরকে, ইন্সপেকশনের জন্যে জাহাজে চড়ব আমরা।'

'ইয়েস, স্যার,' বলে রেডিও রুমে ঢুকল টাফিন, একহারা গড়ন দেখে মনে হয় টেনিস ইন্সট্রাক্টর।

কন্টেইনার শিপ ইউয়েন ফিয়েন-এ সিঙ্গাপুরী পতাকা উড়ছে। কোস্ট গার্ড কাটার মার্ভেল সামান্য দিক বদলে ওটার সঙ্গে সমান্তরাল রেখায় চলে এল। ইউয়েন ফিয়েনের ডেকে স্তূপ হয়ে আছে কন্টেইনার, অথচ অদ্ভুত ব্যাপার হলো তারপরও পানির ওপর অনেক উঁচু দেখাচ্ছে ওটাকে। গলা চড়িয়ে ক্যাপটেন হিউম জানতে চাইলেন, 'ওরা কি সাড়া দিচ্ছে না?'

রেডিও রুম থেকে টাফিন জবাব দিল, 'দিচ্ছে, তবে চীনা ভাষায়।'

'আমি কি অনুবাদ করব?' জিজ্ঞেস করল শাকিলা।

'এটা ওদের চালাকি,' নিঃশব্দে হেসে বললেন হিউম। 'থামতে বললে বেশিরভাগ জাহাজই না বোঝার ভান করে। অথচ প্রায় সব অফিসারই আমাদের চেয়ে ভাল ইংরেজি জানে।'

হিউম অপেক্ষা করছেন। বোতে বসানো সেভেনটি-সিক্স-মিলিমিটার মার্ক সেভেনটিফাইভ রিমোট-কন্ট্রোলড, র‍্যাপিড-ফায়ারিং কামানটা কন্টেইনার শিপের দিকে ঘুরে গেল। 'ইউয়েন ফিয়েন-এর ক্যাপটেনকে জানাও, ইংরেজিতে, এঞ্জিন বন্ধ করুক, তা না হলে ব্রিজে গোলা ফেলব আমরা।'

কয়েক সেকেন্ড পর ব্রিজে ফিরে এল লেফটেন্যান্ট টাফিন, হাসছে বলে সরু আর লম্বা হয়ে আছে ঠোঁট। 'ক্যাপটেন এবার ইংরেজিতেই জবাব দিল,' বলল সে। 'বলল, থামছে।'

ধীরে ধীরে কন্টেইনার শিপ স্থির হয়ে গেল। শাকিলাকে অভয় দিয়ে হাসলেন হিউম, বললেন, 'আপনি রেডি তো, মিস শাকিলা?'

মাথা ঝাঁকাল শাকিলা। 'এক পায়ে খাড়া, ক্যাপটেন।'

'রেডিওটা আরেকবার চেক করবেন?'

যদিও মাথা নাড়ল, তবে চোখ নামিয়ে ব্রেসিয়ারের ভেতর টেপ দিয়ে আটকানো খুদে রেডিওটা দেখে নিতে ভুলল না। 'খানিক আগে শেষবার চেক করেছি, ঠিকমতই কাজ করছে।' কাউকে কিছু বুঝতে না দিয়ে দুই পা এক করল সে, ডান উরুর ভেতর দিকে স্ট্র্যাপ দিয়ে আটকানো ছোট্ট অটোমেটিকটার অস্তিত্ব আরেকবার অনুভব করল। ইউনিফর্ম আস্তিনের নিচে একটা ছোট ছুরিও আছে, খুদে বোতামে চাপ দিলে ফলাটা লাফ দিয়ে বেরিয়ে আসবে।

'ট্র্যান্সমিটার সব সময় অন করে রাখবেন, আপনার প্রতিটি কথা আমরা যাতে শুনতে পাই,' বললেন ক্যাপটেন হিউম। 'মার্ভেল আপনার রেডিওর রেঞ্জের মধ্যে থাকবে, যতক্ষণ না ইউয়েন ফিয়েন সানগারিতে নোঙর ফেলে। আপনি তৈরি, এই সিগন্যাল পাওয়া মাত্র আমরা আপনাকে নামিয়ে আনার ব্যবস্থা করব। তার আগেও যদি কোন সমস্যা দেখা দেয়, এই ধরুন ওরা জেনে ফেলল যে আপনি শম্পা মালাকার নন, সঙ্গে সঙ্গে জানাবেন। আপনাকে উদ্ধার করার জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ব

আমরা। আকাশে একটা কন্টারও থাকবে, প্রয়োজনে ইউয়েন ফিয়েনের ডেকে ল্যান্ড করবে।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ, ক্যাপটেন,' কৃতজ্ঞচিত্তে বলল শাকিলা। 'আপনারা আমার জন্যে অনেক করছেন।'

'মার্ভেলের আমরা সবাই আপনার নিরাপত্তার জন্যে সম্ভাব্য সব কিছু করব, এটাই আমাদের দায়িত্ব।'

'আমার পক্ষ থেকে সবাইকে ধন্যবাদ দেবেন, প্লীজ।'

কাটারের একটা লঞ্চ পানিতে নামাতে বললেন ক্যাপটেন। শাকিলার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করলেন তিনি। 'গড ব্লেস, অ্যান্ড বেস্ট অব লাক।'

ইউ.এস. কোস্ট গার্ড জাহাজ থামিয়েছে তো কি হয়েছে? ইউয়েন ফিয়েনের ক্যাপটেন লি চ্যাং মিং মোটেও উদ্বিগ্ন নয়। আসুক না ওরা, আসুক, জাহাজের বো থেকে স্টার্ন পর্যন্ত তন্নতন্ন করে খোঁজাখুঁজি করুক, সন্দেহজনক কিছুই দেখতে পাবে না। হুয়ান হান ম্যারিটাইমের ডিরেক্টররা আগেই তাকে সাবধান করে দিয়েছে, অবৈধ অভিবাসীদের স্রোত ঠেকাবার জন্যে মার্কিন ইমিগ্রেশন এজেন্টরা একেবারে মরিয়া হয়ে উঠেছে। উঠুক, সে কোন হুমকি অনুভব করছে না। যত খুঁটিয়েই পরীক্ষা করা হোক, বিলজ আর কীল-এর নিচে আটকানো দ্বিতীয় খোলটা কারও চোখে ধরা পড়বে না। ওটার ভেতর তিনশো পঁচিশজন অবৈধ অভিবাসী আছে। ছোট্ট জায়গার ভেতর খুবই কষ্টে আছে ওরা, তবে একজনও মারা যায়নি। তাকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তাইওয়ানে ফিরে গেলে মোটা টাকা বোনাস দেয়া হবে। এর আগেও পাঁচবার জাহাজ ভর্তি মানুষ পাচার করেছে সে, বেতন বাদে যে বোনাস পেয়েছে তা দিয়ে সিঙ্গাপুরের অভিজাত পাড়ায় ছোট্ট একটা বাড়ি কেনা যায়।

কোস্ট গার্ড কাটারের লঞ্চ এগিয়ে আসছে। চ্যাং মিং তার ফার্স্ট অফিসারকে বলল, 'বোর্ডিং র‍্যাম্পে চলে যাও, অতিথিদের অভ্যর্থনা জানাও। দশজন বলে মনে হচ্ছে। সব রকম সহযোগিতা করবে, জাহাজের কোথাও যেতে বাধা দেবে না।'

লেফটেন্যান্ট টাফিন ব্রিজে ঢুকে প্রথমেই ক্যাপটেন চ্যাং মিংকে প্রাপ্য সম্মানসূচক অভিবাদন জানাল, তারপর সবিনয়ে জাহাজের কাগজ-পত্র আর কার্গোর তালিকা দেখতে চাইল। কোস্ট গার্ড কাটার-এর ক্রুরা কয়েক ভাগে আলাদা হয়ে গেল—চারজন গেল কমপার্টমেন্ট সার্চ করতে, তিনজন কার্গো কন্টেইনার পরীক্ষা করতে, বাকি তিনজন গেল ক্রুদের কোয়ার্টার দেখতে। চীনারা নির্লিপ্ত আচরণ করছে, লক্ষ করল কোস্ট গার্ডের তিনজন সদস্য ক্রুদের কেবিন বাদ দিয়ে মেস আর গ্যালির ওপরই বেশি আগ্রহ দেখাচ্ছে।

মেস রূমে মাত্র দু'জন ক্রু। দু'জনের পরনেই সাদা ইউনিফর্ম আর হ্যাট, গ্যালিতে কাজ করার সময় যেমন পরা হয়। চেয়ারে বসে একজন চীনা খবরের কাগজ পড়ছে, আরেকজন চামচ দিয়ে সুপ নাড়ছে। কোস্ট গার্ড কাটার-এর শেফ ডন হুবার্ট ওদেরকে প্যাসেজে বেরিয়ে আসতে বলল, কারণ তার লোকজন

ডাইনিং এরিয়া সার্চ করবে। চীনা ক্রু দু'জন কোন প্রতিবাদ করল না।

কোস্ট গার্ড ক্রুর ছদ্মবেশ নিয়ে এসেছে শাকিলা. সরাসরি গ্যালিতে ঢুকে দেখল শম্পা মালাকার সাদা শার্ট-প্যান্ট পরে একটা স্টোভের ওপর ঝুঁকে কাজ করছে। তার এক হাতে কাঠের চামচ। বড় একটা পিতলের গামলায় চিংড়ি মাছ সেদ্ধ হচ্ছে, চামচটা দিয়ে মাছগুলো নাড়াচাড়া করছে সে। গামলা থেকে বাষ্প উঠছে, মুখ তুলে তাকাতে চেহারাটা আবছা লাগল, একটু হেসে আবার নিজের কাজে মন দিল মেয়েটা। তার ঠিক পিছনে এসে দাঁড়াল শাকিলা, দ্রুত চোখ বুলিয়ে দেখে নিচ্ছে প্যান্ট্রি আর স্টেটরুমগুলো।

সিরিঞ্জের সুঁচটা ঘাড়ের মাংসে ঢুকল, তবে কিছুই অনুভব করল না শম্পা। কয়েক সেকেন্ড পর গামলার ওপর বাষ্প অসম্ভব ঘন হয়ে ওঠায় চোখে বিহ্বল একটা দৃষ্টি ফুটল শুধু। পরমুহূর্তে কালো একটা পর্দা নেমে এল সামনে। আরও বেশ অনেকক্ষণ পর তার ঘুম ভাঙবে মার্ভেলে। প্রথমেই যে চিন্তাটা মাথায় ঢুকবে, সে কি চিংড়িগুলো বেশি সেদ্ধ করে ফেলেছে?

আগেই রিহার্সেল দেয়া ছিল, দেড় মিনিটের মধ্যে নিজের কাজ সেরে ফেলল শাকিলা। শম্পার ড্রেস পরে নিয়েছে সে, ওদিকে শম্পা ইউ. এস. কোস্ট গার্ড সদস্যদের জন্যে বরাদ্দ ইউনিফর্ম পরা অবস্থায় ডেকে শুয়ে আছে। শম্পার চুল কাটতে আরও ত্রিশ সেকেন্ড সময় নিল শাকিলা, চুল কাটার পর ক্যাপটা পরিয়ে দিল মাথায়। 'এবার ওকে নিয়ে যেতে পারেন,' শেফ ডন হুবার্টকে বলল শাকিলা। হুবার্ট তখনও দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে প্যাসেজ পাহারা দিচ্ছে।

হুবার্ট ও তার সঙ্গী দ্রুত ডেক থেকে তুলে খাড়া করল শম্পাকে। শম্পার দু'পাশে থাকল তারা, অসাড় হাত দুটো তুলে নিল নিজেদের কাঁধে, ফলে মুখটা বুকের ওপর ঝুঁকে থাকল, চেহারাটা সহজে কেউ দেখতে পাবে না। এগিয়ে এসে ক্যাপটা আরেকটু নিচে নামিয়ে শম্পার মুখ প্রায় ঢেকে দিল শাকিলা, তারপর মাথা ঝাঁকাল। হুবার্ট আর তার সঙ্গী গ্যালি থেকে রওনা হলো লঞ্চে ফেরার জন্যে, দু'জনের মাঝখানে রয়েছে শম্পা—খানিকটা টেনে নিয়ে যাচ্ছে, খানিকটা বয়ে।

কাঠের চামচটা তুলে নিয়ে পিতলের গামলায় নাড়ছে শাকিলা, যেন সেই বিকেল থেকে এই একটা কাজেই ব্যস্ত সে।

'আপনার এক লোক দেখছি আহত হয়েছে,' লঞ্চে অসাড় একটা দেহকে নামাতে দেখে বলল ক্যাপটেন চ্যাং মিং।

'আমার কপালে সব সময় একটা করে গর্দভ জোটে,' অভিযোগের সুরে বলল লেফটেন্যান্ট টাফিন। 'কোথায় যাচ্ছে খেয়াল করেনি, একটা ওভারহেড পাইপে মাথা ঠুকে গেছে। ভাগ্যিস খুলি ফাটেনি, শুধু ফুলে গেছে।'

চ্যাং মিং সকৌতুকে জানতে চাইল, 'আমার জাহাজে ইন্টারেস্টিং কিছু পেলেন?'

'না, স্যার, আপনার জাহাজ সাদা কাগজের মত ফর্সা।'

'মার্কিন কর্তৃপক্ষকে খুশি করতে পেরে আমি আনন্দিত।'

'আপনার গন্তব্য তো সানগারি, তাই না, স্যার?'

'হ্যাঁ, লেফটেন্যান্ট।'

'আমরা সরে যাওয়া মাত্র আপনি আপনার পথে রওনা হয়ে যান,' বলে চীনা ক্যাপটেনকে সৌজন্যমূলক স্যালুট করল টাফিন। 'দেরি করিয়ে দেয়ার জন্যে দুঃখিত, স্যার।'

কোস্ট গার্ড লঞ্চ চলে যাবার বিশ মিনিট পর মরগান সিটি থেকে পাইলট বোট হাজির হলো, ভিড়ল ইউয়েন-ফিয়েনের পাশে। জাহাজে চড়ে সরাসরি ব্রিজে চলে এল পাইলট। একটু পরই কন্টেইনার শিপ অ্যাটচাফালেয়া নদীর গভীর চ্যানেল ধরে রওনা হলো, সুইট বে লেক পার হয়ে সানগারির ডকে পৌঁছুবে। ব্রিজ উইং-এ, পাইলটের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে ক্যাপটেন চ্যাং মিং। পাইলট অটোমেটেড হেলম নিজের হাতে নিয়েছে, জলাভূমির ভেতর দিয়ে দক্ষতার সঙ্গে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে জাহাজকে। স্রেফ কৌতূহলবশতই চোখে বিনকিউলার তুলে আসমানী রঙের একটা জাহাজের দিকে তাকাল ক্যাপটেন চ্যাং মিং, নোঙর ফেলেছে চ্যানেলের ঠিক বাইরে। খোলের গায়ে বড় বড় হরফে লেখা রয়েছে 'নুমা'। দুনিয়ার সমস্ত সাগরে ঘুরে বেড়ানোর অভিজ্ঞতা আছে তার, মাঝে মধ্যেই নুমা লেখা রিসার্চ শিপ চোখে পড়েছে। সে ভাবল, সানগারির নিচে অ্যাটচাফালেয়া নদীতে কি নিয়ে গবেষণা করছে নুমা?

রিসার্চ শিপের ডেকে বিনকিউলার ফোকাস করল সে। হঠাৎ স্থির হয়ে গেল শরীরটা। মাথায় ঘন কালো কোঁকড়ানো চুল, ডেকে দাঁড়িয়ে আছে, তার চোখেও একজোড়া বিনকিউলার। চ্যাং মিং-এর কাছে যেটা অদ্ভুত মনে হলো, রিসার্চ ভেসেলের ডেকে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটা সরাসরি কন্টেইনার শিপের দিকে বিনকিউলার তাক করেনি।

লোকটা তাকিয়ে আছে স্টার্নের পিছনে আলোড়িত পানিতে, যেন উথলে ওঠা পানি গভীর মনোযোগের সঙ্গে পরীক্ষা করছে।

দুই

সান ফ্রান্সিসকোর চীনাপল্লীর কাছাকাছি মানুষ হওয়ায় ওদের ভাষাটা ভালই শেখা আছে শাকিলার, কাজেই শম্পা মালাকারের তৈরি মেন্যু আর রেসিপি ডিসাইফার করতে কোন সমস্যায় পড়তে হলো না ওকে। স্টোভের সামনে কাজ করার সময় মাথাটা নত করে রাখল, কাছাকাছি যারা আছে তারা যাতে চেহারাটা পরিষ্কার দেখতে না পায়। দু'জন সাহায্য করছে ওকে, একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট কুক, আরেকজন ডিশওয়াশার। কেউই ওকে সন্দেহের চোখে দেখছে না, নিজেদের কাজে ব্যস্ত তারা। ডিনার তৈরি প্রসঙ্গে প্রয়োজন হলে দু'একটা কথা হচ্ছে। ক্রুরাও কেউ গ্যালিতে ঢুকে বিরক্ত করছে না। একবার শুধু রুটি আর কেক তৈরির কারিগর তরুণ চীনা বেকারকে দেখা গেল শাকিলার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে। ব্যাপারটা লক্ষ করে ভুরু কোঁচকাল শাকিলা, বিস্মিত সুরে জিজ্ঞেস করল, 'একটা মেয়ের দিকে এভাবে কেউ তাকায়?' ছোকরার মুখে নার্ভাস হাসি দেখা

দিল। 'যাও, নিজের কাজে মন দাও,' হালকা সুরে ধমক দিল শাকিলা। লজ্জা পেয়ে নিজের কাজে ফিরে গেল বেকার।

কয়েকটা স্টোভে পিতলের গামলা চড়ানো হয়েছে, কোনটায় শ্রিম্প কোনটায় চিকেন সেদ্ধ হচ্ছে। প্রতিটি গামলার ভেতর চামচ ডুবিয়ে অনবরত নাড়ার ফলে ঘন বাষ্পে ভরে উঠেছে গ্যালি। ঘামের নদী বয়ে যাচ্ছে শাকিলার শরীরে। খানিক পরপরই এক গ্লাস করে পানি খাচ্ছে ও। চিংড়ি আর মুরগী সেদ্ধ হবার পর মটরশুঁটি, শিমের বীচি আর লেটিস পাতা সংযোগে সুপ বানাবার কাজটা অ্যাসিস্ট্যান্ট কুক নিজেই শুরু করে দিল দেখে মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিল শাকিলা। শ্রিম্প ফ্রায়িড রাইস আর নুডলস তৈরিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ও।

সানগারি ডকে জাহাজ নিরাপদে নোঙর ফেলার পর ক্যাপটেন চ্যাং মিং একবার গ্যালিতে ঢুকল, একটা প্লেটে কয়েক টুকরো ভাজা ইলিশ নিয়ে বেরিয়ে এল আবার। ব্রিজে চলে এল সে, আমেরিকান কাস্টমস অ্যান্ড ইমিগ্রেশন অফিসারদের অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে। গ্যালিতে এক মিনিটের মত ছিল, শাকিলার দিকে সরাসরি তাকিয়েওছে, তবে আচরণে সন্দেহজনক কিছু ধরা পড়েনি। শাকিলার আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেল, শম্পা মালাকারের ভূমিকায় ভালভাবেই উতরে যাচ্ছে ও।

বাকি সব ক্রুদের সঙ্গে এক লাইনে ওকেও দাঁড়াতে হলো, ইমিগ্রেশন অফিসাররা প্রত্যেকের পাসপোর্ট পরীক্ষা করবেন। সাধারণত সবার কাগজ-পত্র ক্যাপটেনই দেখান, ক্রুরা যাতে যে যার কাজ চালিয়ে যেতে পারে, কিন্তু হুয়ান হান ম্যারিটাইমের নিজস্ব পোর্টে যে-সব জাহাজ ভিড়ছে সেগুলোর ক্রুদের ব্যাপারে কঠোর নিয়ম অনুসরণ করছে আইএনএস কর্তৃপক্ষ। পাসপোর্ট তো চেক করছেই, প্রত্যেক ক্রুকে জেরাও করছেন অফিসাররা। শম্পা মালাকারের পাসপোর্টও চেক করলেন তাঁরা, শম্পার কেবিন থেকে আগেই সেটা সংগ্রহ করে রেখেছে শাকিলা। পাসপোর্টটা চেক করার সময় অফিসার শাকিলার দিকে মুখ তুলে একবার তাকালেনও না।

ইমিগ্রেশন চেকিং শেষ হতে নিচে নেমে খেতে বসল সবাই। গ্যালিটা অফিসার্স ওয়ার্ডরূম আর ক্রু মেসের মাঝখানে। চীফ কুক হিসেবে অফিসারদের পরিবেশন করল শাকিলা। ওর সহকারীরা ক্রুদের খাওয়াচ্ছে। জাহাজটা ঘুরেফিরে দেখার জন্যে ছটফট করছে মনটা, কিন্তু ক্রুদের খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত ধৈর্য ধরতে হবে ওকে।

খেতে বসে অফিসাররা কেউ ওকে কোন প্রশ্ন করল না, তবে দু'একজন তাকাবার পর চোখ সরাতে দেরি করল। যখনই এই ঘটনা ঘটল, হাসিমুখে সংশ্লিষ্ট অফিসারের দিকে এগিয়ে এল শাকিলা, জিজ্ঞেস করল তাঁর কিছু লাগবে কিনা। 'না, বলতে চাইছিলাম রান্না আজ খুব ভাল হয়েছে,' অপ্রতিভ ভাবটা কাটিয়ে উঠে চোখ নামাল একজন অফিসার, তাড়াতাড়ি আবার নিজের প্লেটের ওপর মনোযোগ দিল। আরেকজন অফিসার বলল, 'মিস শম্পা, তোমাকে আজ খুব স্মার্ট লাগছে।' তৃতীয় অফিসার সকৌতুকে মন্তব্য করল, 'আজ কথাটা আরেকবার মনে পড়ল, তুমি আসলে হান ম্যারিটাইমের একটা অ্যাসেট।'

অর্থাৎ সবাই ওকে শম্পা মালাকার বলেই ধরে নিচ্ছে, কারও মনে কোন সন্দেহ জাগেনি।

মনটা শঙ্কামুক্ত হতেই নিজের মিশন সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠল শাকিলা। একটা ব্যাপার খুবই রহস্যময় লাগছে। জাহাজে যদি তিনশোরও বেশি অবৈধ অভিবাসী থাকে, তাদেরকে খাওয়ানো হচ্ছে কিভাবে? গ্যালি থেকে হিসেবের বাইরে কোন খাবার বেরিয়ে যাচ্ছে না, এ-ব্যাপারে শাকিলা নিশ্চিত। অত লোকের রান্নাই তো হচ্ছে না গ্যালিতে। শম্পা মালাকারের তৈরি মেন্যু অনুসারে মাত্র ত্রিশজন ক্রুর জন্যে রান্নার আয়োজন করা হয়েছে। লুকানো তিনশো আরোহীর জন্যে জাহাজের অন্য কোথাও আরেকটা গ্যালি আছে, এটাও সম্ভব বলে মনে হয় না। হংকং থেকে সানগারিতে পৌঁছুতে যে সময় লেগেছে তাতে ত্রিশজন ক্রুকে খাওয়াতে যে পরিমাণ খাবার লাগার কথা ঠিক সেই পরিমাণই বের করা হয়েছে স্টোরেজ কমপার্টমেন্ট আর লকার থেকে, চেক করে দেখেছে ও। তাহলে? শাকিলা ভাবছে, পিট লুকাসের সিআইএ সোর্স ভুল তথ্য দেয়নি তো... সিআইএ এজেন্ট হয়তো জাহাজের নাম উল্টোপাল্টা করে ফেলেছে।

শান্ত একটা ভাব নিয়ে শম্পা মালাকারের ছোট্ট অফিসরুমে বসে আগামীকালের মেন্যু পরীক্ষা করছে শাকিলা। আড়চোখে লক্ষ করল তার সহকারীরা বেঁচে যাওয়া খাবারদাবার লকারে ভরে রাখছে, টেবিল পরিষ্কার করছে, বাসনকোসন ধুচ্ছে। স্বাভাবিক ভঙ্গিতে চেয়ার ছেড়ে অফিস কামরা থেকে বেরিয়ে এল প্যাসেজওয়েতে, গ্যালি থেকে কেউ ওকে লক্ষ করছে না দেখে সাহস আরেকটু বাড়ল। কম্প্যানিয়নওয়ে ধরে উঠছে ও। হুইলহাউস আর ব্রিজ উইং-এর নিচের ডেকে পা রাখল। এরইমধ্যে ডকের বিশাল আকৃতির ক্রেনগুলো পজিশন নিয়েছে, কার্গো ডেকে পাহাড় হয়ে থাকা কন্টেইনারগুলো তুলে নিয়ে যাবে।

জাহাজের কিনারা থেকে নিচে উঁকি দিল শাকিলা। টো-বোট একটা বার্জকে ঠেলে জাহাজের খোলে ঠেকাল। ক্রুরা সবাই চীনা। দু'জন ক্রু আবর্জনা ভর্তি প্লাস্টিক ব্যাগ একটা কার্গো হ্যাচের ভেতর দিয়ে বার্জে ফেলছে। জাহাজে একজন ড্রাগ-এনফোর্সমেন্ট এজেন্ট রয়েছে, জাহাজ থেকে ফেলার আগে প্রতিটি ব্যাগ পরীক্ষা করছে সে।

ডকইয়ার্ডের কোথাও কোন বেআইনী তৎপরতার চিহ্নমাত্র নেই। সন্দেহ বা প্রশ্নের উদ্রেক করে এমন কিছুই শাকিলার চোখে পড়ছে না। ড্রাগ আর অবৈধ অভিবাসীর খোঁজে কোস্ট গার্ড ও কাস্টমস অ্যান্ড ইমিগ্রেশন অফিসাররা সার্চ করেছে, কিছুই তারা পায়নি। কন্টেইনারে রয়েছে তাইওয়ান, হংকং আর সিঙ্গাপুরে তৈরি বিভিন্ন ধরনের পণ্য–তৈরি পোশাক, রাবার ও প্লাস্টিকের জুতো, খেলনা, ইলেকট্রনিক গেম, রেডিও আর টেলিভিশন।

গ্যালিতে ফিরে এসে সহকারীদের কাজ তদারক করল শাকিলা। খানিক পর আবার চুপচাপ বেরিয়ে পড়ল, এবার জাহাজের নিচটা দেখতে যাচ্ছে, বিশেষ করে ওয়াটারলাইনের নিচের কমপার্টমেন্টগুলো। বেশিরভাগ ক্রুই জাহাজের ওপর দিকে ব্যস্ত, মাল খালাসের কাজে। অল্প যে-ক'জন নিচে রয়েছে, তাদেরকে হার্তের বালতি থেকে হালকা নাস্তা পরিবেশন করল শাকিলা। সবাই খুব খুশি। এঞ্জিন

রুমটাকে পাশ কাটাল ও, জানে অবৈধ অভিবাসীদের ওখানে লুকিয়ে রাখা সম্ভব নয়।

মাত্র একবারই আতঙ্কিত হলো শাকিলা। লম্বা একটা কমপার্টমেন্টে ঢুকল ও, যেখানে জাহাজের ফুয়েল ট্যাঙ্কগুলো রাখা হয়। ঢোকার পর পথ হারিয়ে ফেলল, বেরুবার রাস্তা খুঁজে পাচ্ছে না। যখন প্রায় কেঁদে ফেলার অবস্থা, এই সময় হঠাৎ একজন ক্রু ওর ঠিক পিছনে এসে দাঁড়াল, কর্কশ সুরে জানতে চাইল এখানে সে কি করছে। আঁতকে উঠেছিল শাকিলা, কোন রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে জোর করে হাসল। বালতি থেকে রাঙতায় মোড়া মাখন দিয়ে ভাজা ইলিশ মাছের পেটি তুলে বাড়িয়ে ধরল লোকটার দিকে। বলল, ক্যাপটেনের আজ জন্মদিন, তাই সবাইকে ভাজা মাছ খাওয়াচ্ছে সে। সাধারণ একজন ক্রু, জাহাজের চীফ কুককে সন্দেহ করার কোন কারণ দেখতে না পেয়ে মোড়কটা নিয়ে হাসল।

এরপর শাকিলা খোলা স্টারবোর্ড ডেকে উঠে এল। মনটা খারাপ, সন্দেহজনক কিছুই এখন পর্যন্ত চোখে পড়েনি। রেলিঙে একা একা দাঁড়িয়ে আশপাশটা ভাল করে দেখে নিল ও, তারপর কানে খুদে একটা রিসিভার ঢুকিয়ে বুকের মাঝখানে টেপ দিয়ে আটকানো ট্র্যান্সমিটারে কথা বলতে শুরু করল। 'বলতে খারাপ লাগছে, তবে জাহাজে কোন অবৈধ অভিবাসী আছে বলে মনে হয় না। সবগুলো ডেক পরীক্ষা করেছি, কিছুই পাইনি।'

কোস্ট গার্ড কাটার মার্ভেল থেকে ক্যাপটেন হিউম বললেন, 'আপনি সম্পূর্ণ নিরাপদ?'

'হ্যাঁ। কোন রকম দ্বিধা ছাড়াই আমাকে ওরা শম্পা মালাকার বলে ধরে নিয়েছে।'

'আপনি কি জাহাজ ত্যাগ করতে চান?'

'এখুনি নয়। ঘুরে ফিরে আরেকবার দেখতে চাই।'

'কি ঘটে না ঘটে সুযোগ পেলেই আমাকে জানাবেন, প্লীজ,' বললেন হিউম। 'এবং অত্যন্ত সাবধানে থাকবেন।'

ক্যাপটেন হিউমের শেষ কথাগুলো চাপা পড়ে গেল ডকের মাথায় হঠাৎ একটা হেলিকপ্টার উড়ে আসায়। দেখেই চিনতে পারল শাকিলা, ওটা মার্ভেলের কপ্টার। হাত নাড়ার ইচ্ছেটাকে অনেক কষ্টে দমন করল ও। রেলিঙে হেলান দিয়ে ওটার দিকে নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল। শুধু ওর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্যে আকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে ওটা, কথাটা ভাবতেই পরম স্বস্তিবোধ করল ও। সেই সঙ্গে একটা জেদ চাপল মনে, মিশনটা ব্যর্থ হতে দেবে না। ইউয়েন ফিয়েনে যদি কোন অবৈধ অভিবাসী থাকে, তাদেরকে যেমন করে হোক খুঁজে বের করবে সে।

স্টার্ন ঘুরে লোয়ার পোর্টসাইড ডেকে চলে এল শাকিলা, রেলিঙ ধরে ঝুঁকে তাকাতেই সরাসরি নিচে বার্জটাকে দেখতে পেল। আবর্জনা ভর্তি ব্যাগে বার্জ প্রায় অর্ধেকই ইতিমধ্যে ভরে গেছে। বার্জ আর টো-বোটের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল ও। টো-বোটের ক্যাপটেন ইউয়েন ফিয়েনের গা থেকে সরে যাবার জন্যে শক্তিশালী এঞ্জিনগুলো চালু করল। শান্ত পানিকে জোড়া প্রপেলার আলোড়িত

ফেনায় রূপান্তরিত করছে।

হতাশায় মুষড়ে পড়ছে শাকিলা। ইউয়েন ফিয়েনে কোন অবৈধ অভিবাসী নেই। অথচ সিআইএ-এর আন্ডারকভার এজেন্টের পাঠানো তথ্যও ভুয়া বলে উড়িয়ে দেয়া যায় না। হুয়ান হান অত্যন্ত ধূর্ত অপরাধী, কে জানে কি কৌশলে সরকারী ইনভেস্টিগেটরদের চোখে ধুলো দিচ্ছে সে।

জাহাজটার পাশ থেকে ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে বার্জ আর টো-বোট। ওগুলোর মধ্যে কোন রহস্য নেই তো? হঠাৎ কি হলো, মরিয়া হয়ে শাকিলা ভাবল, কিছু একটা তার করা দরকার।

দ্রুত চোখ নামিয়ে নিশ্চিত হয়ে নিল শাকিলা, খোলের গায়ে কার্গো হ্যাচ বন্ধ হয়ে গেছে। জাহাজের যে অংশে রয়েছে ও, সেটা ডকের উল্টোদিকে, এপাশের খোল খোলা পানির দিকে ফেরানো, আশপাশে কোথাও কোন ক্রুকে দেখা যাচ্ছে না। নিচে, টো-বোটের ক্যাপটেন হেলমের পিছনে দাঁড়িয়ে ব্রিজ উইং-এ লুকআউটের ভূমিকায় রয়েছে একজন ক্রু, আরেকজনকে দেখা যাচ্ছে বার্জের বোতে, সামনের পানির ওপর চোখ।

শাকিলার ঠিক নিচ দিয়ে পার হচ্ছে টো-বোট, ওটার স্টার্ন ডেকে স্থির হলো দৃষ্টি। চিমনির সামনে রশির একটা কুণ্ডলী পড়ে আছে। আন্দাজ করল রশির কুণ্ডলী থেকে রেলিঙের দূরত্ব দশ ফুট হবে। রেলিঙ টপকাবার সময় পালস রেট বেড়ে গেল। ক্যাপটেন হিউমকে রেডিওতে ডেকে কি করতে যাচ্ছে ব্যাখ্যা করার সময় নেই হাতে। সমস্ত দ্বিধা আর ভয় মন থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দিল শাকিলা। দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয়াই তার স্বভাব। বড় করে শ্বাস টেনে লাফটা দিয়েই ফেলল।

ইউয়েন ফিয়েনের কোন ক্রু নয়, শাকিলাকে লাফ দিতে দেখল রানা, নুমার রিসার্চ শিপ সী গাল থেকে। সী গাল বন্দরের মুখে নোঙর ফেলেছে। ব্রিজ উইং-এ রয়েছে রানা, ক্যাপটেনের চেয়ারে। প্রায় এক ঘণ্টা হলো ওখানে বসে কখনও রোদে পুড়ছে, কখনও বৃষ্টিতে ভিজছে, চোখে বিনকিউলার সেঁটে কন্টেইনার শিপকে ঘিরে ক্রুদের তৎপরতা লক্ষ করছে। বিশেষ করে ইউয়েন ফিয়েনের গায়ে লেগে থাকা টোবোট আর বার্জ ওর মনে খুঁতখুঁতে একটা ভাব এনে দিয়েছে। জাহাজটার খোলের হ্যাচ থেকে আবর্জনা ভর্তি ব্যাগ নিচের বার্জে খসে পড়ছে। শেষ ব্যাগটা পড়ার পর হ্যাচ বন্ধ হয়ে গেল। চোখ সরিয়ে নিতে যাবে, হঠাৎ দেখল জাহাজটার ওপরের ডেক থেকে কে যেন রেলিং টপকাচ্ছে। রেলিং টপকে সে আর দেরি করল না, সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে টো-বোটের ছাদে নামল। 'কি সাংঘাতিক!' নিজের অজান্তেই আঁতকে উঠল রানা।

পাশে দাঁড়িয়ে আছেন রেডক্লিফ, আড়ষ্ট হয়ে গেলেন। 'কি ব্যাপার, মি. রানা?'

'জাহাজ থেকে এইমাত্র কেউ একজন টো-বোটে লাফ দিল।'

'হয়তো কোন ক্রু জাহাজ থেকে পালাতে চাইছে।'

টো-বোটের ওপর বিনকিউলার তাক করল রানা। 'মনে হচ্ছে জাহাজের কুক।'

'আহত হয়নি তো?'

'রশির একটা স্তূপে পড়েছে। না, আহত হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না।'

'আপনার সন্দেহ জাহাজটার খোলের নিচে কোন জলযান আছে, পানির নিচ থেকেই সেটাকে বার্জের তলায় সরিয়ে ফেলা যায়, তাই না? আপনার এই সন্দেহের সপক্ষে নিরেট কোন তথ্য-প্রমাণ পেলেন?'

'না, আদালতে গ্রহণযোগ্য হবে এমন কোন তথ্য-প্রমাণ এখনও আমি পাইনি,' স্বীকার করল রানা, ওর বুদ্ধিদীপ্ত চোখে কি যেন একটা ঝিলিক দিয়ে উঠল। 'তবে আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে পরিস্থিতি পাল্টে যেতে পারে।'

সী গালের ছোট্ট জেট বোট উপকূলীয় জলসীমার ভেতর দিয়ে ছুটে চলেছে। মরগান সিটিকে পাশ কাটিয়ে আসার পর গতি মন্থর হলো। বন্যার সময় নদীর পানিকে বাধা দেয়ার জন্যে আট ফুট উঁচু একটা কংক্রিটের পাঁচিল তোলা হয়েছে শহরের মুখে। আর সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস ঠেকাবার জন্যে গালফের দিকটায় খাড়া করা হয়েছে বিশ ফুট উঁচু আরেকটা পাঁচিল। অ্যাটচাফালেয়া নদীর ওপর দুটো হাইওয়ে ব্রিজ আর একটা রেলওয়ে ব্রিজ আছে, সড়ক ও রেলপথে মরগান সিটিতে আসা-যাওয়া করা কোন সমস্যা নয়। শহরের বেশিরভাগ বাড়ি ও অফিস ভবন হয় নদী, নয়তো সাগরের দিকে মুখ করা। অ্যাটচাফালেয়ার তীরে মরগান সিটিই একমাত্র শহর, এখানকার মানুষ ঝড়-ঝঞ্ঝা আর বন্যার সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে আছে। লুইযিয়ানার বেশিরভাগ এলাকাই জলমগ্ন জলাভূমি, শহরগুলো তাই আকারে ছোট এবং একটার কাছ থেকে আরেকটা অনেক দূরে। জলাভূমির মধ্যে হওয়ায় জন বসতিগুলোকে বাইয়ু কান্ট্রি বলা হয়। মরগান সিটি পশ্চিম মুখী, সামনের অ্যাটচাফালেয়া নদীর চওড়া অংশটাকে বারউইক বে বলা হয়। দক্ষিণে প্রবাহিত হচ্ছে বাইয়ু বোয়াফ, গভীর ডোবার মত ঘিরে রেখেছে শহরটাকে, তারপর মিলিতে হয়েছে লেক প্যালওর্ড-এর সঙ্গে। শহরে সী পোর্ট আছে। তেল সমৃদ্ধ এলাকা, আবার ফিশ প্রসেসিং যোন হিসেবেও বিখ্যাত। অনেকগুলো শিপ ইয়ার্ডে বোট তৈরি হয়।

'কোথায় নামবেন আপনারা?' প্রপলেস রানঅ্যাবাউটের হুইলে রয়েছেন রেডক্লিফ। ফিশিং বোটের একটা বহরকে পাশ কাটিয়ে এল ওরা।

'দিলে জেলেরাই তথ্য দিতে পারবে,' বলল রানা। 'তীরের কাছাকাছি কোন সেলুন আছে কিনা দেখুন।'

একটা ডকের দিকে হাত তুলল মুরল্যান্ড, পাশেই কাঠের তৈরি কয়েকটা কাঠামো। একটা বিল্ডিঙের মাথায় নিওন সাইন দেখা গেল—'মাইকেল'স ফিশ ডক'। নিচে লেখা, 'এখানে সীফুড আর মদ পাওয়া যায়'। রানা বলল, 'পাশের প্যাকিং হাউসেই সম্ভবত মাছ নিয়ে আসে জেলেরা। চলো হে ববি, মাইকেলের ফিশ ডকেই যাওয়া যাক।'

ট্রলারের ছোট একটা বহরের ভেতর দিয়ে রানঅ্যাবাউট নিয়ে সাবধানে এগোলেন রেডক্লিফ, থামলেন কাঠের একটা মইয়ের নিচে। 'গুড লাক,' বললেন তিনি। ডকে উঠছে রানা, পিছু নিয়ে মুরল্যান্ডও। 'যোগাযোগ রাখবেন।'

রানঅ্যাবাউট ঘুরিয়ে নিয়ে সী গালের দিকে ফিরে যাচ্ছেন রেডক্লিফ।

ডকে মাছের গন্ধ, বাতাস ভারী হয়ে আছে। মাইকেলের সেলুনে ঢুকল ওরা। মান্ধাতা আমলের এয়ার-কন্ডিশনিং মানুষের ঘাম আর তামাক পোড়া ধোঁয়ার সঙ্গে লড়াইয়ে বহুকাল আগেই হেরে গেছে। কাঠের মেঝে জেলেদের বুটের ঘষা খেয়ে মসৃণ হয়ে আছে। কয়েকশো পোড়া দাগ দেখা গেল, দায়ী সিগারেটের আগুন। পুরানো বোটের হ্যাচ কাভার কেটে টেবিল বানানো হয়েছে, টেবিলের ওপরও প্রচুর দাগ, ওই সিগারেটই দায়ী। প্রতিটি দেয়ালে বিজ্ঞাপন, বেশিরভাগই বিয়ার আর হুইস্কির। খদ্দেরদের মধ্যে জেলেরা তো আছেই, আরও আছে স্থানীয় বোটইয়ার্ডের শ্রমিক ও নির্মাণ কর্মীরা। খালি একটা টেবিলে একজোড়া কুকুর দিব্যি নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে। বারে কোন মেয়ে নেই, পুরুষদের সংখ্যা ত্রিশ জনের কম নয়। বারটেন্ডার একাই সবাইকে বিয়ার বা হুইস্কি পরিবেশন করছে।

'কফি পাওয়া যায়?' মুরল্যান্ডকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'দেখতে হবে,' বলল মুরল্যান্ড। 'একটা কথা—এখানে কাউকে আমি ল্যাং মারব না।'

'ভাগ্যিস বুদ্ধি করে নোংরা কাপড় পরে এসেছি,' বলল রানা। 'পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে ধোপদুরস্ত ট্যুরিস্ট হিসেবে এলে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দিত।' তেল আর কালি মাখা কাপড়ের দিকে আরেকবার তাকাল ও। এ-সব সী গালের ক্রুদের কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছে ওরা।

'হ্যাঁ, গত মাসে গোসল করাটা ভুল হয়ে গেছে। এখানে এরা শেষবার গোসল করেছে অন্তত বছর দুয়েক আগে।'

খালি একটা টেবিল দেখিয়ে রানা জিজ্ঞেস করল, 'ডিনারটা সেরে ফেললে হয় না?'

মাথা ঝাঁকিয়ে টেবিলে বসল মুরল্যান্ড।

বিশ মিনিট পার হয়ে গেল, কেউ অর্ডার নিতে এল না।

'ওয়েটার বোধহয় প্রতিজ্ঞা করে বসে আছে, এই টেবিলটাকে সে দেখেও না দেখার ভান করবে,' ফিসফিস করল মুরল্যান্ড।

'নিশ্চয়ই তোমার কথা শুনে ফেলেছে,' বলল রানা। 'তা না হলে আসত।'

ছেঁড়া জিনস্ আর টি-শার্ট পরা ওয়েটার টেবিলের কাছে এসে দাঁড়াল ঠিকই, তবে ওদের দিকে তাকাচ্ছে না। আশ্চর্য তীক্ষ্ণ গলায় জানতে চাইল, 'কিচেন থেকে কিছু আনতে হবে?'

'এক ডজন অয়স্টার আর কফি পাওয়া যাবে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'পেয়ে গেছেন,' জবাব দিল ওয়েটার। 'আর আপনি?' মুরল্যান্ডকে জিজ্ঞেস করল সে।

'অয়স্টারই, তবে কফির বদলে তোমাদের বিখ্যাত বিয়ার হলে ভাল হয়,' বলল মুরল্যান্ড।

'বিখ্যাত কিনা জানি না, তবে তেতো নয়,' চলে যাচ্ছে ওয়েটার, কয়েক পা এগিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। 'আবার আমি আসছি।'

কামরার চারদিকে চোখ বুলিয়ে মিশুক প্রকৃতির একজন লোককে খুঁজছে

রানা, প্রশ্ন করলে যে বিরক্ত বোধ করবে না। অয়েল রিগারদের একটা গ্রুপকে বাতিল করে দিল ও। ডকইয়ার্ডের শ্রমিকরা এলাকা সম্পর্কে খবর রাখে, কিন্তু তারা আবার অস্থানীয় লোকজনকে ভাল চোখে দেখে না। এক আধ বুড়ো জেলের ওপর চোখ পড়ল ওর, একা একটা টেবিলে বসে সিগারেট বানাচ্ছে। ঠোঁটের দু'পাশে রেখা আর ভাঁজ দেখে মনে হলো লোকটা হাসতে জানে।

খাওয়া শেষ হতে ওয়েটারকে রানা জিজ্ঞেস করল, 'ওই ভদ্রলোককে চেনো, একা একটা টেবিলে বসে রয়েছেন? চেনা চেনা লাগছে, কিন্তু কোথায় দেখা হয়েছিল মনে করতে পারছি না।'

লোকটার দিকে তাকাল ওয়েটার। 'ও, ওর কথা। ফিশিং বোটের একটা বহর আছে। কাঁকড়া আর চিংড়ি ধরে। বড় একটা ক্যাটফিশ ফার্মও আছে। দেখে মনে হচ্ছে না, তবে মালদার মক্কেল।' রানার সামনে হাত পাতল সে। 'এক ডলার।'

'কোন প্রশ্ন না করে দিয়ে দাও,' ফিসফিস করল মুরল্যান্ড। 'তোমাকে আমি আগেই জানিয়ে দিয়েছি, এখানে আমি কারও সঙ্গে লাগতে যাব না।'

পকেট থেকে এক ডলার বের করে ওয়েটারের হাতে গুঁজে দিল রানা। 'বকশিশ।'

'কিসের বকশিশ, এ আমি রোজগার করেছি,' বলে ফিরে গেল ওয়েটার।

মুরল্যান্ডকে রানা বলল, 'তুমি বারে চলে যাও, জিজ্ঞেস করো হুয়ান হান ম্যারিটাইম টো-বোট আবর্জনাগুলো কোথায় ফেলে।'

'আর তুমি?'

'আমি ওই লোকটার কাছে যাচ্ছি, দেখি কিছু জানা যায় কিনা।'

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকিয়ে চেয়ার ছাড়ল মুরল্যান্ড। রানা চলে এল প্রৌঢ় জেলের টেবিলে। 'মাফ করবেন, স্যার, আমি কি আপনার সঙ্গে দু'এক মিনিট কথা বলতে পারি?'

রানার পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বুলাল লোকটা। 'অসুবিধে কি। নাম?'

'মাসুদ রানা।' একটা চেয়ার টেনে বসল ও।

'মি. রানা, আপনি বিদেশী। বাইয়ু কান্ট্রির লোক নন, এই দেশেরও লোক নন-সম্ভবত।'

'না, তবে আমি ন্যাশনাল আন্ডারওয়াটার অ্যান্ড মেরিন এজেন্সির লোক। ওয়াশিংটন থেকে আসছি।'

'এদিকে আপনারা মেরিন রিসার্চ করছেন?'

'না, এ-যাত্রায় আমরা ইমিগ্রেশন সার্ভিসকে অবৈধ অভিবাসী ঠেকানোর কাজে সাহায্য করছি।'

সদ্য বানানো একটা সিগারেট ধরাল লোকটা। 'তা কি নিয়ে আমার সঙ্গে আলাপ করতে চান?'

'আমার একটা বোট দরকার। নদীর উজানে যে খাল কাটা হয়েছে, সেটা পরীক্ষা করব।'

'ওই খালটা, সানগারিতে মাটি ভরার জন্যে হুয়ান হান মেরিটাইম যেটা কেটেছে?'

'হ্যাঁ।'

'দেখার তেমন কিছু নেই,' প্রৌঢ় জেলে বলল। 'আগে যেখানে মিস্টিক বাইয়ু ছিল সেখানে এখন শুধু লম্বা একটা গর্ত দেখতে পাবেন। লোকেরা ওটাকে এখন মিস্টিক ক্যানাল বলে।'

'পোর্টটা তৈরি করার জন্যে এত মাটি লাগে কিভাবে?' জানতে চাইল রানা।

'ড্রেজিং করে যে কাদামাটি তোলা হয়, তার সামান্যই ভরাটের কাজে লেগেছে, বাকি সব বার্জে তুলে গালফে ফেলে দিয়ে আসা হয়।'

'আশপাশে কোন জন বসতি আছে?' জানতে চাইল রানা।

'বাইয়ু বা বিলের শেষ মাথায় ছোট একটা শহর ছিল, নাম কালজাস, মিসিসিপি নদী থেকে বেশি দূরে নয়। তবে সেটা এখন আর নেই।'

'কেন, শহরটা নেই কেন?'

'চীনারা প্রথমে রটিয়ে দিল খালটা শহরবাসীদের বিরাট উপকারে আসবে, বোট নিয়ে অ্যাটচাফালেয়া নদীতে যেতে পারবে তারা। কিন্তু তারপর দেখা গেল মালিকদের কাছ থেকে জমি কিনছে ওরা, চলতি দরের চেয়ে তিন গুণ বেশি দামে। বাকি যে অংশটুকু দাঁড়িয়ে থাকল তাকে ভূতুড়ে শহর বললেই হয়। পরে সেটারও বেশিরভাগ বুলডোজার দিয়ে জলাভূমির সঙ্গে এক করে ফেলা হয়েছে।'

রানার মাথায় ব্যাপারটা ঢুকছে না। 'শেষ মাথায় কিছুই থাকল না, তাহলে আঠারো মাইল লম্বা একটা খাল কাটা হলো কেন?'

'উজান-ভাটির সমস্ত লোকের মুখে এই একটাই তো প্রশ্ন,' বলল জেলে। 'সমস্যা হলো, আমার যে বন্ধুরা ওই বিলে ত্রিশ বছর ধরে মাছ ধরছিল, তারা ওদিকে আর যেতেই পারছে না। চীনারা তাদের নতুন খালে চেইন ফেলে আসা-যাওয়ার পথ বন্ধ করে দিয়েছে, জেলেদের ভেতরে ঢুকতে দেয় না। শিকারীদেরও প্রবেশ নিষেধ।'

'খালটায় বার্জ চলাচল করে?' জানতে চাইল রানা।

প্রৌঢ় জেলে মাথা নাড়ল। 'যদি ভেবে থাকেন খাল দিয়ে অবৈধ অভিবাসী পাচার করা হয়, ভুলে যান। সানগারি থেকে বার্জ আর টো-বোট যেগুলো উজানের দিকে আসে, দক্ষিণ-পশ্চিমে ঘুরে বাইয়ু টেচি-র একটা ল্যান্ডিঙে থামে, পুরানো ও পরিত্যক্ত একটা সুগারমিলের পাশে, মরগান সিটি থেকে প্রায় দশ মাইল দূরে। সানগারি তৈরি করার সময় হুয়ান হান ম্যারিটাইম ওটা কিনে নেয়। মিলের পাশে একটা রেল ইয়ার্ড ছিল, চীনারা সেটাকে আবার চালু করেছে।'

'রেললাইনও আছে তাহলে?' হঠাৎ আগ্রহী হয়ে উঠল রানা। 'কোন দিকে গেছে ওটা?'

'মেইন সাউদার্ন প্যাসিফিক লাইনের সঙ্গে মিলেছে।'

ঘোলাটে পানি স্বচ্ছ হতে শুরু করেছে। টেবিলে চোখ রেখে চুপচাপ বসে থাকল রানা, কয়েক মুহূর্ত কথা বলল না। ইউয়েন ফিয়েনের পিছনে পানির যে অস্বাভাবিক আলোড়ন দেখেছে ও, সেটার জন্যে একটা কার্গো শিপের বেসিক হাল ডিজাইন দায়ী হতে পারে না। জাহাজের যে আকৃতি, তার তুলনায় অনেক বেশি পানি আলোড়িত হচ্ছিল মনের চোখ দিয়ে আলাদা একটা জলযান দেখতে পেল

রানা, সম্ভবত একটা সাবমেরিন, কন্টেইনার শিপের কীল-এ আটকানো। এক সময় চোখ তুলে জানতে চাইল, 'ল্যান্ডিংটার কোন নাম আছে?'

'উনিশশো নয় সালে ডাফ মোরাল নামে এক লোক চিনিকলটা তৈরি করে, ল্যান্ডিংটাও ওই নামে পরিচিত ছিল।'

'ডাফ মোরাল ল্যান্ডিংটা চুপিচুপি একবার দেখে আসতে চাই,' বলল রানা। 'সেজন্যে একটা ফিশিং বোট দরকার আমার। ভাড়া পাওয়া যাবে কি?'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে হাসল জেলে। 'ফিশিং বোট নয়, আপনাদের আসলে একটা শ্যান্টিবোট দরকার।'

'শ্যান্টিবোট কি জিনিস?'

'অনেকে ওটাকে ক্যাম্পবোটও বলে। রাতদিন বিলে ঘুরে বেড়ানোর জন্যে খুবই উপযোগী, ইচ্ছে হলে কোন শহর বা খামারের পাশে থামতেও পারেন, না থামলেও চলে। অনেকে আবার বিলের একই জায়গায় বেঁধে রাখে, ট্যুরিস্টরা দু'চারদিন মাছ ধরে কাটায়। কেবিন আছে, ছোট বাড়ি বললেই হয়।'

'আপনি সম্ভবত হাউসবোটের কথা বলছেন।'

'তবে হাউসবোট সাধারণত নিজের পাওয়ারে চলে না,' বলল জেলে। 'আমি যে শ্যান্টিবোটের কথা বলছি, তাতে আপনি রীতিমত বসবাস করতে পারবেন, আবার খোলের ভেতর ফিট করা শক্তিশালী একটা এঞ্জিন থাকায় যেদিকে খুশি চলে যেতেও পারবেন।'

'ভাড়া?'

দাঁত দিয়ে জিভের ডগা কাটল প্রৌঢ়। 'বোটের ক্ষতি হলে মেরামতের জন্যে টাকা নেব। বিদেশী মানুষ হয়ে দেশের উপকার করতে এসেছেন, ভাড়া নিতে পারব না।'

'রাজি হয়ে যাও,' রানার পিছন থেকে বলল মুরল্যান্ড, বার থেকে ফিরে এসে এতক্ষণ ওদের কথা শুনছিল।

'ধন্যবাদ,' প্রৌঢ় জেলেকে বলল রানা।

'অ্যাটচাফালেয়ার এক মাইল উজানে, বাম দিকের তীরে একটা ডক পাবেন, নাম ডিক ল্যান্ডিং, ওখানে আছে আমার শ্যান্টিবোট। কাছাকাছি ছোট একটা বোটইয়ার্ড দেখবেন। মুদি দোকানদার ডিক চ্যাপলিন আমার প্রতিবেশী ও বন্ধু। রসদ-পত্র যা লাগে ওর কাছ থেকে কিনতে পারেন। ফুয়েল ট্যাঙ্ক ভরে দেয়ার ব্যবস্থা করছি আমি। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে বলবেন, বাইয়ু মিকির বন্ধু আপনারা। এদিকে কিছু লোক ওই নামেই আমাকে ডাকে।'

টেবিলের ওপর ঝুঁকে হাত বাড়াল মুরল্যান্ড, বাইয়ু মিকির সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল।

প্রৌঢ় গম্ভীর সুরে বলল, 'আশা করি আপনারা এর একটা বিহিত করতে পারবেন। টাকা কামানোর জন্যে মানুষ পাচার, এর চেয়ে বড় অপরাধ আর কিছু হতে পারে না।'

আরেকবার ধন্যবাদ দিয়ে মাইকেলের সেলুন থেকে বেরিয়ে এল ওরা।

'বারে আলাপ করে কিছু জানতে পারলে?' ডক থেকে ব্যস্ত একটা রাস্তায় উঠে

এসে জিজ্ঞেস করল রানা।

'স্থানীয় লোকেরা হান ম্যারিটাইমের ওপর খেপে আছে। এখানকার শ্রমিকদের কাজ দেয় না ওরা। বোট কোম্পানীগুলোও খুশি নয়। সানগারি থেকে যে-সব টো-বোট আর বার্জ আসা-যাওয়া করে, সবই তাইওয়ান থেকে আনা হয়েছে। চীনা লেবার ও ক্রুরা পোর্ট ছেড়ে মরগান সিটিতে আসে না।'

'হুম।'

'এখন আমাদের প্ল্যানটা কি?'

'হোটেল-মোটেল কিছু একটা দরকার, ঘুমোবার জন্যে,' বলল রানা। 'ভোরে শ্যান্টিবোটে চড়ে উজানের দিকে যাব, খালটা দেখার জন্যে।'

'আর ডাফ মোরাল?' জিজ্ঞেস করল মুরল্যান্ড। 'কৌতূহল জাগছে না, বার্জ থেকে ওখানেই হিউম্যান কার্গো খালাস করা হচ্ছে কিনা?'

'কৌতূহল জাগছে, তবে সেটা পরে মেটানো যাবে। আগে খালটা দেখে আসি।'

'পানির নিচেটা সার্চ করতে হলে ডাইভিং ইকুইপমেন্ট লাগবে,' মনে করিয়ে দিল মুরল্যান্ড।

'মি. রেডক্লিফকে খবর দিলেই পৌঁছে যাবে সব।'

'ডাফ মোরাল আমাকে ছাড়ছে না,' বলল মুরল্যান্ড। 'আচ্ছা, যদি দেখি পুরানো চিনিকলটাই হিউম্যান কার্গোর স্টেজিং ও ডিসট্রিবিউশন ডিপো, তখন আমরা কি করব?'

'সেক্ষেত্রে প্রথমে আমরা অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনকে রিপোর্ট করব, আইএনএস-এর সাহায্য ছাড়াই হানের আরেকটা বেআইনী অপারেশন আবিষ্কার করেছি। তারপর পিট লুকাসের সঙ্গে যোগাযোগ করে বলব, হানা দিয়ে অপরাধীদের পাকড়াও করুন।'

'একেই বোধহয় পোয়েটিক জাস্টিস বলে, ঠিক না?'

তিন

'সব দেশে মোর ঘর আছে/আমি সেই ঘর লব খুঁজিয়া,' শ্যান্টিবোটটা দেখে আবৃত্তি করল রানা।

'সুরম্য অট্টালিকা না হলেও, কাজ চালাবার মত,' ট্যাক্সি ড্রাইভারকে ভাড়া দিয়ে মন্তব্য করল মুরল্যান্ড, ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে আছে বিধ্বস্তপ্রায় ডকের শেষ প্রান্তে বাঁধা প্রাচীন বোটটার দিকে। ডকটা তীর থেকে নদীর দিকে বিস্তৃত ভাসমান পাইলিং-এর ওপর। ডকের ভেতর বেশ কয়েকটা অ্যালুমিনিয়াম ফিশিং বোট সবুজ পানিতে দোল খাচ্ছে, সবগুলোর আউটবোর্ড মোটর জং ধরা।

ট্যাক্সি থেকে আন্ডারওয়াটার ইকুইপমেন্ট নামাচ্ছে মুরল্যান্ড। 'তবে সেন্ট্রাল হিটিং বা এয়ার-কন্ডিশনিং নেই। ওয়াটার সাপ্লাই বা ইলেকট্রিসিটিও পাওয়া যাবে না।'

'পানির দরকার কি? নদীতে গোসল করতে পারবে।'

'কিন্তু টয়লেট?'

'কল্পনাশক্তি ব্যবহার করো।'

বোটের ছাদে একটা ডিশ দেখে সেদিকে রানার দৃষ্টি আকর্ষণ করল মুরল্যান্ড। 'কি আশ্চর্য! রাডার আছে দেখছি!'

শ্যান্টিবোটের খোল চওড়া আর সমতল, ছোট একটা বার্জের মতই। গায়ের কালো রঙ অন্যান্য বোট আর ডক পাইলিং-এর সঙ্গে ঘষা খেয়ে অনেক জায়গাতেই উঠে গেছে, তবে জলরেখার নিচে শ্যাওলা বা জলজ উদ্ভিদ গজায়নি। জানালা ও দরজা সহ চৌকো একটা বাক্স, যেটাকে হাউস বলা যেতে পারে, প্রায় সাত ফুট উঁচু, নীল দেয়ালগুলো সামান্য চকচক করছে। বোর কাছে ছাদ সহ বারান্দা আছে, স্পোর্টিং লন চেয়ার ফেলা। হাউসের ছাদে ব্রিজ সদৃশ একটা কাঠামো দেখা গেল, স্কাইলাইট ও ছোট পাইলটহাউস হিসেবে কাজ চলে। ছাদেই একটা নৌকা রয়েছে, বৈঠা সহ।

'ইকুইপমেন্ট তোলার পর এঞ্জিনটা চেক করো,' বলল রানা। 'দোকানে কি পাওয়া যায় দেখে আসি আমি।'

একটা বোটইয়ার্ডের ভেতর দিয়ে নদীর তীরে নেমে এল রানা। বোটইয়ার্ডের পাশেই ডিক চ্যাপলিনের মুদি দোকান, দরজার মাথায় লেখা–'ডিক ল্যান্ডিং'। ভেতরে একপাশে বোটিং পার্টস সাজানো হয়েছে, আরেক পাশে ফিশিং ও হান্টিং সাপ্লাই, মাঝখানে রসদ সামগ্রী। একটা বাস্কেটে দু'জনের তিন কি চার দিন চলার মত যা যা লাগবে ভরে নিল রানা। ক্যাশ রেজিস্টারের পাশে কাউন্টারে বাস্কেটটা রেখে দোকান মালিক ডিক চ্যাপলিনকে নিজের পরিচয় দিল। 'মি. ডিক। আমি মাসুদ রানা। আমি আর আমার বন্ধু বাইয়ু মিকির শ্যান্টিবোটটা ধার হিসেবে পেয়েছি।'

চওড়া গোঁফের কিনারায় আঙুলের টোকা দিয়ে রানাকে অবাক করে দিল ডিক। 'জানি আপনারা আসবেন। বোটের ফুয়েল ট্যাঙ্ক ভরে দিয়েছি, ব্যাটারিও চার্জ করা হয়েছে। শুনলাম আপনারা নাকি চীনাদের কাটা খালটা দেখতে যাচ্ছেন?'

মাথা ঝাঁকাল রানা।

'আপনাদের কাছে নদীর চার্ট আছে?' জানতে চাইল ডিক, আবার গোঁফের কিনারায় টোকা দিল সে।

এবার রানা অবাক হলো না। ডিকের এটা মুদ্রাদোষ। 'না, নেই। তবে আশা করছি আপনার কাছ থেকে পাব,' বলল ও।

একটা কেবিনেট খুলে ভেতর থেকে গোল পাকানো অনেকগুলো নটিকাল চার্ট বের করল ডিক। কাউন্টারে সেগুলো রেখে রানার দিকে তাকাল। 'একটা চার্টে নদীর কোথায় কতটুকু গভীরতা আছে দেখতে পাবেন। বাকিগুলো জলাভূমির টপগ্র্যাফিক ম্যাপ। অ্যাটচাফালেয়া উপত্যকার ম্যাপও একটা আছে, তাতে খালটা দেখতে পাবেন।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ, মি. ডিক।'

'আশা করি জানেন চীনারা কাউকে খালে ঢুকতে দেয় না। চেইন ফেলে

রেখেছে।'

'ঢোকার আর কোন পথ নেই?'

'আরও অন্তত দুটো পথ আছে,' বলল ডিক, পেন্সিল দিয়ে একটা কাগজে ম্যাপ আঁকতে শুরু করল। 'ভ্যান্স কিংবা এরিক বাইয়ু বা বিল ধরে যেতে পারেন, দুটোই খালের সঙ্গে সমান্তরাল রেখায় রয়েছে, তারপর খালের সঙ্গে মিশেছে অ্যাটচাফালেয়া নদী থেকে আট মাইল দূরে। শ্যালিবোট চলাবার জন্যে ভ্যান্স বিলটাই ভাল।'

'ভ্যান্স বাইয়ুর চারপাশে জমিজমাও কি হান ম্যারিটাইম কিনে নিয়েছে?'

ডিক মাথা নাড়ল। 'ওদের সীমানা খালের দুই কিনারা থেকে একশো গজ পর্যন্ত।'

'সীমানা পেরুলে কি ঘটে?'

'জেলে আর শিকারীরা মাঝে মধ্যে ঢুকে পড়ে। বোট নিয়ে চীনারা ছুটে আসে, সঙ্গে থাকে অটোমেটিক রাইফেল, গুলি করার হুমকি দিয়ে ভাগিয়ে দেয়।'

'তারমানে সিকিউরিটি খুব টাইট,' বলল রানা।

'রাতে তেমন একটা নয়। আগামী দু'দিন সিকি ভাগ চাঁদ থাকবে আকাশে, আপনাদের ওরা দেখতে পাবে বলে মনে হয় না।'

'খালে বা খালের আশপাশে অদ্ভুত কিছু ঘটে? কেউ কখনও কোন রিপোর্ট করেনি?'

'নাহ্। এটাই তো রহস্য, কিছু ঘটে না। আমাদের কারও মাথায় ঢোকে না এত বড় একটা খাল কেন কাটা হলো।'

'বার্জ বা বোট আসা-যাওয়া করে না?'

মাথা নাড়ল ডিক। গোঁফের কিনারায় টোকা দিল। 'না। চেইন ব্যারিয়ার জায়গামত একেবারে ফিক্সড, টিএনটি দিয়ে উড়িয়ে না দিলে খোলা সম্ভব নয়।'

'খালটা আপনাদের কোন ক্ষতি করছে?' জানতে চাইল রানা।

'আগে আমরা ওদিকে প্রচুর হাঁস, কুমীর আর হরিণ পেতাম। মাছও ছিল দেদার। প্রায় সবই চীনারা মেরে খেয়ে ফেলেছে। সামান্য যা আছে, তা-ও ওদের সীমানায়, আমরা ঢুকতে পারি না।'

'যদি কোন রহস্য থাকে, আশা করি আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে আমরা তা জানতে পারব,' বলল রানা, খালি একটা কার্ডবোর্ড বাক্সে সদ্য কেনা রসদ ভরছে।

একটা ম্যাপের কিনারায় খস খস করে কয়েকটা সংখ্যা লিখল ডিক চ্যাপলিন। 'যদি কোন বিপদে পড়েন, আমার সেল-ফোনের নম্বরে ডায়াল করবেন। প্রয়োজনীয় সাহায্য পাঠাতে দেরি করব না।'

'আমি কৃতজ্ঞ, অসংখ্য ধন্যবাদ।'

দোকান থেকে বেরিয়েই মুরল্যান্ডের মুখোমুখি হলো রানা। 'তুমি এখানে?'

'বোটে একজন প্যাসেঞ্জার আছে,' বিড়বিড় করল মুরল্যান্ড।

'প্যাসেঞ্জার? মানে?'

রানার হাতে একটা চিরকুট গুঁজে দিল মুরল্যান্ড। তাতে লেখা—'মি. রানা ও মি. মুরল্যান্ড। আপনাদেরকে দেখে মনে হওয়া উচিত স্থানীয় লোক, মাছ ধরতে

বেরিয়েছেন। সেজন্যে আপনাদের একজন সঙ্গী থাকা দরকার। লন্ডনকে ধার হিসেবে দিলাম। ও সঙ্গে থাকলে আপনাদেরকে জেলে বলে মনে হবে। যে-কোন মাছ দিলেই খাবে ও। শুভেচ্ছা, বাইয়ু মিকি।'

'লন্ডন কে?'

'নিজের চোখে দেখবে চলো,' জবাব দিল মুরল্যান্ড।

শ্যান্টিবোটে ফিরে এল ওরা। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ভেতরে আঙুল তাক করল মুরল্যান্ড। ডেকে পিঠ দিয়ে শুয়ে রয়েছে একটা ব্লাডহাউন্ড, চার পা শূন্যে তোলা, বড় আকৃতির কান দুটো দু'পাশে মেলা, লম্বা জিভের অর্ধেকটা বেরিয়ে আছে।

'মারা গেছে নাকি?'

'গেলে আমি একটুও আশ্চর্য হব না,' বলল মুরল্যান্ড। 'যতক্ষণ বোটে ছিলাম, এক চুল নড়েনি, এমন কি চোখের পাতা পর্যন্ত ফেলেনি।'

'এদিকে পশু বলো মানুষ বলো, সবারই একটা না একটা বৈশিষ্ট্য আছে,' মন্তব্য করল রানা। 'এঞ্জিনটা কেমন দেখলে?'

'ভাল প্রশ্ন করেছ। এসো, দেখো,' বলে কামরার ভেতর দিয়ে হেঁটে এসে একটা ট্র্যাপডোরের ঢাকনি খুলল মুরল্যান্ড। কামরাটা একাধারে বেডরুম, লিভিংরুম ও কিচেন হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। ট্র্যাপডোরের নিচে এঞ্জিনরুমের দিকে আঙুল তাক করল মুরল্যান্ড। 'ওটা একটা ফোর্ড ফোর হানড্রেড টোয়েন্টিসেভেন কিউবিক ইঞ্চ ভি-এইট, জোড়া কারবুরেটর সহ। ওল্ড বাট গোল্ড। কম করেও চারশো হর্সপাওয়ার।'

'বেশি, সম্ভবত চারশো পঁচিশ,' বলল রানা।

'প্রয়োজনে ঘণ্টায় পঁচিশ মাইল ছুটতে পারব আমরা। খালটা কত দূরে?'

'মাপিনি, তবে ষাট মাইলের মত হবে।'

'ওখানে আমরা পৌছুতে পারব সন্ধ্যার খানিক আগে।'

'আমি রশি খুলছি। তুমি হেলমে থাকো।'

মাথা ঝাঁকিয়ে হেলমের দায়িত্ব নিল মুরল্যান্ড। স্টার্টার-এর টান দিতেই শক্তিশালী এঞ্জিন গম্ভীর, চাপা গর্জন তুলে সচল হলো। 'মাই গড!' চোখ কপালে উঠে গেল। 'দেখে যা মনে হয়েছিল তারচেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী, রানা। অর্থাৎ, এঞ্জিনটা মডিফাই করা হয়েছে!'

রানা কিছু না বলে হাসল শুধু, রসদ-পত্র জায়গামত তুলে রাখছে। কাজটা শেষ হতে ঘুমন্ত লন্ডনকে টপকে বোটের সামনের বারান্দায় বেরিয়ে এসে একটা লন চেয়ারে বসল, রেলিঙে পা বাধিয়ে।

আশপাশে যত বোট ছিল সবগুলোকে পিছনে ফেলে অ্যাটচাফালেয়া নদী ধরে শ্যান্টিবোট ছুটছে দ্রুতবেগে। নটিকাল চার্টের ভাঁজ খুলে সামনে নদীর গভীরতা দেখে নিল মুরল্যান্ড, তারপর স্পীড আরও বাড়িয়ে দিল। ভোঁতা ও প্রাচীন চেহারা নিয়ে একটা বোট ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল গতিতে ছুটছে, ব্যাপারটা প্রায় অবিশ্বাস্য। বাতাসের তীব্র চাপে হাউসের দেয়ালে পিঠ সেঁটে গেল রানার।

শ্যান্টিবোটের পিছনে তিন ফুট উঁচু ঢেউ উঠছে, ছড়িয়ে পড়ছে দু'পাশে দু'মাইল পর্যন্ত, রিভার চ্যানেল থেকে জলাভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত অবিচ্ছিন্ন

কচুরিপানার সীমাহীন চাদর দুলিয়ে দিচ্ছে। ছোট দুটো ফিশিং বোটকে মরগান সিটির দিকে ফিরতে দেখল মুরল্যান্ড। থ্রটল টেনে শ্যান্টিবোটের গতি কমাল সে। এদিকের কচুরিপানা দেখতে সুন্দর হলে কি হবে, অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে বিরাট একটা বাধা, এত বেশি জন্মায় যে খাল-বিল সব একেবারে ভরে ফেলে। ফুলগুলো রক্তাভ নীল, পানি থেকে তোলার পর বিচ্ছিরি গন্ধ ছড়ায়।

কামরা থেকে ম্যাপগুলো নিয়ে এল রানা। ডিক ল্যান্ডিং আর হানের কাটা খালের মাঝখানে নদী কোথায় কিভাবে বাঁক নিয়েছে দেখছে। শ্যান্টিবোট বাঁক ঘোরার সময় ম্যাপের সঙ্গে মেলাল। নদীর তীরের গাছ-পালা প্রতি মাইলে বদলে যাচ্ছে। কখনও উইলোর জঙ্গল, কোথাও কটনউডের, মাঝখানে গজিয়েছে বেরি আর বুনো আঙুরের ঝোপ। তারপর শুরু হলো নল খাগড়ার রাজ্য, সেই দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। নল খাগড়ার বনে নিঃসঙ্গ একটা সাইপ্রেস আকাশ ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে রাজকীয় ভঙ্গিতে। জলজ লতার ওপর লম্বা পা ফেলে সারস পাখিকে হাঁটতে দেখল রানা, গলা ইংরেজি এস হরফের মত বাঁকা, কাদা থেকে খাবার খুঁটছে।

ক্যানু নিয়ে কোন শিকারী এদিকে এলে শক্ত মাটি পাওয়াই তার এক নম্বর সমস্যা হবে, তা না পেলে রাত কাটাবার জন্যে তাঁবু ফেলতে পারবে না। জলজ উদ্ভিদ আর কচুরিপানা খোলা পানি বলতে কিছুই রাখেনি। জঙ্গল তৈরি হয়েছে কাদার ওপর, শুকনো মাটিতে নয়।

দিনটা ঠাণ্ডা, বাতাসেও তেমন জোর নেই। কোন ঘটনা ছাড়াই ঘণ্টার পর ঘণ্টা পেরিয়ে যাচ্ছে। শান্তিময় পরিবেশে এমন কিছু নেই যা দেখে মনে হতে পারে সামান্য একটু ভুল করলে প্রাণ হারাতে হতে পারে ওদেরকে।

বেলা একটার দিকে একটা স্যান্ডউইচ আর এক বোতল বিয়ার নিয়ে ছাদের ওপর হুইলহাউসে উঠে এল রানা। হেলমের দায়িত্ব নিতে চাইলে মুরল্যান্ড প্রবল বেগে মাথা নাড়ল। বোট চালাতে খুব মজা পাচ্ছে সে। নিচে নেমে ডাইভিং ইকুইপমেন্টগুলো চেক করল রানা। প্রথমে বাক্স থেকে বের করল এইউবি, ওরিয়ন লেকে যেটা ব্যবহার করেছিল। সবশেষে কেস থেকে বের করল নাইট-ভিশন গগলস।

'বিকেল পাঁচটায় আবার মই বেয়ে হুইলহাউসে উঠল রানা। 'খালের মুখ আর আধ মাইল দূরে,' মুরল্যান্ডকে সতর্ক করল ও। 'মুখ থেকে আরও আধ মাইল এগোলে পরবর্তী বিল। তখন স্টারবোর্ডের দিকে বাঁক নেবে।'

'নাম কি ওটার?' জানতে চাইল মুরল্যান্ড।

'ভ্যাঙ্গ বাইয়ু, তবে সাইনবোর্ড পাবে না। বাঁক নেয়ার পর ছ'মাইল এগোবে। ম্যাপে দেখা যাচ্ছে ওখানে একটা ডক আছে, মুখ বন্ধ করা একটা তেল কূপের পাশে। বোট বেঁধে রেখে রাতের অপেক্ষায় থাকতে হবে।'

বার্জের লম্বা একটা বহরকে নদীর ভাটির দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে বিশাল এক টো-বোট, সেটাকে এড়িয়ে সাবধানে শ্যান্টিবোট চালাল মুরল্যান্ড। পাশ কাটাবার সময় টোবোটের ক্যাপটেন এয়ার হর্ন-এর বিস্ফোরণ ঘটাল, ধরে নিয়েছে শ্যান্টিবোটে স্বয়ং মালিক উপস্থিত। বোতে ফেলা চেয়ারটায় ফিরে এসে হাত নাড়ল রানা। তারপর চোখে বিনকিউলার তুলে খালটা খুঁটিয়ে দেখল, ওটার মুখের

সামনে দিয়ে এগোবার সময়। সোজা পথ ধরে এগিয়েছে খাল, সিকি মাইল চওড়া, সবুজ কার্পেটের মত দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। মুখে মরচে ধরা চেইন ফেলা আছে, কংক্রিট পাইলিং-এর সঙ্গে জোড়া লাগানো। বড়সড়, বিলবোর্ড আকৃতির সাইন খাড়া করা হয়েছে, সাদা জমিনের ওপর লাল হরফে লেখা—'প্রবেশ নিষেধ। হুয়ান হান ম্যারিটাইম প্রপার্টিতে অনুপ্রবেশ আইনত দণ্ডনীয়'।

চল্লিশ মিনিট পর থ্রটল টেনে ভ্যাঙ্গ বাইয়ুর সরু চ্যানেল থেকে বোট সরিয়ে এনে বিধ্বস্তপ্রায় একটা কংক্রিট জেটির দিকে এগোল মুরল্যান্ড। নিচু পাড়ে শ্যান্টিবোটের বো ঠেকে গেল। কংক্রিট পাইলিং-এর স্টেনসিল করা হরফগুলো পড়া গেল—'মারভি অয়েল কোম্পানী, ব্যাটন রুজ, লুইযিয়ানা। শ্যান্টিবোটে নোঙর নেই, ক্যাটওয়াকে বাঁধা লম্বা পোল খুলে কাদায় গাঁথা হলো, সেই পোলে রশি বাঁধল রানা, তারপর একটা গ্যাঙ প্ল্যাঙ্ক ফেলল শক্ত ডাঙায়।

'রাডারে একটা ইমেজ দেখতে পাচ্ছি,' রিপোর্ট করল মুরল্যান্ড। 'দক্ষিণ-পুব দিকে, জলার ওপর।'

'তাহলে খাল থেকেই আসছে ওরা।'

'দ্রুত।'

বোটের ভেতর থেকে চৌকো একটা জাল নিয়ে এল রানা, খাড়া অবলম্বন সহ। 'লন্ডনকে বাইরে টেনে আনো, হাতে একটা বিয়ারের বোতল রাখো,' মুরল্যান্ডকে নির্দেশ দিল।

'ডিনারের জন্যে কাঁকড়া ধরবে?' জালটার দিকে তাকিয়ে আছে মুরল্যান্ড।

'না।' অস্তগামী সূর্যের আলো লাগায় নল খাগড়ার বনে কি যেন ঝিক করে উঠতে দেখল ও। 'আমি চাই ওরা আমাদের জেলে বলে মনে করুক।'

'সম্ভবত একটা হেলিকপ্টার আসছে,' বলল মুরল্যান্ড। 'কিংবা আলট্রালাইট।'

'খুব নিচে রয়েছে, সম্ভবত হোভারক্রাফট।'

'আমরা কি হানের কেনা এলাকায় দাঁড়িয়ে আছি?'

'ম্যাপ বলছে, ওদের প্রপার্টি লাইন থেকে তিনশো গজ দূরে রয়েছি আমরা। দেখতে আসছে কি করছি।'

'কার কি ভূমিকা?' জানতে চাইল মুরল্যান্ড।

'আমি কাঁকড়া শিকারী জেলে। তুমি বিয়ার খেয়ে ফোলা ব্যাঙ। লন্ডন লন্ডনের ভূমিকায়—কুকুর।'

টেনে বারান্দায় বের করে আনার পর লন্ডনকে নিয়ে কোন সমস্যা হলো না, নিজের প্রয়োজনেই ধীর পায়ে গ্যাঙ প্ল্যাঙ্ক ধরে নেমে এল পেশাব করার জন্যে। মুরল্যান্ড ভাবল, কুকুরটার ব্লাডার নিশ্চয়ই লোহার তৈরি, তা না হলে এতক্ষণ চেপে রাখতে পারত না। হঠাৎ সতর্ক হয়ে উঠল লন্ডন, লম্বা ঘাসের ভেতর একটা খরগোশকে ছুটতে দেখে ধাওয়া করল সেটাকে। 'না রে, অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ড নমিনেশন তোর জন্যে নয়!' বলে বারান্দার একটা লন চেয়ারে ধপাস করে বসে পড়ল মুরল্যান্ড। মোজা আর স্নিকার খুলে রেলিঙে নগ্ন পা বাধাল, হাতে বিয়ারের একটা বোতল।

রানা ওর .৪৫ কোল্টটা পায়ের পাশে রাখা বালতিতে ভরে ছেঁড়া ক্যানভাসের

একটা টুকরো দিয়ে ঢেকে রাখল। কংগ্রেস সদস্যা লরেলির হ্যাঙ্গার থেকে টুয়েলভ-গজ শটগানটাও সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে ও, মুরল্যান্ড সেটা লুকিয়ে রাখল চেয়ারের গদির তলায়। জলার ওপর দিয়ে উড়ে আসা কালো বিন্দুটাকে আকারে প্রতি মুহূর্তে বড় হতে দেখছে ওরা। হোভারক্রাফটের নিচে নল খাগড়ার বন নত হচ্ছে। ক্রাফটটার স্টার্নে প্রপেলার আছে, উড়িয়ে আনছে এক জোড়া এয়ারক্রাফট এঞ্জিন। আকাশে উড়তে পারে, পানিতেও চলতে পারে।

'স্পীড খুব বেশি,' মন্তব্য করল মুরল্যান্ড। 'ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল তো হবেই। লম্বায় বিশ ফুট মত। দেখে মনে হচ্ছে ছয়জন বসতে পারে।'

'একজনও হাসছে না,' বিড়বিড় করল রানা। শ্যান্টিবোটের কাছাকাছি এসে স্পীড কমাল হোভারক্রাফটের পাইলট। ঠিক সেই মুহূর্তে ঘাসের বন থেকে তীরবেগে ফিরে এসে কান ফাটানো ঘেউ ঘেউ শুরু করল লন্ডন। 'সাবাস ব্যাটা!' হাসি চেপে বলল রানা।

দশ ফুট দূরে বিলের ওপর নামল হোভারক্রাফট। এঞ্জিনের গর্জন কমে মৃদু যান্ত্রিক গুঞ্জনে স্থির হলো। পাঁচজন লোক, প্রত্যেকের সঙ্গে সাইডআর্ম রয়েছে, কারও কাছেই রাইফেল নেই। ওরিয়ন লেকে যে ইউনিফর্ম দেখেছিল রানা, এরাও তাই পরে আছে। সবাই চীনা, কেউ হাসছে না, রোদে পোড়া চেহারা থমথম করছে।

'এখানে কি করা হচ্ছে?' স্পষ্ট উচ্চারণে ইংরেজিতে প্রশ্ন করল এক লোক, চেহারায় মারমুখো কঠিন ভাব, ইউনিফর্মের কাঁধে একটা তকমা আঁটা, মাথায় হ্যাট। সেই বোধ হয় লীডার, দেখেই বোঝা যাচ্ছে পোকার গায়ে সুঁই বেঁধাতে মজা পায়, কাউকে গুলি করার সুযোগ খোঁজে। লন্ডনের দিকে তাকাতে তার চোখ দুটো চকচক করে উঠল।

'আমরা এখানে মজা করছি,' সহজ সুরে বলল রানা। 'তোমাদের সমস্যাটা কি?'

'এটা ব্যক্তিগত সম্পত্তি,' হোভারক্রাফট কমান্ডার ঠাণ্ডা সুরে বলল। 'এখানে আপনারা বোট বাঁধতে পারেন না।'

'কিন্তু আমরা জানি ভ্যাঙ্গ বাইয়ুর আশপাশের জায়গা মারভি তেল কোম্পানীর,' বলল রানা, যদিও সঠিক জানে না আসল মালিক কে।

কমান্ডার নিজের লোকদের দিকে ফিরল। চীনা ভাষায় কিছুক্ষণ কিচিরমিচির করল ওরা। তারপর হোভারক্রাফটের কিনারায় সরে এসে কমান্ডার বলল, 'আমরা বোটে আসছি।'

আড়ষ্ট হয়ে গেল রানা, বালতি থেকে কোল্টটা বের করার জন্যে শক্ত করল পেশী। তারপরই উপলব্ধি করল, বোটে আসছি বলে ওদেরকে পরীক্ষা করা হচ্ছে।

কিন্তু মুরল্যান্ড ব্যাপারটা ধরতে পারল না। 'কোন অধিকারে?' গর্জে উঠল সে। 'জলদি ভাগো, তা না হলে শেরিফকে ডাকব।'

প্রাচীন শ্যান্টিবোট আর দুই আরোহীর পরিচ্ছদের দৈন্যদশা লক্ষ করল কমান্ডার। 'বোটে রেডিও বা সেলুলার ফোন আছে নাকি?'

'ফ্লেয়ার গান আছে,' বলল মুরল্যান্ড, শুধু শুধু একটা পায়ের তলা চুলকাচ্ছে।

'আমরা ফ্রেয়ার ছুঁড়ি, সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসে আইন।'

কমান্ডারের সরু চোখ আরও সরু হয়ে গেল। 'আমি বিশ্বাস করি না।'

'হুয়ান হান বিশ্বাস করবে,' বাংলায় বিড়বিড় করল রানা।

কমান্ডার আড়ষ্ট হয়ে গেল। 'কি? কি বললেন?'

'বললাম,' ইংরেজিতে বলল রানা, 'ফিরে যাও। আমরা কারও কোন ক্ষতি করছি না।'

কমান্ডার নিজের লোকদের সঙ্গে আরেক দফা পরামর্শ করল। তারপর রানার দিকে একটা আঙুল তাক করল সে। 'আপনাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি। হুয়ান হান ম্যারিটাইম প্রপার্টিতে ঢুকবেন না।'

'কে চায় ঢুকতে?' প্রায় খেঁকিয়ে উঠল মুরল্যান্ড। 'তোমরা তো জলার বারোটা বাজিয়ে দিয়েছ–খাল কাটার সময় ওয়াইল্ডলাইফ বেশিরভাগ খেয়ে ফেলেছ, বাকি যা ছিল পালিয়ে গেছে। ঢুকে পাবটা কি?'

শ্যান্টিবোটের ছাদে বৃষ্টির কয়েকটা ফোঁটা পড়ল। বোটের দিকে পিছন ফিরল কমান্ডার, ঘাড় লোহা হয়ে আছে। কাঁধের ওপর দিয়ে আরেকবার তাকাল, এবার লন্ডনের দিকে। কুকুরটা বিরতিহীন ঘেউ ঘেউ করছে। ক্রুদের কিছু বলল লোকটা। এঞ্জিন গর্জে উঠল আবার, বিল ছেড়ে শূন্যে উঠে পড়ল হোভারক্রাফট, খালের দিকে ফিরে যাচ্ছে।

রেলিঙের বাইরে মুরল্যান্ডের নগ্ন পায়ে বৃষ্টি পড়ছে। অকস্মাৎ বর্ষণটা মুষলধারে শুরু হলো। লন্ডন ভিজে গায়ে ঝাঁকি দিতেই চেয়ারের ভেতর কুঁকড়ে গেল মুরল্যান্ড।

'ওদের কেবিনের মাথায় ভিডিও ক্যামেরাটা দেখলে?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'এই মুহূর্তে হানের তাইওয়ান হেডকোয়ার্টারে আমাদের ছবি পাঠানো হচ্ছে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে।'

'আমরা তার আরেকটা সেনষিটিভ প্রজেক্টে নাক গলিয়েছি, জানতে পারলে হানের কি প্রতিক্রিয়া হবে বলে মনে করো?' জিজ্ঞেস করল মুরল্যান্ড।

'সঙ্গে সঙ্গে আবার সে আমাকে খুন করার নির্দেশ দেবে।'

'তারমানে হোভারক্রাফটটা আবার ফিরে আসবে?'

'নিঃসন্দেহে ধরে নাও।'

'চিন্তার কিছুই নেই,' নির্লিপ্ত সুরে বলল মুরল্যান্ড। 'লন্ডন আমাদেরকে রক্ষা করবে।'

দ্রুত এদিক ওদিক তাকাল রানা, তারপর দেখতে পেল শ্যান্টিবোটের ভেতর আবার চিৎ হয়ে শুয়ে মড়ার ভান করছে কুকুরটা। 'সে-ব্যাপারে ঘোরতর সন্দেহ আছে আমার।'

চার

জলভরা মেঘ উত্তর দিকে সরে গেল, জলাভূমির শেষ মাথায় পশ্চিম দিগন্তে চলে

পড়ল সূর্য। ভ্যাঙ্গ বিলের সরু একটা শাখায় শ্যান্টিবোট নিয়ে ঢুকল ওরা, প্রকাণ্ড এক কটনউডের নিচে বেঁধে রাখল, ফিরে এলে আকাশ থেকে যাতে হোভারক্রাফটের রাডারে ওটা ধরা না পড়ে। তারপর কটনউডের শুকনো ডাল আর নল খাগড়া দিয়ে পুরোপুরি ঢেকে ফেলল বোটটাকে। রানা গোটা কয়েক ক্যাটফিশ ছুঁড়ে দিতেই জ্যান্ত হলো লন্ডন। মুরল্যান্ড হ্যামবার্গার সেধেছিল, লন্ডন স্পর্শই করেনি।

শাটার বন্ধ করে দরজা-জানালায় মোটা চাদর ঝুলিয়ে দিল রানা, ভেতরের আলো যাতে বাইরে বেরুতে না পারে। ডাইনিং টেবিলে ম্যাপের ভাঁজ খুলল ও, প্ল্যানটা ব্যাখ্যা করল, 'হানের সিকিউরিটি ফোর্স যদি সিরিয়াস টাইপের হয়, খালের পাড়ে কোথাও একটা কমান্ড পোস্ট থাকতে বাধ্য। সেটা মাঝামাঝি কোথাও থাকার কথা, জেলেরা ঢুকে পড়লে দু'দিকই যাতে দ্রুত কাভার করতে পারে।'

'খাল খালই,' বলল মুরল্যান্ড। 'কি খুঁজতে বেরুব আমরা?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'তুমি যেখানে আমিও সেখানে।'

'লাশ, ওরিয়ন লেকে যেমন পেয়েছিলে?'

শিউরে উঠল রানা। 'যদি ধরে নিই হান সানগারি পোর্টটাকে মানুষ পাচারের কাজে ব্যবহার করছে, এলাকার কোথাও না কোথাও একটা কিলিং গ্রাউন্ড থাকতে বাধ্য। জলায় লাশ লুকানো খুব সহজ। কিন্তু ইতিমধ্যে আমরা শুনেছি, নদী থেকে বোট-ট্র্যাফিক খালে প্রায় ঢোকেই না।'

'তবে এ-ও তোমাকে স্বীকার করতে হবে যে হান বিনা কারণে আঠারো মাইল একটা ট্রেঞ্চ কাটেনি।'

'হ্যাঁ, রহস্যটা এখানেই। দু'মাইল খুঁড়লেই পোর্ট তৈরির জন্যে প্রয়োজনীয় মাটি পেয়ে যেত সে। প্রশ্ন হলো, বাকি ষোলো মাইল কেন খুঁড়তে গেল?'

'কোত্থেকে শুরু করব আমরা?'

'নৌকো নিয়ে বেরুব, কারণ তাতে ধরা পড়ার ভয় কম। নৌকায় ইকুইপমেন্ট থাকবে, বৈঠা চালিয়ে ভ্যাঙ্গ বাইয়ু হয়ে খালে ঢুকব। খালে ঢুকে পুব দিকেই যেতে থাকব, সেই কালজাস পর্যন্ত। যদি কিছু দেখার থাকে দেখে নিয়ে অ্যাটচাফালেয়া হয়ে ফিরে আসব শ্যান্টিবোটে।'

'অনধিকার প্রবেশ টের পাবার জন্যে নিশ্চয়ই কোন সিস্টেম আছে ওদের।'

'সেটা লেযার ডিটেক্টর হবারই বেশি সম্ভাবনা, ওরিয়ন লেকে যেমন ছিল। লেযারের বীম জলার ঘাস বা নলখাগড়ার ওপর দিয়ে আসা-যাওয়া করবে। বোটে দাঁড়ানো শিকারী বা জেলের অস্তিত্ব পাঁচ মাইল দূর থেকেও টের পাওয়া সম্ভব। আমরা যদি নৌকায় বসে থাকি আর কিনারা ধরে এগোই, লেযারের বীম মাথার ওপর দিয়ে সরে যাবে।'

প্ল্যানটা শোনার পর কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করল মুরল্যান্ড। কল্পনার চোখে দেখতে পেল, ঘণ্টার পর ঘণ্টা বৈঠা চালাতে হচ্ছে তাকে। 'বুঝলাম,' অবশেষে মাথা নেড়ে বলল সে। 'মিসেস মুরল্যান্ডের ছেলের হাতে ফোস্কা পড়া কেউ ঠেকাতে পারবে না।'

..

ডিক চ্যাপলিনের কথাই ঠিক, ক্ষয়ে চারভাগের একভাগ হয়ে আছে চাঁদ।

বারান্দায় নিতম্ব দিয়ে বসা শান্ত লন্ডনকে শ্যান্টিবোটের পাহারায় রেখে নৌকা নিয়ে বিলের ওপর দিয়ে রওনা হলো ওরা, জোছনার আলোয় বাঁক আর মোচড়গুলো সহজেই দেখতে পাচ্ছে। নৌকোটা সরু ও নিচু, ওদের সামান্য পরিশ্রমেই তরতর করে এগোচ্ছে। বিল মাঝে মধ্যে সরু ও গভীর নালায় মিশেছে, চওড়া পাঁচ ফুটের কিছু বেশি, ওগুলো ধরে এগোবার সময় চাঁদটা মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়লে গাইড পাবার জন্যে নাইট-ভিশন গগলসের ওপর নির্ভর করছে রানা।

রাতে জ্যান্ত হয়ে উঠেছে জলা। আকাশ-বাতাস দখল করে নিয়েছে মশকবাহিনী, রসাল খোরাক খুঁজে বেড়াচ্ছে। রানা আর মুরল্যান্ড ওয়েট সুটে মোড়া; নগ্ন হাত, ঘাড় ও মুখে বাগ রিপেল্যান্ট মেখে নিয়েছে, কাজেই সালাম দিয়ে দূরে থাকছে রক্তচোষার দল। ব্যাঙগুলোর সঙ্গীত চর্চার ধরন অদ্ভুত, কেউ যখন গাইছে না তো কেউই গাইছে না, কিন্তু যেইমাত্র একজন গলা ছাড়ল, কর্কশ হেঁড়ে গলায় একের পর এক প্রায় হাজারখানেক ব্যাঙ অনুকরণ করল তাকে। তারপর যখন থামবে, অকস্মাৎ সবাই একযোগে, মনে হবে শুনতে ভুল হয়েছে, এখানে কোন কালে কোন ব্যাঙ ছিল না বা নেই। জলার আগাছা আর ঘাস অলঙ্কৃত করে রেখেছে লক্ষ-কোটি জোনাক পোকা, খসে পড়া আতশবাজির ফুলকির মত তাদের আলো ঘন ঘন জ্বলছে আর নিভছে। দেড় ঘণ্টা পর বৈঠা চালিয়ে ভ্যাস্স বাইয়ু থেকে খালের ভেতর ঢুকল ওরা।

সিকিউরিটি ফোর্স কমান্ড পোস্টটা ফ্লাডলাইটের আলোয় উদ্ভাসিত একটা স্টেডিয়ামের মত। দুই একর শুকনো জায়গার চারধারে উঁচু মঞ্চের ওপর বসানো হয়েছে লাইটগুলো, এক ঝাঁক ওক গাছের ভেতর একটা প্ল্যানটেশন হাউসকে আলোকিত করে রেখেছে, হাউসটা আগাছা আর বুনো লতায় ঢাকা একটা লনের মাঝখানে, লনটা সামান্য ঢালু হয়ে নেমে এসেছে খালের কিনারায়। কাঠামোটা তিনতলা উঁচু, জানালা-দরজার শাটারে মরচে ধরেছে, কজা খসে পড়ায় কাত হয়ে আছে দু'চারটে কবাট। সামনের বারান্দায় সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে কাঠের পিলার, ওগুলোর মাথায় ঢালু ছাদ।

বাতাসে চীনা খাবারের গন্ধ। পর্দাবিহীন জানালার ভেতর ইউনিফর্ম পরা লোকজন হাঁটাচলা করছে। রেডিওতে চীনা গান বাজছে, চিৎকার শুনে মনে হচ্ছে এখুনি গায়িকা সন্তান প্রসব করবে। প্রাচীন বাড়িটার লিভিংরুমে গিজগিজ করছে আধুনিক কমিউনিকেশন ও সিকিউরিটি সিস্টেম অ্যান্টেনা। ওরিয়ন লেকের মতই, কমান্ড সেন্টারের আশপাশে গার্ডদের কোন টহল নেই। এই জলার মাঝখানে কোন ধরনের হামলার আশঙ্কা করছে না ওরা, আস্থা রাখছে ইলেকট্রনিক সিস্টেমের ওপর। তেলের খালি ড্রামের ওপর ভাসছে ডক, হোভারক্রাফটটা ডকের সঙ্গে বাঁধা, ভেতরে কেউ নেই।

'উল্টোদিকের পাড়ে চলো,' ফিসফিস করল রানা। 'বেশি নড়াচড়া কোরো না।'

মাথা ঝাঁকাল মুরল্যান্ড, কোন শব্দ না করে পানিতে বৈঠা চালাচ্ছে। পাড়ের ছায়ার ভেতর রয়েছে ওরা, কমান্ড পোস্টটাকে পাশ কাটিয়ে একশো গজ দূরে সরে এল। রানার নির্দেশে নৌকা থামাল মুরল্যান্ড, বিশ্রাম দরকার তার। দু'জনেই

খুব ভয়ে ভয়ে আছে, কারণ আক্রান্ত হলে পাল্টা আক্রমণ করতে পারবে না। প্রচুর ইকুইপমেন্ট নিয়ে আসতে হয়েছে, জায়গার অভাবে আর ওজন বেশি হয়ে যাবার ভয়ে ফেলে আসতে হয়েছে অস্ত্রগুলো।

'এখানকার সিকিউরিটি সেটআপ ওরিয়ন লেকের মত স্পর্শকাতর নয়,' বলল রানা। 'ডিটেকশন নেটওঅর্ক থাকলেও, তেমন গুরুত্ব দিয়ে মনিটরিং করছে না।'

'বিকেলে তো চট করে ধরে ফেলল আমাদের।'

'সমতল ঘাসের মাঝখানে দশ ফুট উঁচু একটা বোটকে পাঁচ মাইল দূর থেকে দেখতে পাবার মধ্যে কোন কৌশল নেই। এটা যদি ওরিয়ন লেক হত, নৌকায় পা ফেলার পাঁচ সেকেন্ড পর থেকে আমাদের প্রতিটি নড়াচড়া লক্ষ করত ওরা। এখানে ওদের নাকের সামনে চলে এসেছি, অথচ টনক নড়ছে না।'

'তুমি চাও ফ্লেয়ার ছুঁড়ে ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি?' সকৌতুকে জানতে চাইল মুরল্যান্ড।

'এখানে তেমন কিছু দেখার নেই,' বলল রানা। 'চলো সামনে যাই। সূর্য ওঠার আগেই শ্যান্টিবোটে ফিরতে হবে।'

জোরে বৈঠা চালিয়ে আবার খাল ধরে এগোল ওরা। মুরল্যান্ডের বৈঠা চালানোর মধ্যে অনায়াস অথচ দৃঢ় একটা ভঙ্গি আছে, প্রতি টানে চার ফুট এগোচ্ছে নৌকো, রানার তুলনায় এক ফুট বেশি। খালের দু'পাশের জলায় ম্লান চাঁদের আলো ভৌতিক পরিবেশ তৈরি করেছে। অদৃশ্য কোন আলোর উৎস আলোকিত করে রেখেছে সামনের আকাশে ঝুলে থাকা মেঘমালাকে। কার ও ট্রাকের হেডলাইটও দেখা যাচ্ছে, দূরবর্তী কোন হাইওয়ে ধরে আসা-যাওয়া করছে।

পরিত্যক্ত ভৌতিক শহর কালজাসের বিল্ডিংগুলোকে দুই পাড়েই ঝুলে থাকতে দেখা গেল, শহরটাকে দু'ভাগ করে রেখেছে খাল। জলার ওপর বিশাল এলাকা জুড়ে উঁচু ডাঙা, তারই ওপর গায়ে গায়ে লেগে থাকা বাড়ি-ঘর। শহর ছেড়ে চলে যাবার পর লোকজন আর এখানে ফিরে আসেনি। গ্যাস স্টেশনের উল্টোদিকে পুরানো একটা হোটেল দেখা গেল। চার্চের পাশে গোরস্থান। শহরটাকে পিছনে ফেলে এল ওদের নৌকো।

একটানা দীর্ঘক্ষণ বৈঠা চালাবার পর অবশেষে খালের শেষ মাথায় পৌছুল ওরা। একটা ঢালের গায়ে থেমে গেছে খাল, মাথায় হাইওয়ে। ঢালের গোড়ায় কংক্রিটের শক্ত একটা কাঠামো দেখতে পেল, মাথাচাড়া দিয়েছে খালের পানি থেকে, দেখে মনে হচ্ছে প্রকাণ্ড একটা আন্ডারগ্রাউন্ড বাঙ্কারের প্রবেশপথ। বিরাট ইস্পাতের দরজা প্রবেশপথটাকে সীল করে রেখেছে, কবাট বন্ধ করার পর ওয়েল্ডিং করা হয়েছে।

নৌকো নিয়ে ওটার কাছাকাছি যেতে বারণ করল রানা। বলল, 'আগে দেখা দরকার হান এদিকে কোন পাহারা বসিয়েছে কিনা।'

'তোমার কি ধারণা?' জিজ্ঞেস করল মুরল্যান্ড, 'ওখানে ওরা কি রাখে?' নৌকা নিয়ে একটা ঝোপের ভেতর ঢুকে পড়ল সে।

'যা-ই রাখুক, কাউকে দেখতে দিতে চায় না,' ফিসফিস করল রানা, চোখে নাইট ভিশন গগলস এঁটে দরজাটা দূর থেকে পরীক্ষা করছে। 'অ্যাসেটিলিন টর্চ

দিয়ে ইস্পাত গলাতে হবে, তা না হলে খোলা সম্ভব নয়। তাতেও ঘণ্টা দেড়েক লাগবে।'

'জানছি কিভাবে এটা সরকারী বাঙ্কার নয়?' জিজ্ঞেস করল মুরল্যান্ড।

'কি বোকা আমি! হঠাৎ বলল রানা, গলায় চাপা উত্তেজনা। 'সরকারী কিনা এখুনি জানার ব্যবস্থা করা যায়।'

ফিসফিস করল মুরল্যান্ড, 'কিভাবে?'

'আগে চোখে পড়েনি, দরজার নিচের দিকে চৌকো একটা দাগ আছে।'

'অর্থাৎ?'

'সম্ভবত বড় একটা দরজার গায়ে ছোট একটা দরজা,' বলল রানা। 'নিশ্চিত হতে হলে সামনে দাঁড়িয়ে পরীক্ষা করতে হবে।'

'আমি কোন তালা ঝুলতে দেখছি না,' বলল মুরল্যান্ড।

'ওটা যদি ছোট একটা দরজা হয়, আর বাইরে যদি কোন তালা না থাকে, কি বুঝবে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ভেতরে কেউ আছে। শুধু ভেতর থেকে বন্ধ করা যায়।'

'অন্তত কোল্টটা সঙ্গে থাকা উচিত ছিল,' রানার গলায় খেদ।

হাতের পেশী ফোলাল মুরল্যান্ড। 'আমার ওপর তোমার আস্থা নেই?'

'আগে হাইওয়ের ওপর উঠি চলো, দেখি ওপারের ঢালে কিছু আছে কিনা,' বলল রানা। 'বাঙ্কার থেকে যতটা সম্ভব দূরে, ঝোপের ভেতর তুলে ফেলো নৌকা। কোন শব্দ করবে না।'

সরু নৌকোটাকে ডাঙায় তুলে ঝোপের ভেতর লুকিয়ে রাখল ওরা। ঢাল বেয়ে উঠে এল মাথায়, ট্র্যাফিক গার্ডরেল টপকে হাইওয়েতে পা রাখল। সঙ্গে সঙ্গে দশ টনী একটা ট্রাক আর ট্রেলার চাপা দিতে এল ওদেরকে, রেলিঙের সঙ্গে পিঠ সাঁটিয়ে কোন রকমে প্রাণ বাঁচাল।

হাইওয়েতে প্রচুর যানবাহন, ঘণ্টায় একশো মাইল বেগে ছুটে চলেছে। রাস্তার দু'দিকে যতদূর দৃষ্টি চলে, হেড লাইটের আলো দেখা যাচ্ছে। যানবাহনের মিছিলে একটা ফাঁক তৈরি হতে রাস্তা পেরোল ওরা, উল্টোদিকের রেলিঙে পৌঁছে আরেক দৃশ্য দেখতে পেল। রাস্তাটা বাঁক নিয়েছে বিশাল জলরাশিকে ঘিরে। প্রকাণ্ড একটা টোবোট দেখল ওরা, বিশটা বার্জকে ঠেলে নিয়ে চলেছে, জলযানের সিকি মাইল লম্বা একটা বহর। উল্টোদিকের তীরে বড়সড় একটা শহর দাঁড়িয়ে আছে। অয়েল রিফাইনারীর সাদা ট্যাঙ্ক আর পেট্রোকেমিক্যাল প্ল্যান্ট উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত।

'মিসিসিপি নদী,' বিড়বিড় করল রানা। 'নদীর উত্তরে ওটা ব্যাটন রুজ শহর। লাইনের শেষ মাথা, ববি। নির্দিষ্ট ঠিক এই জায়গা পর্যন্ত খাল কাটার উদ্দেশ্য কি বলো তো?'

'হানের বিকৃত মস্তিষ্কে কি আছে কে বলবে। সে হয়তো হাইওয়েটা ব্যবহার করতে চেয়েছে।'

'কিন্তু এদিকে তো কোন বার্জই আসে না।' রানা চিন্তিত, মিসিসিপি নদীর দিকে তাকিয়ে আছে। 'হাইওয়ের এই অংশটুকু মিসিসিপির সবচেয়ে কাছে।'

রানার দিকে তাকাল মুরল্যান্ড, একটা ভুরু কপালে উঠে গেল। 'তাতে কি?'

'ব্যাপারটা কাকতালীয়, নাকি কোন পরিকল্পনার অংশ—ঠিক এখানে এসে কেন শেষ হলো খালটা? এদিকের ঢালে তো বাঙ্কার বা আর কিছু দেখছি না।'

'তোমার কথা আমি ঠিক ধরতে পারছি না। হানের এঞ্জিনিয়াররা যেখানে খুশি খালটা শেষ করতে পারত। ধরে নাও এখানেই তাদের শেষ করতে ইচ্ছে হয়েছিল।'

'এখানে অকারণ খুশি বা অকারণ ইচ্ছের কোন ভূমিকা নেই। খালটাকে ঠিক এখানে টেনে আনার পেছনে নিশ্চয়ই কোন উদ্দেশ্য আছে। সেটা কি, আমি বোধহয় আন্দাজ করতে পারছি।'

'কি?'

'সবার প্রশ্ন, জন বসতিহীন জলার মাঝখানে হান কেন পোর্ট ফ্যাসিলিটি তৈরি করল, ঠিক?'

'আমারও প্রশ্ন।'

'ঢাল আর হাইওয়ে মিলিয়ে একশো গজও হবে না—ধরো সত্তর গজ, ঠিক?' রানার প্রশ্ন শুনে মাথা ঝাঁকাল মুরল্যান্ড, তাকিয়ে আছে বন্ধুর দিকে। 'এই সত্তর গজ উঁচু ডাঙা না থাকলে কি ঘটতে পারে, চিন্তা করো।'

মাত্র দু'সেকেন্ড পর আঁতকে উঠল মুরল্যান্ড। 'মাই গড! রানা!'

'অ্যাটচাফালেয়া আর মিসিসিপি নদী এক করে দেয়া যায়, এই সত্তর গজ ডাঙা বিস্ফোরক দিয়ে উড়িয়ে দিয়ে,' বিড়বিড় করল রানা, উত্তেজনায় কাঁপ ধরে গেছে শরীরে।

'তার কি প্রতিক্রিয়া হতে পারে ভেবে দেখেছ?' মুরল্যান্ডের গলা কেঁপে গেল।

'মিসিসিপির চেয়ে পনেরো ফুট নিচে অ্যাটচাফালেয়া,' বলল রানা। 'দুই নদী এক হলে যে আকস্মিক বন্যা দেখা দেবে তাতে অ্যাটচাফালেয়ার দুই পাশ দুশো মাইল পর্যন্ত তিন থেকে দশ ফুট পানির নিচে তলিয়ে যাবে। মিসিসিপি এদিকে যতটুকু চওড়া হাইওয়ের অন্তত ততটুকু অদৃশ্য হয়ে যাবে। দুশো মাইল তলিয়ে গেলে কত শহর আর গ্রাম নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, ভেবে দেখেছ?'

'এলাকায় ওয়াইল্ডলাইফ বলে কিছু থাকবে না,' বিড়বিড় করল মুরল্যান্ড।

'অ্যাটচাফালেয়া আর মিসিসিপির লেভেল এক হয়ে যাবে।'

'কিন্তু দুই নদী এক করে কি পেতে চায় হান?' জানতে চাইল মুরল্যান্ড।

'জলার মাঝখানে বড় কোন শহর নেই, রাস্তা নেই, রেললাইন নেই, এয়ারপোর্ট নেই, অথচ কোটি কোটি ডলার খরচ করে সানগারি বন্দর তৈরি করেছে হান। কেন? দুই নদী এক হয়ে গেলে গালফ অব মেক্সিকোয় তার এই পোর্ট সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। মিসিসিপির প্রবণতাই হলো পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হওয়া, সেটা ঠেকাবার জন্যে সেনাবাহিনীর এঞ্জিনিয়াররা দেড়শো বছর ধরে বাঁধ, হাইওয়ে ইত্যাদি তৈরি করে আসছে। সত্যিই বড় আশ্চর্যের ব্যাপার যে খালটা মিসিসিপির এত কাছাকাছি টেনে আনতে হানকে কেউ বাধা দেয়নি। আসল কাজ করে ফেলেছে সে। এখন শুধু বাকি হাইওয়ের তলায় বিস্ফোরণ ঘটিয়ে সত্তর গজ ডাঙা উড়িয়ে দেয়া।'

'তুমি বলতে চাইছ বাঙ্কারের ভেতর বিস্ফোরক আছে?'

'আছেই, তা বলছি না,' সাবধানে জবাব দিল রানা। 'সন্দেহ করছি।'

'এত বড় একটা সর্বনাশ ঘটিয়ে হান পার পাবে কিভাবে?' রানার ধারণার সঙ্গে এখনও একমত হতে পারছে না মুরল্যান্ড।

'উত্তরটা তুমি জানো, শুধু শুধু জিজ্ঞেস করছ কেন?' রাগ চেপে বলল রানা। 'ওরিয়ন লেকে তার অপরাধটা কি ছোট ছিল? পার পায়নি? তোমাদের প্রেসিডেন্ট পর্যন্ত চাঁদা নিয়ে বসে আছেন...' নিজেকে সামলে নিল রানা।

'তবু দুই নদী এক হয়ে গেলে যে ব্যাপক প্রাণহানির ঘটনা ঘটবে, প্রেসিডেন্ট যতই চাঁদা নিয়ে থাকুন, হানকে গ্রেফতার করার নির্দেশ না দিয়ে পারবেন না।'

'হ্যাঁ, তা ঠিক,' বলল রানা। 'কিন্তু গ্রেফতার করলেই বা কি? আদালতে তার অপরাধ প্রমাণ করবে কে? সে বলবে, তার কোন ধারণা নেই বিস্ফোরণের জন্যে কে বা কারা দায়ী। গ্রেফতার করা সম্ভব কিনা তা-ও চিন্তার বিষয়। ঘটনার আগে-পরে হানকে হয়তো আমেরিকাতে পাওয়াই যাবে না।'

মুরল্যান্ড উত্তেজিত হয়ে উঠল। 'এখন তাহলে আমাদের করণীয় কি?'

'হ্যাঁ, যা করার আমাদেরকেই করতে হবে,' বলল রানা। 'চলো দেখি, সন্দেহটা সত্যি কিনা।'

'কিভাবে দেখবে?'

'বাঙ্কারে ঢোকা যায় কিনা দেখব।'

'খালি হাতে? ভেতরে লোক থাকলে তাদের কাছে অস্ত্রও আছে।'

হাতের পেশী ফোলাল রানা। 'আমার ওপর তোমার আস্থা নেই?'

হাতজোড় করে ক্ষমা চাইল মুরল্যান্ড। তারপর রানার পিছু নিয়ে হাইওয়ে পেরিয়ে গার্ডরেল টপকাল, ঢাল বেয়ে খালের দিকে নামছে। 'সঙ্গে অস্ত্র না থাকলেও, নৌকায় বোধহয় জেলিগনাইটের একটা বাক্স তুলেছি,' বলল সে।

'বোধহয়?' হাসি চাপল রানা।

'এবার মনে পড়ছে, ডিটোনেটর সহ,' বলল মুরল্যান্ড। 'তাতে কি প্ল্যান তৈরি করা সহজ হবে?'

'দেখি।'

ঝোপের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে নিচে নামল ওরা। প্রথমেই রানা দেখে নিল নৌকাটা জায়গামত আছে কিনা। ঢালের ওপর হাঁটাহাঁটি করে কি যেন খুঁজছে ও। মুরল্যান্ড নৌকোয় উঠল, হাতে একটা ছোট বাক্স নিয়ে নেমে এল একটু পরই। রানাকে ঝুঁকে কিছু কুড়াতে দেখে জিজ্ঞেস করল, 'আম কুড়াচ্ছ নাকি?'

রানা কথা বলল না।

'তোমার প্ল্যানটা কি বলবে?'

'মধু পেতে হলে কি করতে হয় জানো না?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'মৌচাকে ঢিল ছুঁড়তে হয়।'

'আমরা ঠিক তাই করতে যাচ্ছি,' বলে পানির কিনারা ধরে বাঙ্কারের দিকে এগোল রানা, হাতে কয়েকটা ইঁটের টুকরো।

বাঙ্কার থেকে দশ-বারো গজ দূরে থামল রানা, পাশে মুরল্যান্ড। 'চৌকো দাগটা যদি দরজার গায়ে দরজা হয়, আর ভেতরে যদি লোক থাকে, আমি ঢিল

ছুঁড়লে নিশ্চয়ই তারা বেরিয়ে আসবে।'

মাথা নাড়ল মুরল্যান্ড। 'ভেতরে লোক থাকে কিভাবে, জানালা-দরজা নেই যেখানে?'

'মনে হচ্ছে জীবনে কখনও অক্সিজেন সিলিন্ডার দেখোনি!'

এক সেকেন্ড পর মাথা ঝাঁকাল মুরল্যান্ড। 'দুঃখিত। বেশ, ঢিল ছুঁড়লে তুমি। তারপর কি হবে?'

'ঢিল আমিও ছুঁড়তে পারি, তুমিও ছুঁড়তে পারো,' বলল রানা। 'তুমি ছুঁড়লে ওই চৌকো দাগটার পাশে দাঁড়িয়ে থাকব আমি। ভেতর থেকে ওটা খুলে কেউ যদি বের হয়, কি করতে হবে আমি জানি–আশা করি তুমিও জানো।'

'প্ল্যানটা মন্দ নয়,' গম্ভীর সুরে বলল মুরল্যান্ড। 'তবে আরেকটু সাবধানতা অবলম্বন করলে হয় না?'

'কি রকম?'

'টাইমার ও ডিটোনেটর, দুটোই যখন আছে,' বলল মুরল্যান্ড, 'চৌকো দাগের তিন দিকে একটা করে জেলিগনাইটের স্টিক বসিয়ে দিই, তারপর ঢিল ছোঁড়ো তুমি। ভেতরে কেউ থাকলে তারা হানের লোকজনই হবে। যদি দেখি দরজা খুলছে না, তিন মিনিট পর পিছিয়ে আসব আমি। টাইমার সেট করব চার কি পাঁচ মিনিটে।'

'তথাস্তু।'

'মানে?'

'ঠিক আছে।'

বাক্স নিয়ে একাই বাঙ্কারের দরজার সামনে পৌঁছুল মুরল্যান্ড। কাস্তে আকৃতির চাঁদ আকাশের অনেক নিচে নেমে এসেছে, আগের চেয়ে আলো আরও ক্ষীণ। চৌকো দাগ নয়, ফাটল; খুবই সরু, বোঝার কোন উপায় নেই দরজার গায়ে এটা আরেকটা দরজা কিনা, না আছে কোন নব বা হাতল, না আছে তালা দেয়ার কোন ব্যবস্থা। দ্রুত হাতে কাজ সারছে সে। শেষ করতে পাঁচ মিনিট লাগল। সিধে হয়ে হাতছানি দিল, অর্থাৎ রানাকে ঢিল ছুঁড়তে বলছে।

ইস্পাতের চওড়া দরজায় প্রথম ঢিলটা পড়ল, ধাতব আওয়াজ হলো ঠং করে।

মুরল্যান্ড দরজার গায়ে কান ঠেকাল। বিশ সেকেন্ড পর সিধে হলো সে, রানার দিকে ফিরে মাথা নাড়ল। অর্থাৎ ভেতর থেকে কোন আওয়াজ আসছে না। আরেকটা ঢিল ছুঁড়ল রানা। আবার দরজার গায়ে কান ঠেকাল মুরল্যান্ড। বিশ সেকেন্ড পর আবার মাথা নাড়ল।

আড়াই মিনিটের মাথায় বাঙ্কারের দরজা থেকে ফিরে এল মুরল্যান্ড, ইতিমধ্যে চার বার ঢিল ছোঁড়া হয়ে গেছে রানার।

'ভেতরে কেউ নেই বলেই আমার ধারণা,' রানার পাশে, ঝোপের ভেতর ঢুকে বলল মুরল্যান্ড। হাতঘড়ির আলোকিত ডায়ালে চোখ রাখল। 'আর দু'মিনিট পর বিস্ফোরণ।'

সময় যেন কাটছে না। ডায়ালের ওপর চোখ রেখে সেকেন্ডের কাঁটাটাকে ঘুরতে দেখছে মুরল্যান্ড। 'কাঁটাগুলোকে সাংঘাতিক অলস লাগছে আমার,'

ফিসফিস করল সে।

'ল্যাংচাচ্ছে,' বলল রানা।

'একটা করে শব্দ উচ্চারণ করো, আর আমি বোকা বনে যাই,' অভিযোগের সুরে বলল মুরল্যান্ড। 'কতদিন ধরে বলছি, বাংলাটা আমাকে দয়া করে শেখাও!'

'ওয়াশিংটনে বাংলা শেখানোর স্কুল আছে, ভর্তি হলেই তো পারো,' বলল রানা। 'আর কতক্ষণ?'

'এক মিনিট।'

'আওয়াজটা অনেক দূর থেকে শোনা যাবে,' বলল রানা।

'এই মৌচাক থেকে কেউ যদি না-ও বেরোয়, কমান্ড পোস্ট থেকে নিশ্চয়ই ওরা ঝাঁক বেঁধে ছুটে আসবে।'

'বিশেষ করে ভেতরে যদি গোপনীয় কিছু থাকে,' বলল রানা।

'ফেরার পথে খুব সাবধানে থাকতে হবে আমাদের।'

সেকেন্ডের কাঁটা বৃত্তের অর্ধেক পেরিয়ে এল। 'আর ত্রিশ সেকেন্ড,' ফিসফিস করল মুরল্যান্ড।

তার কথা শেষ হয়েছে কি হয়নি, বড় দরজার গায়ে চৌকো ফাটল তিন দিকে ফাঁক হতে শুরু করল। কজা লাগানো একটা দরজাই ওটা, ধীরে ধীরে খুলে যাচ্ছে। রানা আর মুরল্যান্ড এত অবাক হয়েছে, নিঃশ্বাস ফেলার কথাও মনে নেই। তিন ফুট লম্বা আর দুই ফুট চওড়া খোলা দরজা দিয়ে প্রথমে বেরুল একটা মেশিন পিস্তলের ব্যারেল। ওটার পিছনের লোকটাও বেরিয়ে এল। রানা আর মুরল্যান্ড মনে মনে একই কথা চিন্তা করছে, লোকটা কি ভিন গ্রহের কোনও প্রাণী, না মহাকাশ অভিযাত্রী? পরনে ফোলা-ফাঁপা অ্যাস্ট্রোনটদের পোশাক, পিঠে অক্সিজেন সিলিন্ডার, মুখে মাস্ক, তাতে নাইট-ভিশন গগলস ফিট করা। বেরিয়ে এসে এক পাশে সরে দাঁড়াল লোকটা। দরজার মুখে আরও একজনকে দেখা গেল, সে-ও বেরিয়ে এসে খুদে দরজার আরেক পাশে সরে গেল। এরপর বেরুল তৃতীয়জন। আর সেই মুহূর্তে বিস্ফোরিত হলো জেলিগনাইট। প্রচণ্ড আওয়াজটা চারদিকে কোথাও বাধা না পাওয়ায় প্রতিধ্বনি তুলল না, তবে জলাভূমির নিশাচর প্রাণীজগতে আতঙ্কের একটা ঢেউ বয়ে গেল, অকস্মাৎ জ্যান্ত হয়ে উঠল নল খাগড়া আর ঘাসের বন। এমনভাবে সাজিয়ে ছিল মুরল্যান্ড, জেলিগনাইটের তিনটে টুকরোই একযোগে বিস্ফোরিত হয়েছে। আওয়াজটা তখনও মিলিয়ে যায়নি, ঢাল বেয়ে বাঙ্কারের সামনে ছুটে এল ওরা। ইস্পাতের পুরো গেটটাই ভেঙে পড়েছে, ওটার গায়ের ছোট দরজার কোন চিহ্নই অবশিষ্ট নেই। ভেতরে আরও লোকজন থাকতে পারে, সে-কথা ভেবে প্রথমেই রানা ও মুরল্যান্ড নিহত তিনজন লোকের হাত থেকে ছিটকে পড়া মেশিন পিস্তলগুলো মাটি থেকে তুলে নিল। ভেঙে পড়া গেটের ভেতর গুলি করতে যাচ্ছিল মুরল্যান্ড, ধাক্কা দিয়ে তাকে সরিয়ে দিল রানা, চাপাস্বরে ধমক দিল, 'না!' একটা লাশের মাস্ক খুলে চেহারাটা পরীক্ষা করল ও। 'চীনাই,' ফিসফিস করল।

নিজের ভুল বুঝতে পেরে মুরল্যান্ড নিচু গলায় বলল, 'বুঝেছি। ভেতরে টিএনটি থাকতে পারে।'

'টর্চ বের করো!' নির্দেশ দিল রানা। বাঙ্কারের সামনে মাটিতে শুয়ে পড়ল ও, ক্রল করে ভাঙা গেটের দিকে এগোচ্ছে। ওর পাশেই রয়েছে মুরল্যান্ড। ভাঙা গেট কাত হয়ে পড়েছে একপাশে, সেটার কিনারায় পৌঁছে ভেতরে টর্চের আলো ফেলল ওরা।

বাঙ্কারের মুখেই একটা সিঁড়ি, ধাপগুলো নিচে নেমে গেছে। সিঁড়ির নিচে একটা গুহা বা টানেল দেখা যাচ্ছে। ভেতরে কিছুই নড়ছে না। গেট টপকে সিঁড়ি পেরুল ওরা, ক্রল করে নেমে এল। টানেলটা প্রায় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ গজ লম্বা, ছাদ ও দু'পাশের দেয়াল নিরেট কংক্রিটের। দেয়ালে, ছাদের কাছাকাছি, লোহার শেলফ দেখা গেল কয়েকটা, কাঠের বাক্স সাজানো, গায়ে লেখা 'ইলেকট্রিকাল ইকুইপমেন্ট'। দেয়াল ঘেঁষে ফেলা হয়েছে লোহার খাট, পাশাপাশি তিনটে, খাটগুলোর মাঝখানে দুটো রিফ্রিজারেটর। সাইলেন্সার লাগানো একজোড়া জেনারেটর আছে, আর আছে চারজোড়া অক্সিজেন সিলিন্ডার। টানেলের শেষ মাথায় মাটির প্রাচীর, কংক্রিট দিয়ে মোড়া নয়। এদিকে মেঝে আর ছাদও মাটির।

'টানেলটা আরও লম্বা করছিল ওরা,' বলল রানা। 'উদ্দেশ্য ছিল মাটি কেটে যতটা সম্ভব মিসিসিপির কাছাকাছি পৌঁছানো।'

'কিন্তু আমি তো কোথাও এক ছটাক মাটিও দেখছি না।'

'দুই নদী এক করার জন্যে ঢিমে তালে প্রস্তুতি চলছিল, হান সম্ভবত এখনও নির্দিষ্ট কোন তারিখ ঠিক করেনি,' বলল রানা। 'প্রতিদিন অল্প করে মাটি কাটছিল ওরা, এক হপ্তা বা পনেরো দিন পরপর এসে সেই মাটি সরিয়ে নিয়ে গেছে হোভারক্রাফট।' রিফ্রিজারেটর খুলে প্রচুর খাবারদাবার দেখল ও। 'শেলফ থেকে একটা বাক্স নামিয়ে খোলো তো দেখি।'

'টিএনটি,' একটা বাক্স পরীক্ষা করে জানাল মুরল্যান্ড। 'টাইমার ও ডিটোনেটর সহ। প্রায় দশ কেজি। বাকি বাক্সগুলোও তাহলে পরীক্ষা করতে হয়।'

'না, দরকার নেই,' বলল রানা, গলার সুরে জরুরী তাগাদা। 'বিস্ফোরণের আওয়াজে কমান্ড পোস্টে ওদের ঘুম ভেঙে গেছে। রওনা হবার প্রস্তুতি নিচ্ছে ওরা। ধরে নাও সবগুলোতেই টিএনটি আছে।'

'এগুলো এখানে রেখে ফিরে যাব?' মুরল্যান্ড হতভম্ব।

'আমার সঙ্গে হাত লাগাও,' বলে শেলফ থেকে একটা বাক্স নামিয়ে ভাঙা গেট দিয়ে বাঙ্কারের বাইরে বেরিয়ে এল রানা। দেখাদেখি মুরল্যান্ডও।

টিএনটি ভর্তি বাক্সগুলো খালের পানিতে ছুঁড়ে দিল ওরা। দশটা বাক্স, সবগুলো ডুবিয়ে দেয়া হলো।

কাজটা শেষ করে নৌকোয় ফিরে এল ওরা। হাতঘড়ি দেখল মুরল্যান্ড। 'এবার?'

'যে কাজে বেরিয়েছি সেটা শেষ করতে চাই, ভোর হবার আগেই,' বলল রানা।

অটোনমাস আন্ডারওয়াটার ভেহিকেলে চড়ে খালের পুরো আঠারো মাইল সার্চ করতে হবে ওদেরকে । কেস থেকে এইউভি বের করে নৌকোর পাশে পানিতে ছেড়ে দিল ওরা। গাঢ় পানির তলায় তলিয়ে গেল সেটা।

একদিকে মুরল্যান্ড বৈঠা চালাচ্ছে, আরেক দিকে রিমোট কন্ট্রোল অপারেট করছে রানা—এইউভি-র মোটর জ্যান্ত হলো, জ্বলে উঠল আলোগুলো, তারপর খালের তলায় জমে থাকা কাদার স্তর থেকে পাঁচ ফুট ওপরে একটা সরল রেখার ওপর সিধে হলো। পানিতে প্রচুর জলজ উদ্ভিদ আর শ্যাওলা থাকায় দৃষ্টিসীমা ছ'ফুটের বেশি নয়, ফলে রানা সাবধান হবার আগেই জলমগ্ন কোন কিছুর সঙ্গে এইউভি-র ধাক্কা লাগতে পারে।

বৈঠাতে দীর্ঘ টান দিচ্ছে মুরল্যান্ড, প্রতিটি টানে নির্দিষ্ট সময় নিচ্ছে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও ভঙ্গিটায় কোন ছন্দপতন নেই। একই গতিতে সাবলীলভাবে ছুটে চলেছে নৌকো, ফলে এইউভিকে পরিচালনা করতে সুবিধে হচ্ছে রানার। তারপর এক সময় হুয়ান হানের সিকিউরিটি ফোর্স হেডকোয়ার্টারের আলো দেখতে পেল ওরা। সঙ্গে সঙ্গে নৌকোর গতি কমিয়ে আনল মুরল্যান্ড, খালের কিনারা ধরে ছায়ার ভেতর দিয়ে এগোল।

গভীর রাত, সিকিউরিটি ফোর্সের সদস্যরা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন থাকার কথা। কিন্তু হঠাৎ জ্যান্ত হয়ে উঠল প্ল্যানটেশন হাউস হেডকোয়ার্টার, সশস্ত্র লোকজন চারদিকে ছুটোছুটি শুরু করে দিল। একটা দলকে দেখা গেল লনের ওপর দিয়ে ডকের দিকে এগোচ্ছে, হোভারক্রাফটটা যেখানে নোঙর ফেলেছে। ছায়ার ভেতর থেকে রানা ও মুরল্যান্ড দেখল হোভারক্রাফটে অটোমেটিক আগ্নেয়াস্ত্র তোলা হচ্ছে। দু'জন লোককে দেখা গেল ভারী টিউবের মত দেখতে একটা জিনিস বোটে তুলছে।

'আমার ধারণা ওটা একটা রকেট লঞ্চার,' বিড়বিড় করল রানা।

'বোঝা যাচ্ছে বিস্ফোরণে ওদের ঘুম ভাঙেনি,' বলল মুরল্যান্ড। 'তাহলে হঠাৎ কিসের এত ব্যস্ততা?'

'এর উত্তর পানির মত সহজ,' বলল রানা। 'তাইওয়ানে আমাদের ফটো পাঠানো হয়েছিল। ওখান থেকে হানের সিকিউরিটি চীফ আমাদের পরিচয় জানিয়ে সাবধান করে দিয়েছে—আমরা হানের প্রাণের শত্রু, তার আরেকটা প্রজেক্টের ক্ষতি করার মতলবে আছি।'

'শ্যান্টিবোট। শ্যান্টিবোট আর তার আরোহীরাই ওদের টার্গেট হতে যাচ্ছে।'

'বাইয়ু মিকির সম্পত্তি নষ্ট করবে, সে অনুমতি কি ওদেরকে দেয়া চলে? তাছাড়া, লন্ডনের কথাও ভাবতে হবে। লন্ডনকে কুকুরদের বেহেশতে যেতে দিলে পশুক্লেশ নিবারণী সংস্থা আমাদের নাম কালো তালিকায় তুলে দেবে।'

'সংখ্যায় ওরা বেশি, কি করতে পারব আমরা?'

মাথায় ডাইভ মাস্ক গলাল রানা, হাত বাড়াল এয়ার ট্যাঙ্কের দিকে। 'রশি খুলে হোভারক্রাফট রওনা হবার আগে খালের ওপারে পৌঁছুতে হবে আমাকে। তুমি প্ল্যানটেশনের একশো গজ সামনে নৌকো নিয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করবে।'

'এক সেকেন্ড, আমাকে আন্দাজ করতে দাও। খুদে ডাইভ নাইফ দিয়ে হোভারক্রাফটের ইনফ্লেটেবল্ স্কার্ট ফালি করবে তুমি।'

নিঃশব্দে হাসল রানা। 'ফুটো করা গেলে আকাশে ওটা উঠবে না।'

'এইউভি-র কি হবে?'

'ডুবিয়ে রাখো। হেডকোয়ার্টারের সামনে খালের পানিতে কি ফেলে ওর দেখতে চাই।'

দশ সেকেন্ডের মধ্যে রওনা হয়ে গেল রানা। পানি কেটে সাবধানে এগোচ্ছে কোন শব্দ করছে না, ব্যাকপ্যাকে স্ট্র্যাপ দিয়ে বেঁধে নিচ্ছে এয়ারট্যাঙ্ক। নৌকো থেকে বিশ ফুট এগোবার পর মুখে রেগুলেটর ঢোকাল, পানির নিচে ডুবে শ্বাস নিল। গভীর পানিতে নেমে এসে সিধে হলো, চারপাশটা দেখে নিয়ে দিক নির্ণয় করল, তারপর প্ল্যানটেশনের সামনের পানিতে আলোর ঝিলিক লক্ষ করে এগোল

দ্রুত এগোচ্ছে রানা। একটাই ভয়, খালের দিকে তাকালে পানির সারফেসে বুদ্বুদগুলো না দেখে ফেলে হানের লোকেরা।

উৎসের দিকে যত এগোচ্ছে, আলো তত উজ্জ্বল হচ্ছে। খানিক পরই হোভারক্রাফটের ছায়াটাকে সামনে ঝুলে থাকতে দেখল রানা। হোভারক্রাফট লোড করতে দেখেছে ও, সিকিউরিটি ফোর্সের লোকজনও নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে বোটে উঠে পড়েছে। সন্দেহ নেই, শ্যান্টিবোটকে ধ্বংস করতেই রওনা হচ্ছে ওরা। শুধু কোন শব্দ না হওয়াতেই বুঝতে পারছে হোভারক্রাফটের এঞ্জিন এখনও চালু করা হয়নি। সাঁতারের গতি আরও বাড়িয়ে দিল ও। ডক থেকে বেরিয়ে যাবার আগেই হোভারক্রাফটাকে অচল করে দিতে হবে।

খালের এপারে, ঝোপের ছায়ায় রয়েছে মুরল্যান্ড। সময় মত রানা হোভারক্রাফটের কাছে পৌঁছুতে পারবে কিনা, সন্দেহ আছে তার। ফেরার সময় আরও জোরে বৈঠা চালায়নি বলে তিরস্কার করল নিজেকে। ছায়ার ভেতর থেকেই নৌকো নিয়ে সাবধানে এগোল সে, এদিকের নড়াচড়া খালের ওপার থেকে যাতে কেউ টের না পায়। 'ডু ইট!' নিঃশ্বাসের সঙ্গে বিড়বিড় করল সে, রানা যেন তার পাশেই রয়েছে। 'ডু ইট!'

অতিরিক্ত পরিশ্রমে রানার হাত-পা অবশ হয়ে আসছে, বুকের ভেতর কাত আওয়াজ করছে ক্লান্ত ফুসফুস। শরীর বেঁকে বসতে চাইলেও, শেষ শক্তিটুকু এ করে হোভারক্রাফটের নাগাল পেতে চাইছে ও। যদিও বিশ্বাস করতে পারছে একটা কুকুরকে বাঁচাবার জন্যে নিজেকে এভাবে খুন করতে চাইছে। মাথা অপ্রাসঙ্গিক চিন্তা উদয় হচ্ছে...তা-ও এমন একটা কুকুরকে, যে কিনা শিশুকালে থসেথসি মাছির কামড় খাওয়ায় দীর্ঘস্থায়ী ও তীব্র নিদ্রাজনিত অসুস্থতায় ভুগছে।

আচমকা ওপরের আলো ম্লান হয়ে গেল, কালো একটা গর্তে প্রবেশ করল রানা। পানির সারফেস ভেঙে ওপরে মাথা তুলল ঠিক ফ্লেক্সিবল পীভ-এর ভেতরে যেটাকে স্কার্ট বলা হয়। এই স্কার্টেই বাতাস ভরা কুশন থাকে, ওগুলো হোভারক্রাফটকে তুলে বা ঝুলিয়ে রাখে। কয়েক মুহূর্ত ভেসে থাকল রানা, বুকটা ঘন ঘন ওঠা-নামা করছে, হাত এত অসাড় যে নাড়াচাড়া করা যাচ্ছে না। শক্তি ফিরে পাবার অপেক্ষায় রয়েছে, এই ফাঁকে স্কার্টের ভেতরটা দেখে নিচ্ছে। তি ধরনের স্কার্ট ফিট করা হয় হোভারক্রাফটে, এটায় যে ধরনের স্কার্ট ব্যবহার কর হয়েছে সেটাকে ব্যাগ স্কার্ট বলা হয়—একটা রাবার টিউব খোলটাকে পেঁচিয়ে রেখেছে, ওটাকে ফোলানো হলে এয়ার কুশনে বাতাস ঢোকে। একটা অ্যালুমিনিয়াম প্রপেলারও দেখতে পেল রানা, লিফট ফ্যান হিসেবে ব্যবহার কর

হয় ব্যাগ টিউব ফোলাবার জন্যে। পায়ের সঙ্গে স্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধা খাপ থেকে ডাইভ নাইফ বের করে রাবার টিউবে ফুটো তৈরি করতে যাবে রানা, বিজয়ের মুহূর্তটা ছিনিয়ে নিল স্টার্টার। এঞ্জিন সচল হলো, ঘুরতে শুরু করল প্রপেলারের ব্লেড, প্রতি মুহূর্তে গতি বাড়ছে। স্কার্ট ফুলতে শুরু করল, ভেতরের পানিতে ঘূর্ণি সৃষ্টি হচ্ছে। রাবার কুশন ফুটো করা এখন আর সম্ভব নয়। হোভারক্রাফটকে ঠেকানো যাবে না।

জিতেও হেরে যাচ্ছে দেখে মরিয়া হয়ে উঠল রানা। এয়ার ট্যাঙ্ক ব্যাকপ্যাকের স্ট্র্যাপ খুলে মুখ থেকে রেগুলেটর ফেলে দিল ও। ট্যাঙ্কটা মাথা গলিয়ে বের করে আনল, ছুঁড়ে দিল ওপর দিকে ঘুরন্ত প্রপেলার লক্ষ্য করে। ব্লেডগুলোয় লাগল ট্যাঙ্ক, ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল চোখের নিমেষে। হতাশা থেকে জন্ম নেয়া এ এক ধরনের উন্মত্ত আচরণ। রানা জানে কোন কিছুর পরোয়া না করে ভাগ্য যাচাই করার জন্যে মারাত্মক জুয়া খেলেছে ও।

নিরেট অভঙ্গুর একটা কঠিন বস্তু ব্লেডগুলোতে লাগায় বিস্ফোরিত হলো প্রপেলার, ধাতব টুকরোগুলো হারিকেনের রূপ ধারণ করে রাবার স্কার্টের দেয়াল ছিন্নভিন্ন করে দিল। তারপর ঘটল আরও ভয়াবহ দ্বিতীয় বিস্ফোরণ ট্যাঙ্কের দেয়ালে ছিদ্র সৃষ্টি হওয়ায়–আশি কিউবিক ফুট প্রেশারাইজড বাতাসের ওজন ছিল তিন হাজার পাউন্ড, অকস্মাৎ নিষ্ক্রান্ত হবার পথ পাওয়ায় ভেঙে গেছে ট্যাঙ্ক। অক্ষত থাকতে রাজি নয়, ধ্বংসযজ্ঞে যোগ দিল ফুয়েল ট্যাঙ্ক, ওগুলো থেকে আগ্নেয়গিরির তীব্র উদ্গিরণের মত উজ্জ্বল কমলা রঙের শিখা অগ্নি-ঝঞ্ঝার মত ছড়িয়ে পড়ল আকাশে, হোভারক্রাফটের জ্বলন্ত টুকরোগুলো বৃষ্টির মত ঝরে পড়ল প্ল্যানটেশন হাউসের ছাদে, প্রায় চোখের নিমেষে গোটা কাঠামোয় আগুন ধরিয়ে দিল।

আতঙ্কে ও স্তম্ভিত বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেছে মুরল্যান্ড, পানি থেকে হোভারক্রাফটকে শূন্যে লাফ দিতে দেখল সে, বিস্ফোরিত হয়ে সহস্র টুকরোয় পরিণত হলো। বাতাসে পাক খাচ্ছে মানুষের শরীর, যেন সার্কাস দলের মাতাল অ্যাক্রোব্যাট, ঝপাৎ করে পানিতে পড়ল অসাড় আড়ষ্ট ম্যানিকিন-এর মত। খালের পিঠ ধরে ছুটে এসে বিস্ফোরণের ধাক্কা আঘাত করল মুরল্যান্ডের নিরাবরণ মুখে গ্লাভ পরা বক্সারের প্রচণ্ড ঘুসির শক্তি নিয়ে। আকাশে নিক্ষিপ্ত শিখা আর জ্বলন্ত আবর্জনা নিভে যেতে দেখা গেল হোভারক্রাফটের অবশিষ্ট কাঠামো খালের পানিতে ধীরে ধীরে ডুবে যাচ্ছে, রাতের কালো আকাশ থেকে সমস্ত গাঢ় ধোঁয়াকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে ঠাণ্ডা বাতাস।

ভয়ে বুক কাঁপছে, ঘন ঘন বৈঠা চালিয়ে খাল পেরুচ্ছে মুরল্যান্ড। জ্বলন্ত আবর্জনার বাইরের সীমানায় পৌঁছে পিঠে স্ট্র্যাপ দিয়ে এয়ার ট্যাঙ্ক বেঁধে ঝুপ করে পানিতে নামল সে। সারফেসে এখনও বড় একটা এলাকা জুড়ে আবর্জনা জ্বলছে, তার আভায় পানির তলার পরিবেশ গা ছমছমে ভৌতিক লাগল। মন থেকে সমস্ত ভয় আর আশঙ্কা ঝেড়ে ফেলে হোভারক্রাফটের যে-টুকু অংশ অবশিষ্ট আছে তার নিচে চলে এল সে, স্কার্টের ফালি ছিঁড়ে ভেতরে ঢুকে হন্যে হয়ে প্রিয়তম বন্ধুর লাশ খুঁজছে। হাতে লাশ ঠেকল, গায়ে একটা সুতো পর্যন্ত নেই, পেট থেকে সমস্ত নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে গেছে, হাঁটুর নিচে পা বলতে কিছু নেই। সরু একটা চোখ,

খোলা কিন্তু দৃষ্টিহীন, বলে দিল লোকটা রানা নয়।

এত বড় বিপর্যয়ের মাঝখানে কারও বেঁচে যাওয়া সম্ভব নয়। তবু ব্যাকুল হৃদয় শান্ত হতে রাজি নয়, জ্যান্ত একটা শরীরের খোঁজে আবর্জনার ভেতর ঘুরে বেড়াচ্ছে মুরল্যান্ড। ঈশ্বর, কোথায় ও? তারপর এক সময় ক্লান্ত হয়ে পড়ল সে, শরীর ও মস্তিষ্ক ঠিকমত কাজ করতে চাইছে না। হাল ছেড়ে দিয়ে পানির ওপর উঠবে কিনা ভাবছে, এই সময় হঠাৎ নিচের অন্ধকার কাদা থেকে উঠে এসে ওর গোড়ালি চেপে ধরল একটা হাত। আতঙ্কের হিম শীতল শিহরণ বয়ে গেল মুরল্যান্ডের শিরদাঁড়ায়, সেই আতঙ্ক অবিশ্বাসে পরিণত হলো যখন বুঝতে পারল শক্ত মুঠোটা আসলে একজন জ্যান্ত মানুষের। বন করে ঘুরল সে, দেখল তামাটে একটা মুখ ওর দিকে ফেরানো, তরল আবছায়ার ভেতর কালো চোখ দুটো কুঁচকে ছোট হয়ে আছে, নাক থেকে বেরিয়ে এসে পানিতে মিলিয়ে যাচ্ছে লাল রক্ত।

যেন মৃত্যুর ওপার থেকে ফিরে এসেছে, রানার ঠোঁটে বিজয় ও কৃতজ্ঞতার স্মিত হাসি। পরনের ওয়েট সুট অনেক জায়গায় ছিঁড়ে গেছে, ডাইভ মাস্ক মাথা থেকে খসে পড়েছে, তবে অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি যে মারা যায়নি ও। হাত তুলে আঙুল দিয়ে ওপর দিকটা তাক করল ও, মুরল্যান্ডের গোড়ালি ছেড়ে দিয়ে পা ছুঁড়ল পানিতে, পাঁচ ফুট দূরের সারফেসে পৌঁছুতে চাইছে। একসঙ্গে পানির ওপর মাথা তুলল ওরা, হাত দিয়ে কাঁধ পেঁচিয়ে বিশাল এক আলিঙ্গনে রানাকে বুকে টেনে নিল মুরল্যান্ড।

'তুমি শালা!' চিৎকার করল সে। 'বেঁচে আছ!'

'তোমার এই গালি শোনার জন্যে!' জবাব দিল রানা।

'বাট ফর গড'স সেক, কাজটা তুমি করলে কিভাবে?'

'ঝড়ে বক বলতে পারো। তবে বেঁচে গেছি নেহাতই ভাগ্যের জোরে। ট্যাঙ্ক বিস্ফোরিত হবার সময় আট ফুট নিচে ছিলাম আমি। বিস্ফোরণের মূল ধাক্কাটা ওপর দিকে উঠে যায়। ছিটকে কাদার ভেতর পড়ি আমি, হাড়-গোড় না ভাঙার সেটাই কারণ। মাস্কের ভেতর বমি করছিলাম, হঠাৎ দেখি এক লাইনে অনেকগুলো বুদ্বুদ।'

'আমি তো ধরেই নিয়েছিলাম বেহেশতে কেনা জমিটুকুর দখল নিতে চলে গেছ তুমি।'

থেঁতলানো নাক আর ফাটা ঠোঁটে আলতোভাবে আঙুল ছোঁয়াল রানা। হাসছে।

সিকিউরিটি গার্ডদের তিনজন এখনও বেঁচে আছে। একজন হাউজ থেকে ক্রল করে দূরে সরে যাচ্ছে, ধোঁয়া বেরুচ্ছে পিঠের ইউনিফর্ম থেকে। দ্বিতীয় লোকটা খালের পাড়ে শুয়ে পর্দা ফাটা কানে হাত চেপে রেখেছে। জ্বলন্ত আবর্জনার সঙ্গে পানিতে ভাসছে চারটে লাশ। বেঁচে যাওয়া তৃতীয় লোকটা দাঁড়িয়ে আছে, চোখ-কান-নাক থেকে রক্ত গড়াচ্ছে, বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বিধ্বস্ত হোভারক্রাফটের দিকে।

সাঁতরে তীরে উঠল রানা, গার্ডটা ওর দিকে বোকার মত তাকিয়ে থাকল। তারপর, অত্যন্ত ধীর গতিতে সাইডআর্ম ধরার জন্যে হাত বাড়াল সে। কিন্তু হোলস্টার খালি, বিস্ফোরণের ধাক্কায় অস্ত্রটা ছিটকে পড়েছে কোথাও। ঘুরে দৌড়

দিল সে, মাত্র তিন-চার পা এগিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল।

'ইংরেজি জানো, দোস্ত?'

'জানি,' মাথা ঝাঁকিয়ে বলল গার্ড, বিষম খাওয়ার মত কর্কশ গলা।

'গুড। তোমার বস্ হুয়ান হানকে বলবে, মাসুদ রানা জানতে চেয়েছেন-আপনি কি আপনার পরিণতি সম্পর্কে সচেতন? কি বলবে?'

উঠে বসল লোকটা। কয়েকবার চেষ্টা করল সে, তারপর বাক্যটা বলতে পারল, 'মাসুদ রানা জানতে চেয়েছেন–আপনি কি আপনার পরিণতি সম্পর্কে সচেতন?'

'দারুণ,' প্রশংসা করল রানা। 'ক্লাসে ফার্স্ট হয়েছ তুমি।'

ঘুরে খালের কিনারায় চলে এল রানা, ওখানে নৌকো নিয়ে ওর জন্যে অপেক্ষা করছে মুরল্যান্ড।

পাঁচ

সন্ধের পর অন্ধকার গাঢ় হতে স্বস্তিবোধ করল শাকিলা। টোবোটের আউটসাইড ডেক ধরে বো-র দিকে যাবার সময় ছায়ার ভেতর থাকল সে, এক সময় থেমে কিনারা টপকে নেমে পড়ল বার্জে, লুকিয়ে থাকল আবর্জনা ভর্তি কালো প্লাস্টিক ব্যাগের আড়ালে। চাঁদের ম্লান আলোয় টোবোটে ক্রুদের চলাফেরা দেখতে পাচ্ছে, নদীর দু'পাশের প্রাকৃতিক দৃশ্যও খানিকটা আঁচ করতে পারছে। মাঝে মধ্যে মুখ তুলে তারাও দেখছে সে, বুঝতে চেষ্টা করছে ঠিক কোনদিকে যাচ্ছে টোবোট।

আগেই ম্যাপ দেখেছে শাকিলা, ছবির মত সুন্দর জেলেদের একটা শহরকে পাশ কাটানোর সময় চিনতে পারল–প্যাটারসন। পানির কিনারায় সারি সারি ডক, প্রতিটি ডকে ফিশিং ট্রলার ভাসছে। ইতিমধ্যে নদী থেকে বিলে প্রবেশ করেছে টোবোট আর বার্জ। দৃষ্টিসীমার ভেতর ড্রব্রিজ চলে আসতে টোবোটের ক্যাপটেন এয়ার হর্ন বাজাল। ব্রিজ টেন্ডার দায়িত্ব পালন করল, পাল্টা হর্ন বাজিয়ে সাড়া দিল সঙ্গে সঙ্গে, স্প্যান তুলে ব্রিজের তলায় ঢোকার পথ করে দিল।

প্যাটারসনকে কয়েক মাইল পিছনে ফেলে আসার পর টোবোটের স্পীড কমল, পশ্চিম তীরের দিকে সরে যাচ্ছে। বার্জের কিনারা থেকে উঁকি দিয়ে বড় আকৃতির একটা কাঠামো দেখতে পেল শাকিলা, আকারে ওয়্যারহাউসের মত, আশপাশে কয়েকটা আউটার বিল্ডিং রয়েছে, লম্বা ডকের দু'ধারে। উঁচু একটা চেইন-লিঙ্ক বেড়া দেখা গেল, ঘিরে রেখেছে গোটা কমপাউন্ডকে, মাথায় কাঁটাতার বসানো। কয়েকটা ফ্লাডলাইট রয়েছে, বালবগুলো নিস্তেজ, ডক আর ওয়্যারহাউসের মাঝখানে খালি জায়গাটুকু তেমন আলোকিত করতে পারেনি। মানুষ বলতে একজন মাত্র গার্ডকে দেখতে পেল শাকিলা, ডকের শেষ মাথার বন্ধ গেটে দাঁড়িয়ে আছে, পরনে সাধারণ একটা ইউনিফর্ম, রেডিমেড কিনতে পাওয়া যায়। লোকটা দাঁড়িয়ে আছে গার্ডরুমের সামনে, খোলা জানালার ভেতর একটা টেলিভিশন অন করা রয়েছে।

হঠাৎ শাকিলার বুকের ভেতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। একটা রেললাইন দেখতে পেয়েছে সে। বড়সড় ওয়্যারহাউসের নিচে একটা কালভার্ট, সেই কালভার্ট হয়ে কোন এক দিকে চলে গেছে লাইনটা। প্রায় নিশ্চিতভাবে ধরে নিল, এটাই হুয়ান হানের স্টেজিং সেন্টার, এখান থেকেই অবৈধ অভিবাসীদের গোটা আমেরিকার বিভিন্ন শহরে পাচার করা হয়। এখান থেকে যেখানেই পাঠানো হোক, হানের আরেকদল এজেন্ট তাদেরকে ড্রাগ ফেরি করতে বা দেহ-ব্যবসায় নামতে বাধ্য করে। এমন কি কেউ যদি জনবহুল কোনশহরে নিজের চেষ্টায় চাকরি যোগাড় করে নিতে পারে, তার বেতনের বেশিরভাগই চাপ দিয়ে কেড়ে নেয়া হয়।

চীনা ক্রুরা টোবোট থেকে বার্জে নামছে দেখে প্লাস্টিক ব্যাগগুলোর ভেতর গা ঢাকা দিল শাকিলা। ডকের সঙ্গে বার্জটাকে বাঁধা হলো। ক্রুরা আবার ফিরে গেল টোবোটে। গেটের সামনে দাঁড়ানো গার্ডের সঙ্গে ক্যাপটেন বা ক্রুরা কোন কথা বলল না। ক্যাপটেন এয়ার হর্ন বাজিয়ে ছোট একটা ফিশিং বোটকে সরে যাবার সঙ্কেত দিল। বার্জ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পিছু হটছে টোবোট, তারপর বিরাট জায়গা নিয়ে নিতম্ব ঘুরিয়ে একশো আশি ডিগ্রী বাঁকটা সম্পূর্ণ করল, চ্যাপ্টা বো বিলের উল্টোদিকে তাক করা। সানগারির দিকে ফিরে যাচ্ছে ক্যাপটেন।

পরবর্তী বিশ মিনিট ভৌতিক একটা নিস্তব্ধতার ভেতর ঘামতে থাকল শাকিলা। ভয় পাচ্ছে, তবে নিজের নিরাপত্তার কথা ভেবে নয়। তার কি কোথাও ভুল হয়েছে? কোথায় অবৈধ অভিবাসী? বার্জের তলায় লোকজন থাকলে তারা নামছে না কেন? কেউ তাদেরকে নিতেও তো আসেনি। গার্ড তার রুমে ফিরে টিভি দেখছে। আবর্জনা ভর্তি বার্জ ডকে বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে, পরিত্যক্ত ও অবহেলার শিকার।

টোবোট থেকে লাফ দেয়ার কিছুক্ষণ পর কোস্ট গার্ড কাটার মার্ভেল-এর ক্যাপটেন বিল হিউমের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল শাকিলা, ঝুঁকি নিয়ে কি করে বসেছে জানিয়েছে তাঁকে। রিপোর্ট পেয়ে হিউম খুশি হননি, কারণ শাকিলার নিরাপত্তার দায়িত্ব আইএনএস-এর অ্যাসোশিয়েট কমিশনার পিট লুকাস তাঁর হাতে তুলে দিয়েছেন। ওর কোন বিপদ হলে তাঁকেই দায়ী করা হবে। সমস্ত হতাশা আর দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে লেফটেন্যান্ট টাফিনের নেতৃত্বে সশস্ত্র লোক ভর্তি একটা লঞ্চ পাঠালেন তিনি, টোবোটকে অনুসরণ করবে। ব্যাকআপ হিসেবে আকাশে একটা হেলিকপ্টারও থাকল। টাফিনকে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, টোবোট আর বার্জের কাছ থেকে সম্মানজনক দূরত্বে থাকবে লঞ্চ, হানের লোকেরা যাতে কিছু সন্দেহ করতে না পারে। হেলিকপ্টারের পাইলটকেও বলা হয়েছে, এঞ্জিনের গুঞ্জন যেন শুনতে পায় শাকিলা, আকাশে তাকালে নেভিগেশন লাইটও যেন দেখতে পায়।

শম্পা মালাকারের ইউনিফর্ম অনেক আগেই খুলে ফেলেছে শাকিলা, পরিত্যক্ত কাপড় প্লাস্টিকের একটা ব্যাগে ভরে রেখেছে। ইউনিফর্মের নিচে সাধারণ একটা শর্টস আর ব্লাউজ ছিল, এই মুহূর্তে ওগুলোই ওর লজ্জা নিবারণ করছে।

প্রায় এক ঘণ্টা পর এখন আবার লেফটেন্যান্ট টাফিনের সঙ্গে রেডিওতে

যোগাযোগ করছে শাকিলা।

শাকিলার রিপোর্ট পেয়ে টাফিন বলল, 'হ্যাঁ, টোবোট আমাদেরকে পাশ কাটিয়ে সানগারিতে ফিরে যাচ্ছে। আপনার কি অবস্থা?'

'আমি এখনও নিরাপদেই আছি। কিন্তু কাঁটাতারের বেড়ার ওপাশে একজন গার্ড ছাড়া আর কাউকে দেখছি না, সে তার রূমে বসে টিভি দেখছে।'

'তারমানে কি আপনার সন্দেহ মিথ্যে?'

'এখনও বলতে পারছি না। ইনভেস্টিগেট করার জন্যে আরও সময় দরকার,' বলল শাকিলা।

'দুঃখিত, খুব বেশি সময় পাবেন না। ক্যাপটেন হিউম অস্থির হয়ে উঠেছেন। হেলিকপ্টারে যে ফুয়েল আছে তাতে আর মাত্র একঘণ্টা আকাশে থাকতে পারবে।'

'আপনারা আমাকে ছেড়ে চলে যাবেন, এ আমি বিশ্বাস করি না,' মৃদু হেসে বলল শাকিলা। 'শুনুন, এখনও আমি হতাশ নই। এখানে একটা বিল্ডিঙে রেইলরোড সাইডিং আছে, ভেতরে ঢুকে আবার বেরিয়ে গেছে। অবৈধ অভিবাসীদের জড়ো করার জন্যে জায়গাটা আদর্শ।'

'ক্যাপটেন হিউমকে বলছি, তিনি রেইলরোড কোম্পানীর ফ্রেইট-ট্রেন শিডিউল চেক করে দেখবেন চিনিকলে থামে কিনা,' বলল টাফিন। 'ইতিমধ্যে আপনার কাছ থেকে একশো গজ দক্ষিণে বিলের উল্টোদিকে ছোট ইনলেটে ঢুকছি আমি লঞ্চ নিয়ে। আপনার রিপোর্ট পাবার অপেক্ষায় থাকব আমরা। মিস শাকিলা?'

'বলুন।'

'বেশি কিছু আশা করবেন না,' বলল টাফিন। 'বিলের কিনারায় কাত হয়ে থাকা একটা সাইনবোর্ড দেখতে পাচ্ছি আমি। শুনবেন তাতে কি লেখা আছে?'

'কি লেখা আছে?'

'ডাফ মোরাল সুগার প্রসেসিং প্ল্যান্ট নাম্বার ওয়ান,' বলল টাফিন। 'আঠারোশো তিরাশি সালে প্রতিষ্ঠিত। দেখা যাচ্ছে বহুকাল আগে পরিত্যক্ত একটা চিনিকলে ভিড়েছেন আপনি। আমার অবস্থান থেকে কমপ্লেক্সটাকে ডায়নোসরের একটা ফসিল বলে মনে হচ্ছে।'

'তাহলে সিকিউরিটি গার্ড জায়গাটাকে পাহারা দিচ্ছে কেন?' জানতে চাইল শাকিলা।

'তা আমি জানি না।'

'দাঁড়ান!' হঠাৎ চাপা গলায় আঁতকে উঠল শাকিলা। 'কি যেন শুনলাম।'

কান পাতল শাকিলা। মৃদু কিন্তু স্পষ্ট ধাতব আওয়াজ, যেন ঘষা খাচ্ছে। প্রথমে মনে হলো পরিত্যক্ত চিনিকল থেকে আসছে। তারপর ভুল ভাঙল। ভোঁতা আওয়াজটা আসছে বার্জের নিচের পানি থেকে। দ্রুত হাতে প্লাস্টিকের ব্যাগগুলো সরিয়ে বার্জের মেঝেতে কান ঠেকাল সে।

এবার ইস্পাতের পাত ভেদ করে মানুষের অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর উঠে এল। পরিষ্কার নয়, একটা শব্দও ধরা যাচ্ছে না, তবে সন্দেহ নেই মানুষেরই গলা-কান্না যেন কর্কশ সুরে ধমক দিচ্ছে, চিৎকার করছে। পড়িমরি করে ব্যাগগুলোর মাথায় চড়ল আবার শাকিলা। দেখল গার্ডরূম থেকে বেরোয়নি গার্ড, জানালার ভেতর

একই জায়গায় বসে টিভি দেখছে সে। বার্জের কিনারা থেকে নিচের দিকে উঁকি দিল শাকিলা।

পানিতে কোন আলোড়ন নেই। পানির গভীরে কোন আলোও দেখা যাচ্ছে না। 'লেফটেন্যান্ট টাফিন?' নরম গলায় ডাকল শাকিলা।

'লাইনে আছি।'

'ডক আর বার্জের মাঝখানে পানিতে কিছু দেখতে পাচ্ছেন?'

'এখান থেকে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। তবে আপনাকে দেখছি।'

নিজের অজান্তেই ঘাড় ফিরিয়ে বিলের ওপারে তাকাল শাকিলা। 'আমার নড়াচড়া ধরতে পারছেন আপনি?'

'চোখে নাইট-ভিশন স্কোপ থাকায়।'

'আমার বিশ্বাস বার্জের তলায় আরেকটা ভেসেল বা কমপার্টমেন্ট আছে,' রুদ্ধশ্বাসে বলল শাকিলা।

'লক্ষণগুলো জানান।'

'কীলের নিচে থেকে মানুষের গলা পাচ্ছি। এ থেকেই বোঝা যাচ্ছে হানের লোকেরা কিভাবে সানগারি থেকে অবৈধ অভিবাসীদের পাচার করছে এখানে। হানের জাহাজ সানগারিতে ভিড়লে কাস্টমস, ইমিগ্রেশন, কোস্ট গার্ড যতই সার্চ করুক, অভিবাসীদের একজনকেও দেখতে পায় না, কারণ জাহাজের তলায় নিশ্চয়ই আরেকটা ভেসেল বা কমপার্টমেন্ট থাকে। সেই ভেসেল বা কমপার্টমেন্ট যেভাবে হোক জাহাজের তলা থেকে সরিয়ে বার্জের তলায় আনা হয়।'

'গাঁজাখুরি গল্প হিসেবে চলে, কিন্তু বাস্তব গল্পের সঙ্গে কোনই মিল পাওয়া যাবে না।'

'আমি আমার ক্যারিয়ার বাজি ধরে বলছি...'

'জানতে পারি, এখন আপনি কি করতে চান?' জিজ্ঞেস করল টাফিন।

'চিনিকলে ঢুকে তল্লাশী চালাব,' বলল শাকিলা।

'উচিত হবে না। সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করুন, প্লীজ।'

'সকালে অনেক দেরি হয়ে যাবে। ততক্ষণে অভিবাসীদের ফ্রেট কারে তুলে অন্য কোথাও পাঠিয়ে দেয়া হবে। প্লীজ, ক্যাপটেন হিউমকে জানান, আমি কি করতে যাচ্ছি তা যেন পিট লুকাসকে জানানো হয়। উনি ওয়াশিংটনে আছেন। আইএনএস হেডকোয়ার্টারকেও যেন সতর্ক করা হয়। গুডনাইট, মি. টাফিন।'

টাফিন কিছু বলতে চাইল, কিন্তু যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিল শাকিলা।

বার্জ থেকে ডকে লাফ দিল শাকিলা, ডক থেকে নেমে এসে চেইন-লিঙ্ক বেড়ার দিকে ছুটছে। বুড়ো একটা ওক গাছের নিচে এসে থামল সে, হাঁপাতে হাঁপাতে চারদিকে চোখ বুলাচ্ছে। চিনিকলের সব ক'টা বিল্ডিং খালি মনে হলো। বন্ধ বা খোলা জানালা-দরজা দিয়ে কোন আলো বেরুচ্ছে না। কান পেতে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল শাকিলা, ঝিঁঝি পোকার ডাক ছাড়া আর কিছু শুনতে পেল না।

কমপ্লেক্সের মেইন বিল্ডিংটা তিনতলা উঁচু। মধ্যযুগীয় আর্কিটেকচার পছন্দ করত নির্মাতা। ছাদের কিনারা ঘেঁষে চওড়া প্রাচীর রাখা হয়েছে. সাধারণত প্রাচীন

দুর্গে যেমন দেখা যায়। চারকোণে চারটে টাওয়ার, ওগুলোয় সম্ভবত কোম্পানীর অফিস বসত। লাল মাটি দিয়ে তৈরি পাঁচিলের ইঁট ক্ষয়ে গেছে, শ্যাওলা জমেছে গায়ে, লতানো উদ্ভিদ ঢেকে রেখেছে বেশিরভাগ জানালা। বেড়া ঘেঁষে এগোল শাকিলা, ঝোপের আড়ালে থাকছে। অবশেষে রেললাইনটা দেখতে পেল, ভারী একটা তালা ঝোলানো গেটের ভেতর দিয়ে চলে গেছে, কালভার্ট হয়ে পৌঁছেছে প্রকাণ্ড এক কাঠের দরজায়, ওই দরজা দিয়ে মেইন ওয়্যারহাউসের বেসমেন্টে যাওয়া যায়। কাছেই পোলের মাথায় একটা বালব জ্বলছে, হাঁটু গেড়ে বসে তার আলোয় রেললাইনটা পরীক্ষা করল শাকিলা। ইস্পাতের লাইন চকচক করছে, কোথাও এতটুকু মরচে ধরেনি। এরপরও কি সন্দেহ থাকে হানের লোকেরা অবৈধ অভিবাসীদের এই রেলপথ দিয়ে পাচার করছে না?

ঝোপের ভেতর থেকে না বেরিয়ে বেড়া ধরে আবার এগোচ্ছে শাকিলা। ছোট একটা ড্রেনেজ পাইপ পড়ল সামনে, ডায়ামিটারে মাত্র দুই ফুট, বেড়ার তলা দিয়ে এগিয়ে গেছে, শেষ হয়েছে একটা ডোবায়, ডোবাটা পুরানো চিনিকলের সঙ্গে একই সমান্তরাল রেখায়। ভাল করে চারদিকে চোখ বুলাল শাকিলা। আশপাশে লোকজনের ছায়ামাত্র নেই। সন্দেহজনক কোন শব্দও হচ্ছে না। সাহস সঞ্চয় করে পাইপের ভেতর পা ঢোকাল সে। এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে পুরো শরীরটা ঢুকিয়ে ফেলল। পাইপের ভেতর যদি কোন প্রতিবন্ধকতা থাকে, ফিরে আসতে হবে ওকে, তখন সামনের দিকে ক্রল করতে পারবে।

গোটা কমপ্লেক্সে মাত্র একজন গার্ড, ব্যাপারটা শাকিলা মেনে নিতে পারছে না। আরও অনেক গার্ড নেই, আরও উজ্জ্বল আলো নেই, এর একটা কারণ হতে পারে এই যে হান চেয়েছে কমপ্লেক্সটা দেখে লোকে যাতে মনে করে এটা পরিত্যক্ত, এখানে কোন অপতৎপরতা চলছে না। তবে ইনফ্রারেড ভিডিও ক্যামেরা নেই, এটা বিশ্বাস করা কঠিন। কে জানে, ওর প্রতিটি নড়াচড়াই হয়তো ভিডিও স্ক্রীনে দেখা যাচ্ছে।

চওড়া কাঁধ নিয়ে কোন লোক এই পাইপের ভেতর দিয়ে যেতে পারবে না, দু'পাশের দেয়ালে শাকিলারই কাঁধ ঠেকে যাচ্ছে। দু'পায়ের সামনে অন্ধকার ছাড়া প্রথমে কিছুই দেখতে পেল না ও। তবে ধনুকের মত সামান্য একটু বাঁক ঘুরে আসতেই পানিতে চাঁদের আলো খেলা করতে দেখল। বেড়ার বাইরে থেকে যেটাকে ডোবা মনে হয়েছিল সেটা আসলে ডোবা নয়, কংক্রিটের একটা চৌবাচ্চা, তলায় কয়েক ইঞ্চি কাদা জমেছে। এটা তৈরি করা হয়েছে মেন ওয়্যারহাউসের চারধারে, বৃষ্টির পানি যাতে ছাদে বসানো পাইপ থেকে এখানে পড়ে।

চৌবাচ্চা থেকে উঠে স্থির হয়ে থাকল শাকিলা। সাইরেন বাজছে না, কুকুর ছুটে আসছে না, বা হঠাৎ সার্চলাইট জ্বলে উঠছে না। চিনিকলের উঠানে ওর উপস্থিতি কারও চোখে ধরা পড়েনি, এটা ধরে নিয়ে বিল্ডিংটাকে ঘিরে চক্কর দিতে শুরু করল ও, ভেতরে ঢোকার পথ খুঁজছে। শ্যাওলা ঢাকা একটা পাঁচিলে পিঠ ঠেকিয়ে দু'দিকে তাকাল, ভাবছে কোনদিকে গেলে চিনিকলটাকে ভালভাবে দেখার সুযোগ হবে। ঢালু হয়ে রেললাইনটা যেদিকে বেসমেন্টে ঢুকেছে সেদিকটা খোলা, পোলের আলোয় দৃশ্যটা পরিষ্কার, কাজেই উল্টোদিকে এগোল শাকিলা। এক ঝাঁক

সাইপ্রেস গাছ গাঢ় ছায়া তৈরি করেছে ওদিকে। সাবধানে পা ফেলে এগোচ্ছে ও, ছড়িয়ে থাকা আবর্জনায় যাতে পা বেধে না যায়।

এক সার নিচু ঝোপ বাধা হয়ে দাঁড়াল। হামাগুড়ি দিয়ে ভেতরে ঢুকল শাকিলা। সামনে হাত বাড়িয়ে হাতড়াচ্ছে, আঙুলে ঠেকল পাথরের একটা ধাপ। প্রথমে একটা, তারপর আরেকটা, নিচের দিকে নেমে গেছে। চোখ কুঁচকে অন্ধকারে কি আছে দেখার চেষ্টা করল। এক প্রস্থ সিঁড়িই, নেমে গেছে চিনিকলের বেসমেন্টে। ধাপগুলো জঞ্জাল আর আগাছায় ঢাকা, নামার সময় টপকাতে হচ্ছে। সিঁড়ির নিচে কাঠের দরজাটা পচে গেছে, যদিও ওক কাঠের তৈরি। কব্জাগুলোয় মরচে ধরেছে, জোরে একটা ধাক্কা দিতেই একটা কবাট কাত হয়ে পড়ল। সাবধানে ভেতরে ঢুকল শাকিলা।

ভেতরে একটা প্যাসেজ, দু'পাশে কংক্রিটের দেয়াল। প্রায় পঞ্চাশ ফুট দূরে শেষ প্রান্ত, আলোর আভা দেখা যাচ্ছে। ভাঙাচোরা পুরানো ফার্নিচার গাদা করে রাখা হয়েছে প্যাসেজের দেয়াল ঘেঁষে। ভ্যাপসা একটা গন্ধ ঢুকল নাকে। জঞ্জাল হিসেবে ফেলে রাখা ফার্নিচারগুলোয় পচন ধরেছে, ওগুলোকে টপকে এগোতে হচ্ছে ওকে। শেষ প্রান্তের দরজাটা ভারী, গায়ের জানালায় নোংরা কাঁচ লাগানো। জানালার ভেতর থেকে আলোর আভা বেরুচ্ছে। মরচে ধরা হাতটা ঘোরাল ও। মৃদু শব্দ করে খুলে গেল বোল্ট। এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে কবাট ফাঁক করল শাকিলা। সাবলীল ভঙ্গিতে কবাট খুলে যাচ্ছে, কোন রকম ক্যাঁচ-কোঁচ শব্দ নেই, যেন গতকালও তেল দেয়া হয়েছে কব্জায়।

বিপদ হবে ধরে নিয়েই ভেতরে পা রাখল শাকিলা। চারদিকে ওক কাঠের ভারী ফার্নিচার দেখতে পাচ্ছে ও। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। কামরাটা অসম্ভব পরিচ্ছন্ন। কোথাও এতটুকু ধুলো জমেনি বা মাকড়সার জাল নেই। শাকিলা যেন একটা টাইম ক্যাপসুলে ঢুকে পড়েছে।

এটা একটা ফাঁদও বটে।

পিছনে ওক কাঠের ভারী দরজাটা সশব্দে বন্ধ হয়ে যেতে শাকিলার মনে হলো কেউ যেন ওর পেটে ঘুসি মারল। ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকানো হলো না, তার আগেই সামনের পর্দা সরিয়ে তিনজন লোককে কামরায় বেরিয়ে আসতে দেখল ও। পর্দার ওপারে একটা সিটিং রুমের চেহারা দেখা গেল। তিনজনই বিজনেস সুট পরে আছে। দু'জনের হাতে একটা করে ব্রীফকেস। ওরা যেন বোর্ড-অব-ডাইরেক্টরদের মীটিং ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে।

বুকের মাঝখানে লুকানো ট্র্যান্সমিটার চালু করতে পারল না শাকিলা, তার আগেই পিছন থেকে ওর হাত দুটো ধরে ফেলা হলো, সেই সঙ্গে মুখ চেপে ধরল একটা হাত।

'তুমি খুব জেদি মেয়ে, দীপালি। নাকি শাকিলা বলে ডাকব?' হাসছে চুয়াং চু, হুয়ান হানের চীফ এনফোর্সার। 'তোমাকে আবার পেয়ে আমি যে কত খুশি, সে তুমি কল্পনাও করতে পারবে না।'

বিলের ওপর দিয়ে চিনিকলের দিকে তাকিয়ে আছে লেফটেন্যান্ট টাফিন।

ট্র্যান্সমিটারের রিসিভার কানে চেপে রেখেছে সে, মাইক্রোফোনটা মুখের সামনে। শাকিলার সাড়া পাবার জন্যে বারবার ডাকছে সে। কিন্তু শাকিলা যোগাযোগ কেটে দিয়েছে।

বাধ্য হয়ে কোস্ট গার্ড কাটার মার্ভেলের সঙ্গে যোগাযোগ করল টাফিন। 'মার্ভেল, আমি লেফটেন্যান্ট টাফিন।'

'হ্যাঁ, কি খবর, টাফিন?' জানতে চাইলেন ক্যাপটেন হিউম।

'পরিস্থিতি খুব খারাপ, স্যার।'

'ব্যাখ্যা করো।'

'মিস শাকিলার সঙ্গে আমরা যোগাযোগ করতে পারছি না।'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর ক্যাপটেন হিউম বললেন, 'পজিশন ছেড়ে নড়বে না। সুগার মিলের ওপর নজর রাখো। নতুন কোন তথ্য পেলে সঙ্গে সঙ্গে জানাবে।'

বিলের ওপর দিয়ে নিস্তব্ধ ও অন্ধকার চিনিকলের দিকে তাকিয়ে থাকল টাফিন। 'বিপদে পড়লে ঈশ্বর আপনাকে সাহায্য করবেন,' লঞ্চের রেলিং ধরে বিড়বিড় করল সে, 'কারণ আমি আপনার কোন সাহায্যে আসব না।'

কোন কাজ অসমাপ্ত রাখা স্বভাব নয়, মিস্টিক খালে হুয়ান হানের সিকিউরিটি কমান্ড পোস্ট ধ্বংস করে দিয়ে রানা ও মুরল্যান্ড পানির তলার ফটো তোলার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল; ভাবটা যেন, কিছুই ঘটেনি।

অ্যাটচাফালেয়া নদী হয়ে ভ্যান্স বিলে, শ্যান্টিবোটে ফিরে এল ওরা; ঠিক যখন পুবের কালো আকাশ ফর্সা ও নীলচে হতে শুরু করেছে। অবস্থাটা বোঝার জন্যে যতক্ষণ প্রয়োজন খুলেই চোখ দুটো আবার বন্ধ করে ফেলল লন্ডন, সঙ্গে সঙ্গে কুকুরদের স্বপ্নরাজ্যে ফিরে গেল।

নৌকো থেকে ইকুইপমেন্ট নামিয়ে বাক্সে ভরল ওরা, নৌকোটা তুলে রাখল শ্যান্টিবোটের ছাদে। এঞ্জিন স্টার্ট দিল মুরল্যান্ড, দড়ি-দড়া খুলে বোটের তলার কাদা থেকে গোঁজ সরাল রানা। দিগন্তে তখনও উঁকি দেয়নি সূর্য, অ্যাটচাফালেয়ায় বেরিয়ে এল বোট, ছুটছে ভাটির দিকে।

'এবার কোথায়?' পাইলটহাউস থেকে চিৎকার করছে মুরল্যান্ড।

'ডাফ মোরাল,' এঞ্জিনের গর্জনকে ছাপিয়ে উঠল রানার গলা।

এত ভোরেও নদীতে অনেক বোট দেখা গেল, জেলেরা যার যার প্রিয় ফিশিংগ্রাউন্ডে মাছ ধরতে যাচ্ছে। বার্জ ট্রেন ঠেলে নিয়ে চলেছে টোবোটগুলো। খানিক পর নদী আবার ফাঁকা হয়ে যেতে শ্যান্টিবোটের গতি বাড়িয়ে দিল মুরল্যান্ড।

বোটের কামরায় সোফার ওপর বসেছে রানা, এইউভি-র ক্যামেরায় তোলা খালের তলার ছবি দেখছে ভিডিওতে। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একঘেয়ে দৃশ্যগুলো দেখতে ছয় ঘণ্টা পেরিয়ে গেল। অল্পবিস্তর মাছ ছাড়া খালের তলায় দেখার মত তেমন কিছু নেই। লাশ না পাওয়ায় মনে মনে স্বস্তিবোধ করল রানা।

বেলা এগারোটার দিকে ব্রেকফাস্ট তৈরি করে পাইলটহাউসে উঠে এল ও,

মুরল্যান্ডকে খেতে দিয়ে হাত রাখল হেলমে। মরগান সিটির কয়েক মাইল সামনে শ্যান্টিবোট ঘুরিয়ে বারউইক বেতে চলে এল, দক্ষিণ দিকে যাচ্ছে, জেলেদের শহর প্যাটারসনের ঠিক সামনে বাইয়ু টেচি-তে ঢুকল, ডাফ মোরাল সুগার মিল এখান থেকে আর মাত্র দু'মাইল দূরে। এরপর হুইলটা মুরল্যান্ডকে ফিরিয়ে দিয়ে নিচে নেমে এসে বারান্দায় লন চেয়ারে বসল রানা, পাশে কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে লভন।

দুপুরের ঠিক আগে বাঁক ঘোরার পর দৃষ্টিসীমার ভেতর প্রাচীন চিনিকলটা চলে আসতেই শ্যান্টিবোটের স্পীড কমিয়ে আনল মুরল্যান্ড। মাত্র এক মাইল দূরে ওটা, চোখে বিনকিউলার লাগিয়ে তাকিয়ে আছে রানা, বিল্ডিং আর ডকটা দেখছে। ঠোঁটের কোণ টান টান হলো আবর্জনা ভর্তি বার্জটাকে দেখে। বারান্দার রেলিঙের ওপর ঝুঁকে ওপর দিকে তাকাল ও, চিৎকার করে মুরল্যান্ডকে বলল, 'এটাই বোধহয় ডাফ মোরাল সুগার মিল। ডকের ওই বার্জটাকে সম্ভবত সানগারিতে দেখেছিলাম আমরা।'

হেলমের পাশের দেরাজ থেকে একটা টেলিস্কোপ বের করে চোখে তুলল মুরল্যান্ড। সে-ও ডক আর বিল্ডিংগুলো দেখছে। 'বার্জ এখনও খালাস করা হয়নি। কেন?'

'বিল্ডিংগুলোর অবস্থা শোচনীয়, কিন্তু ডকটাকে দেখে মনে হচ্ছে মাত্র এক কি দু'বছরের পুরানো। গেটের পাশের গার্ডরুমে কাউকে দেখতে পাচ্ছ?'

'পাচ্ছি। একজন গার্ড। টিভি দেখছে।'

'লক্ষণ দেখে কি মনে হচ্ছে ফাঁদে বা অ্যামবুশে পড়তে যাচ্ছি?'

'সত্যি কথা বলতে কি, কোন গোরস্থানও এরকম নিষ্প্রাণ দেখিনি,' হালকা সুরে বলল মুরল্যান্ড। 'খালে আমরা যে কৃতিত্ব দেখিয়েছি, সে খবর এখনও এখানে পৌঁছায়নি।'

'পানিতে নেমে বার্জের তলাটা পরীক্ষা করব আমি,' বলল রানা। 'প্ল্যানটেশনে ডাইভ গিয়ার খুইয়েছি, কাজেই তোমারটা নিতে হবে। স্পীড আরও কমাও, যেন এঞ্জিনে সমস্যা দেখা দিয়েছে। আমি পানিতে নেমে যাবার পর ডকে রশি বাঁধবে, তারপর গার্ডের সঙ্গে বোঝাপড়া করবে।'

ওয়েট সুট পরে পানিতে নেমে পড়ল রানা। ডকে শ্যান্টিবোট ভিড়াল মুরল্যান্ড। ক্যাটওয়াকে মই ফেলল সে, ডকে নেমে এসে মরচে ধরা বোলার্ড-এর রশি বাঁধল।

গার্ডরুম থেকে বেরিয়ে এসে গেটের তালা খুলল গার্ড, দ্রুত পা চালিয়ে শ্যান্টিবোটের দিকে হেঁটে আসছে। লভনকে দেখে আড়ষ্ট হয়ে গেল সে, যদিও তাকে দেখে লভনকে খুশি মনে হলো। গার্ড লোকটা চীনা, তবে ইংরেজিতে ভাল। মুরল্যান্ডের চেয়ে চার ইঞ্চি লম্বা, শরীরটা পাটখড়ি বললেই হয়। মাথায় বেসবল ক্যাপ, চোখে পাইলট'স সানগ্লাস। 'আপনি চলে যান। এটা ব্যক্তিগত ডক। বোট ভেড়াবার অনুমতি নেই মালিকের।'

'আমি নিরুপায়,' প্রায় গুঙিয়ে উঠল মুরল্যান্ড। 'এঞ্জিন আমার সঙ্গে বেঈমানী করে বসেছে। স্রেফ বিশ মিনিট সময় দাও, দেখি এঞ্জিন শালাকে লাইনে আনতে

পারি কিনা।'

গার্ড যেন মুরল্যান্ডের কথা শুনতে পায়নি। বোলার্ডে বাঁধা রশি খুলছে সে। 'আপনি এখুনি চলে যাবেন।'

এগিয়ে এসে লোকটার কজি চেপে ধরল মুরল্যান্ড। 'আমি হুয়ান হানের একজন ইন্সপেক্টর। তোমার এই অভদ্র আচরণ সম্পর্কে রিপোর্ট করলে চাকরি নট হয়ে যাবে, বুঝলে?'

মুরল্যান্ডের দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাল গার্ড। 'হুয়ান হান? হুয়ান হান আবার কোন উজবুক? আমি বাটারফ্লাই ফ্রেইট করপোরেশনে চাকরি করি।'

এবার মুরল্যান্ডের চোখে অদ্ভুত দৃষ্টি ফুটল। নিজের অজান্তেই আড়চোখে পানিতে তাকাল সে, শেষবার যেখানে রানার এয়ার ট্যাঙ্কের বুদ্বুদ দেখেছে। ভাবছে, ওরা কি বড় কোন ভুল করে বসেছে? 'চাকরি করো, কাজটা কি? কাক তাড়াও?'

কজিটা ছাড়াতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো গার্ড। মুরল্যান্ড পাগল কিনা ভাবছে সে। ভাবছে হোলস্টার থেকে রিভলবারটা বের করবে কিনা। 'দেশের সবখানে অফিস আছে বাটারফ্লাই-এর, ফার্নিচার রাখার জন্যে পুরানো বিল্ডিং ভাড়া করা হয়। পালা করে কয়েকজন ডিউটি দিই আমরা, কিছু যাতে চুরি না যায়।'

গার্ডের হাতটা ছেড়ে দিলেও মুরল্যান্ড হঠাৎ উপলব্ধি করল, পরিত্যক্ত সুগার মিলে গোপন কোন তৎপরতা চলছে। 'দেখো, ভাই, এঞ্জিনটা নিয়ে সত্যি খুব বিপদে পড়ে গেছি। এক বোতল ব্ল্যাক লেবেল জ্যাক ড্যানিয়েল হুইস্কি দিলে কিছুক্ষণ থাকতে দিতে পারো না?'

'সম্ভব নয়,' কজিটা ডলতে ডলতে বলল গার্ড।

'প্লীজ, ভাই, একটু নরম হও,' বলল মুরল্যান্ড। 'এঞ্জিন মেরামত করার সময় বোট যদি নদীতে ভেসে যায়, টোবোটের ধাক্কা খেয়ে ডুবে যাবে...'

'সেটা আপনার সমস্যা, আমার নয়।'

'দু'বোতল হুইস্কি?'

গার্ডের চোখ দুটো চকচক করে উঠল। 'না। চার বোতল।'

হাত লম্বা করল মুরল্যান্ড। 'রাজি।' ইঙ্গিতে শ্যান্টিবোটের দরজাটা দেখাল গার্ডকে। 'ভেতরে এসো, বোতলগুলো একটা ব্যাগে ভরে দিই।'

লন্ডনের দিকে চোখ কুঁচকে তাকাল গার্ড। 'কামড়ায় না তো?'

'শুধু যদি চোয়ালে পা দিয়ে মুখে হাত ঢোকাও।'

লন্ডনকে এড়িয়ে শ্যান্টিবোটের মেইন কেবিনে ঢুকল গার্ড, লোভের কাছে পরাস্ত। মেইন কেবিনে ঢুকে ভেতরটা ভাল করে দেখার সুযোগও হলো না, চার ঘণ্টা পর জ্ঞান ফিরে পেয়ে মনে করতে পারবে না কি ঘটেছিল। তার ঘাড়ের পিছনে জুডোর একটা চপ মারল মুরল্যান্ড, ডেকের ওপর সশব্দে আছাড় খেলো লোকটা।

দশ মিনিট পর শ্যান্টিবোটের বারান্দায় বেরিয়ে এল গার্ড, অন্তত ইউনিফর্ম দেখে তাই মনে হবে। গার্ডের প্যান্ট আর শার্ট লম্বায় কয়েক ইঞ্চি বড় হয়েছে মুরল্যান্ডের গায়ে, তবে চওড়ায় খুব বেশি আঁটসাঁট। গার্ডের সানগ্লাসও পরেছে

সে, বেসবল ক্যাপটা সানগ্লাসের ওপর নামানো। ডক থেকে নেমে গেটের দিকে এগোল সে, ভেতরে ঢুকে তালা লাগাবার ভান করল, তারপর গার্ডরুমে ঢুকে বসে পড়ল টেলিভিশনের সামনে। টিভির সামনে বসে থাকলেও, আড়চোখে চিনিকলের চারদিকে চোখ বুলিয়ে কমপাউন্ডের চারধারে লুকিয়ে রাখা সিকিউরিটি ক্যামেরাগুলো এক এক করে আবিষ্কার করছে।

প্রথমে পানির একেবারে তলায় নেমে এল রানা, তারপর বার্জ লক্ষ্য করে ওপরে উঠতে শুরু করল। ডক প্ল্যাটফর্মের নিচে পানির গভীরতা ত্রিশ ফুট, লক্ষ করে বিস্মিত হলো ও। বার্জ ট্র্যাফিকের জন্যে যতটুকু প্রয়োজন তারচেয়ে এই গভীরতা অনেক বেশি। এর মানে হলো গভীর খোল বিশিষ্ট জাহাজ ভেড়াবার জন্যে ডক প্ল্যাটফর্মের নিচে ড্রেজিং করা হয়েছে।

বার্জের ছায়া সারফেসের আলো পঞ্চাশ ভাগই ঠেকিয়ে রেখেছে। পানি এখানে সবুজাভ, জলজ শ্যাওলা জাতীয় আবর্জনায় ভর্তি। দ্রুত সাঁতার কাটছে রানা, বার্জের তলায় পৌঁছুবার আগেই গাঢ় ছায়ার ভেতর অস্পষ্ট একটা আকৃতি দেখতে পেয়ে স্থির হয়ে গেল।

বার্জের কীল থেকে ঝুলে রয়েছে বিশাল এক টিউব, দুই প্রান্ত ক্রমশ সরু। দেখামাত্র জিনিসটা চিনে ফেলল রানা, উত্তেজনায় বেড়ে গেল হার্টবিট। টিউবটার আকার ও আকৃতি প্রথম যুগের সাবমেরিনের সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে। ওটার সামান্য ওপর দিয়ে বার্জের খোল ঘেঁষে এগোল ও। টিউবে কোন দৃশ্যমান পোর্ট নেই, বার্জের সঙ্গে একটা রেল সিস্টেমের সাহায্যে সংযুক্ত। এই রেল সিস্টেম, রানা ধারণা করল, জলমগ্ন কন্টেইনারটিকে সমুদ্রগামী জাহাজ থেকে বার্জে, বার্জ থেকে জাহাজে স্থানান্তরের কাজে ব্যবহার করা হয়।

আন্ডারওয়াটার টিউবের দৈর্ঘ্য আন্দাজ করল রানা নব্বুই ফুট। ডায়ামিটারে পনেরো ফুট। দশ ফুট উঁচু। ভেতরে উঁকি দেয়ার কোন উপায় নেই, তবে বোঝা যায় দুই থেকে চারশো লোকের জায়গা হবে, নির্ভর করে মাথা পিছু কতটুকু জায়গা বরাদ্দ করা হবে তার ওপর।

ভেসেলটাকে ঘুরে আরেক প্রান্তে চলে এল রানা, একটা হ্যাচ খুঁজছে। হ্যাচ একটা থাকারই কথা, ভেসেলের আন্ডারওয়াটার প্যাসেজকে ডক প্ল্যাটফর্মকে ধরে রাখা ব্রেকওয়াটার বা বাঁধ-এর সঙ্গে সংযুক্ত করেছে। বো থেকে ত্রিশ ফুট পিছনে পাওয়া গেল সেটা। ছোট একটা ওয়াটারটাইট টানেল, এত সরু যে প্রতিবার দু'জন লোক যেতে পারবে। কিন্তু টানেলে ঢোকার কোন পথ দেখা গেল না, অন্তত পানি থেকে ঢোকার কোন উপায় রাখা হয়নি। হাল ছেড়ে দিয়ে শ্যান্টিবোটে ফিরে আসতে চাইছে রানা, এই সময় পাথুরে ব্রেকওয়াটারের গায়ে পর্টল বা খুদে একটা গেট দেখতে পেল। পর্টলটা পানির সারফেসের ওপরে, তবে ডক প্ল্যাটফর্মের নিচে। লোহার একটা দরজা দিয়ে বন্ধ করা ওটা, তিনটে ডগ লিভারের সাহায্যে সুরক্ষিত। এটা কি কাজে ব্যবহার করা হয় বুঝতে পারছে না রানা। ড্রেনেজ পাইপ? মেইনটেন্যান্স টানেল? লোহার দরজায় প্রস্তুতকারকের নাম খোদাই করা রয়েছে, রহস্যের সমাধান এনে দিল।

'ডানকান শুট কোম্পানী কর্তৃক প্রস্তুত
নিউ অর্লিয়ান্স, লুইযিয়ানা'।

এই শুট ব্যবহার করা হত সুগার মিল যখন চালু ছিল, মিলের কাঁচামাল বার্জে লোড করার জন্যে। পুরানো ডক ভেঙে ফেলে তার বদলে আরও পাঁচ ফুট ওপরে নতুন একটা তৈরি করা হয়েছে পানির তলা দিয়ে অবৈধ অভিবাসীদের গোপনে বার্জ থেকে সরাবার উদ্দেশ্যে।

ডগ লিভারগুলোয় মরচে ধরলেও খুলতে তেমন বেগ পেতে হলো না। লিভার খোলার পর ভারী লোহার দরজাটাও ধীরে ধীরে খুলল রানা। ভেতরে তাকিয়ে অন্ধকারে কিছুই দেখা গেল না। সরে এল রানা, সাঁতার কেটে শ্যান্টিবোটের খোলের পাশে চলে এল। 'ববি, আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?' নিচু গলায় ডাকল।

মুরল্যান্ড নয়, সাড়া দিল লন্ডন। কৌতূহলী কুকুরটা ডক প্ল্যাটফর্মে কিছুক্ষণ পায়চারি করল, তারপর প্ল্যাঙ্কিং-এর ফাঁক-ফোকরে নাক ঠেকিয়ে গন্ধ শুঁকছে, রানার মাথার ঠিক ওপরে। 'আরে ব্যাটা তোকে নয়, আমার ববিকে দরকার।'

হাউন্ড লেজ নাড়তে শুরু করল। সামনের পা দুটো লম্বা করে দিয়ে ডকে শুলো সে, খেলাচ্ছলে পা দিয়ে কাঠের তক্তায় গর্ত তৈরির চেষ্টা করছে।

গার্ডরুমের ভেতর থেকে দু'এক মিনিট পরপর শ্যান্টিবোটের ওপর চোখ বুলাচ্ছে মুরল্যান্ড, রানা ফিরে এল কিনা দেখার আশায়। ডকের গায়ে লন্ডন পা আঁচড়াচ্ছে দেখে কৌতূহল জাগল মনে। গেট পেরিয়ে শান্তভাবে হেঁটে এল সে, থামল লন্ডনের পাশে। 'এই, কি শুঁকছিস?'

'আমাকে,' তক্তার ফাঁক দিয়ে বলল রানা।

'গড!' বিড়বিড় করল মুরল্যান্ড। 'হঠাৎ মনে হলো লন্ডন কথা বলতে পারে।'

তক্তার ফাঁক দিয়ে ওপর দিকে তাকিয়ে আছে রানা। 'ইউনিফর্ম পেলে কোত্থেকে?'

'গার্ড সিদ্ধান্ত নিল কিছুক্ষণ ঘুমাবে,' বলল মুরল্যান্ড। 'বিবেকবান মানুষ আমি, তার বদলে পাহারা দিচ্ছি।'

'ভালভাবে দেখতে পাচ্ছি না, তবে বুঝতে পারছি একদমই ফিট করেনি।'

'জেনে হয়তো খুশি হবে,' সুগার মিলের দিকে পিছন ফিরে কথা বলছে মুরল্যান্ড, দু'দিন না কামানো দাড়ি চুলকাবার ভান করে ঠোঁটের নড়াচড়া আড়াল করে রাখছে,' এই জায়গার মালিক বাটারফ্লাই ফ্রেইট করপোরেশন, হুয়ান হান ম্যারিটাইম নয়। গার্ড লোকটা চীনা হলেও, সে সানফ্রান্সিকো অথবা লস এঞ্জেলসের কোন স্কুলে লেখাপড়া করেছে।'

'বাটারফ্লাই হানেরই একটা করপরেট ফ্রন্ট, এখানে লোক আনা-নেয়ার কাজে ব্যবহার করে। শোনো—বার্জের তলার সঙ্গে জোড়া লাগানো সাবমার্জড ভেসেল আছে, চারশো লোকের জায়গা হবে।'

'তারমানে অবৈধ অভিবাসীদের সন্ধান পেয়ে গেছ!' মুরল্যান্ড উৎফুল্ল।

'সেটা জানতে পারব ভেতরে ঢোকার পর,' বলল রানা।

'কিভাবে?' জিজ্ঞেস করল মুরল্যান্ড।

'আমি একটা শুট পেয়েছি, বার্জে চিনি লোড করার কাজে ব্যবহার করা হত।

দেখে মনে হলো মেইন বিল্ডিঙের দিকে চলে গেছে ওটা।'

'যা কিছু করবে সাবধানে আর দ্রুত। আমার ওপর যারা চোখ রেখেছে তাদেরকে কতক্ষণ বোকা বানিয়ে রাখতে পারব জানি না।'

'ক্যামেরায় ওরা তোমাকে দেখতে পাচ্ছে?'

'তিনটে ক্যামেরা দেখেছি। ক'টা এখনও দেখিনি কে জানে।'

'আমার কোল্টটা বোটের কিনারা দিয়ে নিচে নামাতে পারবে? খালি হাতে শুটে ঢুকতে চাই না।'

'নামাচ্ছি।'

'লন্ডনের মত বা তার চেয়েও ভাল তুমি, ববি। তোমার সম্পর্কে কে কি বলল সে-ব্যাপারে আমি কোন গুরুত্ব দিই না।' নিঃশব্দে হাসছে রানা।

'ঠিক আছে, গুলির আওয়াজ শুনলে লন্ডনকেই পাঠাব, আমি যাব না,' বলে শ্যান্টিবোটের দিকে চলে গেল মুরল্যান্ড।

শ্যান্টিবোটে ঢুকে রানার কোল্ট অটোমেটিকটা দেরাজ থেকে বের করল সে, একটা সুতোয় বেঁধে জানালা দিয়ে নিচে নামাচ্ছে। জানালাটা ডকের উল্টোদিকে। লাইনে হঠাৎ টান পড়ল, সেই সঙ্গে অটোমেটিকটা অদৃশ্য হয়ে গেল। এরপর ধীরে ধীরে গার্ডরুমে ফিরে এল মুরল্যান্ড। অচেতন গার্ডের কাছ থেকে পাওয়া ওয়েসন ফায়ারআর্মস .৩৫৭ ম্যাগনাম রিভলবারটা হোলস্টার থেকে বের করে হাতে রাখল সে, কিছু ঘটার অপেক্ষায় বসে আছে।

ছয়

এয়ার ট্যাঙ্ক ও ওয়েট বেল্ট সহ বাকি সব ডাইভ গিয়ার শ্যান্টিবোটের তলায় ফেলে দিল রানা। পরনে শুধু ওয়েট সুট থাকল, কোল্টটা শুকনো রাখার জন্যে মাথার ওপর তুলে ডক প্ল্যাটফর্মের নিচে চলে এল, ঢুকে পড়ল শুট পর্টল-এর ভেতরে। ভেতরে জায়গা খুব কম, প্রতিবার কয়েক ইঞ্চি করে এগোতে হচ্ছে। বুকের ওপর দিকে, ওয়েট সুটের কলারে গুঁজে রেখেছে কোল্টটা। শুটের যত ভেতরে ঢুকছে আলো তত কমে যাচ্ছে, শরীরটাও আলোর জন্যে একটা পাঁচিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে সামনে কোন বাধা থাকলে এখনও দেখতে পাবে। ভয় লাগছে বিষাক্ত কোন সাপের সামনে না পড়ে যায়। এই অল্প পরিসরে কোল্ট দিয়ে মাথায় বাড়ি মেরে, নয়তো গুলি করে মারতে হবে ওটাকে। হয় সাপের কামড় খেয়ে মরো, তা না হলে সিকিউরিটি গার্ডকে নিজের উপস্থিতি জানিয়ে দাও।

তারপর আরও একটা ভয় ঢুকল মনে। কি হবে যদি দেখে শেষ মাথায় আরেকটা লোহার দরজা আছে, শুধু ভেতর থেকে খোলা যায়? সম্ভাবনাটা উড়িয়ে দেয়া যায় না। তবু ঝুঁকি নিয়ে শেষ মাথা পর্যন্ত যেতে হবে ওকে।

শুটটা এরপর ঢালু হয়ে ওপর দিকে উঠে গেছে। উঠতে কষ্ট হচ্ছে, হাঁপিয়ে যাচ্ছে রানা। শুটের অমসৃণ গায়ে ঘষা খেয়ে আঙুলের ডগার ছাল উঠে যাচ্ছে, জ্বালা করছে হু-হু করে। ধীরে ধীরে চওড়া হতে শুরু করল শুট। তারপর অকস্মাৎ খাড়া একটা শ্যাফট দেখতে পেল রানা, নিচ থেকে ওপরে উঠে গেছে। শ্যাফটের

ওপরের ঠোঁট মাত্র চার ফুট দূরে। আঁচড়াআঁচড়ি করে সিধে হচ্ছে রানা, হাতে কোল্ট।

ওপর দিক থেকে মানুষের গলা ভেসে আসছে। ভাষাটা ইংরেজি নয়। মানুষের ঘামের গন্ধ এত তীব্র, বমি পেল রানার। ধীরে ধীরে মাথা তুলে শাফটের কিনারা দিয়ে বাইরে তাকাল ও। ওর বারো ফুট নিচে বড় একটা চেম্বার দেখা গেল, সিলিঙের স্কাইলাইট থেকে ম্লান আলো আসছে। চেম্বারের দেয়ালগুলো থেকে মুখ ব্যাদান করে আছে ভাঙাচোরা ইঁট, মেঝেটা কংক্রিটের।

চেম্বারে গাদাগাদি করে বসে ও দাঁড়িয়ে আছে তিনশো বা তারও বেশি নারী-পুরুষ, কয়েকটা বাচ্চা ছেলেমেয়ে আর মায়ের কোলে দু'একটা শিশুকেও দেখা যাচ্ছে। চেম্বারটা বড় হলেও, এত লোকের জন্যে খুবই ছোট, নড়াচড়ার জায়গা বলতে কিছুই অবশিষ্ট নেই। যার দিকেই তাকাল রানা, বিভিন্ন মাত্রায় অসুস্থ মনে হলো—বেশিরভাগই ক্লান্তি ও অপুষ্টির শিকার। চীনাদের সংখ্যা খুবই কম, চেহারাই বলে দেয় প্রায় সবাই এরা বাংলাদেশী। স্বদেশী এতগুলো লোককে এরকম করুণ দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় দেখে রানার মনে কোন রকম ভাবাবেগের উদয় হলো না। একটু বরং রাগই হলো। বর্তমান দুনিয়ার সর্বত্র অপরাধীরা প্রতারণার জাল বিছিয়ে রেখেছে, জেনেশুনে বেআইনী পথে বিদেশে পাড়ি জমাবার জন্যে পাঁচ লাখ দশ লাখ টাকা খরচ করাটা কি কোন সুস্থ আর বুদ্ধিমান মানুষের কাজ? মানুষ পাচারে অভিজ্ঞ আন্তর্জাতিক অপরাধী চক্রের বিরুদ্ধে দেশের কাগজে এত লেখালেখি হচ্ছে, তারপরও এরা তাদের ফাঁদে পা দেয় কিভাবে? দেশের অবস্থা যত খারাপই হোক, পাঁচ-সাত লাখ টাকা পুঁজি খাটালে সৎভাবে বেঁচে থাকার উপায় হয় না, এতটা খারাপ নিশ্চয়ই নয়।

নিজেকে মৃদু তিরস্কার করল রানা। বিপদে পড়া মানুষের সমালোচনা করা অন্তত এই মুহূর্তে উচিত নয় ওর। তাছাড়া, গোটা পরিস্থিতিটা নিজের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখছে ও, সেটা একতরফা। নিশ্চয়ই ওদেরও আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি আছে, তাতে হয়তো যুক্তিরও কোন অভাব নেই।

নিচের চেম্বারে কোন গার্ড দেখছে না রানা। কামরাটা এক সময় সুগার প্রসেসিং রূম ছিল। একটা মাত্র প্রবেশপথ, বন্ধ একটা কাঠের দরজা।

রানা তাকিয়ে আছে, দরজা খুলে চেম্বারে ঢুকল একজন গার্ড, পরনে ইউনিফর্ম। এক লোকের ঘাড় ধরে ছিল সে, ভেতরে ঢুকে ভিড়ের মধ্যে ঠেলে দিল তাকে। এক তরুণীকে দেখল রানা, ধারণা করল লোকটার স্ত্রী, প্যাসেজে দাঁড়িয়ে আছে, হাত দুটো পিছমোড়া করে ধরে রেখেছে আরেকজন গার্ড। প্রথম গার্ড লোকটাকে ঠেলে দিয়েই দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল প্যাসেজে, পরমুহূর্তে দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল দরজাটা। ভিড় থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটে এল লোকটা, দরজার গায়ে দমাদম ঘুসি মারছে। তার কাতর চিৎকার শুনতে পাচ্ছে রানা। 'ছেড়ে দাও! আমার স্ত্রীকে ছেড়ে দাও!'

কোন রকম দ্বিধায় না ভুগে বা ব্যক্তিগত ঝুঁকির কথা চিন্তা না করে শ্যাফটের মুখ থেকে নিচের মেঝেতে লাফ দিল রানা, দুই তরুণীর মাঝখানে পা দিয়ে পড়ল। দু'জনই কাত হলো স্থির হয়ে থাকা নিবিড় ভিড়ের গায়ে, একটা ঢেউ উঠল

চারদিকে। মেয়ে দুটো বিহ্বল কৌতূহলে তাকিয়ে আছে ওর দিকে, কথা বলছে না। ওর আকস্মিক আবির্ভাবে কারও মধ্যেই তেমন কোন প্রতিক্রিয়া নেই।

ক্ষমা প্রার্থনার ঝামেলার মধ্যে গেল না রানা। ভিড় ঠেলে দ্রুত দরজার দিকে এগোল। স্ত্রীকে চোখের আড়ালে হারিয়ে ফোঁপাচ্ছে সেই লোকটা, তাকে নরম হাতে ঠেলে সরিয়ে দিল একপাশে, তারপর কোল্টের বাঁট দিয়ে টোকা মারল দরজার গায়ে। টোকার এই ধরন প্রায় সবারই পরিচিত–প্রথম টোকার পর দুই সেকেন্ডের বিরতি, তারপর পরপর চারবার, আবার দুই সেকেন্ডের বিরতি নিয়ে পরপর দু'বার-ঠক ঠক-ঠক-ঠক-ঠক ঠক-ঠক। সাধারণত প্রতিপক্ষের মধ্যে বন্ধু বা শুভাকাঙ্ক্ষী কেউ থাকলে এভাবেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

দ্বিতীয়বার চেষ্টা করার পর রানার উদ্দেশ্য সফল হলো। এলোপাতাড়ি ঘুসির বদলে দরজায় ছন্দবদ্ধ টোকা পড়ায় গার্ডদের মনে কৌতূহল জেগেছে।

তালা খোলার আওয়াজ হলো। দড়াম করে ফাঁক হলো কবাট। রানা দাঁড়িয়ে ছিল কবাটের ঠিক পিছনে। একজন গার্ড ঝড় তুলে ফিরে এল চেম্বারে, স্বামী বেচারার শার্টের কলার ধরে ফলবান বৃক্ষের মত ঝাঁকাচ্ছে। দ্বিতীয় গার্ড এখনও প্যাসেজে দাঁড়িয়ে, তরুণীর হাত এত কষে পিছমোড়া করে ধরে আছে, ব্যথায় নীল হয়ে গেছে চেহারা। প্যাসেজ থেকে সে-ই কথা বলল, 'বেজন্মা কুত্তাকে শেষবার জানিয়ে দে, আরও বিশ হাজার ডলার না দিলে বউ ফিরে পাবার কোন আশা নেই।'

কবাটের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে প্রথম গার্ডের খুলিতে কোল্টের বাড়ি মারল রানা, সঙ্গে সঙ্গে খুলি ফেটে গেল লোকটার, জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল মেঝেতে। চেম্বারের দিকে পিছন ফিরে দ্বিতীয় গার্ডের দিকে তাকাল রানা, দাঁড়িয়ে আছে দোরগোড়ায়, হাতের অটোমেটিক দ্বিতীয় গার্ডের মাথায় তাক করা। 'ছেড়ে দাও ওঁকে,' কঠিন সুরে নির্দেশ দিল ও।

সঙ্গীকে লুটিয়ে পড়তে দেখে আগেই হাঁ হয়ে গিয়েছিল দ্বিতীয় গার্ড, কালো ওয়েট সুট পরা সশস্ত্র রানাকে দেখে একেবারে স্থির পাথর হয়ে গেল। 'কে...কে তুমি?' কোন রকমে বিড়বিড় করল সে।

'তোমাদের বন্দীরা আমাকে ভাড়া করেছে তাদের এজেন্ট হিসেবে,' বলল রানা, ঠোঁটে এক চিলতে নিষ্ঠুর হাসি। 'ভদ্রমহিলাকে ছেড়ে দাও।'

গার্ডের সাহস আছে, মানতে হলো রানাকে। একটা হাত তুলে তরুণীর গলা পেঁচিয়ে ধরল সে। 'যে-ই হও, হাতের অস্ত্র ফেলো, তা না হলে কুত্তীটার ঘাড় মটকাব আমি।'

দোরগোড়া থেকে প্যাসেজে বেরিয়ে এল রানা, হাতের কোল্ট সামান্য একটু নড়ল, লক্ষ্যস্থির করল লোকটার বাঁ চোখে। 'ওঁর কোন ক্ষতি হলে তোমার চোখ বলে কিছু থাকবে না। সারা জীবন কানা হয়ে থাকতে চাও?'

পরিস্থিতি যে তার বিরুদ্ধে চলে গেছে, বুঝতে পারছে লোকটা। প্যাসেজের এদিক ওদিক তাকাল সাহায্য পাবার আশায়। কিন্তু সে একা। ধীরে ধীরে হতাশা ফুটে উঠল চেহারায়, তরুণীর ঘাড় পেঁচিয়ে ধরা হাতটা শিথিল করছে, সেই সঙ্গে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে অপর হাতটা নিয়ে যাচ্ছে নিতম্বে আটকানো হোলস্টারের

দিকে।

ক্ষীণ নড়াচড়াটুকু ধরা পড়ে গেল রানার চোখে। ঝট করে হাত আরেকটু লম্বা করল ও, কোল্টের মাজল ঠেকল লোকটার চোখে। 'আমার সঙ্গে চালাকি করা বোকামি,' বলে হাসল রানা।

ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল লোকটা, মেয়েটাকে ছেড়ে দিয়ে বাম চোখটা দু'হাতে চেপে ধরল। 'মা রে, বাবা রে, চোখ গেল রে!' বলে চিৎকার জুড়ে দিল।

'শয়তানি করলে চোখ তো যাবেই, জানটাও যাবে,' বলে লোকটার ইউনিফর্ম ধরে হ্যাঁচকা টান দিল রানা, চেম্বারের ভেতর টেনে আনল। মেয়েটিকে কিছু বলতে হয়নি; ছুটে এসে স্বামীর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। পা দিয়ে ঠেলে দরজাটা বন্ধ করে দিল রানা, দ্রুত হাতে দুই গার্ডের হোলস্টার থেকে রিভলবার দুটো বের করে নিল। অচেতন গার্ডের কাছ থেকে আরও পাওয়া গেল ছোট একটা .৩২ ক্যালিবারের অটোমেটিক, প্যান্ট বেল্টের সঙ্গে শিরদাঁড়ায় গোঁজা। দ্বিতীয় গার্ডের কাছে পাওয়া গেল একটা ছুরি, বুটের ভেতর লুকানো। দু'জনের মধ্যে একজনের স্বাস্থ্য বেশ ভাল, যথেষ্ট লম্বাও বটে। তার ইউনিফর্ম খুলে দ্রুত পরে নিল ও। কাজটা করার সময় কথাও বলছে, বাংলায়, 'আপনারা কোত্থেকে আসছেন?'

'বেশিরভাগই আমরা বাংলাদেশী। মাথা পিছু পাঁচ লাখ টাকা দেয়ার চুক্তিতে একটা ম্যানপাওয়ার বিজনেস কোম্পানী ঢাকা থেকে আমাদেরকে প্রথমে সিঙ্গাপুরে নিয়ে আসে, সেখান থেকে হংকঙে এনে ইউয়েন ফিয়েন নামে একটা জাহাজে তুলে দেয়...'

এক তরুণ কথা বলছে, তাকে থামিয়ে দিল রানা। 'এ-সব পরে শোনা যাবে। আপনারা গার্ড দু'জনের হাত-পা বেঁধে মুখে কাপড় গুঁজে দিন, তারপর ভিড়ের ভেতর এমনভাবে লুকিয়ে রাখুন চেম্বারে কেউ ঢুকলে ওদেরকে যেন সহজে দেখতে না পায়।'

'ঠিক আছে,' একা তরুণটি নয়, ভিড়ের মধ্যে থেকে একযোগে আরও অনেকে সাড়া দিল।

গার্ড দু'জনকে ভিড়ের ভেতর লুকিয়ে ফেলা হলো। ইউনিফর্ম পরা শেষ করে একটা রিভলবার আর কোল্টটা প্যান্টের ভেতর গুঁজে রাখল রানা। দ্বিতীয় গার্ডের হোলস্টারটা কোমরে পরল ও, ভেতরে আরেকটা রিভলবার। কঠিন চেহারা, দরজা খুলে প্যাসেজে বেরিয়ে এল। বাইরে থেকে বন্ধ করল দরজা, তালাও লাগাল। দরজা থেকে বিশ ফুট দূরে এসে দেখে মরচে ধরা পুরানো মেশিনারি স্তূপ হয়ে আছে, মেঝে থেকে সিলিং পর্যন্ত। ওগুলো পেরিয়ে আরও খানিক দূর এগোতে একটা সিঁড়ি পেল রানা, উঠে গেছে একটা করিডরে, দু'পাশে সারি সারি কামরা, ভেতরে বিরাট আকৃতির তামার পাত্র ও গামলা, বহুকাল অযত্নে পড়ে থাকায় গায়ে সবুজ ছোপ-ছোপ দাগ ফুটেছে। একটা কামরায় ঢুকল ও, এককালে এটা সুগার কেইন কুকিং রূম ছিল। ভেতরে এক সারি জানালা আছে। তারই একটার সামনে দাঁড়াল। ওর নিচে বিশাল একটা স্টোরেজ ও শিপিং টার্মিনাল। একজোড়া লোডিং ডকের মাঝখানে রেললাইন দেখা যাচ্ছে, থেমেছে কংক্রিট ব্যারিয়ারে। মেঝের এক প্রান্তে প্রকাণ্ড দরজা হাঁ-হাঁ করছে। ভেতরে তিনটে ফ্রেইট

কার। নীল আর কমলা রঙের একটা ডিজেল-ইলেকট্রিক লোকোমটিভ কারগুলোকে নামিয়ে আনছে ঢালের নিচে। লোকোমটিভের গায়ে লেখা– 'লুইযিয়ানা অ্যান্ড সাউদার্ন রেলরোড'।

রেলরোড ট্র্যাক-এর পাশে একটা বিল্ডিং, রানা দেখল ওটার সামনে একজোড়া লিমুজিন দাঁড়িয়ে আছে, ড্রাইভাররা পরস্পরের সঙ্গে গল্প করার সময় ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে আছে তাদেরকে পাশ কাটাতে শুরু করা ট্রেনটার দিকে।

র‍্যানার মনে কোন সন্দেহ নেই, অবৈধ অভিবাসীদের ফ্রেইট কারগুলোয় তোলা হবে। লোডিং ডকে বারো থেকে পনেরো জন গার্ড রয়েছে দেখে তলপেটের ভেতর শিরশিরে একটা অনুভূতি জাগল। যা কিছু দেখার দেখে নিয়ে জানালার নিচে বসে পড়ল ও, দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে চিন্তা করছে।

ইমিগ্রান্টদের ট্রেনে তোলার সময় স্মাগলারদের বাধা দেয়া সম্ভব নয়, গোলাগুলি শুরু হলে অনেক নিরীহ লোক গুলি খাবে। তাছাড়া বাধা দিলে শুধু দেরি করিয়ে দেয়া হয়, শেষ পর্যন্ত গার্ডরা ওদেরকে ঠিকই তুলে ফেলবে ট্রেনে– একা ওদের সঙ্গে পেরে উঠবে না ও। আকস্মিক হামলা চালিয়ে তিন কি চারজন গার্ডকে অচল করে দিতে পারে ও, কিন্তু লাভ কি তাতে? বরং চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে ট্রেনটাকে অচল করে দেয়া যায় কিনা। তাতে অন্তত কয়েক ঘণ্টা দেরি করিয়ে দেয়া সম্ভব হতে পারে।

অস্ত্রগুলো বের করল রানা। .৩৫৭ ম্যাগনাম রিভলবার দুটো, একটা ছুরি ও একটা কোল্ট অটোমেটিক। সিক্স-শট রিভলবার দুটো থেকে পাওয়া যাবে বারো রাউন্ড। বহু বছর আগে কোল্টের গ্রিপ রিডিজাইন করায় তাতে একটা টুয়েলভ-শট ম্যাগাজিন ভরা যায়। তবে রিভলবার দুটোয় যে বুলেট আছে, ওগুলোর স্টপিং পাওয়ার যথেষ্ট হলেও ইস্পাত বা লোহার যন্ত্রপাতির খুব একটা ক্ষতি করতে পারবে না। ওর .৪৫ অটোমেটিকে রয়েছে উইনচেস্টার ১৮৫–গ্রেন সিলভারটিপ, পেনিট্রেট করার ক্ষমতা খুব বেশি। ট্রেনের রওনা হওয়া ঠেকাতে চব্বিশটা সুযোগ পাবে ও। একটা লাকি শটই ওর প্রত্যাশা পূরণ করতে পারে। ট্রেনের ডিজেল এঞ্জিন আর ইলেকট্রিক জেনারেটরের গুরুত্বপূর্ণ কোন যন্ত্রাংশে আঘাতটা লাগা চাই, যাতে চাকার ঘোরা বন্ধ হয়ে যায়।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। অসম্ভবকে সম্ভব করতে চাইছে ও। দু'হাতে দুটো রিভলবার, সিধে হয়ে দাঁড়াল, জানালা দিয়ে লক্ষ্যস্থির করল লোকোমটিভের লুভা-র দিকটায়।

কতক্ষণ পর জ্ঞান ফিরল বলতে পারবে না শাকিলা। কোমল চেহারার সুন্দরী এক মেয়ের কথা মনে পড়ছে ওর, পরনে ছিল লাল ওরিয়েন্টাল-সিল্ক ড্রেস, দু'পাশে চেরা। মেয়েটা ওর কাঁধের কাছে ব্লাউজ ছিঁড়ছিল। ধীরে ধীরে সচেতন হচ্ছে ও, সেই সঙ্গে সারা শরীরে তীব্র ব্যথা অনুভব করছে। ওর হাত আর পায়ে বেড়ি পরানো হয়েছে, বেড়ির সঙ্গে লোহার চেইন আছে, প্রান্তগুলো কোমর পেঁচিয়ে এঁকেবেঁকে চলে গেছে একটা গেটের ফাঁক গলে। হাত দুটোয় টান পড়ায় মনে হচ্ছে সকেট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে ওগুলো, পায়ের পাতা কোন রকমে মেঝে

স্পর্শ করেছে। চেইনগুলো গেটের মাথার সঙ্গে টান টান করে বাঁধা, সামান্য একটু নড়াচড়া করাও অসম্ভব করে তুলেছে।

ধীরে ধীরে উপলব্ধি করল শাকিলা, ওর পরনের কাপড়চোপড় খুলে নেয়া হয়েছে, থাকার মধ্যে আছে শুধু ব্রা আর প্যান্টি।

জ্ঞান ফেরার পরও মেয়েটিকে দেখতে পাচ্ছে শাকিলা, কাছাকাছি একটা চেয়ারে হাঁটু ভাঁজ করে বসে আছে। চেহারা দেখে ইউরেশিয়ান বলে মনে হলো। বিড়ালের নীরব হাসি ফুটল তার ঠোঁটে। ভয়ের ঠাণ্ডা একটা স্রোত নেমে এল শাকিলার শিরদাঁড়া বেয়ে। মেয়েটার কালো চুল চকচক করছে, জলপ্রপাতের মত নেমে এসেছে পিঠ বেয়ে। সরু কোমর, চওড়া নিতম্ব, নিপুণ দক্ষতার সঙ্গে মেকআপ ব্যবহার করেছে মুখে, নখগুলো অস্বাভাবিক লম্বা। শাকিলার মনোযোগ কেড়ে নিল চোখ দুটো। একটা চোখ কালো, অপরটা হালকা বাদামী। তাকালে সম্মোহিত না হয়ে যেন উপায় নেই।

'বাস্তব জগতে স্বাগতম।' আবার হাসল মেয়েটা।

'কে তুমি?' জানতে চাইল শাকিলা।

'আমি ফুয়া ফেং। আমি তাইপে ট্রাইয়্যাড-এর চাকরি করি।'

'হুয়ান হান ম্যারিটাইমের নয়?'

'না।'

'আমাকে ইঞ্জেকশন দিয়ে বেহুঁশ করা হয়েছিল,' বলল শাকিলা, রাগে কেঁপে গেল গলাটা।

হেসে উঠল ফুয়া ফেং। 'তবে এখনও রেপ করা হয়নি। ঈশ্বরই জানে মি. হানের কুক শম্পা মালাকারকে নিয়ে কি করেছ তোমরা। ভাল কথা, সে এখন কোথায়?'

'যেখানেই থাকুক, আরামেই রাখা হয়েছে তাকে,' বলল শাকিলা।

সিগারেট ধরিয়ে শাকিলার দিকে এক মুখ ধোঁয়া ছাড়ল ফুয়া ফেং। 'তোমার সঙ্গে আমার অনেকক্ষণ আলাপ হয়েছে।'

'আমাকে ইন্টারোগেট করা হয়েছে?' শাকিলা অবাক হলো। 'কই, মনে পড়ছে না কেন?'

পড়বে না। একেবারে লেটেস্ট ট্রুথ সেরাম ব্যবহার করা হয়েছে যে। এই ওষুধ যে-কোন বয়েসের মানুষের মনকে পাঁচ বছরের শিশুর মনে পরিণত করে, আর শারীরিক অনুভূতি এমন হয় যেন সমস্ত রক্ত গলিত লাভা হয়ে গেছে। তীব্র যন্ত্রণা আর মানসিক বিপর্যয় এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছায়, ইচ্ছাশক্তি যতই প্রবল হোক, যে-কোন প্রশ্নের সঠিক উত্তর না দিয়ে কোন উপায় থাকে না। ভাল কথা, লজ্জা পাবার কোন কারণ নেই, কারণ তোমাকে কোন পুরুষ বিবস্ত্র করেনি, করেছি আমি। তা-ও অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়, শুধু সার্চ করার জন্যে। মেয়ে বলেই তোমার দু'পায়ের ফাঁকে আর বাইসেপের তলায় হাতড়াতে পেরেছি, হাতড়ে ছোট একটা অটোমেটিক আর একটা ছুরি পেয়েছি। রেডিওটা কোথায় পাওয়া যাবে তা-ও জানতাম।'

'তুমি ঠিক চীনা নও,' বিড়বিড় করল শাকিলা।

'বাবা ব্রিটিশ, মা তাইওয়ানিজ।'

এই সময় কামরায় ঢুকল হানের চীফ এনফোর্সার চুয়াং চু, সঙ্গে আরেকজন ইউরেশিয়ান। দু'জনেই শাকিলার সামনে দাঁড়িয়ে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল। 'তোমার কৃতিত্ব প্রশংসনীয়,' ফুয়া ফেংকে বলল চুয়াং চু। 'তুমি ওর কাছ থেকে যে-সব তথ্য আদায় করেছ সেগুলো আমাদের খুবই কাজে লাগবে। মিস শাকিলা কোস্ট গার্ডকে সাহায্য করছিল, আর কোস্ট গার্ড বিলের ওপার থেকে আমাদের ফ্যাসিলিটির ওপর নজর রাখছিল, এটা জানার পর হাতে আমরা যথেষ্ট সময় পাই অবৈধ অভিবাসীদের সরিয়ে ফেলার জন্যে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ আর ইমিগ্রেশন এজেন্টরা হানা দিয়ে কিছুই পাবে না।'

দ্বিতীয় লোকটা এক পা এগিয়ে এসে বলল, 'আমি ব্যাঙ চি। তুমি আমার ভাগে পড়েছ।'

এক দলা থুথু ছিটাল শাকিলা, লোকটার মুখ ভিজে গেল।

এগিয়ে এসে শাকিলার চুলের গোছা মুঠোয় নিয়ে হ্যাঁচকা একটা টান দিল ব্যাঙ চি। 'শালী, তোর এত বড় সাহস!'

'ছাড়ো ওকে, চি,' বলল চুয়াং চু। 'ব্যাপারটা আমাকে ব্যাখ্যা করতে দাও।' শাকিলাকে ছেড়ে দিল চি। 'মিস শাকিলা, মি. হানের আদেশ হলো, তোমাকে দেখামাত্র খুন করতে হবে। কিন্তু মি. চি এমন একটা প্রস্তাব দিল আমাকে, আমি প্রত্যাখ্যান করতে পারলাম না। আসলে কিছু করার নেই, তোমাকে তার মনে ধরে গেছে। মোটা টাকার বিনিময়ে ওর কাছে তোমাকে আমি বিক্রি করে দিয়েছি।'

'তোমরা মানুষ না, জানোয়ার।' শাকিলার চোখে ভয়ের ছায়া বড় হচ্ছে।

'সব দোষ আমার ঘাড়ে চাপিয়ো না,' আহত সুরে বলল চু। 'তোমার ভবিষ্যৎ এখন তাইপে ট্রাইয়্যাড-এর হাতে। তাইপে ট্রাইয়্যাড হুয়ান হান ম্যারিটাইমের ক্রাইম পার্টনার। আমরা পাচার করি আর বেচি, ওরা কেনে; তা সে মানুষ, ড্রাগ, অস্ত্র, যা-ই হোক।'

ঠাস করে শাকিলার গালে একটা চড় মারল চি। 'আঘাত পেয়ে যে মেয়ে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, তাকেই আমার বেশি ভাল লাগে। সেজন্যেই আমার টরচারের মাত্রা মাঝে মধ্যে একটু বেশি হয়ে যায়। তবে ভেবে দেখো, মি. হানের আদেশ মত তোমাকে যদি খুন করা হয়, সেটা কি ভাল হবে? তারচেয়ে আমার কাছে নির্যাতন আর আদর পেয়ে বেঁচে থাকাটা মন্দের ভাল নয়?' হেসে উঠল সে। 'এখন লিমোয় চড়িয়ে তোমাকে আমি অনেক দূরে নিয়ে যাব। নিউ ওরলিয়ান্সে যখন পৌছুব আমার প্রেম আর প্যাদানিতে তুমি অভ্যস্ত হয়ে যাবে।' শাকিলার হাত-পায়ের শিকল খুলে দিচ্ছে সে।

শিকল মুক্ত হয়ে দেয়ালে হেলান দিল শাকিলা, হিসহিস করে বলল, 'এর জন্যে তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি পেতে হবে।' দেয়ালে ঘষা খেয়ে পড়ে যাচ্ছে ও, চু এগিয়ে এসে ধরে ফেলল। 'আমি যুক্তরাষ্ট্র সরকারের একজন এজেন্ট। আমার কোন ক্ষতি করে তোমরা পার পাবে না।'

'তোমার এই দুর্দশার জন্যে তুমিই দায়ী,' হেসে উঠে বলল চু। 'তোমাকে আর মি. রানাকে খুন করার জন্যে বিশজনের একটা টীম পাঠিয়েছিলেন মি. হান,

কন্তু তারা তোমাদের ট্রেইল হারিয়ে ফেলে। ওহ্ গড, কে জানত, তুমি সরাসরি আমাদের সদর দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়বে!'

'যদি ভেবে থাকো আমি একা এসেছি, মারাত্মক ভুল করবে,' মিছে ভয় দেখাবার চেষ্টা করছে শাকিলা, সময় পাবার আশায়। 'মি. মাসুদ রানাও আমার সঙ্গে আছেন, লোকজন নিয়ে। যে-কোন মুহূর্তে হামলা শুরু করবেন তিনি।'

হেসে উঠে কিছু বলতে যাচ্ছিল চি, বিল্ডিঙের ভেতর কোথাও থেকে গুলির আওয়াজ ভেসে এল। হতভম্ব হয়ে পরস্পরের দিকে তাকাল চু আর চি। তারপর ঝট করে দামী স্পোর্টস কোটের পকেট থেকে একটা পোর্টেবল ফোন বের করে রিসিভারে কথা বলল চি, 'কে গুলি করল? কেউ হানা দিয়েছে নাকি?'

'না, মি. চি,' মনিটরিং সিস্টেম রূম থেকে চীফ সিকিউরিটি অফিসার জবাব দিল। 'কেউ হানা দেয়নি। ডক আর আশপাশের গোটা এলাকা ফাঁকা। ট্রেন-লোডিং ডকের ওপর দিকের একটা কামরা থেকে গুলি করা হচ্ছে। কে দায়ী বা কি তার উদ্দেশ্য এখনও আমরা জানতে পারিনি।'

'কেউ আহত হয়েছে?'

'না,' সিকিউরিটি চীফ জানাল। 'যে-ই গুলি করুক, সে আমাদের গার্ডদের টার্গেট করছে না।'

'কি ঘটে জানাবে আমাকে,' ধমকের সুরে বলল ব্যাঙ চি। চুয়াং চুর দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল সে। 'এবার রওনা হবার সময় হয়েছে।' তার কথা শেষ হওয়া মাত্র গুলির আওয়াজ থেমে গেল।

'কি ঘটল?' আবার ফোনে কথা বলছে চি।

সিকিউরিটি চীফ জানাল, 'আমরা সম্ভবত লোকটাকে আহত করেছি। মারাও যেতে পারে। ওপরতলায় লোক পাঠাচ্ছি, লাশটা পায় কিনা দেখে আসবে।'

'কে হতে পারে লোকটা?' চিন্তিত দেখাল চুয়াং চুকে।

'একটু পরই জানা যাবে,' বলল চি। এক হাতে শাকিলার কোমর পেঁচিয়ে ধরে টান দিল, অনায়াস ভঙ্গিতে কাঁধে তুলে নিল ওকে, শাকিলা যেন হালকা একটা বালিশ। অপর হাতে চুর সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল। 'তোমাদের সঙ্গে ব্যবসা করে এতদিন খুব মজা পেয়েছি, চু। আমার পরামর্শ হলো, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নতুন একটা স্টেজিং ডিপো খুঁজে বের করো। এই জায়গা এখন আর নিরাপদ নয়।'

উদ্বেগ বা চিন্তা ঝেড়ে ফেলে হাসল চুয়াং চু। 'আজ থেকে তিন দিন পর মি. হান নতুন যে অপারেশনে হাত দিতে যাচ্ছেন, সেটা সামলাতে এলাকার গোটা প্রশাসন ব্যস্ত হয়ে উঠবে। সত্যিসত্যিই চোখে অন্ধকার দেখবে মার্কিন সরকার। বিশ্বাস করো, এক এক করে পাঁচ থেকে সাতটা স্থায়ী স্টেজিং ডিপো পেতে যাচ্ছি আমরা যুক্তরাষ্ট্রের উপকূল জুড়ে। তার মধ্যে সানগারি পোর্ট ফ্যাসিলিটি একটা। গোপন তথ্যটা এখুনি তোমাকে জানানো যাচ্ছে না, শুধু একটু আভাস দিই—দুই প্রাকৃতিক দৈত্য এক হতে যাচ্ছে, ফলে গালফ অব মেক্সিকোতে সানগারির সঙ্গে আর কোন পোর্টের তুলনা করা যাবে না।'

চু পথ দেখাল, অফিস থেকে বেরিয়ে এল ওরা, পেঁচানো একটা সিঁড়ি বেয়ে

নেমে এল চওড়া করিডরে, চলে গেছে খালি স্টোরেজ ও ইকুইপমেন্ট রূমের দিকে, শেষবার ওগুলো ব্যবহার করা হয়েছে চিনিকলটা যখন চালু ছিল। করিডর অর্ধেকটা পার হয়েছে, চির পকেটে ফোন বেজে উঠল। 'হ্যাঁ, কি ঘটল?' জানতে চাইল সে।

'দুঃসংবাদ, মি. চি। চারদিক থেকে আমাদের এজেন্টরা রিপোর্ট পাঠাচ্ছে, নদী আর বিলের ওপর দিয়ে কোস্ট গার্ডবোট ছুটে আসছে এদিকে। একজোড়া সরকারী হেলিকপ্টারও এই মাত্র মরগান সিটি থেকে আকাশে উঠেছে। মি. চুকে জানান, হাইওয়ের নিচের বাঙ্কার থেকে আমাদের এজেন্ট রিপোর্ট পাঠিয়েছে, ওখানে তার যে তিনজন লোক ছিল, তারা নেই। তিনটে লাশই বাঙ্কারের বাইরে পড়ে আছে।'

'ওহ্ গড! ঠিক জানো?'

'আমাদের এজেন্টরা তো চোখে দেখে রিপোর্ট পাঠাচ্ছে, মি. চি। বাঙ্কারের ওয়েল্ডিং করা দরজা বিস্ফোরকের সাহায্যে উড়িয়ে দেয়া হয়েছে, ফলে একজনও বাঁচেনি।'

খবরটা শুনে হাঁ হয়ে গেল চু। 'কি বলে! নিশ্চয়ই তোমার এজেন্টরা ভুল তথ্য দিচ্ছে, চি। বাঙ্কারের ভেতর ওরা যারা আছে তাদের তো ভেতর থেকে বেরুনোরই কথা নয়।'

চুর কথায় কান না দিয়ে সিকিউরিটি চীফকে চি জিজ্ঞেস করল, 'বোট বা হেলিকপ্টারের এখানে পৌঁছুতে কতক্ষণ লাগবে?'

'হেলিকপ্টার পৌঁছুবে পনেরো থেকে আঠারো মিনিটের মধ্যে। বোটগুলো পৌঁছুবে, এই ধরুন, আরও আধ ঘণ্টা পর।'

'ঠিক আছে, সমস্ত সিস্টেম বন্ধ করে ফ্যাসিলিটি খালি করার প্ল্যান অনুসরণ করো,' নির্দেশ দিল ব্যাঙ চি। 'আমাদের সব লোককে ছড়িয়ে পড়তে বলো, কেউ যেন ধরা না পড়ে।'

'ঠিক আছে, মি. চি।'

'লিমোয় চড়ে রাস্তায় উঠতে তিন মিনিটও লাগবে না আমাদের,' শাকিলাকে এক কাঁধ থেকে আরেক কাঁধে নিল চি।

চু বলল, 'ওরা পৌঁছানোর আগে চিনিকল থেকে অনেক দূরে সরে যাব আমরা।'

একটা দরজার সামনে চলে এল ওরা, ভেতরে একটা সিঁড়ি, নেমে গেছে বেসমেন্ট শিপিং টার্মিনালে। নিচ থেকে লোকজনের চিৎকার-চেঁচামেচির আওয়াজ ভেসে আসছে, কিন্তু লোকোমটিভের কোন শব্দ নেই। তারপর লোকজনের গলাও থেমে গেল। নিশ্চয়ই খুব খারাপ কিছু ঘটেছে। একটা দরজা দিয়ে হুড়মুড় করে ল্যান্ডিঙে বেরিয়ে এল ওরা, সেটা লোডিং ডকের অনেক ওপরে। সামনে ছিল চুয়াং চু, থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

ফ্রেইট কারগুলোয় অবৈধ অভিবাসীদের তোলা হয়েছে, ওগুলোর দরজা বন্ধ করে তালাও দেয়া হয়েছে। কিন্তু এঞ্জিন চলছে না। ডিজেল এঞ্জিন আর ইলেকট্রিক জেনারেটিং কমপার্টমেন্ট প্যানেল কাভারিং দিয়ে আড়াল করা, তাতে

অনেকগুলো বুলেটের ফুটো দেখা যাচ্ছে, ফুটোগুলো থেকে এখনও নীলচে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। ক্ষতির পরিমাণ বা ধরন আন্দাজ করার চেষ্টা করছে এঞ্জিনিয়াররা, চেহারায় অবিশ্বাস আর অসহায়ত্ব। তাইপে ট্রাইয়্যাডের সিকিউরিটি গার্ডরা এরইমধ্যে একটা ট্রাকে চড়ে বসেছে, ড্রাইভার সেটা ছেড়ে দিল, হাইওয়ের দিকে যাচ্ছে।

হঠাৎ করেই ব্যাঙ চি বুঝতে পারল অজ্ঞাত শত্রু কেন গার্ডদের টার্গেট করেনি। ট্রেনটা কোথাও যাচ্ছে না, ভীতিকর এই উপলব্ধি দিশেহারা করে তুলল তাকে। তিনশোর ওপর অবৈধ অভিবাসী আর পঞ্চাশ মিলিয়ন ডলার মূল্যের ড্রাগস মার্কিন সরকারের এজেন্টদের হাতে ধরা পড়তে যাচ্ছে। হানের চীফ এনফোর্সার চুর দিকে তাকাল সে। 'আমি দুঃখিত, দোস্ত। পণ্য যেহেতু হাতবদল হয়নি, এরজন্যে আমার বস্ মি. হানকে দায়ী করবেন।'

'মানে? কি বলতে চাও তুমি?' ব্যাখ্যা দাবি করল চু।

'বুঝতে পারছ না? তাইপে ট্রাইয়্যাড এই শিপমেন্টের জন্যে কোন পেমেন্ট দেবে না।'

'তোমার কি মাথা খারাপ হলো? হান ম্যারিটাইম চুক্তি মোতাবেক গুডস ও প্রপার্টি সময় মতই ডেলিভারি দিয়েছে,' বলল চু। 'এখন যদি কোন বিপর্যয় বা অঘটন ঘটে, আমরা কেন দায়ী হতে যাব?'

'আমাদের সাহায্য ছাড়া হান ম্যারিটাইম আমেরিকায় ব্যবসা করতে পারবে না,' তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল ব্যাঙ চি। 'আমার দৃষ্টিতে, এই ক্ষতি মেনে না নিয়ে তাঁর কোন উপায় নেই।'

'তুমি যা ভাব, তারচেয়ে অনেক বেশি ক্ষমতাবান মি. হান,' বলল চু। 'তুমি মারাত্মক একটা ভুল করতে যাচ্ছ।'

'মি. হানকে বলবে, আমার বস্ কাউকে ভয় পায় না। মার্কিন প্রশাসনে তাঁর প্রভাব মি. হানের চেয়ে কম নয়। তাছাড়া, বিশ্বস্ত বন্ধুকে পুরানো কাপড়ের মত ফেলে দিতে হয় না। এই সামান্য ক্ষতি এক হপ্তার মধ্যে পুষিয়ে নিতে পারবেন মি. হান, কাজেই এটা মেনে নেয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।'

চোখ আরও সরু করে তাকাল চু। 'তাহলে মিস শাকিলাকে নিয়ে যে চুক্তিটা হয়েছিল সেটা বাতিল করলাম আমি। ও আবার আমার হয়ে গেল।'

এক সেকেন্ড চিন্তা করল ব্যাঙ চি, তারপর হেসে উঠল। 'তুমি না বলছিলে মি. হান ওকে মেরে ফেলতে বলেছেন?'

'হ্যাঁ, বলেছেন।'

শাকিলাকে দু'হাতে ধরে মাথার ওপর তুলল ব্যাঙ চি। 'এখান থেকে রেললাইনটা ত্রিশ ফুট নিচে। ধরো মি. হানের ইচ্ছা পূরণ করলাম আমি–তাহলে তুমিও বঞ্চিত হলে, আমিও বঞ্চিত হলাম–কেমন হয় সেটা?'

সরাসরি নিচে তাকিয়ে শেষ ফ্রেইট কার আর কংক্রিট ব্যারিয়ারের মাঝখানে রেললাইনটা দেখল চুয়াং চু। 'মন্দ বলোনি। তাঁর একটা আদেশ প্রতিপালিত হয়েছে দেখলে ক্ষতিটা হয়তো মেনে নেবেন মি. হান। তবে কাজটা তাড়াতাড়ি শেষ করো। এখানে আর এক মুহূর্তও আমাদের থাকা উচিত নয়।'

হাত দুটো লম্বা করল ব্যাঙ চি, শরীরের পেশী আড়ষ্ট হয়ে উঠল। শাকিলার গলা থেকে আর্তচিৎকার বেরিয়ে এল। একপাশে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা উপভোগ করছে চু আর ফুয়া ফেং। কেউই খেয়াল করল না বেঢপ ইউনিফর্ম পরা দীর্ঘকায় এক পুরুষ সিঁড়ি বেয়ে ওদের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। 'বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত,' বলল রানা, কোল্টের মাজল ঠেকাল ব্যাঙ চির ঘাড়ের পিছনে। 'তবে কেউ যদি এমন কি নিজের নাকও চুলকায়, ঘাড়ের ওপর মাথা বলে কিছু রাখব না।'

সত্যি কেউ এক চুল নড়ল না। তবে চোখ ঘুরিয়ে রানাকে দেখে নিতেও ভুলল না। ব্যাঙ চির মুখ থেকে সমস্ত রক্ত নেমে গেল। মাথার ওপর তোলা হাত দুটো থরথর করে কাঁপছে। ফুয়া ফেংকে দেখে মনে হলো হতাশায় কাতর। শুধু চুয়াং চুকে কৌতূহলী দেখাল। 'কে আপনি?' জানতে চাইল সে।

জবাব না দিয়ে ব্যাঙ চির দিকে তাকাল রানা। 'ভদ্রমহিলাকে ধীরে ধীরে নামাও।' কোল্টের মাজল দিয়ে ঘাড়ের নরম মাংসে খোঁচা মারল একটা।

'নামাচ্ছি! নামাচ্ছি! গুলি করবেন না!' ভয়ে ঢোক গিলছে ব্যাঙ চি, ধীরে ধীরে ঘুরে শাকিলাকে ল্যান্ডিঙে নামিয়ে দিল। দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে হাঁটু মুড়ে নিচু হলো শাকিলা। ওর কব্জি আর গোড়ালির চামড়া উঠে গেছে দেখে রানার সারা শরীরে যেন আগুন ধরে গেল। মুহূর্ত মাত্র ইতস্তত না করে কোল্টের ব্যারেল দিয়ে ব্যাঙ চির মাথায় সজোরে বাড়ি মারল একটা, গম্ভীর সন্তুষ্টির সঙ্গে দেখল সিঁড়ি থেকে গড়িয়ে নিচে পড়ছে চি।

'রানা! আপনি!' রানাকে দেখেও শাকিলা বিশ্বাস করতে পারছে না। 'কিন্তু কিভাবে?'

শাকিলাকে ধরে দাঁড় করিয়ে কাছে টেনে নেয়ার ইচ্ছেটা দমন করল রানা, চুর ওপর থেকে মুহূর্তের জন্যেও চোখ সরাচ্ছে না। প্রতিশোধপরায়ণ সাপের মত পোজ নিয়ে আছে লোকটা, সুযোগ পেলেই ছোবল মারবে। ইমিডিয়েট বস্ মারা গেছে, কাজেই ফুয়া ফেং-এরও কিছু হারাবার নেই–রানার দিকে তীব্র ঘৃণা নিয়ে তাকিয়ে আছে সে। রানার হাতের কোল্ট চুর দিকে তাক করা, তবে তাকিয়ে আছে মেয়েটার দিকে। 'এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, তাই ভাবলাম একবার হ্যালো বলে যাই।'

'আপনার নাম মাসুদ রানা?' জানতে চাইল চুয়াং চু।

জবাব না দিয়ে রানা জিজ্ঞেস করল, 'তুমি?'

'আমি চুয়াং চু, আর আমার সঙ্গে উনি ফুয়াং ফেং। আমাদের নিয়ে কি করতে চান আপনি?'

'চুয়াং চু,' বলল রানা, চিন্তা করছে। 'কোথায় শুনেছি নামটা?'

ধীরে ধীরে নিজের পায়ে সিধে হলো শাকিলা। ঘুরে রানার পিছনে চলে এল, এক হাতে জড়িয়ে ধরল ওর কোমরটা। 'আমার মুখে, রানা,' বলল ও। 'ও একটা খুনী, হুয়ান হানের চীফ এনফোর্সার। অবৈধ অভিবাসীদের ওই জেরা করে, সিদ্ধান্ত নেয় কে বাঁচবে কে মরবে। সান বার্ডে ও-ই আমাকে টরচার করেছিল।'

'তুমি লোক ভাল নও, চু,' বলল রানা। 'তোমার হাতের কাজ আমি দেখেছি।'

রানা অন্তত বুঝতে পারেনি কোত্থেকে, হঠাৎ একজন গার্ড হাজির হলো। ফুয়া ফেঙের চোখের দৃষ্টি বদলে যাচ্ছে–ঘৃণার বদলে উল্লাস ফুটে উঠছে–লক্ষ করে ঝট করে ঘাড় ফেরাল রানা। আর ঠিক সেই মুহূর্তে ওকে লক্ষ্য করে লাফ দিল চু। সেই সঙ্গে ফেং চেঁচিয়ে উঠল, 'কিল হিম! কিল হিম! কিল হিম!'

'সুন্দরী মেয়েদের ইচ্ছা সব সময় পূরণ করি আমি,' ইউনিফর্ম পরা গার্ড বলল, যদিও গলায় কোন ভাবাবেগের লেশমাত্র নেই। তার হাতের .৩৫৭ ম্যাগনাম রিভলবার অগ্নি উদ্গিরণ করল, ল্যান্ডিঙের চারদিকে এমন প্রতিধ্বনি তুলল যেন কামান দাগা হয়েছে। চুয়াং চুর চোখ দুটো বিস্ফোরিত হয়ে বেরিয়ে এল কোটর ছেড়ে, নাকের ঠিক ব্রিজের ওপর বুলেট লাগায়। পিছু হটল সে, রেলিঙে বাড়ি খেলো, ডিগবাজি খেয়ে খসে পড়ল নিচে। রেললাইনে পড়ার আগেই মারা গেছে।

ফুয়া ফেং হাঁ করে তাকিয়ে আছে মুরল্যান্ডের পরা ইউনিফর্মের দিকে। এই ইউনিফর্ম দেখেই তাকে গার্ড বলে মনে করেছিল সে।

রানার দিকে তাকাল মুরল্যান্ড। 'আশা করি কোন ভুল করে বসিনি, দোস্ত?'

'ঠিক সময়ে ঠিক কাজটি করেছ,' বলল রানা। 'যদি কোন দিন নির্ঘাত মৃত্যুর হাত থেকে ছিনিয়ে আনতে পারি তোমাকে, তবেই এই ঋণ শোধ করা সম্ভব।'

হাত দুটো সামান্য বাড়াল ফেং, আঙুলগুলো বাঁকা, রানার চোখ তুলে নেবে। তবে এক পা-র বেশি এগোতে পারল না, ছুটে গিয়ে তার মুখে দুম করে একটা ঘুসি বসিয়ে দিল শাকিলা। ঠোঁট ফেটে ঝর ঝর করে রক্ত গড়াতে শুরু করল, ভিজে যাচ্ছে লাল সিল্ক ড্রেস। 'কুত্তী! ওটা ছিল আমাকে ইঞ্জেকশন দেয়ার শাস্তি।' শাকিলার দ্বিতীয় ঘুসিটা লাগল ফেঙের পেটে। হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল, বাতাসের অভাবে হাঁপাচ্ছে সে। 'আর এটা মারলাম পুরুষদের সামনে আমাকে অর্ধনগ্ন করার অপরাধে।'

'আমিও শিক্ষা পেলাম, তোমাকে খেপিয়ে তোলা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।' রানার নীরব ঠোঁটে হাসি।

মুঠোটা আরেক হাত দিয়ে ডলছে শাকিলা। 'সবই হলো, কিন্তু অবৈধ অভিবাসীদের নিয়ে কেটে পড়ল ওরা, ঠেকানো গেল না। ঈশ্বরই জানে কত লোককে বাঁচাতে পারতাম আমরা।'

নরম হাতে শাকিলাকে কাছে টেনে নিল রানা। 'তুমি জানো না?'

'জানি না?' রানার সম্বোধন পাল্টে যাওয়ায় শাকিলার চোখ দুটো জ্বালা করে উঠল, কারণটা সে নিজেও বলতে পারবে না। 'কি জানি না?'

ইঙ্গিতে নিচের ট্রেনটা তাকে দেখাল রানা। 'ফ্রেইট কারগুলো দেখছ? ওগুলোয় তিনশোরও বেশি লোক আছে। ওরা বেশিরভাগই বাংলাদেশী, শাকিলা।'

এমন হকচকিয়ে গেল শাকিলা, রানা যেন ওকে চড় মেরেছে। বোকার মত ট্রেনটার দিকে তাকিয়ে থাকল ও। 'ওরা এখানে, অথচ আমি একজনকেও দেখতে পাইনি!'

'তুমি চিনিকলে এলে কিভাবে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ইউয়েন ফিয়েনের আবর্জনা নিয়ে বার্জটা যখন রওনা হলো, লাফ দিয়ে আমি

ওটায় নেমে পড়ি।'

'তারমানে অভিবাসীদের সঙ্গেই সানগারি থেকে এখানে এসেছ তুমি। হংকং থেকে একটা সাবমারজড় কন্টেইনারে ভরে আনা হয়েছে ওদেরকে, কন্টেইনারটা রেল সিস্টেমের সাহায্যে ইউয়েন ফিয়েনের তলায় আটকানো ছিল। ওই একই রেল সিস্টেম আছে বার্জের তলাতেও, কন্টেইনারটা জাহাজ থেকে বার্জে সরিয়ে আনা হয়।'

হঠাৎ উদ্বিগ্ন দেখাল শাকিলাকে। 'ট্রেন ছাড়ার আগেই ওদেরকে মুক্ত করা দরকার, রানা।'

'ব্যস্ত হয়ো না,' বলল রানা। 'এমন কি মুসোলিনিও ওই ট্রেন চালু করতে পারবে না।'

ফ্রেইট কারগুলোর তালা খুলে অসুস্থ ও ক্লান্ত অভিবাসীদের বের করছে ওরা, এই সময় কোস্ট গার্ড আর ইমিগ্রেশন অ্যান্ড ন্যাচারালাইজেশন সার্ভিসের এজেন্টেরা পৌঁছে গেল।

হিলটন ইন্টারন্যাশনাল হোটেলের পেন্টহাউস স্যুইটে অস্থির উত্তেজনায় পায়চারি করছে হুয়ান হান, তার হলদেটে গাত্রবর্ণ লালচে-বেগুনি দেখাচ্ছে। লিভিং রূমের একপাশে, কার্পেটের ওপর খাড়া করা মার্বেল পাথরের একটা নারীমূর্তি দেখা যাচ্ছে–মূর্তিটা যে জ্যান্ত তা শুধু বোঝা যাচ্ছে মাঝে মধ্যে চোখের পাতা মৃদু কেঁপে উঠলে।

পেন্টহাউসের কমিউনিকেশন রূম থেকে এই মাত্র লিভিং রূমে ঢুকেছে হুয়ান হানের পারসোনাল সেক্রেটারি সুজি সুং। তার হাতে এক গাদা কমপিউটর প্রিন্টআউট দেখে কোত্থেকে কি রিপোর্ট এসেছে জানতে চায় হুয়ান হান। উত্তরে সুং বলেছে, 'চারদিক থেকে এত সব খারাপ খবর আসছে, ইচ্ছে হচ্ছে আমি আত্মহত্যা করি।'

সেই থেকে শুরু হয়েছে হানের অস্থির পায়চারি। মিনিট পাঁচেক পর নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেল সে। খোলা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে দূর দিগন্তে তাকাল, হোয়াইট হাউসের চূড়াটা আকাশের গায়ে ছবির মত আঁকা। 'ঠিক আছে, এক এক করে বলো। আমি প্রশ্ন করি, তুমি জবাব দাও।'

'জ্বী, মাস্টার,' নিষ্প্রাণ মূর্তির ঠোঁট নড়ে উঠল।

'পণ্ডিত ঝাউ মিয়াং যোগাযোগ করেছেন?' জানতে চাইল হান।

'জ্বী, মাস্টার, করেছেন। তাঁর কথা হলো, প্রিন্সেস হিয়া লিয়েন যেখানে ডুবেছে বলে মনে করা হয় সেখানে তদন্ত চালিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন তিনি। বলছেন, সূত্র বা তথ্যগুলো একটার সঙ্গে আরেকটা মিলছে না।'

'প্রিন্সেস হিয়াকে কেউ যদি খুঁজে বের করতে পারে, একমাত্র ঝাউ মিয়াংই পারবেন,' জোর দিয়ে বলল হান। 'এবার বলো রাশিয়ান অয়েল ট্যাঙ্কার কেনার কাজ কত দূর এগোল?'

'এ-সব ছোটখাট খবর, মাস্টার, চিন্তিত হবার কোন বিষয় নয়। রাশিয়ানদের সঙ্গে চারটে অয়েল ট্যাঙ্কার কেনার চুক্তি হয়েছে. কিন্তু ওগুলো ডেলিভারি দিতে

দেরি করছে তারা। তবে আশা করা হচ্ছে আগামী মাসের মাঝামাঝি সময়ে রিফিটিং-এর জন্যে তাইওয়ানে পৌঁছে যাবে ওগুলো।'

'আর নতুন ক্রুজ শিপ? তৈরি হতে আর কতদিন লাগবে?' ভুরু কোঁচকাল হান।

'মর্নিং স্টার? চারমাস, মাস্টার।'

'তাহলে খারাপ খবর কোন্টা?' রাগ চেপে জানতে চাইল হান। 'তোমার আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে করছে কেন?'

মেয়েটা হঠাৎ ফুঁপিয়ে উঠল, চোখ থেকে টপ টপ করে পানি পড়ছে। 'মাস্টার, সানগারি থেকে রিপোর্ট এসেছে।'

'হ্যাঁ, বলো।' এখনও জানালার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে হান।

'ডাফ মোরাল চিনিকলে তাইপে ট্রাইয়্যাড-এর লোকজন কিছু মারা গেছে, কিছু ধরা পড়েছে, মাস্টার। হঙকঙ থেকে তিনশো পঁচিশজন অভিবাসীকে নিয়ে রওনা হয়েছিল আমাদের ইউয়েন ফিয়েন, সানগারি পোর্ট ফ্যাসিলিটিতে নিরাপদেই পৌঁছায়। সাবমারজড্ কন্টেইনারটা বার্জের রেল সিস্টেমে স্থানান্তর করতেও কোন সমস্যা হয়নি। কিন্তু...'

'কিন্তু কি?'

'কিন্তু ডাফ মোরাল চিনিকলে অভিবাসীদের ট্রেনে তোলার পর কেঁচে গেছে সব। দায়ী নুমার স্পেশাল প্রজেক্ট ডিরেক্টর মাসুদ রানা। ট্রেনের এঞ্জিন অচল করে দেয় সে।'

'তাইপে ট্রাইয়্যাড পেমেন্ট করেছে?'

'জ্বী-না, মাস্টার। পঞ্চাশ মিলিয়ন ডলারের ড্রাগসও ছিল বার্জে, ইউ.এস, কাস্টমস সব নিয়ে গেছে।'

'আমাদের লোকজন?'

'চুয়াং চু মারা গেছে। ট্রাইয়্যাডের ব্যাঙ চি-ও মারা গেছে। চি-র অ্যাসিস্ট্যান্ট ফুয়া ফেংকে ধরে নিয়ে গেছে আইএনএস এজেন্টরা।'

শ্রাগ করল হান। 'বিরাট কোন ক্ষতি নয়। আমার চীফ এনফোর্সার সব কাজেই ব্যর্থ হচ্ছিল, মরে গিয়ে আমাকে বাঁচিয়েছে। আর ব্যাঙ চি ছিল তাইপে ট্রাইয়্যাডের কর্মচারী, সে মারা যাওয়ায় ওই চাইনীজ-আমেরিকান ক্রাইম সিন্ডিকেটের বসকে আমি যুক্তি দেখাতে পারব যে তাদের অদক্ষতার কারণেই ডাফ মোরাল স্টেজিং ডিপোর অস্তিত্ব ফাঁস হয়ে গেছে। তিনশো পঁচিশজন অভিবাসী ছিল বার্জে, স্টেজিং ডিপোয় পৌঁছে দেয়ার পর আমাদের কাজ শেষ হয়ে গেছে। মাথা পিছু পাঁচ হাজার ডলার পাবার কথা আমাদের, আর ড্রাগসের দাম বাবদ পঞ্চাশ মিলিয়ন ডলার। এ-সব তো চাইবই, ক্ষতিপূরণও করতে হবে ওদেরকে।'

'মাস্টার, তাইপে ট্রাইয়্যাডের চেয়ারম্যান এ বিষয়ে আলাপ করার জন্যেই আপনার সাক্ষাৎ পেতে চেয়েছেন,' বলল সুজি সুং। 'আমি তাঁকে আধ ঘণ্টা পর আসতে বলেছি। ওনার সঙ্গে একজন কংগ্রেস সদস্যও আছেন।'

'কি নাম?'

'চীন ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া সম্পর্কে মার্কিন প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা, মি. লিয় সেন।'

মাথা নাড়ল হান। 'ভুল করলে। তুমি তাইপে ট্রাইয়্যাডের চেয়ারম্যানের কথা বলছ। আমি কংগ্রেস সদস্যের নাম জানতে চাইছি।'

'মি. কাটহিল ডগলাস, মাস্টার।'

'ডগলাস, আমার বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষী,' বিড় বিড় করল হান, ঠোঁটের কোণে বিদ্রূপাত্মক হাসি। 'তার মাধ্যমেই একশো কংগ্রেস ও সিনেট সদস্যকে নিয়মিত মাসোহারা দিই আমি। কি চায় সে? চলতি বছরের সব টাকাই তো নির্দিষ্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে।'

'তিনি কি কারণে আপনার সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়েছেন আমি জিজ্ঞেস করিনি, মাস্টার।'

'ঠিক আছে, আগে তোমার আত্মহত্যা করতে চাওয়ার কারণটা শুনি, তারপর ওদের সঙ্গে কথা বলা যাবে।' জানালা দিয়ে হোয়াইট হাউসের দিকে তাকিয়ে আছে হান। 'সানগারি সম্পর্কিত আর কোন দুঃসংবাদ?'

'জ্বী, মাস্টার। অ্যাটচাফালেয়া আর মিসিসিপি নদী দুটোকে এক করার প্ল্যান বাতিল করে দিতে হয়েছে। হাইওয়ের নিচে বাঙ্কারের ভিতর যারা ছিল তারা খুন হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে মাসুদ রানাই দায়ী। বাঙ্কারের ভেতর থেকে সমস্ত টিএনটি সরিয়ে ফেলা হয়েছে।'

হান কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর বলল, 'প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আমার দেখা হওয়া দরকার।'

'মাস্টার, আপনি দেখা করতে চাইতে পারেন, এটা ধরে নিয়ে আজ সকালে হোয়াইট হাউসের সঙ্গে যোগাযোগ করি আমি। কিন্তু চীফ অব স্টাফ স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, প্রেসিডেন্ট অত্যন্ত ব্যস্ত, সময় দিতে পারবেন না।'

বন করে আধ পাক ঘুরল হান। 'এ অসম্ভব! প্রেসিডেন্টের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু আমি, আমাকে তিনি এভাবে এড়িয়ে যেতে পারেন না।'

মাথা নিচু করল সুং। 'মাস্টার, সিআইএ আর এফবিআই থেকে আমাদের ইনফর্মাররা গোপন সূত্র থেকে পাওয়া খবর পাঠিয়েছে–প্রেসিডেন্ট নুমা আর আইএনএস চীফদের নিয়ে বৈঠক করেছেন। সেই বৈঠকে প্রেসিডেন্টকে তাঁরা অনুরোধ করেছেন, তিনি যেন আপনাকে কোন রকম প্রশ্রয় না দেন। এমন কি সাক্ষাৎ না করতেও পরামর্শ দিয়েছেন।'

হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকল হান। 'আর কোন খারাপ খবর, সুজি? আমাকে কোণঠাসা ইঁদুরে পরিণত করতে পারে, এমন কিছু?'

'ইনফর্মাররা বলছে, আমেরিকা ত্যাগ করার জন্যে আপনাকে খুব বেশি হলে মাত্র আটচল্লিশ ঘণ্টা সময় দেয়া হবে।'

হাত দুটো মুঠো পাকাল হান। 'ঠিক আছে, ওদেরকে তুমি আসতে বলো। তবে শোনো, আত্মহত্যা করার আগে আমার অনুমতি নেয়ার কথা ভুলো না।'

মাথা ঝাঁকিয়ে লিভিং রূম থেকে বেরিয়ে গেল সুং।

বিশ মিনিট পর হানের পেন্টহাউস স্যুইটের লিভিং রূমে আসন গ্রহণ করলেন

প্রেসিডেন্টের অন্যতম উপদেষ্টা লিয়াং সেন ও কংগ্রেস সদস্য কার্টহিল ডগলাস। হানকে কিছু বলতে হলো না, সুং তাঁদেরকে ব্র্যান্ডি পরিবেশন করল।

হানই প্রথম শুরু করল, ভঙ্গিটা আক্রমণাত্মক, 'আমার সমস্ত প্ল্যান আইএনএস আর নুমা ধ্বংস করে দিয়েছে। অথচ আপনাদের দু'জনকেই আমি অনুরোধ করেছিলাম, যত টাকা লাগে দেব, অন্তত নুমাকে যেন আমার সমস্ত ফ্যাসিলিটি থেকে দূরে সরিয়ে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। আইএনএস-কেও নিষ্ক্রিয় রাখার জন্যে কম টাকা ঢালিনি আমি।'

'ভুলটা আপনিই করেছেন, মি. হান,' উপদেষ্টা লিয়াং সেন বললেন। 'নুমার স্পেশাল প্রজেক্ট ডিরেক্টর আর আইএনএস-এর ফিমেল এজেন্টকে খুন করতে গিয়ে আপনি আসলে মৌচাকে ঢিল মেরে বসেছেন। আমাদের পৃষ্ঠপোষকতায় তাইপে ট্রাইয়্যাড আমেরিকার মাটিতে অপারেশন চালায়, কাজেই এখানকার বাস্তব পরিস্থিত সম্পর্কে জানি আমি। কিন্তু আপনি আমাদের পরামর্শ গ্রহণ করেননি। এখানে কেউ যদি সরকারী কোন প্রতিষ্ঠানের কাউকে মেরে ফেলার চেষ্টা করে, সে যত ক্ষমতাধরই হোক, এমন কি প্রেসিডেন্টও তার কোন সাহায্যে আসেন না।'

'এ-পর্যন্ত যা কিছু করেছি আমি,' হান বলল, 'সবই আমাদের পারস্পরিক ব্যবসায়িক স্বার্থে, মি. সেন।'

'মানলাম,' মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন লিয়াং সেন। 'কিন্তু এ-ও তো সত্যি যে ভুল করলে তার খেসারত দিতে হয়।'

'আমেরিকায় আমাকে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে, এ আমি বিশ্বাস করি না,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল হান। 'ওয়াশিংটনে অনেক প্রভাবশালী বন্ধু আছে আমার। একশো সিনেটর আর কংগ্রেসম্যানকে আমি মাসোহারা দিই। প্রেসিডেন্টের ইলেকশন ফান্ডে মোটা টাকা চাঁদা দিয়েছি। তিনি আমাকে ব্যক্তিগত বন্ধুর মর্যাদা দেন।'

'সবই সত্যি,' এতক্ষণে মুখ খুললেন কংগ্রেসম্যান কার্টহিল ডগলাস। 'কিন্তু আপনার বন্ধুরা পরিস্থিতির চাপে অসহায় হয়ে পড়েছেন, মি. হান। দুর্ভাগ্যজনক এত সব ঘটনা একের পর এক ঘটে গেছে, হোয়াইট হাউসের কর্মকর্তাদের বোঝানো হয়েছে যে আপনি যুক্তরাষ্ট্রের জন্যে একটা বিপজ্জনক চরিত্র। শুনতে পাচ্ছি, আপনার সঙ্গে হোয়াইট হাউসের বিশেষ কোন সম্পর্ক থাকার কথা প্রকাশ্যে অস্বীকার করা হবে।'

'এত টাকা ঢালার পর এই হলো তার ফল?' হান হতভম্ব।

'আপনার দ্বারা উপকৃত হবার কথা কেউ অস্বীকার করছে না, মি. হান,' বললেন ডগলাস। 'কিন্তু ক্ষতিকর ভুল তো হয়েছেই। এখন বুদ্ধিমানের কাজ হবে আপনার অপূরণীয় কোন ক্ষতি হওয়া ঠেকানো। যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া দুনিয়ার যে-কোন পোর্ট ব্যবহার করতে পারবে হান ম্যারিটাইম। তাইওয়ান আর হংকঙে আপনার পাওয়ার বেস অটুট থাকবে। আপনি সারভাইভ করবেন, মি. হান। এখানকার ব্যবসা আমি আর মি. সেন চালাই আপাতত।'

'কিন্তু সানগারি? যুক্তরাষ্ট্রে আমার অন্যান্য পোর্ট ফ্যাসিলিটি যেগুলো তৈরি হচ্ছে?'

লিয়াং সেন কাঁধ ঝাঁকালেন। 'ওগুলোর কথা আপনাকে ভুলে যেতে হবে, মি.

হান। পোর্টগুলো তৈরি হচ্ছিল বিভিন্ন মার্কিন বিনিয়োগ গোষ্ঠির টাকায়, সরকারও ভর্তুকি দিচ্ছিল। আপনার নিজের টাকা খুব কমই ব্যয় হয়েছে। সেটাও আপনি ছ'মাসের মধ্যে পুষিয়ে নিতে পারবেন মালয়েশিয়া আর কোরিয়ায় লোক পাচার করে।'

'এত আয়োজন করার পর খালি হাতে ফিরে যেতে কষ্ট হবে আমার,' বিড় বিড় করল হান।

'আপনি না গেলে আমেরিকান জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট আপনাকে জেলে ভরবে।' লিয়াং সেনকে চিন্তিত দেখাল।

ডগলাস বললেন, 'দেরি করাটা নেহাতই বোকামি হয়ে যাবে, মি. হান। আমার পরামর্শ, আজ রাত দুটোর মধ্যেই আমেরিকা ত্যাগ করুন আপনি। খবর পেয়েছি, রাত দুটোর পর জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট আপনার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করবে।'

'নিশ্চয়ই খুনের অভিযোগে নয়?'

'না, ইচ্ছাকৃতভাবে ফেডারেল প্রপার্টি ধ্বংস করার অভিযোগে।'

'খুবই হালকা একটা কেস। প্রমাণ করা সম্ভব নয়।'

'এটা শুধু আপনাকে আটকে রাখার জন্যে,' বললেন লিয়াং সেন। 'তারপর একের পর এক আরও বহু অভিযোগ তোলা হবে। ওরিয়ন লেকে পাইকারী হত্যাকাণ্ড তার মধ্যে একটা। অস্ত্র, ড্রাগ, অবৈধ অভিবাসী আমদানি, ইত্যাদি প্রতিটি বিষয়ে আলাদা আলাদা কেস ফাইল করা হবে।'

'নিউজ মিডিয়া কি করছে?'

'বাতাসে গন্ধ শুঁকছে। কালো মেঘ যেমন আকাশ ঢেকে ফেলে, ওরাও তেমনি আপনাকে ঢেকে ফেলবে। তবে আপনি যদি চুপিচুপি কেটে পড়েন, আর তাইওয়ানে পৌঁছে কিছুদিন আত্মগোপন করে থাকেন, আমার বিশ্বাস ঝড়টা সামলে উঠতে খুব একটা সমস্যা হবে না।'

'আর আপনারা কি করবেন?'

'আমরা স্বীকারই করব না যে আপনার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক ছিল,' বললেন লিয়াং সেন।

'প্রশ্নই ওঠে না,' সায় দিলেন ডগলাস।

'আমাকে তাহলে কুকুরের খোরাক বানাবার কোন ষড়যন্ত্র করা হয়নি?'

'আমরা যেহেতু এখানে থাকছি, লক্ষ রাখব কেউ যাতে আপনার সর্বনাশ করতে না পারে,' বললেন লিয়াং সেন। 'আমেরিকান জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট আপনাকে ফেরত পাঠাবার জন্যে তাইওয়ান সরকারকে চাপ দিতে পারে, তবে তা যাতে না দেয় সেদিকটা দেখব আমরা–কথা দিলাম।'

'আমি সম্মানিত বোধ করছি,' নরম সুরে বলল হান। 'তাহলে এখানেই শেষ বার বিদায় নিচ্ছি আমরা, তাই না?'

লিয়াং সেন আর কাটহিল ডগলাস বিদায় নিয়ে চলে যাবার পর সোফা ছেড়ে দাঁড়াল হান। 'আত্মহত্যা করার কোন প্রয়োজন নেই, সুং। আজ চলে যাচ্ছি ঠিকই, কিন্তু আবার আমি আমেরিকার মাটিতে ফিরে আসব। তখন তুমিও আমার সঙ্গে

থাকবে। আপাতত আমার আরামের ব্যবস্থা করো। বেডরুমে যাও, একটু পরই আমি আসছি।'

'জ্বী, মাস্টার।'

সাত

রানা আর শাকিলা আলাপ করে চলে যাবার পর আস্তিন গুটিয়ে কাজে নেমে পড়ল বিউ মরটন। নিখোঁজ একটা জাহাজের ট্রেইল একবার যদি ধরে, দুনিয়ার আর কিছু সম্পর্কে তার কোন হুঁশ থাকে না। সংশ্লিষ্ট জাহাজটা সম্পর্কে যে-কোন সূত্র বা গুজব, তা সে যত নগণ্যই হোক, যাচাই না করে ছাড়বে না সে। সমস্যাটা যত বেশি জটিল আর সমাধানের অযোগ্য বলে মনে হবে ততই বেশি মনোযোগী হয়ে ওঠা তার স্বভাব, রাত বা দিনের প্রতিটি মুহূর্ত কাজে লেগে থাকা চাই। প্রিন্সেস হিয়া লিয়েন তৈরি হবার পর পানিতে নামানো থেকে শুরু করে নিখোঁজ হওয়া পর্যন্ত জানা সমস্ত ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ ও সাজানোর মধ্যে দিয়ে সে তার গবেষণা শুরু করল। জাহাজটার নির্মাণ কৌশল, প্ল্যান ও ডিজাইন, এঞ্জিন স্পেসিফিকেশন, ইকুইপমেন্ট, ডাইমেনশন ও ডেক প্ল্যান ইত্যাদি সংগ্রহ করতে খুব একটা বেগ পেতে হলো না। এ-সব থেকে সে জানতে পারল, প্রিন্সেস হিয়া লিয়েন অত্যন্ত শক্তিশালী ও লড়াকু জাহাজ ছিল, এশিয়ার কুখ্যাত সব হারিকেন আর টাইফুন তার কোন ক্ষতিই করতে পারেনি। ইংল্যান্ড আর সাউথ ইস্ট এশিয়ার আর্কাইভ তল্লাশী চালাবার জন্যে কয়েকজন গবেষককে সহকারী হিসেবে নিল মরটন, তাতে সময় আর খরচ বাঁচবে।

চীনের প্রাচীন ইতিহাস বিশেষজ্ঞ ঝাউ মিয়াং-এর সঙ্গে মরটনের খাতির ও যোগাযোগ আছে। শ্রদ্ধেয় পণ্ডিতের সাহায্য নিতে পারলে খুশি হত সে, কিন্তু রানা তাকে এমন কিছু করতে নিষেধ করে দিয়ে গেছে যার ফলে তাইওয়ানিজ শিপিং ম্যাগনেট হুয়ান হান প্রিন্সেস হিয়া সম্পর্কে নতুন আবিষ্কৃত কোন তথ্য জানতে পারে। তবে তাইওয়ানে কয়েকজন বন্ধু আছে তার, তাদের মাধ্যমে চিয়াং কাই-শেকের জীবিত সহকর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে সে নতুন কোন সূত্র পাবার আশায়।

তখনও ভোর হয়নি, কমপিউটর মনিটরে চোখ রেখে একে একে প্রিন্সেস হিয়ার ছ'টা ছবি খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল মরটন। সব মিলিয়ে জাহাজটার এই ছ'টা ছবিই পাওয়া গেছে। হিয়ার সুপারস্ট্রাকচার বো থেকে অনেকটা পিছনে, আর খোলের তুলনায় আকারে বেশ ছোট। জাহাজের কালার ইমেজের দিকে মনোযোগ দিল সে, সবুজ চিমনির মাঝখানে সাদা ব্যান্ড ম্যাগনিফাই করায় চোখে স্পষ্টভাবে ধরা পড়ল ক্যান্টন লাইন্স-এর প্রতীক চিহ্ন—সোনালি একটা সিংহ, বাম থাবা উঁচু হয়ে আছে। জাহাজটার লোডিং ক্রেন সংখ্যায় অনেকগুলো, বুঝতে অসুবিধে হয় না প্রচুর আরোহী ছাড়াও বিপুল কার্গো বহন করতে পারত।

প্রিন্সেস হিয়া লিয়েনের সিস্টার শিপ টা'লি সিনান-এর ফটোও সংগ্রহ করেছে

মরটন। হিয়ার এক বছর পর সিনানকে পানিতে নামানো হয়। রেকর্ড থেকে জানা গেছে, হিয়াকে স্ক্র্যাপে পরিণত করার যে তারিখ নির্ধারণ করা হয় তার ছ'মাস আগেই ভেঙে ফেলা হয় সিনানকে।

বুড়ি হিয়া ক্লান্ত-বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিল, সেজন্যেই সিঙ্গাপুরে নিয়ে গিয়ে ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সেদিক থেকে বিবেচনা করলে চীনের সমস্ত প্রাচীন ট্রেজার গোপন কোন লোকেশনে বয়ে নিয়ে যাবার জন্যে হিয়া মোটেও আদর্শ জাহাজ ছিল না। অন্তত প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দেয়ার সামর্থ্য তার না থাকারই কথা। মরটন ভাবল, গোপন লোকেশনটা কোথায় হতে পারে? চিয়াং কাই-শেক শেষ পর্যন্ত তাইওয়ানে চাইনীজ ন্যাশনালিস্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত করেন, কাজেই হিয়ার গন্তব্য তাইওয়ান হওয়াটাই যেন যুক্তিসঙ্গত। অথচ হিয়ার সর্বশেষ রিপোর্ট পাওয়া গেছে চিলির ভাইপারাসো-র এক ন্যাভাল রেডিও স্টেশনের অপারেটরের কাছ থেকে। মকরক্রান্তি থেকে ছ'হাজার মাইল দক্ষিণে, প্রশান্ত মহাসাগরের যেখানে সাধারণত কোন জাহাজ চলাচল করে না, সেখানে কি কারণে যাবে প্রিন্সেস হিয়া? ওদিকে যাবার গোপন কোন কারণ যদি থেকেও থাকে, সহজ-সোজা পথ ধরে অর্থাৎ ভারত মহাসাগর হয়ে কেপ অব গুড হোপ ঘুরে যায়নি কেন?

হিয়ার ফটোগুলো আবার পরীক্ষা করল মরটন। তার মন খুঁত খুঁত করছে। জাহাজটার আউটলাইন খুঁটিয়ে লক্ষ করার সময় মাথার ভেতর একটা আইডিয়া গজাতে শুরু করল। পানামায় তার এক বন্ধু আছে, নটিকাল আর্কিভিস্ট, টেলিফোন করে তার ঘুম ভাঙাল সে, জানতে চাইল উনিশশো আটচল্লিশের ২৮ নভেম্বর থেকে ৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত পশ্চিম থেকে পুব দিক গামী যত জাহাজ পানামা খাল পার হয়েছে তার একটা তালিকা দিতে পারবে কিনা।

ঘুম ভাঙানোয় রেগে গেলেও, চেষ্টা করে দেখবে বলে কথা দিল বন্ধু।

মরটন এবার হিয়ার সর্বশেষ যাত্রায় যে-সব অফিসার ডিউটিতে ছিল তাদের একটা তালিকা নিয়ে বসল। প্রায় সবাই তারা চীনা, শুধু ক্যাপটেন পেন্স ওয়াকার আর চীফ এঞ্জিনিয়ার ঝাঁঝর সিং বাদে।

আবার টেলিফোনের ডায়াল ঘোরাল মরটন। খানিক পর রিসিভারে ঘুম জড়ানো একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'হ্যালো, সঙ্গত কোন কারণ দেখাতে না পারলে খবর আছে।'

'ল্যারি, আমি মরটন।'

'বিউ, তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? ভোর চারটের সময় কেউ ফোন করে?' নুমার কমপিউটর জাদুকর ল্যারি কিং রাগ চেপে রাখতে ব্যর্থ হলো।

'আমি রানার হয়ে একটা ব্যাপারে রিসার্চ করছি। তোমার সাহায্য দরকার।'

ল্যারির রাগ হঠাৎ করেই পানি হয়ে গেল। 'রানার জন্যে কি না করতে পারি, কিন্তু তাই বলে ভোর চারটের সময় ফোন করবে তুমি?'

'ব্যাপারটা খুব জরুরী। তোমার কাছাকাছি কাগজ আর পেন্সিল আছে?' জানতে চাইল মরটন। 'তোমাকে কয়েকজনের নাম দিচ্ছি।' নামগুলো বলে গেল সে।

'কি করতে হবে আমাকে?' জানতে চাইল কিং, নামগুলো লিখে নিয়েছে সে।

'এরা কে কোথায় ছিল বা আছে, আইআরএস ও সোশাল সিকিউরিটি রেকর্ড দেখে যাচাই করতে হবে। তোমার নিজের কাছেও বিশাল ম্যারিটাইম রেকর্ডস আছে, চেক করতে ভুলো না।'

'আর কিছু?'

'তোমাকে একটা জাহাজও খুঁজে বের করতে হবে।'

'তাই?'

'উনিশশো আটচল্লিশের ২৯ নভেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর, এই সময়সীমার মধ্যে জাহাজটা কোন পোর্টে পৌঁছেছিল জানতে চেষ্টা করো।'

'নামটা বলবে তো।'

'ক্যান্টন লাইনের জাহাজ, নাম প্রিন্সেস হিয়া লিয়েন,' বলল মরটন।

'ঠিক আছে, নুমা হেডকোয়ার্টারে পৌঁছেই কাজ শুরু করব।'

'এখুনি ডিউটিতে বেরিয়ে পড়ো,' তাগাদা দিল মরটন। 'হাতে সময় খুব কম।'

'কথাটা সত্যি তো, তুমি রানার কাজ করছ?' জানতে চাইল কিং।

'যীশুর কিরে।'

'জানতে পারি, আসল ব্যাপারটা কি নিয়ে?'

'পারো না,' বলে যোগাযোগ কেটে দিল মরটন।

ছ'ঘণ্টা পর কল ব্যাক করল ল্যারি কিং।

অপরপ্রান্তে রিসিভার তুলে মরটন বলল, 'আমি বিউ মরটন।'

'আমি ল্যারি কিং,' কমপিউটর জিনিয়াস বন্ধুর কণ্ঠস্বর নকল করে ভেঙাল।

'ইন্টারেস্টিং কিছু পেলে?' জানতে চাইল মরটন।

'ক্যাপটেন সম্পর্কে প্রায় কিছুই না, অন্তত যা পেয়েছি তা তোমার কোন কাজে লাগবে না।'

'তাঁর চীফ এঞ্জিনিয়ার সম্পর্কে?'

'বিউ, তুমি বসে আছ তো?'

'কেন?' সাবধানে জানতে চাইল মরটন।

'দাঁড়িয়ে থাকলে বসে পড়ো, তা না হলে পড়ে যেতে পারো,' বলল কিং। 'প্রিন্সেস হিয়া লিয়েনের সঙ্গে চীফ এঞ্জিনিয়ার ঝাঁঝর সিং ডোবেননি।'

'কি ছাই বকছ!'

'উনিশশো পঞ্চাশ সালে ঝাঁঝর সিং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হয়েছেন।'

'সম্ভব নয়। এ তাহলে অন্য কোন ঝাঁঝর সিং।'

'না,' বলল কিং। 'তুমি যাকে খুঁজছ তাকেই আমি খুঁজে পেয়েছি। আমার সামনে ভদ্রলোকের এঞ্জিনিয়ারিং পেপারস-এর কপি রয়েছে, নাগরিকত্ব পাবার পরপরই এগুলো তিনি রিনিউ করার জন্যে ইউ.এস. ডিপার্টমেন্ট অভ ট্র্যান্সপোর্টেশন-এর ম্যারিটাইম অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে জমা দেন। এরপর পরবর্তী সাতাশ বছর নিউ ইয়র্কের ইনগ্রাম লাইনের চীফ এঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজ করেছেন তিনি। উনিশশো উনপঞ্চাশে ক্যারিনা মেরিল নামে এক ভদ্রমহিলাকে

বিয়ে করেন ঝাঁঝর সিং। ওঁরা পাঁচ সন্তানের জনক-জননী হয়েছেন।'

'ভদ্রলোক আজও বেঁচে?' হতভম্ব মরটন জানতে চাইল।

'রেকর্ড বলছে, এখনও তিনি পেনশন আর সোশাল সিকিউরিটি চেক নিয়মিত গ্রহণ করে যাচ্ছেন।'

'এমন কি হতে পারে, প্রিন্সেস হিয়া লিয়েন ডুবে গেলেও, কোনভাবে বেঁচে যান ঝাঁঝর সিং?'

'যদি ধরে নাও হিয়া ডোবার সময় তাতে তিনি ছিলেন, তাহলে ঠিক তাই ঘটেছে,' জবাব দিল কিং। 'তুমি কি এখনও চাও প্রিন্সেস হিয়া ইস্টার্ন সীবোর্ড পোর্টে তোমার দেয়া সময়-সীমার মধ্যে পৌঁছেছে কিনা খোঁজ নিই আমি?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই,' বলল মরটন। 'আরও একটা কাজ করো, প্লীজ। শিপিং-পোর্ট অ্যারাইভাল রেকর্ড ঘেঁটে দেখো ক্যান্টন লাইন্সেরই আরেকটা জাহাজ প্রিন্সেস টা'লি সিনান সম্পর্কে কিছু জানতে পারো কিনা।'

'এরমধ্যেও কোন রহস্য আছে নাকি?'

'ইনটিউইশন, স্রেফ ইনটিউইশন।'

দুপুরে খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল মরটন। দু'ঘণ্টা পর টেলিফোনের শব্দে ঘুম ভাঙল। কয়েকবার রিঙ হবার পর রিসিভার তুলল সে।

'বিউ মরটন, পানামা থেকে আমি হোসে ফার্নান্দেজ বলছি।'

'হোসে, যোগাযোগ করার জন্যে ধন্যবাদ, ভাই। কিছু পেলে?'

'প্রিন্সেস হিয়া লিয়েন সম্পর্কে কিছুই পাইনি। দুঃখিত।'

'শুনে খারাপ লাগছে। আমার ধারণা ছিল জাহাজটা পানামা খাল পেরিয়েছে।'

'তবে আমি এক অদ্ভুত কোইন্সিডেন্স লক্ষ করেছি।'

'কি?'

'ক্যান্টন লাইন্সেরই অন্য একটা জাহাজ, প্রিন্সেস টা'লি সিনান উনিশশো আটচল্লিশের পয়লা ডিসেম্বরে খাল পার হয়।'

রিসিভার ধরা মরটনের মুঠো শক্ত হয়ে গেল। 'কোন দিকে যাচ্ছিল সিনান?'

'পশ্চিম থেকে পুবে,' জবাব দিল হোসে ফার্নান্দেজ। 'প্যাসিফিক থেকে ক্যারিবিয়ানে।'

অপার উল্লাসে কথাই বলতে পারল না মরটন। কয়েকটা ঘুঁটি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না ঠিকই, তবে ধাঁধার একটা আকৃতি ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে উঠছে। 'তোমার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ, হোসে। তুমি আমার খুব বড় একটা উপকার করলে।'

'উপকারে লাগায় আমিও খুশি,' বলল ফার্নান্দেজ। 'তবে আগামীতে আমাকেও সাহায্য কোরো।'

'তুমি শুধু বলতে যা দেরি।'

'আরেকটা কথা। যখনই ফোন করবে, দিনের বেলা, কেমন?'

'চেষ্টা করব।'

'বাই।'

বিসিআই চীফ মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খানের সঙ্গে রানা কথা বলল

বাংলাদেশ দূতাবাস ওয়াশিংটন থেকে। শাকিলার কাছ থেকে পাওয়া ঢাকার কয়েকজন ম্যানপাওয়ার রিক্রুটিং এজেন্ট আর তাদের ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের নাম-ঠিকানা জানিয়ে বসকে অনুরোধ করল, সিআইডি পুলিস যেন অফিসগুলোয় হানা দিয়ে সমস্ত কাগজ-পত্র আটক করে, বেআইনী উপায়ে মানুষ পাচারের অভিযোগে তাদেরকে যেন গ্রেফতারও করা হয়। হুয়ান হান ম্যারিটাইম লিমিটেড সম্পর্কেও মৌখিক একটা সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট দিল ও, সবশেষে জানাল প্রাচীন চীনা আর্ট ট্রেজার খুঁজে পাবার সম্ভাবনা সম্পর্কে।

বিস্তারিত সব জানার পর রাহাত খান অল্প একটু প্রশংসা করলেন রানার, বললেন, 'কাজ তো ভালই করছ, তবে শেষটুকু সুষ্ঠুভাবে সারতে পারলেই কেবল এদেশে পুঁজি বিনিয়োগ এবং আরও কিছু সুবিধের জন্যে আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জোরাল দেন-দরবার করতে পারবে। কাজ শেষ হলে রিপোর্ট করবে আমাকে, ওদেরকে আমি নিজে ব্রিফিং করব। এই একটা সুযোগ পাওয়া গেছে রানা, এটা যেন হাতছাড়া না হয়।'

রানা প্রতিশ্রুতি দিল, ও ওর সাধ্যমত ভাল করার চেষ্টা করবে। তারপর জানাল, ওয়াশিংটনে চীনা এমব্যাসীর অ্যামব্যাসাডরের সঙ্গে আজই দেখা করতে চায় ও। রাহাত খান কারণ জানতে চাইলে বলল, 'ওদেরকে ওদের আর্ট ট্রেজার সম্পর্কে সতর্ক করতে চাই।'

রাহাত খান বললেন, 'ঠিক আছে, কর্মকর্তা যিনি আছেন তাঁকে লাইন দাও, চীনা এমব্যাসীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলছি আমি।'

চীনা দূতাবাসের সঙ্গে বাংলাদেশ দূতাবাসের সম্পর্ক খুব ভাল, আর তাছাড়া বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের অন্যতম এজেন্ট মাসুদ রানা সম্পর্কে ওদের খানিকটা ধারণাও আছে, অ্যামব্যাসাডরের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ঠিক করতে তেমন সময় লাগল না।

এক ঘণ্টা পর চীনা দূতাবাসে হাজির হলো রানা, নিজের খাস চেম্বারে অ্যামব্যাসাডর স্বয়ং রানাকে অভ্যর্থনা জানালেন। প্রিন্সেস হিয়া লিয়েনের ইতিহাস, আর্ট ট্রেজার লুঠ করায় চিয়াং কাই-শেকের ভূমিকা, সিস্টার শিপ প্রিন্সেস টা'লি সিনান-এর ইতিহাস, হারানো আর্ট ট্রেজার খুঁজে পাবার সম্ভাবনা ইত্যাদি ব্যাখ্যা করল রানা। কথা না বলে গভীর মনোযোগ সহকারে সব শুনলেন রাষ্ট্রদূত। সব শেষে রানা জানাল, তাইওয়ান সরকার আর্ট ট্রেজার দাবি করবে, এমন কি হুয়ান হানও দাবি করবে, কিন্তু আমার ধারণা ওগুলো পাবার অধিকার একমাত্র পিপল'স রিপাবলিক অভ চায়নার। 'আপনারা যত তাড়াতাড়ি ওগুলো নিজেদের বলে দাবি করবেন ততই মঙ্গল। তা না হলে কিন্তু সব হাতছাড়া হয়ে যাবার আশঙ্কা।'

'আমরা সত্যি কৃতজ্ঞ,' সোফা ছেড়ে উঠে এসে রানার কাঁধে হাত রাখলেন প্রৌঢ় অ্যামব্যাসাডর। 'বেইজিংয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করে একটু পরই আপনাকে আমরা জানাচ্ছি ফাইন্ডার'স ফী হিসেবে বাংলাদেশকে আমরা কি দিতে পারব।'

স্যাটেলাইট টেলিফোনে বেইজিংয়ের সঙ্গে আলাপ করার জন্যে কমিউনিকেশন সেকশনে চলে গেলেন অ্যামব্যাসাডর, আধ ঘণ্টা পর ফিরে এলেন উদ্ভাসিত চেহারা নিয়ে। 'ত্রিশ পার্সেন্ট কি যথেষ্ট নয়, মি. রানা?'

'মোর দ্যান এনাফ,' বলে হেসে উঠল রানা।

বিদায় দেয়ার সময় রানাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন অ্যামব্যাসাডর। 'আপনার এই উপকার কোনদিন আমরা ভুলব না।'

কংগ্রেস সদস্যা মিস লরেলির সেই হ্যাঙ্গার আর খামারবাড়ির ওপর অত্যাধুনিক ফ্ল্যাটে রানার তরফ থেকে শাকিলা আজ মেহমানদারির দায়িত্ব নিয়েছে। নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন নুমার ডিরেক্টর অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন, অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর জর্জ রেডক্লিফ, আইএনএস-এর অ্যাসোশিয়েট কমিশনার পিট লুকাস আর রানার বন্ধু ও ফ্রিল্যান্সার গবেষক বিউ মরটন। ডাইনিং রূমে খেতে বসে সবাই একবাক্যে স্বীকার করল, শুধু চীনা জাহাজের কুক হিসেবেই নয়, ইউরোপ-আমেরিকার যে-কোন ফাইভ স্টার হোটেলের শেফ হিসেবেও অনায়াসে উতরে যাবে শাকিলা। সবার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনে লজ্জা পেল ও, মাথা নেড়ে সবিনয়ে জানাল, 'রানার কাছ থেকে টিপস না পেলে আমি জানতে পারতাম না আপনাদের কার কি পছন্দ।'

সবাইকে লিভিং রূমে নিয়ে এসে বসাল ও, তারপর কাউকে ব্র্যান্ডি বা হুইস্কি, আবার কাউকে কফি পরিবেশন করল।

সরু একটা চুরুট ধরিয়ে মরটনের দিকে তাকালেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। 'বিউ মরটন। কৌতূহলে মারা যাচ্ছি আমি। রানা বলছে তুমি নাকি সাংঘাতিক কি একটা আবিষ্কার করে বসেছ।'

'শুনলাম ওই আবিষ্কারের সঙ্গে আইএনএস-এর স্বার্থও জড়িত,' বললেন পিট লুকাস। 'কাজেই আমিও কৌতূহলী।'

'আমি একটু বলি,' কফির কাপে ছোট্ট একটা চুমুক দিয়ে বলল রানা। 'মরটনকে আমি প্রিন্সেস হিয়া লিয়েন নামে একটা নিখোঁজ জাহাজ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে বলি। ও যদি ডুবন্ত জাহাজটার সন্ধান পেয়ে থাকে, তা শুধু আমাকেই জানানোর কথা।'

ভুরু কোঁচকালেন পিট লুকাস। 'তাহলে আমাদের আপনি ডাকলেন কেন?'

অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনও অস্বস্তিবোধ করছেন। 'কি ব্যাপার, রানা? ঠিক কি বলতে চাও তুমি?'

'চীনের ইতিহাস আপনারা সবাই জানেন, কাজেই নতুন করে আপনাদের আমি কিছু বলতে যাচ্ছি না,' বলল রানা। 'শুধু কয়েকটা পয়েন্ট উল্লেখ করব। সাবেক ফরমোজা নামে যে দ্বীপটাকে আমরা চিনতাম বর্তমানে সেটা তাইওয়ান নামে পরিচিত। তাইওয়ান মূল চীনের প্রতিনিধিত্ব করে না। চিয়াং কাই-শেক ছিলেন জাতীয়তাবাদী নেতা, উনিশশো আটচল্লিশ সালে মূল চীন থেকে ফরমোজায় পালিয়ে যান তিনি, যাবার সময় প্রাচীন চীন সভ্যতার প্রায় সমস্ত শিল্পকর্ম ও আর্টিফ্যাক্ট একটা জাহাজে তুলে অজানা গন্তব্যে পাঠিয়ে দেন। সহজ ভাষায় এটাকে চুরি বা ডাকাতি ছাড়া আর কিছু বলার উপায় নেই।'

'এ পর্যন্ত আমি তোমার সঙ্গে একমত,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'তবে তোমার কথা বোধহয় এখনও শেষ হয়নি।'

'যে জাহাজটা অজানা গন্তব্যে রওনা হয় তার নাম প্রিন্সেস হিয়া লিয়েন। আমার প্রশ্ন হলো, এখন যদি আমরা জাহাজটা উদ্ধার করতে পারি, আর উদ্ধার করার পর যদি দেখা যায় প্রাচীন চীনা শিল্পকর্ম ও আর্টিফ্যাক্ট সত্যিই আছে তাতে, সেগুলো কার প্রাপ্য হবে?'

এক সেকেন্ড চিন্তা করলেন অ্যাডমিরাল, তারপর বললেন, 'এখানে একটা প্রশ্ন জাগে। জাহাজটা কোথেকে উদ্ধার করছি আমরা?'

'যেখান থেকেই করি। ধরুন, চিলির উপকূল থেকে উদ্ধার করলাম। বা যুক্তরাষ্ট্রের উপকূলীয় জলসীমার ভেতর কোথাও থেকে।'

'এ খুব জটিল প্রশ্ন, রানা।' অ্যাডমিরালকে চিন্তিত দেখাল। 'এ-ব্যাপারে এক এক দেশে এক এক আইন প্রচলিত। আমেরিকার কোন কোন রাজ্যের আইন হলো, যার উদ্যোগে উদ্ধার কাজ সমাধা হবে ট্রেজারের একটা অংশ তার প্রাপ্য। তার প্রাপ্য অংশের আনুমানিক দাম ধরে আয়কর বিভাগ ট্যাক্স চেয়ে বসবে। ওই জলসীমা যদি কোন ব্যক্তি বা কোম্পানী লীজ নিয়ে থাকে, সে-ও একটা ভাগ পাবে। আরেকটা ভাগ পাবে রাজ্য সরকার। বাকিটুকু চলে যাবে ফেডারেল সরকারের হাতে। আইনটার খুঁটিনাটি জটিল দিকগুলো অভিজ্ঞ একজন লইয়ারই শুধু ব্যাখ্যা করতে পারবেন।'

'আমার বক্তব্য সংক্ষিপ্ত করি,' বলল রানা। 'আমেরিকায় হুয়ান হানের প্রভাব সম্পর্কে সবাই আমরা সচেতন। সে আমেরিকা ছেড়ে চলে গেলেও, এখানে তার স্বার্থ দেখার লোকের অভাব নেই—সবাই তারা অত্যন্ত প্রভাবশালীও বটে। আমার ভয় হচ্ছে, জাহজটা উদ্ধার করা সম্ভব হলে সেটা না তাইওয়ানের তরফ থেকে দাবি করে বসে হান। আমি জানি, তাকে সমর্থন করার লোকের অভাব হবে না।'

'এ ব্যাপারে মনে হচ্ছে তোমার কোন পরামর্শ আছে,' বললেন অ্যাডমিরাল।

'ঠিক পরামর্শ নয়, অনুরোধ,' বলল রানা। 'অনুরোধটা আমি আপনার মাধ্যমে মি. প্রেসিডেন্টকে করতে চাই।'

'কি সেটা?' কৌতূহলী দেখাল অ্যাডমিরালকে।

'চীনা ট্রেজার আমরা যদি উদ্ধার করতে পারি, সবই যাদের জিনিস তাদেরকে ফিরিয়ে দিতে হবে।'

'অর্থাৎ পিপল'স রিপাবলিক অব চায়নাকে?'

'হ্যাঁ।'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর অ্যাডমিরাল বললেন, 'আমি তোমাকে কোন প্রতিশ্রুতি দিতে পারছি না, রানা। তবে একটা কাজ অবশ্যই করতে পারি। তা হলো, প্রেসিডেন্টের সঙ্গে তোমার সাক্ষাতের ব্যবস্থা। যা বলার তাঁকেই তুমি বলবে।'

'আমি সন্তুষ্ট।' মাথা ঝাঁকাল রানা।

'এবার আমার পালা,' বলে চেয়ারে নড়েচড়ে বসল মরটন, পায়ের কাছ থেকে একটা ব্রীফকেস তুলে ভেতর থেকে কয়েকটা ফাইল বের করল। একটা ফাইল খুলে চোখ বুলাল কিছুক্ষণ, তারপর মুখ তুলল। 'প্রথম কথা, একটা গুজব-ঐতিহাসিক চীনা আর্ট ট্রেজার নিয়ে প্রিন্সেস হিয়া লিয়েন নামে একটা প্যাসেঞ্জার

শিপ সাংহাই ত্যাগ করেছিল উনিশশো আটচল্লিশ সালের নভেম্বর মাসে। গুজবটা গুজব নয়, সত্য ঘটনা।'

'কিভাবে নিশ্চিত হচ্ছ?' জর্জ হ্যামিলটনের প্রশ্ন।

'ভদ্রলোকের নাম ফুই উয়া, একজন সাবেক ন্যাশনালিস্ট আর্মি কর্নেল, চিয়াং কাই-শেকের অধীনে দায়িত্ব পালন করেছেন। উয়া এখন তাইপেতে। কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে লড়াই করেন তিনি, তারপর ফরমোজায় পালিয়ে যান– এখন যেটাকে তাইওয়ান বলা হচ্ছে। এখন তাঁর বয়েস বিরানব্বুই হলেও স্মৃতিশক্তি ক্ষুরের মত ধারাল। চীনের সমস্ত মিউজিয়াম আর প্রাসাদের যেখানে যত আর্ট ট্রেজার ছিল সব খালি করে এক জায়গায় জড়ো করার নির্দেশ দেন চিয়াং কাই-শেক, এই ঘটনার কথা পরিষ্কার মনে আছে তাঁর। ধনকুবেরদের ব্যক্তিগত কালেকশনেও হাত দেয়া হয়। হাত দেয়া হয় বিখ্যাত সব ব্যাঙ্কের ভল্টে। তারপর সমস্ত ট্রেজার কাঠের বাক্সে ভরে জড়ো করা হয় সাংহাই ডকে। চিয়াং কাই-শেকের একজন জেনারেলের উপস্থিতিতে বাক্সগুলো একটা প্যাসেঞ্জার স্টীমার-এ তোলা হয়। জেনারেলের নাম ছিল চিউয়েন কাও। প্রিন্সেস হিয়া লিয়েন নিখোঁজ হবার সময় থেকে তাঁর নামও আর শোনা যায়নি। এ থেকে ধরে নিতে হয় ওই জাহাজেই ছিলেন তিনি।

'হিয়ায় যতটুকু জায়গা ছিল তারচেয়ে বেশি ট্রেজার আনা হয় ডকে। তবে ভেঙে ফেলার জন্যে সিঙ্গাপুরে নিয়ে যাবার কথা ছিল হিয়াকে, তাই সমস্ত ফার্নিচার আগেই নামিয়ে ফেলা হয়েছিল, ফলে বাক্সের সংখ্যা এক হাজারের বেশি হলেও এক এক করে সবগুলোই তোলা সম্ভব হয়। শুধু হোল্ডগুলো নয়, খালি প্যাসেঞ্জার স্টেটরুমেও রাখা হয় ওগুলো। স্কাল্পচার ভরা বড় আকৃতির বাক্সগুলো রশি দিয়ে বেঁধে খোলা ডেকে ফেলে রাখা হয়। প্রিন্সেস হিয়া সর্বকালের সবচেয়ে মূল্যবান ট্রেজার নিয়ে সাংহাই থেকে রওনা হয় উনিশশো আটচল্লিশ সালের দোসরা নভেম্বর।'

'রওনা হবার পর অদৃশ্য হয়ে গেল?' রেডক্লিফ জানতে চাইলেন।

'ঠিক একটা ভূতের মত।'

'আপনি বললেন ঐতিহাসিক আর্ট ট্রেজার,' বললেন রেডক্লিফ। 'ঠিক কি কি লুঠ করা হয় তা কি জানা গেছে?'

'জাহাজটায় ওগুলোর যদি কোন তালিকা থাকে,' জবাব দিল মরটন, 'দুনিয়ার যে-কোন মিউজিয়ামের কিউরেটর তাতে একবার শুধু চোখ বুলাবার সুযোগ পেলে অদম্য ঈর্ষায় আর লোভে এমনভাবে আক্রান্ত হবেন, পাগল হয়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়। ধরুন সংক্ষিপ্ত একটা ক্যাটালগ পাওয়া গেল। তাতে কি কি থাকবে একটা ধারণা দিই। শ্যাং-ডাইন্যাস্টির ব্রোঞ্জের তৈরি অস্ত্রশস্ত্র আর ফুল-মোম-আতর-দানির ডিজাইন। যীশুর জন্মের ষোলোশো বছর আগে শ্যাং শিল্পীরা পাথর, জেড, মার্বেল, হাড় ও আইভরি কেটে-চেঁছে নিজেদের ইচ্ছে মত আকৃতি দিতে দক্ষ হয়ে ওঠেন। চাও সাম্রাজ্যের আমলে কাঠের ওপর কনফুসিয়াসের নিজের হাতের লেখা পাওয়া যাবে, এই সাম্রাজ্যের মেয়াদ ছিল যীশুর জন্মের এগারোশো বছর আগে থেকে দুশো বছর আগে পর্যন্ত। ক্যাটালগে থাকবে মনোহর ব্রোঞ্জ ও মাটির

স্কাল্পচার, মূল্যবান রত্নখচিত সোনার ধূপদানী, প্রমাণ সাইজের রথ, ছ'টা ঘোড়া আর ঘোড়সওয়ার সহ। হান সাম্রাজ্যের মেয়াদ কাল ছিল দুশো ছয় বি.সি. থেকে দুশো বিশ এ.ডি.–পাওয়া যাবে অদ্ভুত ডিজাইনের চীনামাটির পাত্র, গামলা, ফুলদানি, প্রাচীন চীনা কবিদের পাণ্ডুলিপি, চিত্রশিল্প। টি'য়্যাং সাম্রাজ্যের মেয়াদ কাল ছিল ছয়শো আঠারো খ্রিস্টাব্দ থেকে নয়শো সাত খ্রিস্টাব্দ, তখনকার ওস্তাদ পেইন্টারদের শিল্পকর্ম সবই প্রায় হারিয়ে গেছে, তবে আশা করা যায় ওই ক্যাটালগে পাওয়া যাবে। এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না, ওই আমলের একটা পেইন্টিং গত বছর বেইজিং থেকে চুরি যায়, লন্ডনের একটা অকশন হাউসে গোপনে সেটা বিক্রি করা হয়েছে দুই মিলিয়ন পাউন্ডে। মাঝখানে আরও দু'একটা সাম্রাজ্যের কথা বাদ দিয়ে আসুন মিং সাম্রাজ্যে, সে-সময়কার শিল্পীরা কার্ভিং আর স্কাল্পচারে ছিলেন সারা দুনিয়ার সেরা। বিশেষ করে অলঙ্কার শিল্পে খুবই দক্ষ ছিলেন তাঁরা। আসবাব আর মৃন্ময় পাত্রে নকশা তৈরিতেও ছিলেন নিপুণ কারিগর। তাঁদের তৈরি নীল আর সাদা চীনামাটির বিভিন্ন আকৃতির বিখ্যাত পাত্র সম্পর্কে সবাই আমরা জানি।'

চুরুট থেকে পাক খেয়ে ওঠা ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে থাকলেন অ্যাডমিরাল। 'সনোরান মরুভূমি থেকে রানা যে ইনকা ট্রেজার উদ্ধার করেছিল, তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে এগুলো তারচেয়েও অনেক দামী।'

'এ যেন কাপ ভর্তি চুনির সঙ্গে ট্রাক ভর্তি পান্নার তুলনা,' হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলল মরটন। 'এ বিশাল সম্পদের মূল্যায়ন করা আসলে সম্ভবই নয়। ডলারের হিসাবে, আমরা এখানে কয়েক বিলিয়নের কথা বলছি। কিন্তু ঐতিহাসিক ট্রেজার হিসেবে অমূল্য শব্দটিও সঠিক অর্থ প্রকাশে সক্ষম নয়।'

স্তম্ভিত ও বিহ্বল দেখাচ্ছে শাকিলাকে। 'এই পরিমাণ সম্পদ আমি কল্পনাও করতে পারি না।'

'আরও আছে,' শান্ত সুরে বলল মরটন, সবাইকে যেন সম্মোহিত করতে চাইছে। 'এটাকে বলা যেতে পারে কেকের ওপর ক্রীম। চীনারা যেটাকে মাথার মুকুট বলে মনে করবে।'

'নীলকান্তমণি আর চুনির চেয়েও দামী?' জানতে চাইল শাকিলা। 'কিংবা হীরে আর মুক্তোর চেয়েও?'

'আমি যেটার কথা বলতে চাইছি সেটার তুলনায় ওগুলো স্রেফ নুড়ি পাথর বলে উড়িয়ে দেয়া যায়,' মরটনের গলা খাদে নেমে গেল। 'পিকিং ম্যান-এর হাড়।'

'গুড লর্ড!' সশব্দে নিঃশ্বাস ফেললেন অ্যাডমিরাল। 'মরটন, তুমি নিশ্চয়ই বলতে চাইছ না প্রিন্সেস হিয়ায় পিকিং ম্যান ছিল?'

'ছিল,' মাথা ঝাঁকিয়ে নিশ্চিত করল মরটন। 'কর্নেল ফুই উয়া কসম খেয়েছেন, মিথ্যে বললে নরকে যাবেন–লোহার একটা বাক্সে পিকিং ম্যান-এর হাড়গুলো ছিল। ক্যাপটেনের কেবিনে বাক্সটা তোলা হয় প্রিন্সেস হিয়া রওনা হবার মাত্র কয়েক মিনিট আগে।'

'আমাদের চীনা প্রতিবেশীরা বাবার সঙ্গে প্রায়ই এই হাড়গুলো নিয়ে গল্প করেন,' বলল শাকিলা। 'প্রাচীন সম্রাটদের সমাধি খুঁজে পেলে ঐতিহ্যপ্রিয় চীনারা

উল্লাসে মেতে ওঠে, ওই সব সমাধি থেকে পাওয়া ছোট্ট একটা মৃৎপাত্র কেনার জন্যে বিদেশী কালেক্টররা লাখ লাখ ডলার দাম দিতে কার্পণ্য করেন না। কিন্তু চীনাদের কাছে ওই সব সমাধির চেয়েও অনেক বেশি গুরুত্ব বহন করে পিকিং ম্যানের হাড়।'

অ্যাডমিরাল সোফা ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন, খানিকটা ঝুঁকে মরটনের দিকে তাকিয়ে আছেন। 'তুমি জানো তো, পিকিং ম্যানের ওই বোন ফসিল বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে আলোচিত অথচ ব্যাখ্যার অতীত রহস্য?'

'অ্যাডমিরাল, মনে হচ্ছে পিকিং ম্যানের ইতিহাস সম্পর্কে বিস্তারিত জানেন আপনি?' জিজ্ঞেস করলেন রেডক্লিফ।

'আমিও জানি,' বিড়বিড় করল রানা, তবে কাউকে শোনাবার জন্যে বলেনি, ফলে কেউ শুনতেও পেল না।

রেডক্লিফের প্রশ্নের উত্তরে অ্যাডমিরাল বললেন, 'ন্যাভাল অ্যাকাডেমিতে থাকার সময় নিখোঁজ পিকিং ম্যান সম্পর্কে আমি একটা পেপার তৈরি করেছিলাম। আমার জানামতে উনিশশো একচল্লিশ সালে হাড়গুলো হারিয়ে গেছে, তারপর আর ওগুলোর কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। কিন্তু মরটন এখন বলছে সাত বছর পর ওগুলো আবার দেখা গেছে যাত্রা শুরু করার আগে প্রিন্সেস হিয়া লিয়েনে।'

'কোত্থেকে এল ওগুলো?' পিট লুকাস জিজ্ঞেস করলেন।

মাথা ঝাঁকিয়ে অ্যাডমিরালের দৃষ্টি আকর্ষণ করল মরটন। 'আপনি লিখেছেন, আপনিই বলুন।'

'সিন্যানথ্রোপাস পিকিনেনসিস,' মৃদু, সশ্রদ্ধ কণ্ঠে বললেন অ্যাডমিরাল। 'পিকিং-এর চীনা মানুষ। অতি প্রাচীন ও আদিম পূর্ব-পুরুষ, দু'পায়ে ভর দিয়ে সিধে হয়ে হাঁটতে পারত। উনিশশো উনত্রিশ সালে একজন কানাডিয়ান অ্যানাটোমিস্ট, ড. ডেভিডসন ব্ল্যাক তার খুলি আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করেন। রকফেলার ফাউন্ডেশনের ফান্ডে পরিচালিত খনন কর্মসূচীর পরিচালক ছিলেন তিনি। এরপর কয়েক বছর ধরে একটা কোয়ারি খোঁড়ার কাজে ব্যস্ত থাকেন ভদ্রলোক। জায়গাটায় এক সময় লাইমস্টোন গুহা বহুল একটা পাহাড় ছিল, চৌকৌতিয়েন গ্রামের কাছে। ব্ল্যাক এখানে কয়েক হাজার ভাঙা পাথরের টুলস পান, আরও পান উনান; এ-সব প্রমাণ থেকে পরিষ্কার হয়ে যায় পিকিং ম্যান আগুনকে আয়ত্তে আনতে পেরেছিল। আরও দশ বছর খোঁড়াখুঁড়ি চলতে থাকে। এবার চল্লিশজনের দেহাবশেষ পাওয়া যায়, পরিণত ও অপরিণত সব বয়েসেরই। এত বড় হিউম্যান ফসিল কালেকশন আর কোথাও পাওয়া যায়নি।'

'জাভা ম্যান-এর সঙ্গে কোন সম্পর্ক আছে?' জানতে চাইলেন রেডক্লিফ। 'পিকিং ম্যানের চেয়ে ত্রিশ বছর আগে পাওয়া যায় জাভা ম্যান।'

'উনিশশো উনত্রিশ সালে জাভা আর পিকিং খুলি পরীক্ষা করা হয়, মিল পাওয়া যায় প্রায় হুবহু, তবে দৃশ্যপটে জাভা ম্যানের আবির্ভাব ঘটে কিছু সময় আগে, অস্ত্র বা গৃহস্থালির কাজে ব্যবহারযোগ্য জিনিস-পত্র তৈরিতে পিকিং ম্যানের মত সফিসটিকেটেড ছিল না তারা।'

'সায়েন্টিফিক ডেটিং টেকনিক আরও পরে উদ্ভাবিত হয়,' বললেন পিট

লুকাস। 'পিকিং ম্যানের বয়েস তাহলে কত ধরব আমরা?'

'আবার খুঁজে না পেলে সায়েন্টিফিকালি বয়েস নির্ধারণ করা সম্ভব নয়,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'আনুমানিক বয়েস ধরা যে্তে পারে সাত থেকে দশ লক্ষ বছরের মধ্যে। তবে চীনে নতুন সব আবিষ্কার থেকে আভাস পাওয়া যায় যে হোমো ইরেকটাস, মানুষের আদি প্রজাতি, আফ্রিকা থেকে এশিয়ায় এসেছিল বিশ লক্ষ বছর আগে। স্বভাবতই চীনা নৃবিজ্ঞানীরা এটা প্রমাণ করার আশা পোষণ করেন যে আদি মানব জাতির ক্রম বিকাশ ঘটেছিল এশিয়াতে, তারাই আফ্রিকাতে মাইগ্রেট করে—অর্থাৎ এর ঠিক উল্টো ধারণাটা তাঁরা মানতে রাজি নন।'

'পিকিং ম্যানের ফসিল হারিয়ে গেল কিভাবে?' শাকিলা জানতে চাইল।

'উনিশশো একচল্লিশ সালের ডিসেম্বর মাসে, আক্রমণকারী জাপানী সৈন্যরা পিকিং-এর কাছাকাছি চলে আসে,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'তখন পিকিং ইউনিয়ন মেডিকেল কলেজের কর্মকর্তারা—ওই মেডিকেল কলেজেই ছিল পিকিং ম্যানের হাড়—সিদ্ধান্ত নেন, ওগুলো নিরাপদ কোথাও সরিয়ে ফেলা দরকার। চীনাদের মনে তখন একটা ধারণা ছিল, জাপান আর যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ বাধতে যাচ্ছে। চীনা আর মার্কিন বিজ্ঞানীরা একমত হলেন যে নিরাপত্তার স্বার্থে পিকিং ম্যানের ফসিল যুক্তরাষ্ট্রে পাঠিয়ে দেয়া হবে, ফিরিয়ে আনা হবে যুদ্ধ শেষ হলে। কয়েক মাস ধরে সংলাপ চলার পর অবশেষে পিকিং-এ আমেরিকান অ্যামবাসাডর ইউ.এস. মেরিনদের একটা ডিটাচমেন্টকে দায়িত্ব দিলেন তারা যেন জাহাজে করে হাড়গুলো ফিলিপাইনে নিয়ে যায়।

'প্রাচীন হাড়গুলো দুটো ফুট লকারে ভরা হয়, সেগুলো নিয়ে একটা ট্রেনে চড়ে মেরিনরা, বন্দর শহর টিয়েন্তসিন-এ যাবে, ওখান থেকে এস.এস. প্রেসিডেন্ট হ্যারিসন-এ চড়বে। এস.এস. প্রেসিডেন্ট হ্যারিসন ছিল আমেরিকান প্রেসিডেন্ট লাইন্সের একটা প্যাসেঞ্জার শিপ। কিন্তু ট্রেনটা কোন দিনই টিয়েন্তসিন শহরে পৌঁছায়নি। মাঝপথে কোথাও জাপানীরা ওটাকে থামায়, ওপরে উঠে সব কিছু লণ্ডভণ্ড করে দেয়। ইতিমধ্যে ডিসেম্বরের আট তারিখ এসে গেছে, সাল উনিশশো একচল্লিশ। মেরিনরা নিজেদেরকে নিরপেক্ষ বলে মনে করত, জাপানীরা তাদেরকে ধরে প্রিজন ক্যাম্পে পাঠায় যুদ্ধ শেষ হলে ছেড়ে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে। এক্ষেত্রে শুধু আন্দাজ করা চলে যে দশ লক্ষ বছর মাটির তলায় পড়ে থাকার পর পিকিং ম্যানের দেহাবশেষ রেললাইনের পাশের ধান খেতে ছড়িয়ে পড়েছিল।'

'ওগুলোর নিয়তি সম্পর্কে এটাই শেষ খবর?' পিট লুকাস জানতে চাইলেন।

মাথা নেড়ে নীরবে হাসলেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। 'যুদ্ধের পর গুজবের ডানা গজাল। একটা গুজবে বলা হলো, হাড়গুলো ওয়াশিংটনের মিউজিয়াম অভ ন্যাচারাল হিস্টরির একটা ভল্টে গোপনে লুকানো আছে। যে মেরিনরা শিপমেন্ট পাহারা দিয়ে রেখেছিল, যুদ্ধের পর জাপানী প্রিজন ক্যাম্প থেকে ছাড়া পেয়ে দশ রকম গল্প বলে বেড়াল। ফুটলকার দুটো একটা জাপানী হসপিটাল শিপে তোলা হয়—হসপিটাল শিপ বলা হলেও জাহাজটা আসলে বোঝাই ছিল অস্ত্র আর সৈন্যে। মেরিনদের আরেক গ্রুপ বলল, একটা আমেরিকান কনসুলেট-এর কাছে ফুটলকারগুলো মাটিতে পুঁতে রেখেছে তারা। আবার শোনা গেল, যুদ্ধ-

বন্দীদের একটা ক্যাম্পে লুকানো ছিল ওগুলো, কিন্তু যুদ্ধের পর আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। আরেকটা গুজব–একটা সুইস ওয়্যারহাউসে সযত্নে তুলে রাখা হয়েছে। এ-ও শোনা গেল, তাইওয়ানের একটা ভল্টে ঠাঁই পেয়েছে। একজন মেরিন বলল, তার এক বন্ধুর ক্লজিটে ছিল, ওগুলো সে নিজের বাড়িতে নিয়ে চলে গেছে। আসল ঘটনা যা-ই হোক, পরস্পরবিরোধী ধারণার গাঢ় কুয়াশায় পিকিং ম্যান আজও নিখোঁজ। হাড়গুলো কিভাবে চিয়াং কাই-শেকের হাতে পড়ল, তারপর প্রিন্সেস হিয়া লিয়েনে তোলা হলো, সে-ও একটা অমীমাংসিত রহস্য।'

সেন্টার টেবিলে পট ভর্তি চা রাখল শাকিলা, যার দরকার কাপে ঢেলে নেবে। 'তবে আর এত আলোচনা করে লাভ কি, প্রিন্সেস হিয়াকেই যদি খুঁজে পাওয়া না যায়?'

এতক্ষণে মুখ খুলল রানা। 'মরটনের ওপর আস্থা রাখো।'

অ্যাডমিরাল জানতে চাইলেন, 'হিয়ার নিখোঁজ হওয়ার ব্যাপারে বিশদ কোন তথ্য জানো তুমি?'

'২৮ নভেম্বরে হিয়া একটা মে-ডে সিগন্যাল পাঠায়, ধরা পড়ে ভালপারাইসো, চিলিতে। নিজের পজিশন দেয় দক্ষিণ আমেরিকার উপকূল থেকে দুশো মাইল পশ্চিমে, প্যাসিফিকে। হিয়ার রেডিও অপারেটর জানায় যে, এঞ্জিন রূমে আগুন ধরে গেছে, দ্রুত পানি উঠছে জাহাজে। এলাকায় যে জাহাজগুলো ছিল, হিয়ার দেয়া পজিশন লক্ষ্য করে ছুটে যায়, কিন্তু কয়েকটা খালি লাইফ জ্যাকেট ছাড়া কিছুই পাওয়া যায়নি। ভালপারাইসো থেকে বারবার রেডিও সিগন্যাল পাঠিয়েও কোন সাড়া মেলেনি। ফলে ব্যাপক কোন তল্লাশীও চালানো হয়নি।'

রেডক্লিফকে চিন্তিত দেখাল, বললেন, 'নেভীর লেটেস্ট ডীপ-সি-পেনিট্রেটিং টেকনলজির সাহায্যে কয়েক বছর খোঁজাখুঁজি করলেও কিছু পাওয়া যাবে না। পজিশন এত অস্পষ্ট, অন্তত দু'হাজার বর্গমাইল সার্চ করতে হবে।'

কাপে নিজের জন্যে চা ঢালল রানা। 'হিয়ার গন্তব্য সম্পর্কে কি জানা গেছে?'

কাঁধ ঝাঁকাল মরটন। 'রওনা হবার আগে গন্তব্য সম্পর্কে কিছুই জানানো হয়নি। পরেও কিছু জানা যায়নি।' আরেকটা ফাইল খুলে প্রিন্সেস হিয়ার কয়েকটা ফটো দেখাল সবাইকে।

'ওই যুগের তুলনায় জাহাজটা দেখতে খুব সুন্দর ছিল,' মন্তব্য করলেন জর্জ হ্যামিলটন।

খুঁটিয়ে দেখার ভঙ্গিতে ভুরু কোঁচকাল রানা। তারপর চেয়ার ছেড়ে ডেস্কের সামনে চলে এল, দেরাজ থেকে বের করল একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস। এক জোড়া ফটো গ্লাসের তলায় ফেলে পরীক্ষা করল ও। 'এই ফটো দুটো...,' শুরু করেও থেমে গেল ও।

'হ্যাঁ, কিছু বলবে?' বিড়বিড় করল মরটন, প্রত্যাশায় উন্মুখ দেখাল তাকে।

'ফটো দুটো একই জাহাজের নয়।'

'ঠিক ধরেছ তুমি। একটা ফটো হিয়ার সিস্টার শিপ প্রিন্সেস টা'লি সিনান-এর।'

মরটনের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। 'চতুর শিয়াল কি যেন লুকাচ্ছে

তুমি।'

'আমার কাছে নিরেট কোন প্রমাণ নেই,' প্রকাণ্ডদেহী ইতিহাস বিশেষজ্ঞ বলল, 'শুধু একটা থিওরি আছে।'

'সেটা কি আমরা শুনতে চাই,' বললেন অ্যাডমিরাল।

ব্রীফকেস থেকে আরেকটা ফাইল বেরুল। 'আমার সন্দেহ চিলিতে যে ডিসট্রেস সিগন্যাল শোনা গেছে তা আসলে ভুয়া ছিল, চিয়াং কাই-শেকের কোন এজেন্ট হয় ডাঙা নয়তো কোন ফিশিং বোট থেকে পাঠিয়েছিল। প্যাসিফিক পাড়ি দেয়ার সময় প্রিন্সেস হিয়ার ক্রুরা জাহাজের এটা-সেটা খানিক বদলে ফেলে, নাম সহ। প্রিন্সেস হিয়া লিয়েন রূপান্তরিত হয় প্রিন্সেস টা'লি সিনান-এ। তাহলে প্রশ্ন উঠতে পারে, প্রিন্সেস সিনান গেল কোথায়? এর উত্তর পানির মত সহজ। প্রিন্সেস সিনানকে এই ঘটনার অল্প কিছুদিন আগে ভেঙে বাতিল লোহা-লক্কড়ে পরিণত করা হয়। প্রিন্সেস হিয়া নাম বদলে তার চূড়ান্ত গন্তব্যে রওনা হয়ে যায়।'

'বিকল্প জাহাজটা আবিষ্কার করে খুব বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছ তুমি,' প্রশংসা করলেন অ্যাডমিরাল।

'এতে আমার কোন কৃতিত্ব নেই,' সবিনয়ে বলল মরটন। 'আমার এক বন্ধু রিসার্চার পানামায় থাকে, সেই আবিষ্কার করে পানামা খাল দিয়ে পার হয়েছিল প্রিন্সেস হিয়া নয়, প্রিন্সেস সিনান-মে-ডে সিগন্যাল শুনতে পাবার ঠিক তিন দিন আগে।'

'পানামা থেকে কোথায় গেল জাহাজটা?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'এ-ব্যাপারে ধন্যবাদ দিতে হয় ল্যারি কিংকে। উনিশশো আটচল্লিশ সালের ডিসেম্বর মাসের প্রথম ও দ্বিতীয় হপ্তায় ইস্টার্ন সীবোর্ডের উজান-ভাটিতে যত পোর্ট আছে, সে-সব পোর্টে যত জাহাজ পৌঁছেছে তার একটা তালিকা বের করে সে কমপিউটর থেকে। ওই তালিকায় পাওয়া গেছে প্রিন্সেস টা'লি সিনানকে। সিনান ওরফে হিয়া ওয়েল্যান্ড খাল পার হয় ডিসেম্বরের সাত তারিখে।'

'ওয়েল্যান্ড খাল লেক ইরি-কে লেক ওন্টারিয়ো থেকে আলাদা করেছে,' বললেন অ্যাডমিরাল।

'হ্যাঁ,' সায় দিল মরটন।

'মাই গড,' ফিসফিস করলেন রেডক্লিফ। 'এর মানে হলো প্রিন্সেস হিয়া সমুদ্রে নিখোঁজ হয়নি, গ্রেট লেকস-এর কোন একটায় ডুবে গেছে।'

'এ চিন্তা কি কারও মাথায় খেলবে?' জনান্তিকে বললেন অ্যাডমিরাল।

'সেন্ট লরেন্স রিভারে তখনও সীওয়ে তৈরি হয়নি, ওই আকারের একটা জাহাজ নিয়ে লেকে ঢোকা, সীম্যানশিপের চরম পরাকাষ্ঠা বলতে হবে,' মন্তব্য করল রানা।

'কিন্তু চিয়াং কাই-শেক হাজার হাজার মাইল ঘোরাপথে জাহাজ পাঠালেন কেন? আর্ট ট্রেজার আমেরিকায় লুকাতে চাইলে সান ফ্রান্সিসকো বা লস এঞ্জেলসকে বেছে নিলেই তো পারতেন।'

'কর্নেল ফুই উয়া বলছেন, জাহাজের গন্তব্য সম্পর্কে তাঁকে কিছু জানানো হয়নি। তবে তিনি জানতেন যে চিয়াং কাই-শেক আমেরিকায় কয়েকজন

এজেন্টকে পাঠান। তাদের ওপর দায়িত্ব ছিল জাহাজ থেকে গোপনে আর্ট ট্রেজার খালাস করে লুকিয়ে রাখার ব্যবস্থা করবে। তাঁর ভাষ্য অনুসারে, এই অপারেশনের সঙ্গে ওয়াশিংটনের স্টেট ডিপার্টমেন্টও জড়িত ছিল।'

'প্ল্যানটা কিন্তু মন্দ ছিল না,' বলল রানা। 'উত্তর আর পুব উপকূলের প্রধান সবগুলো পোর্ট বড় বেশি খোলামেলা। ডকওয়ার্কাররা মুহূর্তের মধ্যে বুঝে ফেলত কি তারা খালাস করছে। খবরটা দাবাগ্নির মত ছড়িয়ে পড়ত। পিকিং-এর কমিউনিস্ট নেতারা ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করতে পারেননি যে তাঁদের জাতীয় সম্পদ আমেরিকার হার্টল্যান্ডে পাচার করা হয়েছে।'

'কিন্তু জাহাজটা কোন লেকে ঢোকে?' জানতে চাইলেন রেডক্লিফ।

সবাই তারা মরটনের দিকে ফিরল। 'সঠিক লোকেশন আমি বলতে পারব না,' বলল সে। 'তবে এক ভদ্রলোককে চিনি, যিনি হয়তো কোন সূত্র দিতে পারবেন।'

'তিনি জানেন অথচ তুমি জানো না?' রানার গলায় অবিশ্বাস।

'হ্যাঁ, তিনি জানেন, আমি জানি না।'

গম্ভীর সুরে অ্যাডমিরাল জিজ্ঞেস করলেন, 'ভদ্রলোককে তুমি প্রশ্ন করেছ?'

'এখনও করিনি। কাজটা আমি আপনাদের জন্যে রেখে দিয়েছি।'

'আপনি নিশ্চিত হচ্ছেন কিভাবে যে তাঁর দেয়া তথ্য সঠিক হবে?' শাকিলার প্রশ্ন।'

'কারণ তিনি প্রত্যক্ষদর্শী,' বলল মরটন।

হাঁ হয়ে গেল সবাই। তারপর সবার মনের প্রশ্ন রানার মুখ থেকে বেরিয়ে এল, 'প্রিন্সেস হিয়াকে ডুবে যেতে দেখেছেন তিনি?'

'শুধু দেখেননি, জাহাজটার সঙ্গে তিনিও ডুবে যান। ভদ্রলোক প্রিন্সেস হিয়ার চীফ এঞ্জিনিয়ার, একমাত্র সারভাইভার। কেউ যদি হিয়ার ডুবে যাওয়া সম্পর্কে বিশদ কিছু বলতে পারে, তিনিই পারবেন। ভদ্রলোকের নাম ঝাঝর সিং। ভারতীয়, তবে কোনদিনই আর দেশে ফেরেননি। আমেরিকার নাগরিকত্ব নিয়ে আবার জাহাজ কোম্পানীতে চাকরি নেন, তারপর অবসর গ্রহণ করেন।'

'ভদ্রলোক এখনও বেঁচে আছেন?'

'আমিও ল্যারি কিংকে ঠিক এই প্রশ্ন করেছি,' বলল মরটন, মুখে চওড়া হাসি। 'স্ত্রীকে নিয়ে লেক মিশিগানের উইসকনসিন সাইডে থাকেন ভদ্রলোক, লেকের তীরে শহরটার নাম ম্যানিটোউওক। মি. ঝাঝর সিং-এর ঠিকানা আর ফোন নম্বর আমার সঙ্গেই রয়েছে। কেউ চাইলে দিতে পারি।'

এগিয়ে এসে মরটনের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল রানা। 'তোমার কোন তুলনা হয় না, বিউ। কংগ্রাচুলেশন্স!'

'আমাকে তাহলে আরও খানিকটা হুইস্কি খাওয়াও,' বলে নিজেই গ্লাসটা আবার ভরে নিল মরটন।

'মি. লুকাস,' বলল রানা। 'আমার একটা প্রশ্ন আছে। হুয়ান হান যদি আমেরিকায় ফিরে আসে, তাহলে কি হবে?'

'ফিরে এলে মনে করতে হবে লোকটা বদ্ধ উন্মাদ।'

'ধরুন একটা উন্মাদই ফিরে এল।'

'প্লেন থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে গ্রেফতার করা হবে। ঠাঁই পাবে একটা ফেডারেল জেলখানায়। সব মিলিয়ে অন্তত চল্লিশটা কেস দেয়া হবে তার বিরুদ্ধে, পাইকারী হত্যাকাণ্ডের অভিযোগ সহ।'

মরটনের দিকে ফিরল রানা। 'বিউ, তুমি একবার শ্রদ্ধেয় এক চীনা গবেষকের কথা বলেছিলে, অতীতে যার সঙ্গে কাজ করেছ–তিনিও নাকি প্রিন্সেস হিয়া লিয়েন সম্পর্কে আগ্রহী।'

'ঝাউ মিয়াং। চীনের সবচেয়ে বিখ্যাত হিস্টোরিয়ান, বিভিন্ন সাম্রাজ্যের ওপর কয়েকটা বইও লিখেছেন। তোমার নির্দেশে তাঁর সঙ্গে আমি এ-ব্যাপারে কোন যোগাযোগ বা তথ্য বিনিময় করিনি। তিনি হুয়ান হানকে সতর্ক করে দেবেন, এই ভয়ে।'

'ঠিক আছে, এখন তুমি সবই তাঁকে জানাতে পারো, শুধু ঝাঁঝর সিং-এর প্রসঙ্গটা বাদে। আর, মি. সিং যদি প্রিন্সেস হিয়ার সন্ধান দিতে পারেন, সে-তথ্যও ঝাউ মিয়াংকে জানিয়ে দিতে পারো তুমি।'

'আমার তো কিছুই বোধগম্য হচ্ছে না,' বলল শাকিলা, হতভম্ব। 'আর্ট ট্রেজারের খোঁজ হুয়ান হানকে কেন দিতে চাইছ তুমি?'

'তুমি অর্থাৎ আইএনএস, সিআইএ, এফবিআই, কোস্ট গার্ড, কাস্টমস, নুমা, জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট–সবাই আমরা হুয়ান হানকে নাগালের ভেতর পেতে চাইছি। আর হান কি চাইছে? প্রিন্সেস হিয়ার ভেতর যা কিছু আছে।'

'আপনার কথা ধরতে পারছি আমি,' পিট লুকাস বললেন। 'নিখোঁজ আর্ট ট্রেজারের খোঁজ জানতে পারলে আমেরিকায় কেন, নরকে পর্যন্ত যেতে রাজি হবে হান, যত ঝুঁকিই থাক।'

'এই আর্ট ট্রেজার তার স্বপ্ন। অপারেশনটার দায়িত্ব বিশ্বাস করে সে তার বাপকেও দিতে রাজি হবে না। শিপিং রেজিস্ট্রি চেক করে দেখেছি আমি, হুয়ান হান ম্যারিটাইম-এর একটা স্যালভেজ ভেসেল আছে। হিয়ার লোকেশন সম্পর্কে খবর পাওয়া মাত্র জাহাজটাকে পাঠিয়ে দেবে সে, সেন্ট লরেন্স নদী হয়ে গ্রেট লেকস-এ আসার সময় কানাডা থেকে নিজেও চড়বে ওটায়।'

'তোমার ভয় করছে না, আমাদের আগে সে পেয়ে যাবে?' জিজ্ঞেস করল শাকিলা।

'চিন্তার কিছু নেই। প্রথমে আমরা ট্রেজার উদ্ধার করব, তারপর তথ্য ফাঁস করব।'

'খুঁজে বের করাটা প্রথম পদক্ষেপ। ট্রেজার উদ্ধার করতে এক বছর বা তারও বেশি লেগে যাবে।'

'ঝাঁঝর সিং-এর ওপর বেশি আস্থা রাখা হয়ে যাচ্ছে।' অ্যাডমিরালকে সন্দিহান দেখাল। 'জাহাজটা অদৃশ্য হবার অনেক আগেই হয়তো নেমে গিয়েছিলেন তিনি।'

'অ্যাডমিরালের কথায় যুক্তি আছে,' বললেন রেডক্লিফ। 'ঠিক কোথায় ডুবেছে জানা থাকলে মি. সিং নিজেই জাহাজটা উদ্ধার করতে চেষ্টা করতেন।'

'তা তিনি করেননি,' বলল রানা। 'করলে কোথাও না কোথাও দু'একটা

আর্টিফ্যাক্ট পাওয়া যেত। বিউ ভাল জানে, উদ্ধার করা ট্রেজার গোপন করা সম্ভব নয়। যে-কোন কারণেই হোক, মি. সিং লোকেশনটা গোপন রেখেছেন। উদ্ধার করার চেষ্টা হলে বিউ তা অবশ্যই জানতে পারত।'

চুরুটের হালকা ধোঁয়ার ভেতর দিয়ে রানার দিকে তাকালেন জর্জ হ্যামিলটন। 'ঠিক কখন তুমি রওনা হতে পারছ, রানা?'

'আপনি যখন বলবেন।'

পিট লুকাসের দিকে তাকিয়ে চোখ মটকালেন অ্যাডমিরাল। 'আইএনএস-এর বদলে বলটা নুমার পায়ে থাকুক, যতক্ষণ না হুয়ান হান দৃশ্যপটে হাজির হয়, ঠিক আছে?'

'আমি আপনার সঙ্গে বিতর্কে জড়াব না, অ্যাডমিরাল,' হেসে উঠে বললেন পিট লুকাস। শাকিলার দিকে ফিরলেন। 'আপনার লম্বা একটা ছুটি পাওনা রয়েছে, শাকিলা। তবে সন্দেহ করছি আমাদের দুই এজেন্সির মাঝখানে লিয়াযোঁ হিসেবে দায়িত্ব পেলে আপনি খুশিই হবেন।'

'আপনি যদি আমাকে স্বেচ্ছাসেবক হতে বলেন,' ব্যাকুল আগ্রহ চেপে রাখতে ব্যর্থ হয়ে বলল শাকিলা, 'আমি রাজি।'

'কোন ধারণা দিতে পারো,' মরটনকে জিজ্ঞেস করল রানা, 'মি. সিং কি রকম মানুষ?'

'বুড়ো হবার আগে নিশ্চয়ই কঠিন পাত্র ছিলেন,' জবাব দিল মরটন।

'দুনিয়ায় হৈ-চৈ পড়ে যাবে এমন একটা তথ্য দীর্ঘ চার যুগ গোপন রেখেছেন তিনি।' চিন্তিত দেখাল রানাকে। 'নিশ্চয়ই সঙ্গত বা ব্যক্তিগত কোন কারণ আছে। চাইলেই কি তথ্যটা পাব আমরা?'

আট

হাইওয়ে ফরটি থ্রী থেকে বাঁক নিয়ে কাঁকর ছড়ানো মেঠো পথে নেমে এল ওদের গাড়ি। কালো মেঘ হুমকি হয়ে দেখা দিলেও এখনও এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়েনি। রাস্তার দু'পাশে মাইলের পর মাইল ফলের বাগান দেখা যাচ্ছে, লেক মিশিগানের তীরবর্তী এলাকায় এ অতি সাধারণ একটা দৃশ্য। তারপর ওরা পাইন আর বার্চ বনে প্রবেশ করল। রাস্তার পাশে মেইলবক্স খাড়া করা আছে, সেগুলোর ওপর নজর রাখছে রানা। যেটা খুঁজছিল পেয়ে গেল এক সময়–প্রাচীন স্টীমশিপের আকৃতিতে তৈরি, ঢালাই করা অ্যাংকর চেন দিয়ে উঁচু করা, খোলের গায়ে মাঝারি হরফে লেখা 'ঝাঁঝর সিং'।

'এটাই বোধহয়,' বলে ঘাস মোড়া সরু পথে গাড়ি ঘোরাল রানা, লেনের মাথায় পটে আঁকা ছবির মত দোতলা একটা লগ হাউস।

শাকিলা আর রানা প্লেনে করে প্রথমে উইসকনসিন-এর গ্রীন বেতে আসে, তারপর ত্রিশ মাইল দূরে ম্যানিটোউওক-এ আসার জন্যে একটা গাড়ি ভাড়া করতে হয়। ম্যানিটোউওক বন্দর শহর, বড় আকৃতির জাহাজগুলো এই পোর্ট থেকেই

লেকগুলোতে চলাচল করে। পোর্ট থেকে ভাটির দিকে দশ মাইল দূরে লেকের তীরে ঝাঁঝর সিং-এর বাড়ি।

মরটন চেয়েছিল টেলিফোন করে ঝাঁঝর সিংকে সতর্ক করে দেবে। কিন্তু অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন ভেটো দিয়ে বসেন। তাঁর যুক্তি, ঝাঁঝর সিং প্রিন্সেস হিয়া সম্পর্কে যদি আলোচনা করতে রাজি না হন, রানা ও শাকিলা পৌঁছে দেখবে তিনি বাড়িতে নেই।

ঝাঁঝর সিং-এর বাড়িটা গাছপালার দিকে মুখ করা, তবে পিছন দিকটা লেক মিশিগানের দিকে খোলা। লগগুলোকে কেটে চেঁছে প্রথমে চৌকো কড়িকাঠ করা হয়েছে, তারপর জোড়া লাগিয়ে তৈরি করা হয়েছে উঁচু দেয়াল আর পাঁচিল। ওগুলোর গোড়ায় নদীর পাথর এনে ফেলা হয়েছে, ফলে বাড়ির চেহারায় বেঢপ বা ভোঁতা একটা ভাব এসে গেছে। চূড়া আকৃতির ছাদ তামার পাত দিয়ে মোড়া, সবুজ রঙ করা। জানালাগুলো লম্বা, শাটার দিয়ে ঢাকা। বাড়ির ভেতরের সমস্ত কাঠ চড়ুইপাখির গায়ের সঙ্গে মিলিয়ে রঙ করা হয়েছে, ফলে বাড়িটাকে ঘিরে থাকা বনভূমির সঙ্গেও একটা সাযুজ্য খুঁজে পাওয়া যাবে।

বাড়ির সামনে লনে গাড়ি থামাল রানা, একটা গ্র্যান্ড চেরোকি জীপ-এর পাশে। লনের এই অংশের মাথায় ছাদ আছে, কারপোর্ট হিসেবে ব্যবহার করা হয়। জীপটার আরেক পাশে ট্র্যানসম-এর ওপর আঠারো ফুট লম্বা একটা কেবিন ক্রুজারও দেখা যাচ্ছে, বড় আকৃতির আউটবোর্ড মোটর সহ। কয়েকটা ধাপ টপকে সদর দরজার সামনে থামল ওরা, নকারটা কবাটে তিনবার ঠুকল শাকিলা।

কয়েক মুহূর্ত পর দরজা খুলে সামনে দাঁড়ালেন এক বৃদ্ধা শ্বেতাঙ্গিনী। চোখ দুটো উজ্জ্বল নীল, মুখে সূক্ষ্ম বলিরেখা এমন জ্যামিতিক নকশা তৈরি করেছে, যেন চেহারাটা নেট দিয়ে ঢাকা। শরীরটা ভারী, এখনও শক্ত-সমর্থ, প্রকৃত বয়েসের তুলনায় বিশ বছরের ছোট লাগে। শাকিলার কাছে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল, ভদ্রমহিলা যুবা বয়েসে সাংঘাতিক সুন্দরী ছিলেন।

'হ্যালো,' মিষ্টি সুরে বললেন তিনি। 'তোমরা সম্ভবত বৃষ্টির আশীর্বাদ নিয়ে এসেছ।'

'বোধহয় না,' বলল রানা, 'মেঘগুলো সব পশ্চিমে সরে যাচ্ছে।'

'আমি তোমাদের কোন কাজে লাগতে পারি?' জানতে চাইলেন বৃদ্ধা।

'আমি মাসুদ রানা, আর ইনি আমার সঙ্গে শাকিলা সুলতান। আমরা মি ঝাঁঝর সিংকে খুঁজছি।'

'পেয়েছ তাঁকে,' হেসে উঠে বললেন বৃদ্ধা। 'আমি তাঁর স্ত্রী, মিসেস ঝাঁঝর মেরিল। তোমরা ভেতরে আসবে না, প্লীজ?'

'হ্যাঁ, ধন্যবাদ,' বলে ভেতরে ঢুকে পড়ল শাকিলা, পিছু নিয়ে রানাও। কয়েকটা খোলা দরজা দিয়ে বাড়ির ভেতর তাকিয়ে বিস্মিত হলো শাকিলা। ফার্নিচার হিসেবে পুরানো আমেরিকান অ্যান্টিকস দেখতে পাবে বলে আশা করেছিল ও, তার বদলে রয়েছে চীনা ফার্নিচার আর শিল্পকর্ম। দেয়ালে ঝুলছে এমব্রয়ডারি করা সিল্ক ডিজাইন। কামরার কোণে চকচকে ফুলদানি, ভেতর থেকে বেরিয়ে আছে শুকনো লতাপাতা আর ফুল। উঁচু তাকে শোভা পাচ্ছে চীনামাটির

সুদৃশ্য পুতুল আর মূর্তি। একটা কাঁচমোড়া কেবিনেটে প্রায় ত্রিশটা জেড স্কাল্পচার রয়েছে। কাঠের মেঝেতে চীনা ডিজাইনে তৈরি কার্পেট।

'এরকম একটা কার্পেট সান ফ্রান্সিসকোয় আমাদের বাড়িতেও আছে, প্রতিবেশী এক চীনা ভদ্রলোক উপহার দিয়েছিলেন,' কথাটা বলেই ফেলল শাকিলা। 'ছোটবেলায় আমি চীনা পল্লীর কাছাকাছি মানুষ হয়েছি।'

হঠাৎ করেই মিসেস ঝাঁঝর অর্থাৎ ক্যারিনা মেরিল ম্যান্ডারিন চাইনীজ ভাষায় কথা বলতে শুরু করলেন। 'তুমি তো তাহলে ওদের ভাষাও কিছু কিছু জানো?'

মাথা ঝাঁকাল শাকিলা। 'কাজ চালিয়ে নিতে পারি। মিসেস সিং, আপনার বাড়ির জিনিস-পত্র কি অনেক কাল আগের, মানে খুব বেশি প্রাচীন?'

হাসিমুখে মাথা নাড়লেন বৃদ্ধা। 'কোনটাই পঞ্চাশ বছরের বেশি পুরানো নয়। চীনেই জন্ম আমার, মানুষও হয়েছি সেখানে। ঝাঁঝরের সঙ্গে ওখানেই আমার পরিচয়, তারপর শুভ পরিণয়।' লিভিং রুমে নিয়ে এসে ওদেরকে বসতে বললেন তিনি, আবার ইংরেজিতে কথা বলছেন। 'আরাম করে বসো তোমরা। চা খাবে তো?'

'হ্যাঁ, ধন্যবাদ,' বলল শাকিলা।

ফায়ারপ্লেসের সামনে এসে দাঁড়াল রানা, ম্যানটেল-এর ওপর ঝুলে থাকা জাহাজের একটা পেইন্টিং দেখছে। ছবিটা থেকে চোখ না সরিয়েই বলল, 'প্রিন্সেস হিয়া লিয়েন।'

নিজের বুকে দু'হাত চেপে ধরে বৃদ্ধা বড় করে শ্বাস ফেললেন। 'ঝাঁঝর সব সময় বলে আসছে, কেউ একজন একদিন আসবে।'

'কে আসবে বলে আপনাদের ধারণা?'

'সরকারের কোন লোক।'

সমীহ দেখিয়ে হাসল রানা। 'আপনার স্বামীর ধারণাই ঠিক। আমি ন্যাশনাল আন্ডারওয়াটার মেরিন এজেন্সি, আর শাকিলা ইমিগ্রেশন অ্যান্ড ন্যাচারালাইজেশন সার্ভিসের প্রতিনিধিত্ব করছি।'

চোখে বিষণ্ণ দৃষ্টি, শাকিলার দিকে তাকালেন বৃদ্ধা। 'তোমরা সম্ভবত আমেরিকা থেকে বহিষ্কার করবে আমাদের, কারণ এ-দেশে আমরা অবৈধভাবে আসি।'

অবাক হয়ে দৃষ্টি বিনিময় করল রানা ও শাকিলা। 'কিন্তু···না!' তাড়াতাড়ি আশ্বস্ত করল রানা। 'আমরা সম্পূর্ণ অন্য বিষয়ে আলাপ করতে এসেছি।'

বৃদ্ধা শাকিলার চেয়ে অন্তত দেড় ইঞ্চি বেশি লম্বা, এগিয়ে এসে তাঁর কাঁধে একটা হাত রাখল শাকিলা। 'অতীত নিয়ে একটুও চিন্তা করবেন না,' নরম সুরে বলল ও। 'এখানে আপনারা কয়েক যুগ আগে এসেছেন, আর রেকর্ড বলছে আইনসম্মতভাবে নাগরিকত্ব পেয়েছেন, সেই থেকে নিয়মিত ট্যাক্সও দিয়ে আসছেন। চাইলেও কেউ আপনাদেরকে বহিষ্কার করতে পারবে না।'

'কিন্তু নাগরিকত্ব পাবার জন্যে কিছু কাগজ-পত্র তৈরি করতে হয় আমাদের, তার সবগুলো আইনসম্মত ছিল না।'

'এ-ব্যাপারে যত কম বলা যায় ততই ভাল।' হেসে উঠল শাকিলা।

'আপনারা যদি কাউকে কিছু না জানান, আমরাও কাউকে কিছু বলতে যাচ্ছি না।'

বৃদ্ধার দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকাল রানা। 'আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আপনারা দু'জন একসঙ্গেই আমেরিকায় ঢোকেন।'

'হ্যাঁ, অবশ্যই,' বললেন বৃদ্ধা, মুখ তুলে পেইন্টিংটার দিকে তাকালেন। 'প্রিন্সেস হিয়া লিয়েনে চড়ে আসি আমরা।'

'ডোবার সময় জাহাজটায় আপনারা ছিলেন?' রানার গলায় অবিশ্বাস।

'সে বড় অদ্ভুত এক গল্প।'

'যদি শোনান, কৃতজ্ঞ বোধ করব।'

'আগে তোমরা বসো, আমি চা নিয়ে আসি।' শাকিলার দিকে ফিরে হাসলেন বৃদ্ধা, একটা দাঁতও পড়েনি। 'আশা করি এই চা তোমার ভাল লাগবে। ষাট বছর আগে সাংহাইয়ের যে দোকান থেকে চা কিনতাম, এখনও সেই দোকান থেকেই আমদানি করি।'

কয়েক মিনিট পর গাঢ় সবুজ চা পরিবেশনের ফাঁকে গল্পটা শুরু করলেন বৃদ্ধা, ক্যান্টন লাইনে চাকরি করার সময় ঝাঁঝর সিং-এর সঙ্গে কিভাবে তাঁর পরিচয় হলো। গোপনে বিয়ে করার পর স্বামীর সঙ্গে দেখা করার জন্যে প্রায়ই তিনি জাহাজে উঠতেন। এরকম একদিন জাহাজে উঠে স্বামীর কেবিনে লুকিয়ে ছিলেন–কথা ছিল জাহাজ ভেঙে ফেলার জন্যে সিঙ্গাপুরে নিয়ে যাওয়া হবে। তারপর হঠাৎ পরিস্থিতি বদলে গেল। কয়েকশো কাঠের বাক্স আনা হলো ডকে, রাতের অন্ধকারে সেগুলো তোলা হলো জাহাজে। লোডিং-এর দায়িত্বে ছিলেন চিয়াং কাই-শেকের একজন জেনারেল, চিউয়েন কাউ...'

'নামটা আমাদের পরিচিত,' বাধা দিয়ে বলল রানা। 'তিনিই জাহাজে চুরি করা কার্গো লোড করেন।'

'সবই অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে সারা হয়,' সমর্থনসূচক মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন বৃদ্ধা। 'জেনারেল কাউ জাহাজের কর্তৃত্ব গ্রহণ করার পর আমার কুকুর মিরাকল আর আমাকে তীরে নামার অনুমতি দিলেন না। জাহাজ রওনা হবার এক মাস পর প্রচণ্ড ঝড় শুরু হলো, এই এক মাস স্বামীর কেবিনে একরকম বন্দী জীবন কাটাতে হয়েছে আমাকে। ওই ঝড়েই ডুবে যায় প্রিন্সেস হিয়া। সিং আমাকে কয়েক প্রস্থ কাপড়ে মুড়ে ফেলে, তারপর আপার ডেকে তুলে এনে একটা লাইফ র‍্যাফটে ওঠায়। জাহাজ ডোবার আগে জেনারেল কাউও আমাদের সঙ্গে যোগ দেন।'

'জেনারেল চিউয়েন কাউ আপনাদের সঙ্গে লাইফ র‍্যাফটে ছিলেন?'

'হ্যাঁ, কিন্তু শীতে জমে কয়েক ঘণ্টা পরই মারা যান তিনি। ঠাণ্ডাটা ছিল অসহ্য। একেকটা ঢেউ ছিল ছোটখাট পাহাড়ের মত। নেহাতই ভাগ্যের জোরে বেঁচে যাই আমরা।'

'পানি থেকে আপনাদের উদ্ধার করল কারা?'

'কেউ না, ভাসতে ভাসতে নিজেরাই আমরা তীরে চলে আসি। খালি একটা ভ্যাকেশন কেবিন পেয়ে যায় সিং, সেটা ভেঙে ভেতরে ঢুকে আগুন জ্বালায়, আমাকে আবার জ্যান্ত করে তোলে। কয়েক দিন পর হাঁটাচলার শক্তি ফিরে পেলে

সিং-এর এক আত্মীয়ের বাড়ি নিউ ইয়র্কে চলে যাই আমরা। সিদ্ধান্ত নিই, আমেরিকাতেই থাকব। কিভাবে প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্র যোগাড় করলাম, তা বলছি না, তবে এ-ব্যাপারে সিং-এর আত্মীয়রা যথেষ্ট সাহায্য করেন। নাগরিকত্ব পাবার পর সিং চাকরি নিয়ে আবার জাহাজে চড়ে, আর আমি ঘরকন্যায় মন দিই। তখন বেশ কয়েক বছর লং আইল্যান্ডে ছিলাম আমরা, তবে সিং ছুটি নিয়ে বাড়ি ফিরলেই আমরা গ্রেট লেকস-এ বেড়াতে আসতাম। এভাবেই আমাদের ছেলেমেয়েরা মিশিগান লেকের পশ্চিম তীরের প্রেমে পড়ে যায়। সিং অবসর নেয়ার পর এখানে এই বাড়িটা তৈরি করা হয়। আমরা সুখী একটা পরিবার, লেকে বোট চালিয়ে জীবনটা খুব আনন্দে কাটিয়ে দিচ্ছি।'

'দু'জনেই আপনারা অত্যন্ত ভাগ্যবান,' মন্তব্য করল শাকিলা।

দেয়ালে ঝোলানো সারি সারি বাঁধানো ফটোগুলোর দিকে তাকালেন বৃদ্ধা। একটা ফটোয় তাদের সব ছেলেমেয়ে আর নাতি-নাতনীদের দেখা যাচ্ছে। প্রিয় কুকুর মিরাকলের একটা ফটোর দিকে তাকাতেই তাঁর চোখ দুটো ভিজে উঠল। 'কি জানো,' বললেন তিনি। 'মিরাকলের ছবিটার দিকে তাকালেই মনটা কেঁদে ওঠে। এত তাড়াতাড়ি জাহাজ ছাড়তে হয় আমাদের, মিরাকলকে ভুলে কেবিনে রেখে আসি। বেচারি হিয়ার সঙ্গে ডুবে যায়। ওর কথা ভুলতে পারি না। অপরাধবোধ থেকে মুক্তি পাওয়াও সম্ভব নয়।'

রানাই প্রসঙ্গ পাল্টাল। 'মি. সিং-এর সঙ্গে কথা বলতে চাইলে আপনি কিছু মনে করবেন?'

'না, কি মনে করব! কিচেন হয়ে খিড়কি দরজা দিয়ে বেরিয়ে যান, বোট ডকে পাবেন তাঁকে।'

কিচেন থেকে লম্বা একটা বারান্দায় বেরিয়ে এল রানা, বারান্দা থেকে নেমে বোট ডকের দিকে এগোচ্ছে। লন ঢালু হয়ে জেটির সঙ্গে মিশেছে, জেটিটা ত্রিশ ফুট লম্বা। জেটির মাথায় একটা ক্যানভাস টুলে বসে মাছ ধরছেন ঝাঁঝর সিং। মাথায় পাগড়ী দেখেই তাকে চিনতে পারল রানা, তাছাড়া আশপাশে আর কেউ নেইও। ঘাড় ফিরিয়ে রানাকে দেখে অকারণই হাসলেন ভদ্রলোক, জানতে চাইলেন, 'আপনাকে আমি চিনি?'

'এইমাত্র আপনার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ হলো,' বলল রানা। 'আমি ন্যাশনাল আন্ডারওয়াটার অ্যান্ড মেরিন এজেন্সি থেকে এসেছি। আমার সঙ্গে আইএনএস-এর একজন ফিমেল এজেন্টও আছেন। আপনি টোপ হিসেবে কি ব্যবহার করছেন, মি. সিং?'

'চিকেন লিভার আর কেঁচো,' হাসিমুখেই বললেন ঝাঁঝর সিং। তারপর বেশ কিছুক্ষণ মুখ খুললেন না। নিস্তব্ধতা যখন অস্বস্তিকর হয়ে উঠছে, আবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন রানাকে, তারপর বললেন, 'জানতাম কেউ না কেউ একদিন আসবে, প্রিন্সেস সম্পর্কে জানতে চাইবে। কিন্তু আপনাকে তো আমেরিকান বলে মনে হচ্ছে না।'

জাতীয়তা, পেশা, নুমার সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার ধরন ইত্যাদি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা

করতে হলো রানাকে।

ঝাঁঝর সিং জানতে চাইলেন, 'এত বছর পর আমাকে আপনারা পেলেন কিভাবে?'

'কমপিউটরকে ফাঁকি দেয়া আজকাল আর সম্ভব নয়,' বলল রানা। 'আপনার স্ত্রীর কাছে শুনলাম কিভাবে আপনারা বেঁচে যান।'

'আমরা ভাগ্যবান।'

'উনি বলছিলেন, জেনারেল চিউয়েন কাউ লাইফ র‍্যাফটেই মারা যান।'

'আমি বলব, প্রকৃতির প্রতিশোধ,' আড়ষ্ট একটু হাসি ফুটল ঝাঁঝর সিং-এর ঠোঁটে। 'হিয়ার শেষ যাত্রায় জেনারেল কাউ-এর কি ভূমিকা ছিল তা নিশ্চয়ই আপনি জানেন, তা না হলে এখানে আসতেন না।'

'শুধু এইটুকু যে জেনারেল কাউ আর চিয়াং কাই-শেক চীনের সমস্ত প্রাচীন আর্ট ট্রেজার চুরি করে হিয়ায় তুলে দেন, আমেরিকায় পাঠিয়ে কোথাও লুকিয়ে রাখার জন্যে।'

'প্ল্যান সেরকমই ছিল, কিন্তু প্রকৃতি মাতা বাদ সাধেন।'

'অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে কৌশল আর ফাঁকিগুলো আবিষ্কার করতে হয়েছে,' বলল রানা। 'জাহাজ ডুবে যাচ্ছে, চিলিতে শুনতে পাওয়া এই ডিসট্রেস সিগন্যালটা ছিল ভুয়া। ওদিকের পানিতে লাইফ ভেস্ট ফেলে রাখাটাও ওই চালাকির একটা অংশ। তারপর পানামা খাল পার হলো হিয়া, কিন্তু রেকর্ডে থাকল হিয়া নয়, পার হয়েছে প্রিন্সেস সিনান। তারপর সেন্ট লরেন্স হয়ে গ্রেট লেকস-এ ঢুকলেন আপনারা। ধাঁধাটার শুধু একটা রহস্যই এখনও জানা যায়নি–আপনাদের গন্তব্য।'

'শিকাগো,' হেসে উঠে বললেন ঝাঁঝর সিং। 'আমেরিকান স্টেট ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে আগেই ব্যবস্থা করে রেখেছিল জেনারেল কাউ, পোর্ট শিকাগোর টার্মিনাল ফ্যাসিলিটিতে ট্রেজার আনলোড করা হবে। তারপর ওখান থেকে কোথায় পাঠানো হবে, সে সম্পর্কে আমার কোন ধারণা ছিল না। কিন্তু তার আগেই শুরু হলো ভয়ানক তুফান। সমুদ্র সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা ছিল, কিন্তু জানা ছিল না উত্তর আমেরিকার লেকগুলোয় এরকম তুমুল ঝড় উঠতে পারে।'

'বলা হয় শুধু গ্রেট লেকগুলোতেই পঞ্চাশ হাজারের বেশি জাহাজ ডুবির ঘটনা ঘটেছে,' বলল রানা। 'অন্য সব লেকে যত জাহাজ ডুবেছে, তারচেয়ে বেশি ডুবেছে শুধু মিশিগান লেকেই।'

'সাগরের চেয়ে লেকের ঢেউ বেশি মারাত্মক,' ঝাঁঝর সিং বললেন। 'সাগর বা সমুদ্রের ঢেউ ফুলে উঠে একদিক থেকে আরেকদিকে ছুটে যায়। কিন্তু লেকের ঢেউ উঁচু হতে শুরু করলে থামতে চায় না, ছোটার গতিও অনেক বেশি। যে রাতে প্রিন্সেস হিয়া ডুবে গেল, অত বড় ঝড় সাগরেও আমি কখনও দেখিনি। তীরে নামার পর জেনারেলের লাশ সহ ভেলাটা আমরা স্রোতে ঠেলে দিই। সেই শেষ, তারপর আর তাঁকে দেখিনি। লাশটা কেউ পায় কিনা তা-ও জানতে পারিনি।'

'আপনি কি আমাকে বলবেন, কোথায় হিয়া ডুবেছে? কোন গ্রেট লেকে?'

লাইনে টান পড়ল, মুচকি হেসে সেটা গুটাতে শুরু করলেন ঝাঁঝর সিং। নিশ্চয়ই খুব ছোট মাছ, পালাবার কোন চেষ্টাই নেই। নেটে তোলার পর দেখা গেল

াত্যি তাই, পাউন্ড দেড়েক ওজন হবে। মাছটা ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'ওই তো ওখানে।'

প্রথমে রানা বুঝতে পারল না। ভাবল, চারটে গ্রেট লেকের যে-কোন একটার কথা বলছেন ভদ্রলোক। তারপর একটা বিস্ময়ের ধাক্কা অনুভব করল। 'লেক মিশিগানে? প্রিন্সেস হিয়া এখানে, এই মিশিগান লেকে ডুবেছে?'

'এখান থেকে মাত্র পঁচিশ মাইল দক্ষিণ-পুবে।'

স্তম্ভিত হয়ে গেল রানা। প্রিন্সেস হিয়া সমস্ত প্রাচীন চীনা আর্ট ট্রেজার নিয়ে এখান থেকে মাত্র পঁচিশ মাইল দূরে লেকের তলায় এত বছর ধরে পড়ে আছে? 'আপনারা তাহলে এদিকেই কোথাও তীরে ওঠেন?'

'এদিকেই কোথাও নয়, এখানেই, এই জেটি যেখানে তৈরি করেছি।' হাসছেন ঝাঁঝর সিং। 'বলতে পারেন ভাবাবেগজনিত দুর্বলতায় এই জায়গাটা কেনার চেষ্টা করি আমরা। কিন্তু মালিক বিক্রি করতে রাজি হননি। তিনি মারা যাবার পর ছেলেদের কাছ থেকে কিনি। পুরানো কেবিনটা ভেঙে ফেলি আমরা, ওই কেবিনটা ছিল বলেই ক্যারিনাকে আমি বাঁচাতে পেরেছিলাম। কেবিনটার জায়গায় বাড়িটা তৈরি করি। আমাদের একান্ত ইচ্ছেটা পূরণ হয়েছে, যে স্থানটিতে আমাদের পুনর্জন্ম হয় জীবনের বাকিটা সময় সেখানেই কাটিয়ে যেতে পারব।'

'আপনারা জাহাজটা বা আর্টিফ্যাক্টগুলো উদ্ধার করার চেষ্টা করেননি কেন?'

মৃদু শব্দে হেসে উঠে মাথা নাড়লেন বৃদ্ধ ঝাঁঝর সিং। 'কি লাভ হত তাতে? কমিউনিজম আমার পছন্দ নয়, আর্ট ট্রেজার উদ্ধার করা সম্ভব হলে কমিউনিস্ট চায়না ওগুলো দাবি করে বসবে। ট্রেজার যেহেতু চিয়াং কাই-শেক জাহাজে তুলে ছিলেন,. একই দাবি জানাবে তাইওয়ানও। এ-ব্যাপারে মার্কিন সরকারের কি নীতি, আমার জানা নেই। তবে নিজের দেশে কুড়িয়ে পাওয়া জিনিস সরকার আর কাউকে দিতে রাজি হবে বলে মনে হয় না। এই সব জটিলতার কথা তো ভেবেছিই, আরও বেশি করে ভাবতে হয়েছে নিজেদের নিরাপত্তার কথা। নাগরিকত্ব পাবার জন্যে অবৈধ পন্থায় বেশ কিছু কাগজ-পত্র যোগাড় করতে হয়, হিয়ার কথা তুললে সে-সবও ফাঁস হয়ে যাবে। সেজন্যেই সিদ্ধান্ত নিই, লেকের তলাতেই পড়ে থাকুক সব।'

'ভাল একজন লইয়ারের সঙ্গে পরামর্শ করতে পারতেন,' বলল রানা। 'তিনি আপনাকে এ-সম্পর্কিত মার্কিন আইন ব্যাখ্যা করতেন। যে-কোন ট্রেজার প্রথমে যে দাবি করে, উদ্ধার করা সম্ভব হলে সে-ই বেশির ভাগটা পায়। আপনি বিরাট ধনী একজন মানুষ হতে পারতেন, মি. সিং।'

'কিন্তু ভেবে দেখুন, উদ্ধার করার আগে কোর্টে কত বছর লড়তে হত আমাকে। দুই চীন তো বিরক্ত করতই, ফেডারেল সরকারও আমাকে নিয়ে কম টানা-হ্যাঁচড়া করত না। তারপর ধরুন, অ্যাটর্নিদের ফি। ধনী হবার জন্যে প্রথমে আমাকে ফকির হতে হত।'

'তা-ও সত্যি,' বলল রানা।

'তাছাড়া, মি. রানা, আমার পরিবারই আমার ট্রেজার। নিজেকে আমি বোঝাই, আর্ট ট্রেজার কোথাও পালাচ্ছে না। উপযুক্ত একটা সময়ে কেউ না কেউ

ওগুলো উদ্ধার করবেই। আর তখন ওগুলো মানুষের কল্যাণেই কাজে লাগবে।'

'আপনার চিন্তাধারা খুব কম লোকের সঙ্গে মিলবে, মি. সিং,' রানার গলায় শ্রদ্ধার সুর।

'দেখুন, আমার মত বুড়ো হলে আপনিও উপলব্ধি করবেন, সৌখিন ইয়ট, জেট প্লেন আর ব্যাঙ্ক ভূর্তি টাকার মালিক না হলেও চলে, জীবনের কাছ থেকে আরও মূল্যবান অনেক কিছু পাবার আছে।'

হাসল রানা। 'মি. সিং, আপনার জীবন-উপলব্ধি আমার খুব ভাল লাগল।'

ঝাঝর দম্পতি ওদেরকে ডিনার না খাইয়ে ছাড়লেন না। রাত কাটাতেও অনুরোধ করলেন, কিন্তু রানা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ম্যানিটোউওকে ফেরার জন্যে ব্যাকুল হয়ে আছে। অনুসন্ধান ও উদ্ধার প্রকল্পের জন্যে এমন একটা জায়গা বাছাই করতে হবে যেটাকে হেডকোয়ার্টার হিসেবে ব্যবহার করা যায়। সব খবর জানিয়ে অ্যাডমিরাল হ্যামি গটনকে রিপোর্টও করতে হবে। ডিনারে বসে দুই মহিলা মেয়েলি গল্পে মশগুল হয়ে থাকল, আর পুরুষ দু'জন যে-যার সামুদ্রিক অভিযান সম্পর্কে আলাপ শুরু করল।

'ক্যাপটেন পেঙ্গ ওয়াকার মানুষ হিসেবে কেমন ছিলেন?'

'ওরকম ভালমানুষ আমার জীবনে আর দেখিনি,' জানালা দিয়ে বিষণ্ন দৃষ্টিতে লেকের দিকে তাকিয়ে থাকলেন ঝাঝর সিং। 'এখনও তিনি ওখানে আছেন। জাহাজের সঙ্গেই গভীরে তলিয়ে যান। হুইলহাউসে তাঁকে আমি এমন শান্ত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি, যেন একটা রেস্তোরাঁয় টেবিল পাবার অপেক্ষায় আছেন।' রানার দিকে ফিরলেন। 'শুনেছি ঠাণ্ডা মিষ্টি পানিতে সব অটুট আর অবিকৃত থাকে, এমন কি মাছেরা লাশও খেয়ে ফেলে না।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'এই তো মাত্র কিছুদিন আগের কথা, ডুবে যাবার সত্তর বছর পর কার ফেরীর একটা কার তোলে ডুবুরীরা এই মিশিগান লেক থেকেই। গাড়িটার গদি অক্ষত পাওয়া গেছে, এমনকি টায়ারে বাতাসও ছিল। এঞ্জিন আর কারবুরেটর শুকানোর পর, তেল বদলে, অরিজিনাল ব্যাটারি রি-চার্জ করে, স্টার্ট দেয়া হয়। ওটাকে চালিয়ে ডেট্রয়েট-এর একটা অটো মিউজিয়ামে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।'

'তাহলে তো চীনা আর্ট ট্রেজার ভাল অবস্থাতেই পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়।'

'বেশিরভাগই। বিশেষ করে ব্রোঞ্জ আর চীনামাটি।'

'তবে প্রিন্সেসকে আবার যদি দেখি, নিজেকে আমি সামলাতে পারব কিনা জানি না,' ফিসফিস করলেন ঝাঝর সিং।

'আমি তো বলব প্রিন্সেস হিয়ার নিয়তি খুব একটা খারাপ নয়,' বলল রানা। 'অন্তত সিঙ্গাপুরে নিয়ে গিয়ে ভেঙে ফেলার চেয়ে তো অবশ্যই ভাল, তাই না?'

'তা তো অবশ্যই,' সায় দিলেন ঝাঝর সিং। 'আপনি এটাকে সম্মানজনক পরিণতিও বলতে পারেন।'

নয়

ম্যানিটোউওকে ফিরে ভাল একটা হোটেলে পাশাপাশি দুটো কামরা ভাড়া নিল

ওরা। সকালে ব্রেকফাস্ট সেরেই অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনকে ফোন করল রানা।

সব কথা শোনার পর অ্যাডমিরাল বললেন, 'তুমি বলতে চাইছ সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ট্রেজার গত পঞ্চাশ বছর ধরে আমাদের সবার নাকের ডগায় পড়ে রয়েছে, অথচ ঝাঁঝর দম্পতি কাউকে কিছু বলেননি?'

'এক কথায় যদি বলি, ওঁদের প্রকৃতি ঠিক আপনার মত, অ্যাডমিরাল। হুয়ান হানের উল্টো চরিত্র, এঁরা লোভ জয় করতে শিখেছেন। দু'জনের একই উপলব্ধি, উপযুক্ত সময়ে কেউ না কেউ ঠিকই একদিন আর্ট ট্রেজার উদ্ধার করবে।'

'ফাইন্ডারস ফি হিসেবে মোটা টাকা পাওয়া উচিত ওঁদের।'

'কৃতজ্ঞ সরকার প্রস্তাব দিয়ে দেখতে পারে, কিন্তু ওঁরা গ্রহণ করবেন বলে মনে হয় না।'

'অবিশ্বাস্য,' শান্ত সুরে বললেন অ্যাডমিরাল। 'ঝাঁঝর দম্পতি মানুষজাতির ওপর আমার আস্থা ফিরিয়ে আনছেন।'

'অ্যাডমিরাল, এবার তাহলে আমাদের একটা সার্চ-অ্যান্ড-সার্ভে ভেসেল দরকার, তাই না?'

'এ-ব্যাপারে তোমার চেয়ে এগিয়ে আছি আমি,' মৃদু হেসে বললেন অ্যাডমিরাল। 'মি. রেডক্লিফ এরইমধ্যে সমস্ত ইকুইপমেন্ট সহ একটা সার্চ বোট ভাড়া করেছেন। কেনোশা থেকে ম্যানিটোউওকের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেছে ক্রুরা। বোটটার নাম সাবসিডি। ব্যাপারটা গোপন রাখা দরকার, তাই ছোট বোটই ভাল মনে করেছি। খবরটা ফাঁস হয়ে গেলে কয়েক হাজার ট্রেজার সীকার লেক মিশিগানে ঝাঁপ দেবে।'

'কিন্তু যদি...'

'কিন্তু যদি প্রিন্সেস হিয়াকে পেয়ে যাও তুমি,' রানার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন অ্যাডমিরাল, 'তখন কি হবে, এই তো? আমি আরও নির্দেশ দিয়েছি অন্য একটা প্রজেক্ট থেকে সরিয়ে জেড অ্যাডভেঞ্চারারকে যেন লেক মিশিগানে পাঠিয়ে দেয়া হয়।'

'ঠিক জাহাজটাই বেছে নিয়েছেন,' বলল রানা। 'জটিল উদ্ধারের কাজে প্রয়োজন হয়, এমন সব ইকুইপমেন্টই আছে জেড অ্যাডভেঞ্চারারে।'

'সাইটে ওটা চারদিনের মাথায় পৌঁছুবে।'

'এ-সব কাজ আপনি সেরে রেখেছেন, ঝাঁঝর সিং আমাদেরকে প্রিন্সেস হিয়ার হদিশ দিতে পারবে কিনা না জেনেই?'

'ইনটিউইশন, মাই বয়।'

রানা মুগ্ধ। 'আপনার সঙ্গে থাকতে হলে না দৌড়ে উপায় নেই।'

'কৃতিত্বটা আমার প্রিয় বন্ধু রাহাত খানের, রানা। সময়ের আগে থাকতে পারাটা আমি তাঁর কাছ থেকে শিখেছি।'

শাকিলাকে সঙ্গে নিয়ে দিনটা কাটাল রানা স্থানীয় ডুবুরীদের সঙ্গে পানির গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে আলাপ আর লেকের তলার চার্ট পরীক্ষা করে। পরদিন খুব সকালে ম্যানিটোউওক'স ইয়ট বেসিনে গাড়ি থামাল ওরা, ডক ধরে হেঁটে এল

যেখানে সাবসিডি ভিড়েছে। ক্রুরা ওদের জন্যে অপেক্ষা করছিল।

বোটটা পঁচিশ ফুট লম্বা, একটা কেবিন আছে, শক্তি যোগায় আড়াইশো হর্স পাওয়ারের একটা ইয়ামাহা আউটবোর্ড মোটর। ইকুইপমেন্টের মধ্যে আছে একটা নাভস্টার ডিফারেনশিয়াল গ্লোবাল-পজিশনিং সিস্টেম, সঙ্গে একটা ফোর-এইট-সিক্স কমপিউটর ও জিয়োমেট্রিক এইট-সিক্স-সিক্স মেরিন ম্যাগনেটোমিটার। আরও আছে সাইড-স্ক্যান সোনার, প্রিন্সেস হিয়াকে খুঁজে বের করতে প্রধান ভূমিকা পালন করবে। কাছ থেকে দেখার সুযোগ করে দেয়ার জন্যে বোটে একটা রোবোটিক আন্ডারওয়াটার ভেহিকেলও রাখা হয়েছে–মিনিরোভার এমকে টু।

অভিজ্ঞ ক্রুদের মধ্যে রয়েছে রুবিন ব্যাংক, দীর্ঘদেহী হাসিখুশি মানুষ, গোঁফে মোম লাগানো। তার সঙ্গী ম্যাট নোয়ামি, নিচু স্বরে কথা বলে, চেহারায় অলস ভাব। দু'জনেই ওরা উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাল। নিজেদের পরিচয় দিল রানা। 'এত সকাল সকাল আপনাদের আমরা আশা করিনি,' বলল ম্যাট নোয়ামি।

'দু'জনেই আমরা ভোরের পাখি,' বলল রানা। 'কেনোশা থেকে ট্রিপটা কেমন ছিল?'

'পানি একদম শান্ত পেয়েছি।'

চেহারা যা-ই বলুক, আলাপ করে দু'জনকেই পেশাদার মনে হলো রানার, নিজেদের কাজে নিবেদিতপ্রাণ। চোখে কৌতুক নিয়ে শাকিলাকে তারা ডক থেকে ঠিক একটা বিড়ালের মত নরম পায়ে লাফ দিয়ে বোটে উঠতে দেখল। শাকিলা তাজ জিনস আর সোয়েটার পরেছে, নাইলন উইন্ডব্রেকারের নিচে।

'বোটটা দারুণ লাগছে আমার,' মন্তব্য করল রানা।

সায় দিয়ে মাথা ঝাঁকাল ব্যাংক। 'কাজ চলে।' শাকিলার দিকে ফিরল সে। 'বোটে কিন্তু টয়লেট নেই, ম্যাডাম।'

'আমাকে নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। আমার ব্লাডার লোহা দিয়ে তৈরি।'

ছোট হারবার থেকে সীমাহীন লেকের বিস্তারটা একবার দেখে নিল রানা। 'হালকা বাতাস, এক কি দুই ফুট উঁচু ঢেউ, পরিস্থিতি অনুকূল বলেই মনে হচ্ছে। রওনা হবার জন্যে তৈরি আমরা?'

মাথা ঝাঁকিয়ে মুরিং লাইন খুলছে নোয়ামি। খোলার পর বোটে উঠতে যাবে, হাত তুলে একজন লোককে দেখাল। লোকটা ডকের দিকে এগিয়ে আসছে, পাগলের মত হাত নাড়ছে ওদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টায়। 'উনি কি আপনাদের সঙ্গে?'

ববি মুরল্যান্ডের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল রানা। বগলে জোড়া ক্রাচ, একটা পা গোড়ালি থেকে কুঁচকি পর্যন্ত প্লাস্টার করা। আহত, তবে হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে আছে ইটালিয়ান চেহারা। 'যদি ভেবে থাকো সমস্ত কৃতিত্ব একা নেবে, তীরে ফেলে রেখে যাবে আমাকে, তোমার সব ক'টা ছেলেমেয়ের চিকেন পক্স হবে,' অভিশাপ দিল সে।

রানা হাসছে না। 'পা ভাঙল কিভাবে? তোমার না ফিয়াঁসের সঙ্গে দেখা করার জন্যে টেক্সাসে যাবার কথা?'

নোয়ামি আর ব্যাংক ধরাধরি করে বোটে তুলে নিল মুরল্যান্ডকে। 'না যাই, না

আমার এই সর্বনাশ হয়,' জবাব দিল সে। 'শীলা, আমার ফিয়াঁসে, বিয়ের তারিখ ঠিক করার জন্যে জেদাজেদি করছে, এই সময় ওর বাবা বাড়িতে ফিরলেন। মেয়ের চেয়ে বাবা এককাঠি সরেস। যতই বলি, তিন মাস পর বিয়ের তারিখ জানাব, ততই চেপে ধরে—না, এখুনি বলতে হবে। আমিও গোঁ ধরে থাকলাম। ওমা, বাপ শালা রাইফেল বের করে তাড়া করল আমাকে! বাধ্য হয়ে জানালা গলে পালাবার চেষ্টা করি।'

'ক'তলার জানালা ওটা?'

'আর বোলো না। তিনতলার।'

রানা হাসবে না কাঁদবে বুঝতে পারছে না।

শাকিলা বলল, 'আপনার হাসপাতালে থাকা উচিত নয়?'

'হাসপাতালে আমার বমি পায়,' বলল মুরল্যান্ড, গম্ভীর হয়ে গেল। 'স্বভাবতই, ঘৃণাও করি। সুস্থ হবার চেয়ে মরার হার ওখানে বেশি।'

নোয়ামি জানতে চাইল, 'মি. রানা, আমরা কি এবার রওনা হতে পারি?'

'হ্যাঁ, পারি,' হাসি চেপে বলল রানা।

হারবার ছাড়িয়ে এসে সাবসিডির থ্রটল সামনে বাড়াল ব্যাংক, ঝাঁকি খেয়ে ছুটল বোট, ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল গতি। শাকিলা আর মুরল্যান্ড বোটের পিছন দিকে বসে প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করছে। আকাশের ভাসমান কালো মেঘগুলো যেন গরুর পাল, ঘাস খেতে খেতে অলস পায়ে হাঁটছে। ব্যাংকের হাতে চার্টটা ধরিয়ে দিল রানা, তাতে ঝাঁঝর দম্পতির বাড়ি থেকে ঠিক পঁচিশ মাইল দক্ষিণ-পুবে একটা ক্রস চিহ্ন আঁকা। ক্রস চিহ্নটাকে ঘিরে একটা চৌকো ঘর এঁকেছে, পাঁচ বর্গমাইল জায়গা জুড়ে। প্রিন্সেস হিয়াকে এই পাঁচ মাইলের মধ্যে খোঁজা হবে। কমপিউটরের বোতাম টিপে একটা প্রোগ্রাম তৈরি করল ব্যাংক, সংখ্যাগুলো মনিটরে ফুটে উঠছে। রানা ওদিকে প্রিন্সেস হিয়ার ফটোগুলো পরীক্ষা করছে।

খানিক পরই ব্যাংক জানাল, 'সার্চ গ্রিড এখান থেকে শুরু হবে। প্রথম লেন, আটশো মিটার।'

রানা ও নোয়ামি মিলে ম্যাগনেটোমিটার সেনসর আর সাইড-স্ক্যান সোনার টোফিশ ফেলল পানিতে। বোটের পিছু নিয়ে আসছে ওগুলো, কেবলের সঙ্গে সংযুক্ত। কেবলগুলো বেঁধে রেখে কেবিনে ফিরে এল ওরা।

সার্চ গ্রিড-এর সমান্তরাল লাইনগুলো মনিটর স্ক্রীনে ফুটে আছে, রুবিন ব্যাংক বোট চালাচ্ছে প্রথম লাইনটার ওপর দিয়ে। 'আর চারশো মিটার বাকি,' রিপোর্ট করল সে।

'মনে হচ্ছে যেন একটা অ্যাডভেঞ্চারে বেরিয়েছি আমরা,' কোন কারণ ছাড়াই উত্তেজিত দেখাচ্ছে শাকিলাকে।

'দুঃখজনক হলেও সত্যি, তোমাকে হতাশ হতে হবে,' হেসে উঠল রানা। 'লাইন ধরে শিপরেক খোঁজার চেয়ে একঘেয়ে কাজ খুব কমই আছে। সীমাহীন লনে ঘাস ছাঁটার মত বিরক্তিকর। হপ্তা, মাস, এমন কি বছর পেরিয়ে যাবে, তুমি হয়তো পুরানো একটা টায়ারও খুঁজে পাবে না।'

নোয়ামি সোনার-এর ওপর নজর রাখছে, রানা ম্যাগনেটোমিটারের ওপর।
'তিনশো মিটার,' বলল ব্যাংক।
'আমাদের রেঞ্জ কতোয় সেট করা হয়েছে?' জানতে চাইল রানা।
'টার্গেট যেহেতু পাঁচশো ফুট লম্বা, লেনের রেঞ্জ সেট করেছি এক হাজার মিটারে।' ইঙ্গিতে লেকের তলার বিশদ বিবরণ দেখাল সে, প্রিন্টার থেকে বেরিয়ে আসছে। 'লেকের তলা এদিকে সমতল, কিছু থাকলে সহজেই দেখতে পাব।'
'স্পীড?'
'ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল।'
'আমি একটু দেখতে পারি?' কেবিনের দরজা থেকে জিজ্ঞেস করল শাকিলা।
'ইউ আর ওয়েলকাম,' সরে গিয়ে জায়গা করে দিল নোয়ামি।
'সব একেবারে পরিষ্কার,' প্রিন্টারের ইমেজ দেখে বলল শাকিলা। 'বালির আলোড়ন পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি।'
'ডেপথ?' জিজ্ঞেস করল রানা।
ডেপথ সাউন্ডারের ওপর চোখ রাখল ব্যাংক। 'চারশো দশ ফুটের মত।'
কেবিনের বাইরে কুশনের ওপর শুয়ে আছে মুরল্যান্ড, ক্রাচ দুটো একটা রেলিঙে আটকানো। 'দিবানিদ্রার ডাকে সাড়া দিচ্ছি আমি। কিছু পেলে বোমা ফাটিয়ো।'
ঘণ্টাগুলো ধীরে ধীরে পেরিয়ে যাচ্ছে। সোনার, প্রিন্টার, কমপিউটর, ম্যাগনেটোমিটার ঠিকমত কাজ করছে কিনা লক্ষ রাখছে ওরা। একঘেয়ে কাজ, তবু কারও মনোযোগে এতটুকু ঢিল পড়েনি।
'লেকের তলা তো দেখছি মরুভূমির মত,' ক্লান্ত চোখ ডলে বলল শাকিলা।
'না, স্বপ্নের বাড়ি তৈরির জন্যে জায়গাটা আদর্শ নয়,' ঠোঁট মুড়ে হাসল নোয়ামি।
'বাইশ নম্বর লাইন শেষ করলাম,' জানাল ব্যাংক। 'তেইশ নম্বর ধরতে যাচ্ছি।'
হাতঘড়ি দেখল শাকিলা। 'লাঞ্চের সময় হয়েছে।' সঙ্গে করে নিয়ে আসা পিকনিক বাস্কেটটা খুলল। 'আমি ছাড়া আর কারও খিদে পেলে বলুন।'
'আমি সারাক্ষণ ক্ষুধার্ত,' বোটের পিছন থেকে মুরল্যান্ডের চিৎকার ভেসে এল।
'অদ্ভুত।' অবিশ্বাসে মাথা নাড়ছে রানা। 'বারো ফুট দূরে রয়েছে ও। বাইরে বাতাস তো আছেই, আউটবোর্ড মোটরও গর্জন করছে। অথচ খাবারের কথা একবার উচ্চারণ করতেই শুনে ফেলল!'
'খবরদার! খাবারের খোঁটা দেবে না…'
আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল মুরল্যান্ড, রানার গলা শুনে থেমে গেল। 'ম্যাগে একটা রিডিং পাচ্ছি আমি।' নোয়ামিকে জিজ্ঞেস করল, 'সোনারে কিছু আছে?'
'আপনার ম্যাগ সেনসরের চেয়ে আমার সোনার চৌত্রিশ পিছিয়ে আছে,' জবাব দিল নোয়ামি। 'আমি রিডিং পাব আপনার পরে।'
পিকনিক বাস্কেট এক পাশে সরিয়ে রেখে সোনার প্রিন্টারের দিকে ঝুঁকল

শাকিলা, কিছু একটা দেখতে পাবার আশায় জ্বল জ্বল করছে চোখ জোড়া। ভিডিও ডিসপ্লে ও প্রিন্টারে একই সঙ্গে একটা কঠিন টার্গেট ধীরে ধীরে ফুটে উঠতে শুরু করল। 'জাহাজ!' চেঁচিয়ে উঠল শাকিলা। 'একটা জাহাজ!'

'তবে আমরা যেটা খুঁজছি সেটা নয়,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'এটা পুরানো একটা সেইলিং শিপ।'

সবার পিছন থেকে উঁকি দিয়ে জাহাজটার দিকে তাকাল ব্যাংক। 'কেবিন, হ্যাচ কাভার, বো-সব পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।'

'মাস্তুল নেই,' বলল নোয়ামি।

'সম্ভবত ঝড় ওটাকে ভেঙে নিয়ে গেছে, তারপরই জাহাজটা ডুবে যায়,' বলল রানা।

টোফিশ-এর রেঞ্জ থেকে বেরিয়ে গেছে জাহাজটা, তবে ভিডিও স্ক্রীনে রেকর্ড করা ইমেজটা ফিরিয়ে আনল নোয়ামি। 'বেশ বড় আকার,' বলল সে। 'দেড়শো ফুট তো হবেই।'

'আমি ক্রুদের কথা ভাবছি,' বলল শাকিলা। 'ওরা কি বাঁচেনি?'

'প্রায় অক্ষত দেখে মনে হচ্ছে ডুবতে বেশি সময় নেয়নি,' বলল ব্যাংক।

উত্তেজনা কেটে গেছে, আবার শুরু হয়েছে প্রিন্সেস হিয়ার খোঁজ। বাতাস দিক বদলে এখন পশ্চিমে বইছে, গতি এত কম যে বোটের পতাকা ঠিকমত ওড়াতে পারছে না। কয়েকশো গজ দূর দিয়ে পাশ কাটাল একটা ওর শিপ, বেশ কিছুক্ষণ দোল খেলো সাবসিডি। আর কিছু ঘটছে না, কাজেই আপেল আর স্যান্ডউইচ দিয়ে লাঞ্চ সারল ওরা।

বেলা চারটের দিকে রানাকে প্রশ্ন করল ব্যাংক, 'দিনের আলো আর মাত্র দু'ঘণ্টা পাব, ডকে আপনি কখন ফিরতে চান?'

'লেক কখন খেপে উঠবে বলা যায় না, যতক্ষণ পানি শান্ত থাকে বিশ্রাম নিতে চাই না।'

'রোদ থাকা পর্যন্ত আছি,' সায় দিল নোয়ামি।

প্রত্যাশার উজ্জ্বল ভাবটুকু কারও চেহারা থেকেই অদৃশ্য হয়নি। রানা অনুরোধ করেছিল ব্যাংক যেন গ্রিড-এর মাঝখান থেকে সার্চ শুরু করে, পুব দিকটা ধরে। গ্রিড-এর অর্ধেকটা সমাপ্ত হয়েছে, বাকি অর্ধেক অর্থাৎ পশ্চিমের ত্রিশটা লেন বাকি আছে। লেকের পশ্চিম তীরে ইতস্তত করছে সূর্য, এই সময় আবার সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করল রানা। 'ম্যাগে একটা টার্গেট,' গলায় চাপা উত্তেজনার রেশ। 'বেশ বড়।'

'স্ক্রীনে আসছে,' বলল শাকিলা, ওর চেহারা দেখে মনে হচ্ছে বিদ্যুতের ধাক্কা খেয়ে স্থির হয়ে গেছে।

'আধুনিক একটা স্টীল শিপ,' বলল নোয়ামি।

'কত বড়?' জানতে চাইল ব্যাংক।

'এখুনি কি করে বলি। সবেমাত্র স্ক্রীনের কিনারায় পেলাম।'

'প্রকাণ্ড!' ফিসফিস করল শাকিলা। 'বিশাল!'

রানার ঠোঁটে লটারি বিজয়ীর মৌন হাসি। 'আমার ধারণা, পেয়ে গেছি।' চার্টে

চোখ রেখে ক্রসচিহ্নটা দেখে নিল একবার। ঝাঁঝর সিং যে লোকেশন দিয়েছেন তার চেয়ে তীরের দিকে তিনি মাইল ভেতরে জাহাজটা। পরিবেশ-পরিস্থিতি বিবেচনার মধ্যে রাখলে ভদ্রলোকের অনুমান প্রায় নিখুঁতই বলতে হবে, ভাবল রানা।

'ভেঙে দু'টুকরো হয়ে আছে,' বলল নোয়ামি, ভিডিও স্ক্রীনের ব্লু-ব্ল্যাক ইমেজের দিকে আঙুল তুলল সে। স্ক্রীনের দিকে সরে এসেছে সবাই, মুরল্যান্ডও পিছিয়ে থাকেনি। 'স্টার্নের অন্তত দুশো ফুট বিচ্ছিন্ন হয়ে দেড়শো ফুট দূরে পড়ে আছে। দুটো অংশের মাঝখানে আবর্জনার স্তূপ।'

'সামনের অংশটা খাড়াভাবে বসে আছে,' বলল রানা।

'কেউ বলছে না কেন এটাই প্রিন্সেস হিয়া!' উত্তেজনায় কেঁপে গেল শাকিলার গলা।

'নিশ্চিতভাবে জানা যাবে ওটার কাছে রোবোটিক আন্ডারওয়াটার ভেহিকেল পাঠাবার পর।' ব্যাংকের দিকে তাকাল রানা। 'আপনি কি কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে চাইছেন?'

'পাবার পর ফিরে যাব?' হাসল ব্যাংক। 'রাতে কাজ করার ব্যাপারে কারও কোন আপত্তি আছে?'

হৈ-হৈ করে উঠল সবাই, আপত্তি জানাতে আপত্তি। রানা আর নোয়ামি দ্রুত টৌফিশ ও ম্যাগনেটোমিটার তুলে আনল পানি থেকে। বাক্স খুলে বের করা হলো মিনিরোভার এমকে টু রোবোটিক ভেহিকেল, সংযোগ দেয়া হলো কন্ট্রোল হ্যান্ডবক্স আর ভিডিও মনিটরের সঙ্গে। মাত্র পঁচাত্তর পাউন্ড ওজন, দু'জন ধরাধরি করে নামিয়ে দেয়া গেল পানিতে। আরওভি-র আলো ধীরে ধীরে পানির গভীরতায় অদৃশ্য হয়ে গেল, লেক মিশিগানের গাঢ় অতলে অভিযান শুরু করল ওটা। জাহাজটার সরাসরি ওপরে স্থির হয়ে আছে সাবসিডি, রুবিন ব্যাংক গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেমের কমপিউটর স্ক্রীনে একটা চোখ রেখেছে।

স্ক্রীনে লেকের তলা দেখা যেতেই মিনিরোভারকে থামাল নোয়ামি। ধূসর একটা চাদরের মত লাগছে পলি মোড়া লেকের তলা। 'গভীরতা এখানে চারশো ত্রিশ ফুট,' বলল সে, মিনিরোভারকে একটা বৃত্তাকারে চালাচ্ছে। ওটার আলোয় হঠাৎ করে বড় আকৃতির একটা শ্যাফট দেখা গেল, যেন সামুদ্রিক কোন দানবের শরীর থেকে প্রকাণ্ড শুঁড়ের মত বেরিয়ে এসেছে।

কমপিউটর পজিশনিং স্ক্রীন থেকে চোখ তুলে ব্যাংক অবাক গলায় জানতে চাইল, 'কি ওটা?'

'আরও কাছে নিয়ে যান,' নোয়ামিকে নির্দেশ দিল রানা। 'সম্ভবত খোলের সামনের দিকে, কার্গো সেকশনে নেমেছি আমরা।' সত্যি সত্যিই ওরা কেউ নামেনি, বলাই বাহুল্য, রোবোকে টীমের একজন সদস্য ধরে নিয়ে কথা বলছে ও। 'ওটা একটা লোডিং ক্রেনের ওভারহেড বুম, ফরওয়ার্ড ডেকে।'

হ্যান্ডবক্স কন্ট্রোল নাড়াচাড়া করে রোবো বা মিনিরোভারকে ক্রেনের এক পাশ দিয়ে চালাচ্ছে নোয়ামি। ধীরে ধীরে বড় একটা জাহাজের খোল ভিডিও স্ক্রীনে আলোকিত হয়ে উঠছে। জাহাজের বো এখনও খাড়া হয়ে আছে, প্রবল স্রোত বা

ঝড় ওটাকে কাত করতে পারেনি। খানিক পর জাহাজটার আউটলাইন পরিষ্কার হলো, গায়ে আঁকা হরফগুলো এক এক করে পাশ কাটাচ্ছে স্ক্রীনে।

'প্রিন্সেস টা'লি সিনান!' মুরল্যান্ড উল্লাসে ফেটে পড়ল। 'পেয়ে গেছি!'

'চীন সাগরের রানী,' বিড়বিড় করল শাকিলা, যেন সম্মোহিত হয়ে পড়েছে। 'কেমন বিষণ্ন আর পরিত্যক্ত লাগছে, না? যেন কাঁদছিল আর মনে মনে প্রার্থনা করছিল, আমরা এসে উদ্ধার করব।'

'কিন্তু আমি ভেবেছিলাম আপনারা প্রিন্সেস হিয়া লিয়েন নামে একটা জাহাজ খুঁজছেন,' ব্যাংক একে একে ওদের দিকে তাকাল।

'সে এক লম্বা কাহিনী,' বলল রানা। 'তবে নাম দুটো হলেও জাহাজ একটাই।'

রানার নির্দেশ পেয়ে আন্ডারওয়াটার ভেহিকেল আর ক্যামেরা নিয়ন্ত্রণে মনোযোগী হলো নোয়ামি। মিনিরোভারের নিচে বসানো ক্যামেরা পঞ্চাশ ফুট পর্যন্ত আলো পাচ্ছে, তাতে দেখা গেল প্রিন্সেস হিয়ার ভেতরটা পঞ্চাশ বছরেও তেমন একটা বদলায়নি। লবণমুক্ত হিম পানি জলজ উদ্ভিদ গজাতে বা মরচে ধরতে দেয়নি। সুপারস্ট্রাকচার প্রায় অক্ষত দেখতে পেল ওরা, রঙের ওপর শুধু হালকা পলি জমেছে। ভৌতিক একটা বাড়ির মত লাগছে প্রিন্সেস হিয়াকে, বহুকাল ঝাড়মোছ হয়নি।

মিনিরোভারকে ব্রিজের দিকে নিয়ে এল নোয়ামি। ঝড়ের তাণ্ডবে আর লেকের তলার সঙ্গে সংঘর্ষের বেশিরভাগ জানালা ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। ভেতরে এঞ্জিন-রুম টেলিগ্রাফ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল ওরা, পয়েন্টার এখনও 'ফুল অ্যাহেড'-এ সেট করা। ভেতরে এখন শুধু অল্প কিছু মাছ বাস করে। ক্রুরা কেউ নেই, ডোবার সময় প্রবল স্রোতে ভেসে গেছে। লাইফবোট ডেভিটগুলো খালি, দুমড়েমুচড়ে একাকার হয়ে আছে। কাঠের বাক্সগুলোকে অক্ষত বলে মনে হলো, খোলা ডেকের প্রতিটি বর্গফুট দখল করে রেখেছে। ব্রিজের পিছনে চিমনি অদৃশ্য হয়েছে, তবে খোলের পাশে কোথায় খসে পড়েছে দেখতে পেল ওরা।

'কৌতূহলে মরে যাচ্ছি আমি,' ফিসফিস করল শাকিলা। 'বাক্সগুলোর ভেতর কি আছে?'

'দু'একটা বাক্স নিশ্চয়ই খোলা পাব,' বলল রানা, স্ক্রীন থেকে চোখ সরাতে পারছে না।

সুপারস্ট্রাকচারের পিছনে খোলটা ভেঙে গেছে, দৈত্যাকার ঢেউয়ের অবিরাম আঘাত সহ্য করতে পারেনি। ইস্পাতের খোল প্রথমে মোচড় খায়, ভাঙার পর কিনারাগুলো এবড়োখেবড়ো হয়ে গেছে। পানির গভীরে তলিয়ে যাবার সময় স্টার্ন সেকশন সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, যেন একটা দৈত্য জাহাজটাকে দু'হাতে টেনে ছিঁড়ে ফেলেছে, তারপর ভাঙা টুকরোগুলো ছুঁড়ে ফেলেছে এক পাশে।

'দুই টুকরোর মাঝখানে এত আবর্জনা, ওগুলো কি জাহাজের ফার্নিচার?'

মাথা নাড়ল রানা। 'সিঙ্গাপুরে পাঠানো হচ্ছিল ভেঙে ফেলার জন্যে, তাই আগেই সব ফার্নিচার সরিয়ে ফেলা হয়। তুমি যেগুলোকে আবর্জনা বলছ, আমার ধারণা ওগুলো আর্টিফ্যাক্ট।'

ক্যামেরা কাছে যেতে রানার কথাই সত্যি প্রমাণিত হলো। স্লোকের তলায় একগাদা কাঠের বাক্স ছড়িয়ে আছে। বেশিরভাগ বাক্সই খোলা বা ভাঙা, ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে নানা আকৃতির বিচিত্র সব আর্টিফ্যাক্ট। বড় আকৃতির একটা বাক্স বিস্ফোরিত হয়েছে গোলাপ পাপড়ির আকৃতি নিয়ে, ভৌতিক নির্জনতায় ভেতরে দাঁড়িয়ে আছে অদ্ভুত একটা কাঠামো।

'কি ওটা?' ব্যাংককে হতচকিত দেখাল।

'ব্রোঞ্জের তৈরি একটা ঘোড়া আর ঘোড়সওয়ার,' মুগ্ধ বিস্ময়ে বিড়বিড় করল রানা। 'লাইফ-সাইজ। আমি বিশেষজ্ঞ নই, তবে এ নিশ্চয়ই প্রাচীন হান সাম্রাজ্যের কোন সম্রাটের স্কাল্পচার।'

'কতদিনের পুরানো হতে পারে?' নোয়ামি জানতে চাইল।

'দু'হাজার বছরের কাছাকাছি।'

পানির তলায় ছুটন্ত ভঙ্গিতে তৈরি করা ঘোড়ার পিঠে শিরদাঁড়া খাড়া করে প্রাচীন সম্রাটকে বসে থাকতে দেখে এমনই মুগ্ধ আর বিহ্বল হয়ে পড়ল ওরা, দীর্ঘ দু'মিনিট কারও মুখে কথা ফুটল না, একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল স্ক্রীনের দিকে। শাকিলার মনে হলো ওকে যেন অতীতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ঘোড়ার মাথা মিনিরোভারের দিকে সামান্য ফেরানো, নাকের ফুটোগুলো বিস্ফারিত হয়ে আছে। ঘোড়সওয়ার সরাসরি সামনে তাকিয়ে, দৃষ্টিহীন চোখ অনন্ত শূন্যতায় স্থির।

'চারদিকে আমি শুধু ট্রেজার দেখছি,' ফিসফিস করে বলল শাকিলা।

'স্টার্নের দিকে চলুন,' নোয়ামিকে নির্দেশ দিল রানা।

'কেবলে টান পড়বে,' বলল নোয়ামি। 'স্টার্নের দিকে যেতে হলে ব্যাংককে বোট সরাতে হবে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে কমপিউটরের দিকে তাকাল ব্যাংক, দিক ও দূরত্ব হিসাব করে সাবসিডিকে হিয়ার বিচ্ছিন্ন স্টার্নের দিকে নিয়ে এল। এরপর মিনিরোভার হিয়ার প্রপেলারকে পাশ কাটাল। পলির ভেতর থেকে প্রপেলারের আপার ব্লেড বাইরে বেরিয়ে আছে। প্রকাণ্ড হালটা সরাসরি সামনের কোর্সে এখনও স্থির। স্টার্নের হরফগুলো পরিষ্কার বলে দিচ্ছে জাহাজটার হোম পোর্ট সাংহাই। এদিকেও একই দৃশ্য–ইস্পাতের প্লেট মোচড়ানো ও ছেঁড়া, ছিটকে বেরিয়ে পড়েছে এঞ্জিন, চারদিকে ছড়িয়ে আছে মহামূল্য আর্ট ট্রেজার।

মাঝরাত পার হয়ে গেল। ভাঙা খোলের অংশ দুটো সম্ভাব্য সব কোণ থেকে পরীক্ষা করছে ওরা। রাত তিনটের দিকে একমত হলো সবাই, আর কিছু দেখার নেই। মিনিরোভারকে টেনে নিল নোয়ামি।

দশ

অফিসটা এত বড় যে মাঝখানে স্টেজ তৈরির পরও চারধারে প্রচুর খালি জায়গা পড়ে আছে। স্টেজের ওপর ফেলা ডেস্কে বসে হুয়ান হানের ভাড়া করা গবেষকদের পাঠানো রিপোর্টে চোখ বুলাচ্ছেন হিস্টোরিয়ান ঝাউ মিয়াং, সংখ্যায়

সেগুলো একশোরও বেশি। হানের 'প্রিন্সেস হিয়া লিয়েন প্রজেক্ট' তার তাইপে হেডকোয়ার্টারের একটা ফ্লোরের অর্ধেকটা দখল করে নিয়েছে। বিশাল বাজেট, বলা হয়েছে যত টাকা লাগে লাগুক, প্রজেক্ট সফল হওয়া চাই। অথচ কোথাও থেকে কোন সুখবর আসছে না। মেধার এত চর্চা, পরিশ্রম, খরচ, প্রত্যাশা, সবই ব্যর্থ হতে চলেছে। ঝাউ মিয়াং-এর কাছে প্রিন্সেস হিয়া এখনও একটা রহস্যময় মরীচিকা হয়েই আছে।

একদিকে মিয়াং-এর টীম সূত্র পাবার জন্যে সম্ভাব্য সবগুলো ম্যারিটাইম উৎস হানা দিচ্ছে, আরেকদিকে হুয়ান হানের সার্ভে-অ্যান্ড স্যালভেজ শিপ অ্যাকসেস প্যাসেঞ্জার লাইনার প্রিন্সেস হিয়ার খোঁজে চিলির উপকূল চষে বেড়াচ্ছে। তার এই শিপ হংকঙের নিজস্ব শিপইয়ার্ডে তৈরি, আন্ডারসী টেকনলজির একটা বিস্ময়ই বলতে হবে। বিদেশী জলসীমায় অপারেট করা হবে, এ-কথা মনে রেখে হান তার অনুসন্ধান ও উদ্ধারকারী জাহাজের ইংরেজি নাম দিয়েছে। এর আগে জাহাজের ক্রুরা চীন সাগর থেকে ষোলোশো শতাব্দীর একটা জাহাজ উদ্ধার করেছে, সেটা থেকে পাওয়া গেছে প্রচুর আর্টিফ্যাক্ট।

চশমা খুলে হাত দিয়ে চোখ ডলছেন ঝাউ মিয়াং, স্পীকারফোনে তাঁর একজন সহকারীর গলা ভেসে এল, 'স্যার, আমেরিকা থেকে আপনার ফোন। বিউ মরটন নামে এক ভদ্রলোক।'

'লাইন দাও, লাইন দাও,' তাড়াতাড়ি বললেন ঝাউ মিয়াং।

'হ্যালো, মিস্টার মিয়াং,' মরটনের উল্লসিত গলা ভেসে এল লাইনে। 'আমি বিউ মরটন।'

'কি অদ্ভুত সারপ্রাইজ, মি. মরটন। তরুণ বন্ধু আমাকে স্মরণ করায় নিজেকে আমি সম্মানিত বোধ করছি।'

'এখন যা বলব, শুনে আরও বেশি সম্মানিত বোধ করবেন।'

চীনা ইতিহাস বিশেষজ্ঞ বিমূঢ় হলেন। 'আমাকে বিস্মিত করা আপনার একটা গুণ। আমি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি।'

'তাহলে আমাকে বলুন, মি. মিয়াং, আপনি কি এখনও প্রিন্সেস হিয়া লিয়েন নামে জাহাজটা খুঁজে পাবার ব্যাপারে আগ্রহী?'

হাঁ করে মুখ দিয়ে বাতাস টানলেন ঝাউ মিয়াং, ভয়ের একটা শিহরণ জাগছে শরীরে। 'জাহাজটাকে আপনিও খুঁজছেন নাকি?'

'আরে দূর, না!' তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল মরটন। 'জাহাজটা সম্পর্কে আমার নিজের কোন আগ্রহই নেই। আসলে হয়েছে কি, গ্রেট লেকস-এ ডুবে যাওয়া একটা কার ফেরী সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে একটা জাহাজের ডকুমেন্ট হাতে পাই। ডকুমেন্টটা তৈরি করেছেন একজন এঞ্জিনিয়ার। ভদ্রলোক মারা গেছেন। ডকুমেন্টে দেখা যাচ্ছে প্রিন্সেস হিয়া ডুবে যাবার সময় তাতে তিনি ডিউটিতে ছিলেন।'

'হোয়াট? আপনি একজন সারভাইভারকে পেয়েছেন?'

'ভদ্রলোকের নাম ঝাঁঝর সিং। ঝাঁঝর সিং প্রিন্সেস হিয়ার চীফ এঞ্জিনিয়ার ছিলেন, জাহাজটা যখন ডোবে।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাঁর একটা ফাইল আছে আমার কাছে।'

'ঝাঁঝর সিংই একমাত্র সারভাইভার। জাহাজডুবির পর বেঁচে যান তিনি, কিন্তু কোনদিনই আর চীনে বা ভারতে ফেরেননি, আমেরিকায় গা ঢাকা দিয়ে ছিলেন-কারণটা যা-ই হোক।'

'প্রিন্সেস হিয়া!' হাঁপাচ্ছেন মিয়াং, প্রত্যাশায় ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন। 'চিলির কাছে জাহাজ যেখানে ডুবেছে, ঝাঁঝর সিং কি সঠিক পজিশন দিয়ে গেছেন?'

'দাঁড়িয়ে থাকলে বসে পড়ুন, শ্রদ্ধেয় বন্ধু,' বলল মরটন। 'প্রিন্সেস হিয়া সাউথ প্যাসিফিকে ডোবেনি।'

'কিন্তু হিয়ার ফাইনাল ডিসট্রেস কল?' গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুতে চাইছে না, দিশেহারা বোধ করছেন মিয়াং।

'হিয়া লেক মিশিগানে, আমেরিকায়।'

'ইমপসিবল!' গুঙিয়ে উঠলেন মিয়াং।

'বিশ্বাস করুন, কথাটা সত্যি। ডিসট্রেস সিগন্যাল ভুয়া ছিল।' চিয়াং কাই-শেক আর তার জেনারেলের চালাকি ব্যাখ্যা করল মরটন। হিয়ার নাম বদলের ঘটনা আর সেন্ট লরেন্স নদীপথ ধরে গ্রেট লেকস-এ পৌঁছানোর ইতিহাসও বলে গেল। জানাল, শিকাগো থেকে মাত্র দুশো মাইল উত্তরে প্রবল একটা ঝড়ের মধ্যে পড়ে ডুবে যায় হিয়া।'

'এ অবিশ্বাস্য, মি. মরটন। এ-সব তথ্যের সত্যতা সম্পর্কে আপনি পুরোপুরি নিশ্চিত?'

'অভিযান আর জাহাজ ডুবি সম্পর্কে ঝাঁঝর সিং-এর রিপোর্ট আমি আপনাকে ফ্যাক্স করে পাঠাচ্ছি।'

তলপেট মোচড় খাচ্ছে, ঝাউ মিয়াং অসুস্থ বোধ করছেন। 'ঝাঁঝর সিং জাহাজের কার্গো সম্পর্কে রিপোর্টে কিছু লিখেছেন?'

'কার্গো সম্পর্কে ঝাঁঝর সিং এক জায়গায় লিখেছেন, জেনারেল তাঁকে জানান যে সাংহাই থেকে কাঠের যে বাক্সগুলো জাহাজে তোলা হয় সেগুলোয় প্রথম সারির জাতীয়তাবাদী নেতা ও সামরিক কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত ফার্নিচার আর পোশাক-পরিচ্ছদ আছে।'

যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল, পরম স্বস্তিবোধ করলেন মিয়াং। গোপন ব্যাপারটা তাহলে ফাঁস হয়নি! 'বিপুল ট্রেজার সম্পর্কে গুজবটা তাহলে সত্যি নয়। হিয়ায় দেখা যাচ্ছে খুব দামী কিছু নেই।'

'কিছু জুয়েলারি পাওয়া যেতে পারে, তবে প্রফেশনাল ট্রেজার হান্টারদের আকৃষ্ট করার মত কিছু নেই।'

'আমাকে ছাড়া এই তথ্য আর কাউকে আপনি জানিয়েছেন?' সাবধানে জিজ্ঞেস করলেন মিয়াং।

'আর কেউ আগ্রহ দেখালে তো জানাব,' জবাব দিল মরটন। 'একমাত্র আপনিই হিয়া সম্পর্কে খোঁজ চেয়েছিলেন, তাই...'

'এই আবিষ্কারের কথা কাউকে না জানালে আপনার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ থাকব, মি. মরটন। অন্তত মাস কয়েক ব্যাপারটা গোপন রাখুন, প্লীজ।'

'এই মুহূর্ত থেকে মুখে কুলুপ আঁটছি।'
'আর, ব্যক্তিগত একটা অনুরোধ।'
'বলুন, প্লীজ।'
'দয়া করে ঝাঁঝর সিং-এর রিপোর্টটা ফ্যাক্স করে পাঠাবেন না। সব খরচ আমার, ওটা আপনি একজন প্রাইভেট কুরিয়ারকে দিয়ে পাঠান।'
'আপনি যা বলেন,' সঙ্গে সঙ্গে রাজি হলো মরটন। 'কোন রেখেই কুরিয়ার সার্ভিসের সঙ্গে যোগাযোগ করছি।'
'অসংখ্য ধন্যবাদ, আমার তরুণ বন্ধু,' আন্তরিক সুরে বললেন ঝাউ মিয়াং। 'আপনি আমার একটা বিরাট উপকার করলেন। প্রিন্সেস হিয়ার তেমন কোন ঐতিহাসিক বা অর্থনৈতিক মূল্য নেই বটে, কিন্তু বহু বছর ধরে আমার কানে একটা মশা হয়ে আছে ওটা।'
'ব্যাপারটা আমি উপলব্ধি করতে পারি। যত নগণ্যই হোক, কোন কোন জাহাজের কথা ভোলা যায় না।'
'ধন্যবাদ, মি. মরটন, অসংখ্য ধন্যবাদ।'

'আলাপটা ভালই করলে,' মরটন ফোনের রিসিভার নামিয়ে রাখতে বললেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন। 'পাকা সেলসম্যানের মতই বোকা বানালে পণ্ডিত ঝাউ মিয়াংকে।'
'কিংবা নির্বাচনে দাঁড়ানো একজন রাজনীতিকের মত,' বলল মুরল্যান্ড।
'ঝাউ মিয়াং অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব,' গম্ভীর সুরে বলল মরটন। 'তাঁর সঙ্গে আমার বহু বছরের সম্পর্ক। তাঁকে মিথ্যে কথা বলতে আমার খারাপ লেগেছে।'
'তিনিও তোমাকে মোটেও সত্যি কথা বলেননি,' বলল রানা। 'বলেছেন, হিয়া সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ স্রেফ অ্যাকাডেমিক। অথচ তাঁর অন্তত না জানার কথা নয় যে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ আর্ট ট্রেজার নিয়ে ডুবে গেছে জাহাজটা। ফ্যাক্স লাইনে আড়িপাতা সম্ভব, সেজন্যেই কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে রিপোর্টটা চেয়েছেন তিনি, তাই না? তুমি বাজি ধরতে পারো, খবরটা হুয়ান হানকে জানাবার জন্যে ছটফট করছেন ভদ্রলোক।'
মাথা নাড়ল মরটন। 'ঝাউ মিয়াং অত্যন্ত খুঁতখুঁতে স্কলার, ডকুমেন্ট পরীক্ষা না করে তিনি তাঁর এমপ্লয়ারকে কিছু জানাবেন না।' একে একে সবার দিকে তাকাল সে। 'স্রেফ কৌতূহল, যে রিপোর্টটা তাঁকে পাঠাচ্ছি, কে লিখেছে সেটা?'
হাত তুললেন জর্জ রেডক্লিফ। 'এই অধম। স্বভাবতই লেখকের স্বাধীনতা বলে যে কথাটা প্রচলিত আছে, সেটার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছি আমি। ফুট নোটে উল্লেখ করতে ভুলিনি ঝাঁঝর সিং উনিশশো বিরানব্বুই সালে হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছেন।'
অ্যাডমিরাল তাঁর স্পেশাল প্রজেক্ট ডিরেক্টরের দিকে ফিরলেন। 'হানের স্যালভেজ শিপ পৌঁছুবার আগে যথেষ্ট সময় পাবে তো, আর্ট ট্রেজার তুলে আনার জন্যে?'
কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'শুধু জেড অ্যাডভেঞ্চারারকে দিয়ে হবে না, আরও

জাহাজ লাগবে।'

'চিন্তার কিছু নেই,' বললেন রেডক্লিফ। 'আমরা আরও একজোড়া স্যালভেজ ভেসেল ভাড়া করেছি। একটা মন্ট্রিঅল-এর প্রাইভেট কোম্পানি থেকে, দ্বিতীয়টা পাচ্ছি ইউ.এস. নেভির কাছ থেকে ধার হিসেবে।'

'সব কাজ তাড়াতাড়ি সারতে হবে,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'আমি চাই ব্যাপারটা জানাজানি হবার আগেই সমস্ত ট্রেজার তুলে ফেলা হোক। কোন পক্ষই, এমন কি আমাদের সরকারও, যেন কোন বিঘ্ন সৃষ্টি করতে না পারে।'

'তারপর? কাজটা শেষ হলে?' জিজ্ঞেস করল মরটন।

'সমস্ত আর্টিফ্যাক্ট দ্রুত একটা ফ্যাসিলিটিতে পাঠিয়ে দেব। সেখানে প্রয়োজনীয় ইকুইপমেন্ট থাকতে হবে, এত বছর পর পানি থেকে তোলায় ওগুলোর ক্ষয়ক্ষতি যাতে ঠেকাতে পারে। শুধু তারপরই আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করব আমরা, একপাশে সরে দাঁড়িয়ে ওয়াশিংটন আর বেইজিং-এর ব্যুরোক্র্যাটদের লড়াই করতে দেখব।'

'আর হুয়ান হান?' আরও গভীরে যেতে চাইছে মরটন। 'নিজের স্যালভেজ শিপ নিয়ে সে যখন সাইটে আসবে, তখন কি হবে?'

শয়তানি হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে। 'তার ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দাও।'

প্রিন্সেস হিয়ার ওপর, সারফেসে, সবার আগে পৌছুল জেড অ্যাডভেঞ্চারার; আরোহী হিসেবে রয়েছে রানা, মুরল্যান্ড, জর্জ রেডক্লিফ ও শাকিলা। চার ঘণ্টা পর মন্ট্রিঅল থেকে এল কানাডিয়ান স্যালভেজ শিপ ম্যাডাম ইসাবেলা। ইসাবেলা পুরানো জাহাজ, প্রথম জীবনে টাগবোট ছিল, মডিফাই করে স্যালভেজ শিপ বানানো হয়েছে। পরিচ্ছন্ন আবহাওয়া আর শান্ত পানি পাওয়ায় আর্ট ট্রেজার উদ্ধারের কাজ শুরু করে দিল ওরা।

কৃত্রিম হাত সহ সাবমারসিবল নামানো হলো পানিতে। ডাইভাররাও নামল, ডীপ-ওয়াটার অ্যাটমসফেরিক ডাইভিং সিস্টেমে মোড়া, নাম নিউটসুট। ফাইবারগ্লাস আর ম্যাগনেশিয়াম দিয়ে তৈরি, সেলফ-প্রপেলড। নিউটসুট পরে চারশো ফুটের বেশি গভীরতায় ডিকম্প্রেশন-এর ঝামেলা এড়িয়ে দীর্ঘ সময় কাজ করতে পারবে ডাইভাররা।

রুটিন নিখুঁত করার পর সুশৃঙ্খল একটা পদ্ধতিতে দ্রুত ও নিয়মিত আর্টিফ্যাক্ট আসতে শুরু করল। কাজের গতি আরও বেড়ে গেল ইউ. এস. নেভির স্যালভেজ ভেসেল ডীপ প্রোব নির্ধারিত সময়ের দু'দিন আগে পৌছে যাওয়ায়। ডীপ প্রোব নতুন জাহাজ, মাত্র দু'বছর হলো পানিতে নামানো হয়েছে। সাধারণত গভীর পানি থেকে সাবমেরিন তোলার কাজে ব্যবহার করা হয় ওটাকে। লম্বা ব্যালাস্ট ট্যাঙ্ক সহ খোলা একটা বিশাল বার্জ ওটার খোলের পাশে ভেসে আছে। গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেমের সাহায্যে লেকের তলায় ডোবানো হলো ওটাকে, স্থির হলো প্রিন্সেস হিয়ার সামনের অংশ থেকে সামান্য দূরে। এরপর ক্রেন অপারেটররা, সারফেসে ভাসমান জাহাজে যারা দাঁড়িয়ে আছে, আন্ডারওয়াটার ক্যামেরা থেকে পাঠানো জ্যান্ত ছবি দেখে উইঞ্চ কেবল-এর শেষপ্রান্তে ফিট করা

যান্ত্রিক থাবা অপারেট শুরু করল, হিয়ার আউটার ডেকে পড়ে থাকা কাঠের বাক্সগুলো তুলে আনছে। আউটার ডেক খালি হবার পর যান্ত্রিক থাবা কার্গো হোল্ডের ভেতর ঢুকল, যা আছে বের করে আনল সব। সবশেষে হিয়ার দুই অংশের মাঝখানে ছড়িয়ে থাকা বাক্স ও আর্টিফ্যাক্ট তুলছে। সবই এক এক করে বার্জে তোলা হলো। বার্জে যখন আর জায়গা নেই, প্রেশারাইজড এয়ার ভরা হলো ব্যালাস্ট ট্যাঙ্কে, বার্জ উঠে এল সারফেসে। এরপর দায়িত্ব নিল একটা টাগবোট, বার্জটাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে শিকাগো বন্দরে। ওখানে নুমার একটা আর্কিওলজিস্ট টীম অপেক্ষা করছিল, তাদের হাতে আর্ট ট্রেজার তুলে দেয়া হলো। ভেজা কাঠের বাক্স থেকে অত্যন্ত সাবধানে এক এক করে সেগুলো বের করলেন তাঁরা, আপাতত রেখে দিলেন কনজারভেশন ট্যাঙ্কে। এখান থেকে পরে ওগুলোকে আরও স্থায়ী প্রিজার্ভেশন ফ্যাসিলিটিতে পাঠানো হবে।

পুরো লোড করা বার্জ রওনা হবার পরপরই আরেকটা বার্জকে পজিশনে এনে নামিয়ে দেয়া হলো লেকের তলায়, পদ্ধতিটার পুনরাবৃত্তি ঘটছে। বার্জগুলোর কার্গো কমপার্টমেন্ট বিশেষভাবে ডিজাইন করা, অমূল্য আর্টিফ্যাক্ট ভর্তি বাক্সগুলোকে ওই কমপার্টমেন্টে নিয়ে আসছে সব মিলিয়ে ছ'টা সাবমারসিবল।

খোলের ভেতর থেকে বাক্স বের করার জন্যে নিউটসুট পরা ডাইভাররা টর্চ সিস্টেমের সাহায্যে স্টীল প্লেট কেটে ফেলল। ঢোকার মত ফাঁক তৈরি হলেই ভেতরে সেঁধিয়ে ট্রেজার বের করে আনছে সাবমারসিবল, সাহায্য করছে সারফেস থেকে পরিচালিত ক্রেনের যান্ত্রিক থাবা।

গোটা অপারেশন জেড অ্যাডভেঞ্চারারের একটা কন্ট্রোল রূম থেকে পর্যবেক্ষণ করা হলো। প্রিন্সেস হিয়ার চারধারে বসানো ক্যামেরা কন্ট্রোল রূমের ভিডিও স্ক্রীনে ছবি পাঠাচ্ছে, এখানে বসে ট্রেজার উদ্ধারের খুঁটিনাটি প্রতিটি কাজ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ করল ওরা। রেডক্লিফ আর রানা বারো ঘণ্টার শিফটে কাজ করছে, ওদের সঙ্গে তিন জাহাজের ক্রুরাও। ঘড়ির কাঁটা নিয়ম ধরে একই জায়গায় বারবার ফিরে আসছে, তবু লেকের তলা থেকে আর্টিফ্যাক্ট ওঠার শেষ নেই।

মুরল্যান্ড একটা সাবমারসিবলে রয়েছে, সেটা প্রিন্সেস হিয়ার খোলের ভেতর ঢুকে আর্টিফ্যাক্ট সংগ্রহে ব্যস্ত; সাত ঘণ্টার শিফটে কাজ করছে সে।

জর্জ রেডক্লিফ কন্ট্রোল রূমে ঢুকছেন, ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা। সকালের প্রথম রোদ ঢুকল ভেতরে, মুহূর্তের জন্যে আলোকিত হয়ে উঠল কমপার্টমেন্টটা– এখানে কোন পোর্ট বা জানালা নেই। 'এখুনি ফিরে এলেন?' রানা অবাক। 'মনে হচ্ছে এই একটু আগে বেরিয়ে গেছেন।'

'মজার কাজে সময় জাদু,' বলে হাসলেন রেডক্লিফ। 'কেমন বুঝছেন?'

'আরেকটা বার্জ ভরা হয়েছে, উঠে আসছে সারফেসে।' গ্যালি থেকে ভেসে আসা কফির গন্ধ ঢুকল রানার নাকে, এক কাপ পাবার জন্যে কাতর হয়ে উঠল মনটা।

'এত বেশি বাক্স, আমার কাছে প্রায় অবিশ্বাস্য লাগছে।' কমিউনিকেশন কনসোল ও সারি সারি ভিডিও স্ক্রীনের সামনে নিজের আসনে বসলেন রেডক্লিফ।

'হিয়া অতি মাত্রায় ওভারলোডেড ছিল,' বলল রানা। 'খারাপ আবহাওয়ায় পড়ে ভেঙে ডুবে যাবার সেটাই তো কারণ।'

'কাজটা শেষ হতে আর কতক্ষণ লাগবে?'

'লেকের মেঝেতে ছড়িয়ে পড়া প্রায় সব বাক্সই তুলে আনা হয়েছে। স্টার্ন সেকশনেও কাজ প্রায় শেষ। পরবর্তী শিফট শেষ হবার আগেই কার্গো হোল্ড খালি হয়ে যাবে। বাকি থাকবে প্যাসেজওয়ে আর স্টেটরুমের স্তূপ করা বাক্সগুলো। বাল্কহেড কেটে ভেতরে ঢুকতে হচ্ছে তো, সময় তো লাগবেই।'

'কোন খবর পেলেন, হানের স্যালভেজ শিপ কখন পৌঁছাবে?' জানতে চাইলেন রেডক্লিফ।

'অ্যাকসেস?' একটা টেবিলে মেলা গ্রেট লেকস-এর ম্যাপে চোখ রাখল রানা। 'শেষ রিপোর্ট, সেন্ট লরেন্সে আসার পথে কুইবেক পার হয়েছে।'

'অর্থাৎ এখানে পৌঁছুতে পুরো তিন দিনও লাগবে না।'

'ঝাউ মিয়াং আপনার রিপোর্ট পেয়েই হানকে সব জানিয়ে দিয়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে চিলি থেকে রওনা হয়ে গেছে অ্যাকসেস।'

'ভিডিও স্ক্রীনে ফুটে ওঠা একটা সাবমারসিবলের দিকে তাকিয়ে আছেন রেডক্লিফ, যান্ত্রিক হাত চীনামাটির একটা ফুলদানী তুলে আনছে কাদার ভেতর থেকে। 'ভাবছি ঝুঁকি নেয়া হয়ে গেল কিনা। ট্রেজার নিয়ে আমরা কেটে পড়ার আগেই না হান পৌঁছে যায়।'

'ভাগ্যই বলতে হবে যে এদিকের আবহাওয়া জানার জন্যে হান তার কোন এজেন্টকে আগেভাগে পাঠিয়ে দেয়নি।'

'কিভাবে জানছেন পাঠায়নি?'

'আমাদের সার্চ এরিয়ায় টহল দিচ্ছে কোস্ট গার্ড কাটার, সেরকম কাউকে দেখলে রিপোর্ট করত তারা।'

'তা ঠিক।'

'কাল রাতে আমি যখন ডিউটি দিতে এলাম, ববি বলছিল স্থানীয় একজন রিপোর্টার যেভাবেই হোক জেড অ্যাডভেঞ্চারারের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করে জানতে চায়, এখানে আমরা কি করছি।'

'মুরল্যান্ড তাকে কি বলেছে?'

হাসি চেপে রাখতে ব্যর্থ হলো রানা। 'বলেছে লেকের তলা খুলে দেখছি ডায়নোসরের ফসিল পাওয়া যায় কিনা।'

'রিপোর্টার বিশ্বাস করেছে?'

'বোধহয় করেনি, তবে খুব উত্তেজিত হয়ে ওঠে ববি তাকে জাহাজে ডাকায়—আগামী হপ্তায়।'

রেডক্লিফকে বিমূঢ় দেখাল। 'কিন্তু তার আগেই তো আমরা চলে যাব।'

'বুঝে নিন,' বলে হেসে উঠল রানা।

'ট্রেজার হান্টাররা এখনও কিছু জানতে পারেনি, জানলে জীবনটা হেল করে ছাড়ত।'

হাতে একটা ট্রে নিয়ে কন্ট্রোল রুমে ঢুকল শাকিলা। 'ব্রেকফাস্ট,' বলল সে।

'সকালটা দারুণ না?'

চিবুকের খোঁচা খোঁচা দাড়ি চুলকে রানা বলল, 'খেয়াল করিনি।'

'আপনাকে এত খুশি খুশি লাগছে কেন?' জানতে চাইলেন রেডক্লিফ।

'আমার বস্ মি. পিট লুকাসের কাছ থেকে এই মাত্র একটা রিপোর্ট পেয়েছি। একটা জাপানী এয়ারলাইনারে চড়ে কুইবেকে পৌঁছেছে হুয়ান হান, ক্রুর ছদ্মবেশে। এয়ারপোর্ট থেকে ক্যানাডিয়ান রয়াল মাউন্টেড পুলিস নদীর তীর পর্যন্ত অনুসরণ করে তাকে। ছোট একটা বোটে চড়েছে সে, বোটটা অ্যাকসেসের সঙ্গে মিলিত হবে।'

'গিলেছে,' চেঁচিয়ে উঠলেন রেডক্লিফ। 'টোপ গিলেছে!'

আন্তরিক হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল শাকিলার মুখ। ব্রেকফাস্ট ট্রেটা টেবিলে নামিয়ে রেখে বলল, 'তাকে নিয়ে রানা এখন কি করে সেটাই দেখার বিষয়।'

একটা চেয়ার টেনে ব্রেকফাস্ট টেবিলে বসল রানা। 'দেখার বিষয় হলো আমি কিছু করার আগেই তোমার বস্ পিট লুকাস কিছু করে বসেন কিনা।'

'উনি আইএনএস-এর লিগ্যাল স্টাফের সঙ্গে মীটিং করছেন। কারণ হলো, তিনি ভয় পাচ্ছেন, হানকে আইএনএস গ্রেফতার করতে চাইলে স্টেট ডিপার্টমেন্ট আর হোয়াইট হাউস থেকে বাধা আসবে।'

'সে ভয় আমারও,' বললেন রেডক্লিফ।

'শুধু মি. লুকাস নন, কমিশনার ডীন ফেয়ারও সন্দেহ করছেন রাজনৈতিক যোগাযোগ আর প্রভাব থাকায় হান না জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে যায়।'

'অ্যাকসেসে উঠে আমরা তাকে উচিত শাস্তি দিচ্ছি না কেন?' জানতে চাইলেন রেডক্লিফ।

'লেক ওন্টারিয়ো, আয়ার আর হিউরন-এর কানাডিয়ান তীর ধরে আসার সময় আমরা তার জাহাজে চড়তে গেলে সেটা বেআইনী কাজ হবে,' ব্যাখ্যা করল শাকিলা। 'শুধু লেক মিশিগানে ঢুকলে অ্যাকসেসকে আমরা আমেরিকান জলসীমায় পাব।'

রুটিতে মাখন লাগাচ্ছে রানা। 'এখানে এসে যখন দেখবে প্রিন্সেস হিয়া একদম খালি, তখন তার চেহারাটা দেখার মত হবে, তাই না?'

'রানা, তুমি জানো,' জিজ্ঞেস করল শাকিলা, 'প্রিন্সেস হিয়া আর তার কার্গো দাবি করে ফেডারেল ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে একটা ফাইল জমা দিয়েছে হান, নিজের একটা সাবসিডিয়ারি করপরেশনের মাধ্যমে?'

'না,' জবাব দিল রানা। 'তবে আমি আশ্চর্য হচ্ছি না। তার কাজের ধারাই এরকম।'

জাহাজের ফার্স্ট অফিসার দরজা খুলে ভেতরে উঁকি দিলেন। রানাকে বললেন, 'বার্জ সারফেসে উঠেছে, স্যার। টো করে সরিয়ে নেয়ার আগে বাক্সগুলো আপনি একবার দেখতে চেয়েছিলেন।'

'হ্যাঁ, ধন্যবাদ,' বলে চেয়ার ছাড়ল রানা, রেডক্লিফের দিকে তাকাল। 'সব আপনার দায়িত্বে থাকল, মি. রেডক্লিফ। বারো ঘণ্টা পর দেখা হবে।'

মনিটরে চোখ রেখে রেডক্লিফ বললেন, 'ভাল ঘুম হোক।'

ব্রিজ উইং-এ বেরুবার সময় রানার বাহু ধরে ঝুলে থাকল শাকিলা, দু'জনেই লেকের তলা থেকে উঠে আসা বিরাট বার্জটার দিকে তাকিয়ে আছে। প্রাচীন চীনা ট্রেজার ভর্তি বাক্স বিভিন্ন আকারের ইন্টিরিয়র কার্গো হোল্ডে বোঝাই করা হয়েছে। আলাদা একটা কমপার্টমেন্টে রাখা হয়েছে ভাঙা বা খোলা বাক্সগুলো। কয়েকটা বাক্সতে মিউজিকাল ইন্সট্রুমেন্ট দেখা যাচ্ছে—পিতল আর ব্রোঞ্জের তৈরি ঘণ্টা ও ড্রাম। তিন পায়ে দাঁড়িয়ে থাকা একটা কুকিং স্টোভ, দরজায় ভীতিকর একটা পেত্নীর মুখ খোদাই করা; মার্বেল পাথরে তৈরি বেঁটে বামুন, ডানা সহ পরী, শিশু ও যুবতী, পশু-পাখির মূর্তি, এ-সবও চোখে পড়ল।

'রানা! রানা, দেখো!' রানার বাহু ধরে ঝাঁকাল শাকিলা। 'ঘোড়ার পিঠে সম্রাটকে তুলে এনেছে ওরা।'

পঞ্চাশ বছরে এই প্রথম রোদের মুখ দেখল, ঘোড়সওয়ারের ব্রোঞ্জ বর্ম আর ঘোড়ার গা থেকে এখনও পানি ঝরছে, দু'হাজার বছরের পুরানো স্কাল্পচার কোথাও এতটুকু ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। অজ্ঞাতনামা সম্রাট সীমাহীন দিগন্তে তাকিয়ে আছেন, যেন জয় করার জন্যে নতুন কোন এলাকার সন্ধানে।

'এত সুন্দর স্কাল্পচার জীবনে আমি দেখিনি।' প্রাচীন বিস্ময় জাদু করেছে শাকিলাকে। খানিক পর একপাশের বাক্সগুলোর দিকে আঙুল তুলল সে। 'এত বছর পানিতে ছিল, কাঠের বাক্স নষ্ট হয়নি কেন?'

'কৃতিত্বটা জেনারেল কাউ-এর,' বলল রানা। 'বাক্সগুলো তিনি তৈরি করান সাধারণ কোন কাঠ দিয়ে নয়, টিক দিয়ে। এই টিক সম্ভবত বার্মা থেকে সাংহাই শিপইয়ার্ডে ব্যবহার করার জন্যে আনা হত। সবাই জানে, বার্মা টিক অসম্ভব মজবুত আর টেকসই। ভাঙা বাক্সগুলো লক্ষ করো। প্রতিটি বাক্সে একটা করে আউটার ওয়াল আছে, তারপরও আছে ইনার লাইনিং।'

পানিতে প্রতিফলিত রোদ চোখে লাগায় হাত তুলে ঠেকাল শাকিলা। 'তবে ওগুলোকে তিনি ওয়াটারটাইট করতে পারেননি। প্রাচীন মৃৎশিল্প, কাঠের মূর্তি, পেইন্টিং এসব অনেক কিছুই অক্ষত পাওয়া যাবে না।'

'আর্কিওলজিস্টরা শিগ্‌গিরই সব জানতে পারবেন। দূষণমুক্ত পানি আর বরফ, আশা করা যায়, সূক্ষ্ম ও ভঙ্গুর অনেক কিছুই রক্ষা করেছে।'

রওনা হবার জন্যে পজিশন নিয়েছে বার্জ, হুইলহাউস থেকে একজন ক্রু বেরিয়ে এসে শাকিলার সঙ্গে কথা বলল, হাতে একটা কাগজ। 'আপনার নামে আরেকটা মেসেজ, মিস শাকিলা—ওয়াশিংটন থেকে।'

মেসেজটা নিয়ে পড়ল শাকিলা। 'ওহ্ গড!' বিড়বিড় করল ও।

'কি খবর?'

'তাইওয়ান সরকার একা নয়, পিপল'স রিপাবলিক অভ চায়নাও প্রিন্সেস হিয়া আর তার আর্ট ট্রেজার দাবি করেছে। বেইজিং থেকে প্রেসিডেন্ট জিয়াং জেমিন স্বয়ং সরাসরি ফোনে কথা বলেছেন হোয়াইট হাউসে আমাদের কর্তার সঙ্গে। আইএনএস কমিশনার হোয়াইট হাউসে গেছেন, বিভিন্ন এজেন্সি আর সার্ভিস থেকে আরও অনেকেই গেছেন. প্রেসিডেন্টের সঙ্গে এই মুহূর্তে বৈঠক করছেন

তাঁরা।'

'মেসেজটা কে পাঠিয়েছেন?' জানতে চাইল রানা।

'আমার বস, পিট লুকাস,' বলল শাকিলা। 'এইমাত্র বৈঠক থেকে বেরিয়ে এসেছেন তিনি। বলছেন, হানের পক্ষ নিয়ে জোরাল সুপারিশ করা হচ্ছে। তাইওয়ানের দাবি নিয়ে বিশেষ কেউ মাথা ঘামাচ্ছে না। তবে প্রেসিডেন্ট মৌন সমর্থন দিচ্ছেন জিয়াং জেমিনের দাবিকে।'

'শেষটা সুসংবাদ,' বলল রানা। 'আর্ট ট্রেজার তাইওয়ানের প্রাপ্য হতে পারে না। সবই মূল চীনকে ফিরিয়ে দেয়া উচিত।'

'তুমি ফাইন্ডার'স ফি সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করছ না কেন?'

'মীটিঙে তা নিয়েও কথা হচ্ছে?'

'নিয়মটার কথা উল্লেখ করা হয়েছে–টোয়েনটি পার্সেন্ট। কিন্তু অদ্ভুত একটা রহস্যই বলব যে জিয়াং জেমিন নিজেই প্রস্তাব দিয়েছেন ফাইন্ডার'স ফি হিসেবে চীনের প্রাপ্য অংশ থেকে ত্রিশ পার্সেন্ট পর্যন্ত দিতে রাজি আছেন তিনি।'

'চীনের প্রেসিডেন্ট আর্ট ট্রেজারের পুরোটা দাবি করেননি?' রানাকে বিস্মিত দেখাল।

'ও, তোমাকে বলা হয়নি,' মেসেজটার ওপর আরেকবার চোখ বুলাল শাকিলা। 'ফোনে কথা হবার সময় আমাদের প্রেসিডেন্ট তাঁকে জানান, আমেরিকান জলসীমার ভেতর কোন বিদেশী ট্রেজার পাওয়া গেলে অর্ধেকটা রেখে দেয়ার অধিকার সরকার সংরক্ষণ করে। এরই উত্তরে কথাটা বলেন জিয়াং জেমিন।' চোখ তুলল শাকিলা। 'রানা!'

'কি?'

'হিসেব করেছ, বাংলাদেশ কি পাচ্ছে?' আনন্দে ও বিস্ময়ে হাঁপিয়ে উঠল শাকিলা। 'চীন তার অংশ থেকে দেবে ত্রিশ শতাংশ, আর আমেরিকা তার অংশ থেকে দেবে বিশ শতাংশ। কথার কথা বলছি, ধরো, সমস্ত আর্ট ট্রেজারের মূল্য ধরা হলো দু'হাজার বাংলাদেশী টাকা।'

হাসি চেপে রানা বলল, 'ধরলাম।'

'চীন পাবে এক হাজার টাকা, আমেরিকা পাবে এক হাজার টাকা। তুমি চীনের কাছ থেকে পাবে তিনশো টাকা, আমেরিকার কাছ থেকে পাবে দুশো টাকা। সব মিলিয়ে পাঁচশো টাকা–মোট মূল্যের চার ভাগের এক ভাগ!' হাঁ করে তাকিয়ে থাকল শাকিলা।

একটা ঢোক গিলে রানা বলল, 'তুমি শুধু হিসেব করছ বাংলাদেশ কি পাবে। খরচটার কথা ধরছ না।'

'খরচ মানে?'

'জাহাজ ভাড়া করতে হয়নি? ক্রুদের বেতন ও বোনাস দিতে হবে না? নুমার স্টাফ আর বিজ্ঞানীরা ঘণ্টা হিসেবে মোটা সম্মানী পাবেন না? সিং দম্পতিকেও তো কিছু দিতে হবে। অবশ্য নিতে না চাইলে আলাদা কথা। এ-সব খরচ শুধু চীন আর আমেরিকা বহন করবে না, বাংলাদেশকেও করতে হবে।'

মেসেজটা আবার চোখের সামনে তুলে দেখে নিল শাকিলা। 'আরেকটা খবর

দিই। চীনের তরফ থেকে যে প্রস্তাবটা দেয়া হয়েছে তাতে আরও বলা হয়েছে, আমেরিকার প্রাপ্য যা-ই হোক, নগদ টাকায় সে-সবও কিনে নিতে চায় ওরা।'

খুশি দেখাল রানাকে। 'বাংলাদেশই বা আর্ট ট্রেজার নিয়ে কি করবে। আমাদের তো নগদ টাকার প্রয়োজন। আমরাও চীনকে আমাদের অংশটুকু বিক্রি করে দেব।'

হঠাৎ রানাকে ধরে ঝাঁকাল শাকিলা। 'এড়িয়ে যাবে না, দোহাই লাগে, একটা আন্দাজ করো তো নিলামে তোলা হলে পুরো ট্রেজারের দাম কত হতে পারে?'

'এড়িয়ে যাচ্ছি না,' বলল রানা, সতর্ক একটা ভাব ফুটে উঠেছে চেহারায়। 'সত্যি আমার কোন ধারণা নেই।'

'না, তুমি এড়িয়ে যাচ্ছ!' অভিমানে ঠোঁট ফোলাল শাকিলা। 'প্লীজ, অনুমান করতে অসুবিধে কি?'

'কি কি উদ্ধার হয়েছে এখনও দেখাই তো হয়নি, কিভাবে অনুমান করব? কি অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে তা-ও দেখতে হবে। তারপরও প্রকৃত মূল্য নির্ধারণ করতে পারবেন শুধু মাত্র অভিজ্ঞ আর্কিওলজিস্ট আর অকশন হাউসের কর্মকর্তারা।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে, দু'হাজার বছরের পুরানো ব্রোঞ্জের ঘোড়া আর সম্রাটের দাম কত হতে পারে, আন্দাজ করো। এর আগেও তুমি ট্রেজার উদ্ধার করেছ, ট্রেজারের ভাগও পেয়েছ, এমন কি নিলামে তা বিক্রিও করেছ, কাজেই ওটার দাম তুমি বলতে পারবে।'

চিন্তা করছে রানা। 'ওটা এত বেশি পুরানো, আর এত বেশি বড়, দাম আন্দাজ করা সত্যি খুব কঠিন। তবে ওটা যদি বাংলাদেশ পায়, আমরা পাঁচশো থেকে সাতশো কোটি টাকার কমে বেচব না।'

'আর একটা বেঁটে বামুন, মার্বেলের তৈরি?'

'পাঁচশো থেকে এক হাজার বছরের পুরানো হলে দাম পাওয়া যেতে পারে পঞ্চাশ থেকে সত্তর লাখ টাকা।'

'ব্রোঞ্জের একটা ঘণ্টা?'

'দুই থেকে তিন হাজার বছরের পুরানো হলে এক সেট ঘণ্টার দাম পাওয়া যাবে, এই ধরো, পাঁচ থেকে সাত কোটি টাকা।'

'মিং সাম্রাজ্যের একটা রথ?'

'আরোহী সহ হলে পঁয়ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ কোটি টাকা–কাঠের হলে।'

'ধরো মিং সাম্রাজ্যের একজন শিল্পীর আঁকা একটা পেইন্টিং প্রায় অক্ষত অবস্থায়...'

'এবার থামো,' ধমক দিল রানা। 'কৌশলে তুমি সব কিছুর দাম জেনে নিচ্ছ।'

'তারমানে তুমি জানো, আমাকে বলবে না!'

'এত অস্থির হবার কি আছে, সবই তো এক সময় জানতে পারবে...'

কন্ট্রোল রুম থেকে জর্জ রেডক্লিফকে অস্থির উত্তেজনায় ছুটে বেরিয়ে আসতে দেখে চুপ করে গেল রানা।

'মুরল্যান্ডের ধারণা ওগুলো সে পেয়েছে,' এক নিঃশ্বাসে বললেন তিনি।

'সারফেসে উঠে আসবে, জানতে চাইছে কিভাবে আনবে।'

'অত্যন্ত সাবধানে,' বলল রানা। 'ধীরে ধীরে উঠতে বলুন, শক্ত করে নিজেই যেন ধরে থাকে যান্ত্রিক হাতের লিভার। ও সারফেসে উঠলে, ওগুলোকে সহ সাবমারসিবল জাহাজে তুলে নেব আমরা।'

'কি ওগুলো?' জানতে চাইল শাকিলা।

দ্রুত একবার ওর দিকে তাকিয়ে সাবমারসিবল রিকভারি ডেকে নামার জন্যে মইয়ের দিকে এগোল রানা। 'পিকিং ম্যান-এর হাড়।'

জাহাজের সর্বত্র দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল খবরটা, স্টার্ন ওঅর্ক ডেকে জেড অ্যাডভেঞ্চারারের ক্রুরা জড়ো হতে শুরু করল। আর সব জাহাজের ক্রুরাও রেলিঙে এসে দাঁড়িয়েছে, আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ করছে নুমার জাহাজে কি ঘটছে। আসমানী রঙের সাবমারসিবল সারফেসে উঠে দোল খেতে লাগল লেকের পানিতে, অপেক্ষারত ডাইভাররা ক্রেন কেবল জুড়ে দিল ওটার মাথায়। সবাই চুপ হয়ে গেছে, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে যান্ত্রিক হাত দুটোর মাঝখানে বড় আকৃতির মেস-বাস্কেটটার দিকে। ধীরে ধীরে পানি থেকে শূন্যে উঠছে সাবমারসিবল, দম বন্ধ করে আছে সবাই। ক্রেন অপারেটর অত্যন্ত সাবধানে স্টার্নের ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে এনে ডেকে নামাল ওটাকে।

ডেকে উপস্থিত ক্রুরা সাবটাকে ঘিরে ফেলল, জাহাজের আর্কিওলজিস্ট মিসেস হলি হুপার বাক্সগুলোকে ডেকে কিভাবে নামাতে হবে নির্দেশ দিচ্ছেন। নামাবার পর ঢাকনি খোলার আয়োজন চলছে, সাবমারসিবলের হ্যাচ খুলে ডেকে বেরিয়ে এল মুরল্যান্ড।

'কোথায় পেলে ওগুলো?' গলা চড়িয়ে জানতে চাইল রানা।

'ডেক প্ল্যানের ডায়াগ্রাম অনুসরণ করি, ইস্পাতের পাত কেটে ক্যাপটেনের কেবিনে ঢুকি-বাক্সটা ওখানেই ছিল।'

'তুমি বলার পর মনে হচ্ছে ঠিক ওখানেই থাকার কথা,' চশমার কাঁচ মুছতে মুছতে বললেন রেডক্লিফ।

উৎসাহী চার জোড়া হাতের সাহায্যে আর্কিওলজিস্ট হলি হুপার একটা বাক্সের ঢাকনি খুলে ভেতরে তাকালেন। 'ওহ্ গড, ওহ্ গড, ওহ্ গড...' আনন্দে এতটাই আত্মহারা, ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ছাড়া এই মুহূর্তে আর কিছু ভাবতে পারছেন না।

'কি?' জানতে চাইছে রানা, 'কি দেখছেন?'

'মিলিটারি ফুটলকার, মাথায় ইউ.এস.এম.সি. স্টেনসিল করা।'

'প্লীজ, দাঁড়িয়ে থাকবেন না। খুলুন ওটা।'

'এটা কিন্তু একটা ল্যাবরেটরিতে খোলা উচিত,' হলি হুপার প্রতিবাদের সুরে বললেন। 'সঠিক পদ্ধতি ব্যবহার না করলে...'

'রাখুন আপনার সঠিক পদ্ধতি!' বলল রানা। 'পানির তলায় পঞ্চাশ বছর পড়ে থাকায় ক্ষতি যা হবার হয়ে গেছে, এখন আর সঠিক পদ্ধতি কি কাজে আসবে? এরা সবাই অমানুষিক পরিশ্রম করেছেন, সেই পরিশ্রমের ফল চাক্ষুষ করা থেকে এঁদেরকে আপনি বঞ্চিত করতে পারেন না। ফুটলকার খুলুন।'

হলি হুপার বুঝতে পারলেন রানাকে অগ্রাহ্য করা সম্ভব নয়, তাছাড়া আশপাশের সবাই তার দিকে যেভাবে তাকিয়ে আছে সেটাকে আক্রমণাত্মক বলা না গেলেও অহিংস বলা যাবে না। অগত্যা ডেকে হাঁটু গেড়ে ফুটলকারের সামনের ল্যাচ ছোট একটা ক্রোবার দিয়ে খোলার চেষ্টা করলেন। ল্যাচের চারপাশের দেয়াল দ্রুত খসে পড়ল, ওগুলো যেন মাটির তৈরি। অত্যন্ত সাবধানে, ধীরে ধীরে ঢাকনিটা তুললেন তিনি।

ফুটলকারের ভেতর আপার ট্রেতে রয়েছে আলাদা আলাদা কয়েকটা কমপার্টমেন্ট, প্রতিটি কমপার্টমেন্টে ভেজা গজে জড়ানো কিছু না কিছু আছে। সবচেয়ে বড় জিনিসটাই প্রথমে খুলছেন হলি হুপার। গজের শেষ পরত খুলে জিনিসটা সবাইকে দেখানোর জন্যে উঁচু করে ধরলেন তিনি–খয়েরি-হলদেটে রঙের বৃত্তাকার একটা পেয়ালা বা বাটির মত দেখতে। 'পিকিংম্যানের,' হিসহিস করে বললেন, 'খুলি।'

এগারো

অ্যাকসেস-এর ক্যাপটেন চিয়াং ফু ত্রিশ বছর সাগরে আছে, তার মধ্যে বিশ বছরই চাকরি করছে হুয়ান হান ম্যারিটাইম লিমিটেডের। প্রায় ছ'ফুট লম্বা, ব্যাক-ব্রাশ করা সাদা চুল ঘাড়ে নেমে এসে ঢেউ তুলেছে, চেহারায় আত্মবিশ্বাস আর দৃঢ়তার কোন অভাব নেই। হানের অত্যন্ত বিশ্বস্ত কর্মচারী সে। ক্লান্ত হওয়া সত্ত্বেও বসের সঙ্গে কথা বলার সময় জোর করে হাসতে হলো তাকে। 'মাস্টার, ওটাই আপনার জাহাজ।'

'এত বছর পর সত্যি সত্যি আমি প্রিন্সেস হিয়াকে খুঁজে পেয়েছি, এ যেন আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।' পানির নিচে আরওভি প্রিন্সেস হিয়াকে ঘিরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ভিডিও স্ক্রীনে তারই প্রতিচ্ছবি দেখছে হান।

'আমাদের ভাগ্যই বলতে হবে যে এখানে পানির গভীরতা মাত্র চারশো ত্রিশ ফুট। জাহাজটাকে চিলি উপকূলে পাওয়া গেলে আমাদেরকে দশ হাজার ফুট নিচে কাজ করতে হত।'

'দেখে মনে হচ্ছে খোলটা ভেঙে দু'টুকরো হয়ে গেছে।'

'গ্রেট লেকস-এর ঝড়ে এ অস্বাভাবিক কোন ঘটনা নয়,' ব্যাখ্যা করল ক্যাপটেন চিয়াং ফু। 'এডমন্ড ফিটজেরাল্ড, বিখ্যাত ওর ক্যারিয়ার, ডোবার সময় ভেঙে গিয়েছিল।'

তল্লাশী চলছে, হুইলহাউসের ডেকে পায়চারি করছে হান। ক্যাপটেন আর অফিসারদের সঙ্গে শান্ত ব্যবহার করছে সে, কিন্তু উদ্বেগ আর প্রত্যাশায় তার মন, মাথা আর হৃৎপিণ্ড বিস্ফোরিত হবার উপক্রম। সৎ উপায়ে জীবনে সাফল্য পেতে হলে ধৈর্য ধরতে জানতে হয়, হানের চরিত্র ঠিক তার বিপরীত। অসততাই তার সাফল্যের চাবিকাঠি, ফলে সারাক্ষণ একটা অস্থিরতা তাড়িয়ে বেড়ায় তাকে। জাহাজ আগুপিছু করছে, সবাই খুব ব্যস্ত, অথচ তাকে অপেক্ষা করতে হচ্ছে, এটা

অসহ্য লাগছে তার। অবশেষে প্রিন্সেস হিয়ার ওপর সারফেসে স্থির হলো জাহাজ।

অ্যাকসেস সাধারণ কোন সার্ভে-অ্যান্ড-স্যালভেজ শিপের মত দেখতে নয়। চকচকে মসৃণ সুপারস্ট্রাকচার আর জোড়া ক্যাটাম্যারান খোল দেখে বরং অত্যন্ত দামী ইয়ট বলে মনে হয়। স্টার্নে শুধু একটা এ-ফ্রেম ক্রেন থাকায় বোঝা যায় অ্যাকসেস কোন প্লেজার ক্রুজার নয়। খোলটা নীল, চারদিকের কিনারায় লাল ফিতের মত দাগ টানা, ওপরের অংশ চকচকে সাদা।

অ্যাকসেসের দৈর্ঘ্য তিনশো পঁচিশ ফুট, অত্যন্ত শক্তিশালী এঞ্জিন, অত্যাধুনিক ও সফিসটিকেটেড ইকুইপমেন্ট আর ইন্সট্রুমেন্টে সজ্জিত। গর্ব করার মত বহু জিনিসই আছে হানের, তার মধ্যে অন্যতম হলো অ্যাকসেস।

সাইটে অ্যাকসেস পৌঁছেছে আজ খুব সকালে। প্রিন্সেস হিয়ার আনুমানিক অবস্থান সম্পর্কে ঝাউ মিয়াংকে যথেষ্ট তথ্য দিয়েছিল বিউ মরটন, সে-সব তথ্য হানকে জানিয়ে দেন মিয়াং, কাজেই সাইট খুঁজে বের করতে তেমন কোন সমস্যা হয়নি। এখানে পৌঁছে বিশ মাইলের মধ্যে মাত্র দুটো জাহাজকে দেখতে পায় হান, ফলে মনে মনে স্বস্তিবোধ করে সে। দুটো জাহাজের মধ্যে একটা ছিল ওর ক্যারিয়ার, শিকাগোর দিকে চলে গেছে। দ্বিতীয়টিকে ক্যাপটেন চিয়াং ফু রিসার্চ শিপ বলে সনাক্ত করেছে। তিন মাইল দূরে এখনও সেটা রয়েছে, অ্যাকসেস থেকে শুধু স্টারবোর্ড-এর চওড়া দিকটা দেখা যায়। রিসার্চ ভেসেল স্থির নয়, অসহ্য অলস গতিতে দূরে সরে যাচ্ছে।

নুমার জেড অ্যাডভেঞ্চারারের মত একই টেকনিক আর ইকুইপমেন্ট ব্যবহার করা হচ্ছে। তিন ঘণ্টার মাথায় অ্যাকসেসের সোনার অপারেটর টার্গেট খুঁজে পাবার কথা ঘোষণা করে। লেকের তলায় পড়ে থাকা জাহাজটার ওপর দিয়ে চারবার আসা-যাওয়া করার পর জানা গেল, ভাঙা হলেও প্রিন্সেস হিয়ার আকার-আকৃতির সঙ্গে নিচের জাহাজটা মেলে। এরপর তাইওয়ানে তৈরি রোবোটিক আন্ডারওয়াটার ভেহিকেল অ্যাকসেস থেকে পানিতে নামানো হয়।

আরও এক ঘণ্টা মনিটরে চোখ রেখে ক্লান্ত হয়ে পড়ল হান, তবে রাগটা ক্লান্তির চেয়েও বেশি। কর্কশ গলায় ধমক দিল সে, 'এটা কি? এটাকে তোমরা প্রিন্সেস হিয়া বলছ কেন? জাহাজটার কার্গো কোথায়? আর্ট ট্রেজার ভর্তি এক হাজার কাঠের বাক্স থাকার কথা, একটাও তো দেখছি না!'

'অদ্ভুত,' বিড়বিড় করল চিয়াং ফু। 'খোল আর সুপারস্ট্রাকচারের স্টীল প্লেট চারদিকে ছড়িয়ে আছে। দেখে মনে হচ্ছে ভেঙে খুলে ফেলা হয়েছে জাহাজটা।'

ম্লান হয়ে গেল হানের চেহারা। 'এটা প্রিন্সেস হিয়া হলে আমি চিয়াং কাই-শেকের ভূত।'

'আরওভি-কে স্টার্নের দিকে নিয়ে যাও,' অপারেটরকে নির্দেশ দিল চিয়াং ফু।

কয়েক মিনিট পর আন্ডারওয়াটার ভেহিকেল স্টার্নের কাছে এসে থামল, অপারেটর ক্যামেরা জুম করল স্টার্নে লেখা নামটার ওপর। নামে কোন ভুল নেই, বড় বড় হরফে লেখা রয়েছে–প্রিন্সেস টা'লি সিনান।

'না, এটাই আমার জাহাজ!' বিস্ফারিত চোখে মনিটরের দিকে তাকিয়ে আছে হান। 'তাহলে ট্রেজার কোথায়?'

'কেউ জানে না, অনেক আগেই হয়তো কেউ সরিয়ে ফেলেছে, এটা হতে পারে?' জানতে চাইল চিয়াং ফু।

'সম্ভব নয়। এত বিপুল ট্রেজার এত বছর লুকিয়ে রাখা অসম্ভব। কিছু না কিছু বাইরে বেরুতই।'

'আমি কি ক্রুদের সাবমারসিবল নামাবার প্রস্তুতি নিতে বলব?'

'হ্যাঁ, এখুনি,' উৎকণ্ঠিত হান বলল। 'কি ঘটেছে নিজে নেমে দেখতে চাই আমি।'

হানের সাবমারসিবলের নাম স্টার ফাইভ, নিজের ভাড়া করা এঞ্জিনিয়ারদের দিয়ে ডিজাইন করিয়েছে। ফ্রান্সের যে কোম্পানী ওটা তৈরি করে দিয়েছে তারা ডীপ-আন্ডারসী ভেহিকেল নির্মাণে অভিজ্ঞ। ডিজাইনটা এমনভাবে করা হয়েছে, সায়েন্টিফিক চেম্বারের বদলে একটা অফিস বলে মনে হবে। হানের কাছে ওটা একটা প্লেযার ক্রাফট। ট্রেনিং নিয়ে অপারেট করতে শিখেছে সে, তাইপে আর হংকং হারবারের তলায় বহু ঘণ্টা একা একা ঘুরে বেড়িয়েছে। নিজের ব্যক্তিগত চাহিদা পূরণের জন্যে স্টার ফাইভের অনেক কিছুই পরে অদলবদল করা হয়।

হানের সাবমারসিবল একটা নয়, দুটো। দ্বিতীয়টার নাম ডলফিন থ্রী। লেকের তলায় থাকার সময় স্টার ফাইভে যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দিলে ডলফিন থ্রী ব্যাক-আপ হিসেবে কাজে আসবে।

এক ঘণ্টা পর পানিতে নামানো হলো স্টার ফাইভকে। সব সিস্টেম চেক করার পর হ্যাচের মুখে অপেক্ষায় থাকল কো-পাইলট, হান এবার ভেতরে ঢুকবে।

'আমি একা নামব,' কর্কশ গলায় জানাল হান।

জাহাজের ডেকে চিয়াং ফু এক সেকেন্ড ইতস্তত করে বলল, 'সেটা কি উচিত হবে, মাস্টার? এদিকের পানি আপনার পরিচিত নয়।'

'তা না হোক, স্টার ফাইভ কিভাবে চালাতে হয় জানা আছে আমার। তুমি ভুলে যাচ্ছ, ক্যাপটেন ফু, এটা আমার তৈরি। আমার দেশের ট্রেজার যদি চুরি হয়ে থাকে, নিশ্চিত হবার মুহূর্তটিতে আমি একা থাকতে চাই।'

সসম্মানে মাথা নিচু করল ক্যাপটেন ফু। নিঃশব্দে ইঙ্গিত করল সে, হ্যাচ থেকে সরে গেল কো-পাইলট। একটা টাওয়ারের ভেতর থেকে নিচে নামছে হান, মই বেয়ে। মোবাইল টাওয়ারটা এমনভাবে ফিট করা হয়েছে, সাবমারসিবলের হ্যাচ গলে ভেতরে যাতে পানি ঢুকতে না পারে। হ্যাচ গলে ভেতরে ঢুকল হান। কন্ট্রোল আর প্রেশার চেম্বারে যাবার পথ এটা। হ্যাচ বন্ধ ও সীল করল সে, তারপর অন করল লাইফ-সাপোর্ট সিস্টেম।

নিজের ডিজাইন করা আরামদায়ক একটা চেয়ারে বসল হান, সামনে কন্ট্রোল কনসোল আর বড় একটা ভিউইং উইন্ডো। টাওয়ার আগেই সরিয়ে ফেলা হয়েছে, ডাইভাররা এবার হুক-মুক্ত করল সাবমারসিবলকে। বোতামে চাপ দিয়ে, লিভার ঘুরিয়ে লেকের তলায় ডাইভ দিল হান।

'ব্যালাস্ট ট্যাঙ্ক ভরছি,' কমিউনিকেশন স্পীকারে রিপোর্ট করল সে।

হানকে না শুনিয়ে অফিসারদের নির্দেশ দিল ক্যাপটেন ফু, 'ডলফিন থ্রীকে পানিতে নামাবার জন্যে তৈরি রাখো।'

'স্যার, আপনি কি কোন বিপদের ভয় করছেন?'

'না, তবে সাবধানের মার নেই,' বলল ফু। 'মাস্টারের কোন ক্ষতি হবার ঝুঁকি আমরা নিতে পারি না।'

লেকের তলায় নামার সময় ভিউইং উইন্ডো দিয়ে হান দেখল সবুজ পানি ধীরে ধীরে কালো হয়ে যাচ্ছে। প্রেশার চেম্বারে নিজের প্রতিফলন দেখতে পাচ্ছে সে। চোখ জোড়া ঠাণ্ডা, পরস্পরের সঙ্গে চেপে আছে ঠোঁট, মুখে হাসি নেই। মাত্র এক-দেড় ঘণ্টা আগেও নিজেকে প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী মনে হয়েছে, অথচ এখন সে অসুস্থ ও ক্লান্ত বোধ করছে। দিশেহারা হওয়া চলবে না, নিজেকে তিরস্কার করল হান। এখনও সে বিশ্বাস করতে রাজি নয় ট্রেজার কেউ চুরি করে নিয়ে গেছে। তার ধারণা, ভাঙা খোলের ভেতরই কোথাও আছে সব। কেন থাকবে না? এখানে আর কেউ কিভাবে পৌঁছুবে?

নিচে নেমে আসতে দশ মিনিটও লাগল না, যদিও এক সেকেন্ডকে এক ঘণ্টা মনে হচ্ছে হানের। আলো জ্বালার আগে গাঢ় অন্ধকার পানিতে তাকিয়ে থাকল সে। চেম্বারটা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, ছোট হিটিং ইউনিট অন করে তাপমাত্রা বাড়িয়ে সত্তর ডিগ্রীতে তুলল। ইকো সাউন্ডার ইঙ্গিত দিল, লেকের তলা দ্রুত ওপরে উঠে আসছে। নামার গতি কমানোর জন্যে ব্যালাস্ট ট্যাঙ্কে সামান্য প্রেশারাইজড এয়ার ভরল।

আলোর নিচে ফাঁকা লেকের তলা দেখা যাচ্ছে। ব্যালাস্ট অ্যাডজাস্ট করে তলা থেকে পাঁচ ফুট ওপরে সাবমারসিবল স্থির করল হান। এরপর ইলেকট্রিক থ্রার্স্টার অন করে বড় একটা বৃত্ত ধরে চক্কর দিতে শুরু করল। 'তলায় পৌঁছেছি,' ওপরের সাপোর্ট ক্রুদের জানাল সে। 'প্রিন্সেস হিয়ার কাছ থেকে কত দূরে, কোনদিকে রয়েছি বলতে পারো তোমরা?'

'হিয়ার মূল অংশ অর্থাৎ স্টারবোর্ড সাইড থেকে চল্লিশ গজ দূরে রয়েছেন আপনি, মাস্টার,' জবাব দিল ফু। 'পশ্চিম দিকে।'

প্রত্যাশায় হার্টবিট বেড়ে গেল, স্টার ফাইভ নিয়ে হিয়ার খোলের পাশে চলে এল হান, তারপর রেলিঙের ওপর দিয়ে এসে ফরওয়ার্ড কার্গো ডেকের কিনারায় ঝুলে থাকল। ক্রেনগুলো দেখতে পেল সে, অন্ধকারে হারিয়ে গেছে। সেগুলোকে এড়াবার জন্যে দিক বদলাতে হলো। এবার সরাসরি কার্গো হোল্ডের ওপর চলে এল স্টার ফাইভ। হাঁ করা মুখটার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল সে।

হতাশায় মুষড়ে পড়ল হান। কার্গো হোল্ড সম্পূর্ণ খালি।

আর ঠিক তখনই তার চোখের কোণে ধরা পড়ল–কি যেন নড়ছে। প্রথমে সে ভাবল, হয়তো কোন মাছ। কিন্তু সরাসরি তাকাতে দেখল অন্ধকার থেকে ধীরে ধীরে উঠে আসছে ভিনগ্রহের কাল্পনিক প্রাণীর মত দেখতে একটা কাঠামো।

অ্যাকসেসের ব্রিজ থেকে ক্যাপটেন চিয়াং ফু হঠাৎ করেই দেখতে পেল সাড়ে তিন মাইল দূরে রিসার্চ ভেসেলটা নব্বুই ডিগ্রী বাঁক নিয়ে ধীরে ধীরে ঘুরে যাচ্ছে। এক সময় অ্যাকসেসের দিকে বো তাক করল ওটা। এতক্ষণ আড়াআড়ি ছিল, তাই রিসার্চ ভেসেলের পিছনে দ্বিতীয় জাহাজটা অ্যাকসেস থেকে দেখা যায়নি। ফুর চোখ কপালে উঠে গেল, ভয়ে আর চিন্তায় গরম হয়ে উঠল মুখ। কারণ দ্বিতীয়

জাহাজটা সাধারণ কোন জলযান নয়, ইউনাইটেড স্টেটস কোস্ট গার্ড কাটার। এই মুহূর্তে দুটো ভেসেলই ফুল স্পীডে অ্যাকসেসকে লক্ষ্য করে ছুটে আসছে।

হান যেন নরকের গভীরতম পাতাল দেখতে পেয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। সাদা মোম হয়ে গেছে চেহারা। কপাল থেকে ঘাম ঝরছে। বিস্ময়ের আঘাতে চকচক করছে চোখ। দ্রুত আসা প্রাণীটাকে হলুদ আর কালো রঙের জলদানব মনে হচ্ছে, মাথাটা বুদ্বুদ আকৃতির। সেই বুদ্বুদের ভেতর মুখটায় হঠাৎ হাসি ফুটল। সেই মুহূর্তে চিনতে পারল হান। 'রানা!' নিঃশ্বাসের সঙ্গে হিসহিস করল সে।

'হ্যাঁ, আমি,' নিউটসুটে আন্ডারওয়াটার কমিউনিকেশন সিস্টেম আছে, সেটার মাধ্যমে জবাব দিল রানা। সিস্টেমটার সঙ্গে একটা টেপ-রেকর্ডারও আছে, আঙুলের ডগা দিয়ে বোতামে চাপ দিয়ে সেটাও অন করল। 'আমার কথা ঠিকমত শুনতে পাচ্ছ তো, হুয়ান হান?'

অবিশ্বাস আর বিস্ময়ের ধাক্কা কাটিয়ে উঠেছে হান। প্রতিদ্বন্দ্বীকে চিনতে পেরে লেকের তলায় কি ঘটে গেছে আন্দাজ করতে পারছে সে। মাসুদ রানা নুমার স্পেশাল প্রজেক্ট ডিরেক্টর, আর নুমা গভীর সাগরে গবেষণা ও উদ্ধার কাজে দক্ষ। প্রচণ্ড রাগ তীব্র বিষক্রিয়ার মত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল শিরায় শিরায়। 'হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি,' ধীরে ধীরে বলল সে, নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাচ্ছে। রানা কোত্থেকে এল বা এখানে কি করছে, এ-সব কিছুই সে জানতে চাইল না। হানের মাথায় একটা মাত্র প্রশ্ন। 'ট্রেজার কোথায়?'

'ট্রেজার,' বলল রানা, ট্রান্সপারেন্ট বুদ্বুদের ভেতর নিউটসুটের হেলমেট পরে রয়েছে ও। 'কার ট্রেজার, হান?'

'আমার ট্রেজার!' গর্জে উঠল হান। 'আমি চিয়াং কাই-শেকের প্রতিনিধি! আমি তাইওয়ানের প্রতিনিধি। সমস্ত ট্রেজার একমাত্র আমার কাছে সুরক্ষিত থাকবে। ওগুলো রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে যে বিরাট ফ্যাসিলিটি দরকার গোটা চীনে তা একমাত্র আমারই আছে। কোথায় সব, রানা? কয়েক বিলিয়ন ডলারের চীনা ট্রেজার, কোথায় সরিয়েছ তুমি?'

'চিন্তা করো না, সব নিরাপদেই আছে,' গম্বুজের ভেতর হাসছে রানা।

'এ আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। সরালে কিভাবে?' হানের বিস্ময় নির্ভেজাল। 'এক হাজারের বেশি বাক্স থাকার কথা, সরালে কিভাবে?'

এক কথায় জবাব দিল রানা, 'ঝাউ মিয়াংকে প্রিন্সেস হিয়ার পজিশন জানানো হয়েছে সমস্ত ট্রেজার সরিয়ে ফেলার কয়েকদিন পর।'

'তাহলে এখানে তুমি কি করছ?' রানার কথা বিশ্বাস করছে না হান।

'আমি জানি, এই ট্রেজার তোমার একটা অবসেশন। তুমি আসবে, সেই অপেক্ষায় ছিলাম। খোলা একটা বইয়ের মতই তোমাকে আমি পড়তে পারি, হান। এবার তোমার মাসুল দেয়ার পালা। আমেরিকায় ফিরে আসায় আয়ু বাড়াবার সর্বশেষ সুযোগটাও তুমি হারিয়েছ। এখন তোমাকে সারাজীবন জেলে পচতে হবে।'

'তুমি হাস্যকর কথাবার্তা বলছ, রানা,' খেঁকিয়ে উঠল হান। 'আমার কত

টাকা জানো? জানো আমার হাত কত লম্বা? কে আমাকে জেলে পাঠাবে?' মুখে যা-ই বলুক, ভয়ে মরে যাচ্ছে সে। তবে ভয়টা ধীরে ধীরে কমতে শুরু করল হঠাৎ একটা জিনিস লক্ষ করে–সারফেস শিপ থেকে রানা কোন সাপোর্ট পাচ্ছে না। নিউটসুট পরা কোন ডাইভার কেবল ছাড়া গভীর পানি থেকে ওঠা-নামা করতে পারে না, সারফেসে স্থির মাদার শিপ থেকে একটা উইঞ্চের সাহায্যে নামাতে হবে তাকে, তোলার সময়ও টেনে তুলতে হবে। ওই কেবল কমিউনিকেশন লিঙ্ক হিসেবেও কাজ করে। নিউটসুট থেকে এয়ার সাপ্লাই পাচ্ছে রানা, তবে সে-টুকু শেষ হতে বেশি সময় লাগবে না। বড়জোর এক ঘণ্টা। সারফেস থেকে লাইফ-সাপোর্ট না থাকায় রানা আসলে পুরোপুরি অরক্ষিত ও অসহায়।

'তুমি আসলে খুব একটা বুদ্ধিমান নও,' বলল হান, মুখের স্বাভাবিক রঙ ধীরে ধীরে ফিরে আসছে। 'তুমি আমাকে জেলে ভরবে কি, আমি তো দেখতে পাচ্ছি আমার হাতে তোমার মরণ ঘনিয়েছে। তোমার ডাইভিং অ্যাপারাটাস আমার সাবমারসিবলের তুলনায় কিছুই না। এখানে সব মিলিয়ে আমি একটা হাতী, তুমি একটা পিঁপড়ে।'

'আমি খুন-খারাবির মধ্যে যেতে চাই না, আইন হাতে তুলে নেয়ার পক্ষপাতী নই,' বলল রানা। 'তাছাড়া, যে অপরাধ করেছ, মরে গেলে তুমি বেঁচে যাবে। আমি চাই বাকিটা জীবন জেলে পচো তুমি।'

'আবার সেই প্রলাপ। তোমার সাপোর্ট শিপ কোথায়?'

'সাপোর্ট শিপ দরকার নেই আমার,' সহজ সুরে বলল রানা। 'তীর থেকে একাই এসেছি। তুমি কি স্বেচ্ছায় সারেন্ডার করবে, নাকি জোর খাটাতে হবে?'

'কি আছে তোমার যে জোর খাটাবে?' পাল্টা প্রশ্ন করল হান, তবে উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করল না। 'বরং ইচ্ছে করলে আমিই তোমাকে এমন বিপদে ফেলতে পারি, যে বিপদ থেকে কেউ তোমাকে রক্ষা করতে পারবে না।'

'কি রকম?'

'ওজন ফেলে দিয়ে সারফেসে উঠে যেতে পারি আমি, তোমাকে নিয়তির হাতে একা ছেড়ে দিয়ে,' বলল হান। 'কিংবা আমার ক্রুদের ডেকে বলতে পারি ব্যাকআপ সাবমারসিবলটাকে নিচে পাঠাতে।'

'সেটা ফেয়ার হবে না,' বলল রানা। 'ছোট একটা পিঁপড়ের বিরুদ্ধে দুটো হাতী হয়ে যাবে।'

কন্ট্রোল কনসালের দিকে গোপনে হাত বাড়াচ্ছে হান। ওখানে একটা লিভার আছে, সাবমারসিবলের ম্যানিপুলেটর বাহু আর থাবা অপারেটর করার জন্যে। 'তুমি একা কেন মরতে এলে, এটা আমার মাথায় ঢুকছে না,' বলল সে।

'একাই এসেছি, তবে প্রস্তুতি না নিয়ে আসিনি,' বলে নিউটসুটের একটা ম্যানিপুলেটর বাহু উঁচু করল রানা, শেষ প্রান্তে ছোট একটা ওয়াটারটাইট বাক্স দেখা যাচ্ছে, অ্যান্টেনা সহ। 'এটা একটা স্ক্র্যাম্বলার ডিভাইস, হান। অ্যাকসেসের সঙ্গে তোমার যোগাযোগ বন্ধ হবার জন্যে এটাই দায়ী।'

অ্যাকসেস থেকে কোন কল না আসার কারণটা পরিষ্কার হয়ে গেল। কিন্তু হান তাতে দমল না। 'তুমি আমার বহু ক্ষতি করেছ, রানা। কিন্তু আর নয়। আমার

আর্ট ট্রেজার কোথায় সরিয়েছ বলতে হবে তোমাকে।'

'আমি আশা করছি তোমার কোন প্রস্তাব আছে,' বলল রানা।

উত্তর দিতে দু'সেকেন্ড সময় নিল হান। 'হ্যাঁ, থাকতে পারে। কি চাও তুমি, রানা?'

'কিছুই চাই না। তবু শুনি তুমি কি দিতে ইচ্ছুক।'

'চার ভাগের এক ভাগ। উপরি পাওনা, আমার বন্ধুত্ব। সত্যি কথা বলতে কি, অতীত তিক্ততার কথা ভুলে গেলে পরস্পরের অনেক উপকারে লাগতে পারি আমরা।'

'কিন্তু অনেক প্রশ্নের উত্তর আমার জানা নেই,' বলল রানা। 'সংশয় আর সন্দেহ নিয়ে বন্ধুত্ব হয় না। তুমি এত মানুষ মারতে গেলে কেন? ওরিয়ন লেকের তলায় লাশ তো পেয়েছিই, কঙ্কালেরও পাহাড় জমে আছে। কেন, হান?'

'বড় মাপের ব্যবসা করতে গেলে কিছু কিছু পণ্য বাতিল হবে না বা পচবে না, এ কি হয়?'

'তাই বলে মানুষ খুন? স্রেফ অতিরিক্ত টাকার অন্যায় দাবি মেটাতে পারেনি বলে?'

'খরচে পোষায় না, অতিরিক্ত টাকা চাওয়ার সেটাই কারণ,' যুক্তি দেখাল হান। 'জাহাজে তোলার আগেই যদি বিশ-ত্রিশ হাজার ডলার চাওয়া হয়, বেশিরভাগ লোকই আমেরিকায় আসতে রাজি হবে না। সেজন্যেই আমেরিকার উপকূলে পৌঁছানোর পর, বোটে তোলার আগে, অতিরিক্ত দশ হাজার ডলার চাওয়া হয়। তা না হলে খরচে সত্যি পোষায় না।'

'পোষাত, তোমার আমেরিকান পার্টনারদেরকে বেশি টাকা দিতে হচ্ছে, তাই পোষায় না। তাছাড়া, কংগ্রেস আর সিনেট সদস্য, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, এদেরকে তোমার ঘুষ দিতে হয়। এমন কি রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী তহবিলেও মোটা টাকা চাঁদা দাও তুমি।'

'এ-সব বিষয়ে আলাপ করার কারণটা কি?' হান ভুরু কোঁচকাল। 'তুমি কি আমার পার্টনার হবার কথা ভাবছ?'

উত্তর দিতে কয়েক সেকেন্ড দেরি করল রানা। 'তোমার সেট-আপ সম্পর্কে একটা ধারণা পেতে চাইছি। তোমার পার্টনাররা কতটুকু ক্ষমতাবান। তারা বিশ্বস্ত কিনা। নিজেকে আমি তাদের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারব কিনা।'

'ওরা আমাকে পিঠ দেখিয়ে দিয়েছে, রানা,' স্বীকার করল হান। 'প্রেসিডেন্টের দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া বিষয়ক উপদেষ্টা লিয়াং সেন আর কংগ্রেস সদস্য কাটহিল ডগলাস। তাইপে ট্রাইয়্যাড নামে একটা ক্রাইম সিন্ডিকেট চালায় ওরা।' হঠাৎ আগ্রহী ও উত্তেজিত হয়ে উঠল সে। 'তুমি আমেরিকায় আমার যোগ্য পার্টনার হতে পারো রানা, যদি নুমার সমস্ত সুযোগ-সুবিধে পাইয়ে দিতে পারো আমাকে। সম্ভব? তুমি রাজি?'

'না, হান,' বলল রানা। 'তোমাকে তোমার অপরাধ স্বীকার করানোর জন্যে একটু অভিনয় করতে হলো। আমার টেপে তোমার পার্টনারদের পরিচয়ও রেকর্ড হয়ে গেছে।'

প্রচণ্ড রাগে কয়েক মুহূর্ত কোন কথাই বলতে পারল না হান। তবে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারাল না। 'সেক্ষেত্রে তোমাকে আমি আর সময় দিতে পারছি না,' বলল সে। 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খুঁজে বের করতে হবে আমাকে কোথায় তুমি আমার ট্রেজার লুকিয়ে রেখেছ। বিদায়, রানা। ব্যালাস্ট খালি করে সারফেসে উঠে যাচ্ছি আমি।'

কি ঘটতে যাচ্ছে বুঝতে পারছে রানা। দু'জনের মাঝখানে পানি ঘোলা হলেও, অকস্মাৎ নড়ে উঠতে দেখল হানের চোখকে। জলবিম্ব বা বুদ্বুদের তৈরি মুখোশ সুরক্ষিত নয়, ওটাকে রক্ষা করার জন্যে ম্যানিপুলেটর বাহু দুটো উঁচু করল ও। তারপর নিউটসুটের দুই কোমরে বসানো খুদে মোটর দুটো রিভার্স-এ আনল। কাজটা মাত্র শেষ হয়েছে, ঝাঁকি খেয়ে ওর দিকে ছুটে এল হানের সাবমারসিবল।

এটা একটা অসম যুদ্ধ, রানার জেতার কোন আশা নেই। সাবমারসিবলের দীর্ঘ বাহু আর বিশাল থাবার সঙ্গে ওর নিউটস্যুটের খুদে বাহু আর পিনসারের কোন তুলনা চলতে পারে না। জোরাল একটা খোঁচা খেলেই ছিঁড়ে যাবে নিউটসুট, সেই সঙ্গে ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে যাবে রানার।

অসহায়ভাবে দেখছে রানা, কুৎসিত ম্যানিপুলেটর বাহু দুটো ফাঁক হচ্ছে, মাঝখানে আটকে নিয়ে পিষবে ওকে, যতক্ষণ না নিউটসুট ছিঁড়ে বা ফেটে যায়। রানার মৃত্যু হবে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক।

সাবমারসিবল নাগালের মধ্যে চলে এলে নিউটসুট পরা রানা সামনের দিকে ডাইভ দিতে পারে, নিজের ম্যানিপুলেটর পিনসার দিয়ে ভেঙে ফেলার চেষ্টা করতে পারে হানের ভিউইং উইন্ডো। কিন্তু নিষ্ফল চেষ্টা হবে সেটা, সাবমারসিবলের লম্বা বাহু পিনসার দুটোকে অনায়াসে ঠেলে সরিয়ে দেবে এক পাশে। তাছাড়া, আত্মরক্ষা করতে চাইছে ও, বাধ্য না হলে হানকে খুন করার কোন ইচ্ছে ওর নেই। মৃত্যুর জোড়া চোয়াল দেখতে পাচ্ছে রানা, দেখতে পাচ্ছে হানের ঠোঁটে হিংস্র হাসি। কিম্ভূত চেহারার প্রেশার সুট পিছিয়ে আনছে ও, সময় পাবার আশায়।

নিউটসুটের যান্ত্রিক হাত নামিয়ে প্রিন্সেস হিয়ার ডেকে পড়ে থাকা ছোট একটা পাইপ তুলল রানা, যান্ত্রিক বাহু ওপরে তুলে প্যাইপটা এক দিক থেকে আরেক দিকে ঘোরাল সাবমারসিবলের লম্বা বাহু দুটোকে আঘাত করার জন্যে। হাস্যকর একটা ভঙ্গি। কোন কাজ হচ্ছে না। হান তার যান্ত্রিক থাবা দুটো এমন ভাবে অপারেট করছে, রানাকে দু'দিক থেকে ঘিরে ফেলছে ওটা। শিশুর হাত থেকে চকলেট কেড়ে নেয়ার ভঙ্গিতে নিউটসুটের পিনসার থেকে পাইপটা কেড়ে নিল সে। ঘোলা পানিতে ওদের এই লড়াই কেউ যদি দেখার সুযোগ পেত, মনে করত পো মোশনে দুটো বিশাল প্রাণী ব্যালে নৃত্য পরিবেশন করছে। লেকের গভীরে পানির চাপ ওদের প্রতিটি নড়াচড়া মন্থর করে তুলছে।

হিয়ার ফরওয়ার্ড বাল্কহেডে রানার পিঠ ঠেকে গেল। পিছু হটার বা পালাবার আর কোন জায়গা নেই। অসম যুদ্ধটা আট কি নয় মিনিট স্থায়ী হয়েছে। হত্যার জন্যে এগিয়ে আসছে হান, তার ঠোঁটে শয়তানের নীরব হাসি দেখতে পাচ্ছে রানা।

এই সময় অস্পষ্ট একটা কাঠামো দেখা গেল, বিশাল এক শকুনের মত

অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসছে।

মুরল্যান্ড যে সাবমারসিবল নিয়ে আসছে সেটা ছোট আর ভোঁতা চেহারার একটা প্লেনের মত দেখতে। নুমার এই সাবমারসিবলের নাম 'মিয়াও মিয়াও'। স্টার ফাইভের অনেকটা ওপর দিয়ে এল মিয়াও মিয়াও, তারপর পানিতে স্থির হয়ে একটা যান্ত্রিক বাহু লম্বা করল। বাহুর শেষ মাথার থাবায় রয়েছে তিন ইঞ্চি ডায়ামিটারের একটা বল, সেটা সাকশন ডিভাইসের সঙ্গে সংযুক্ত। হানের সমস্ত মনোযোগ রানার ওপর, খুন করার নেশা পেয়ে বসেছে তাকে। মুরল্যান্ডের উপস্থিতি সম্পর্কে তার কোন ধারণা নেই। স্টার ফাইভের প্রেশার হাল-এ বল আর সাকশন ডিভাইসটা আটকে দিল মুরল্যান্ড। কাজটা শেষ করে সাবমারসিবল নিয়ে আরও ওপরে উঠে গেল সে, দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেল অন্ধকার গভীরতায়।

বিশ সেকেন্ড পর পানির তলায় তীক্ষ্ণ একটা শব্দ হলো। স্টার ফাইভকে ঝাঁকি খেতে দেখে হান প্রথমে শুধু বিস্মিত হলো। চিন্তা করল, নিশ্চয়ই রানা অন্য কোন উৎস থেকে হামলা পরিচালনার আয়োজন করে রেখেছে, সেজন্যেই ওর চেহারায় মৃত্যু-ভয় ফুটতে দেখা যায়নি। তারপর সে আঁতকে উঠে দেখতে পেল প্রেশার চেম্বারের ওপরদিকের দেয়ালে মাকড়সার জাল তৈরি হচ্ছে। অকস্মাৎ কামানের নিক্ষিপ্ত গোলার মত ভেতরে পানি ঢুকতে শুরু করল। প্রেশার চেম্বার তার বৈশিষ্ট্য বজায় রাখছে, বিস্ফোরিত হচ্ছে না, কিন্তু ভেতরে ঢুকে পড়া পানি ওটাকে ভরাট করে তুলছে।

পানি ক্রমশ উঁচু হচ্ছে দেখে ঠাণ্ডা ভয়ে হানের আত্মা খাঁচা ছেড়ে পালাবার উপক্রম করল। সাবমারসিবলের ভেতরটা ছোট, দ্রুত ভরে উঠছে সেটা। পাম্পের বোতামে ঝাপটা মারল সে, ব্যালাস্টের সমস্ত পানি যাতে বের করে দেয়; লিভার টেনে কীল-এর নিচে থেকে ভারী ভারগুলোও খসিয়ে দিল। স্টার ফাইভ যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও কয়েক ফুট ওপরে উঠল, কিন্তু স্থির হয়ে গেল আবার। তারপর ধীরে ধীরে নামতে শুরু করল ওটা, থামল লেকের তলায় পৌঁছে, পলির একটা মেঘ ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে।

স্রেফ পাগল হয়ে গেল হান। সে সম্ভবত স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলেছে, ভুলে গেছে যে লেকের তলা থেকে সারফেসের দূরত্ব চারশো ত্রিশ ফুট, তা না হলে উন্মত্ত ব্যস্ততার সঙ্গে আউটার হ্যাচ খোলার চেষ্টা করত না। হ্যাচ খুললে পানির বিপুল চাপ কি পরিণতি বয়ে আনবে, তা তার না জানার কথা নয়।

পলির মেঘে ঢুকল রানা, খুব কাছ থেকে সাবমারসিবলের ভিউইং উইন্ডোর ভেতরে তাকাল, নিজের অজান্তেই মনে পড়ে গেল ওরিয়ন লেকে দেখা বীভৎস দৃশ্যগুলোর কথা। হান এই মুহূর্তে যেভাবে চিৎকার করছে, যে যন্ত্রণা পেয়ে মারা যাচ্ছে, তার নির্দেশে বহু বাংলাদেশীসহ অনেক ভারতীয়, পাকিস্তানী ও চীনা লোকজন ঠিক এভাবেই যন্ত্রণা পেয়ে খুন হয়েছে, তাদের মধ্যে শিশু তো ছিলই, মেয়েদের সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশি। হান এখন আর চিৎকার করতে পারছে না, কারণ লেকের হিমশীতল পানিতে ডুবে গেছে তার নাক আর হাঁ করা মুখ। তারপর হঠাৎ সাবমারসিবলের আলো নিভে গেল। অন্ধকার হয়ে গেল লেকের তলা।

নিউটসুটের ভেতর দরদর করে ঘামছে রানা। লেকের তলায় দাঁড়িয়ে আছে

ও, চেহারায় গম্ভীর সন্তুষ্টি, তাকিয়ে আছে হানের সলিল সমাধির দিকে। বিলিওনিয়ার শিপিং ম্যাগনেট আরও টাকা, আরও ক্ষমতার জন্যে লালায়িত হয়ে উঠেছিল, ঈশ্বরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে হাজার হাজার মানুষকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছিল। রানার মনে কোন করুণা জাগছে না। মানুষ নামের অযোগ্য হানের উচিত শাস্তিই হয়েছে।

মিয়াও মিয়াও নিয়ে মুরল্যান্ডকে ফিরে আসতে দেখল রানা। 'নিজের সময় মত এলে। আমি মারা যেতে পারতাম।'

মিয়াও মিয়াও নামিয়ে আনল মুরল্যান্ড, ওটার আর নিউটসুটের প্রোটেকটিভ ট্র্যান্সপারেন্ট শীল্ড মুখোমুখি হলো, মাঝখানে মাত্র দুই ফুট ব্যবধান। 'এরকম শো উপভোগ করতে হয়, আমিও তাই করেছি।' হেসে উঠল মুরল্যান্ড।

'পরের বার কঠিন কাজটুকু তুমি সারবে।'

'হান?'

স্টার ফাইভের অচল যান্ত্রিক বাহু দুটো ইঙ্গিতে দেখাল রানা। 'যেখানে তার থাকার কথা।'

'তোমার এয়ার?'

'আর বিশ মিনিট চলবে।'

'সময় তাহলে কম। স্থির হয়ে থাকো, তোমার হেলমেটে আমার কেবলের লিফট রিঙ আটকাই। নিউটসুটকে টো করে নিয়ে যাব।'

'আবার তোমাদের দেখে ভারি আনন্দ লাগছে আমার,' খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে বললেন মিসেস সিং। 'প্লীজ, ভেতরে এসো। ঝাঁঝর পিছনের বারান্দায় বসে খবরের কাগজ পড়ছে।'

'আমরা কিন্তু বেশিক্ষণ থাকতে পারব না,' ভেতরে ঢোকার সময় বলল শাকিলা। 'রানা আর আমাকে প্লেন ধরে আজ দুপুরের মধ্যেই ওয়াশিংটন ফিরতে হবে।'

শাকিলা আর মিসেস ঝাঁঝর সিং-এর পিছু নিয়ে রানাও ভেতরে ঢুকল, হাতে মাঝারি আকৃতির লম্বাটে একটা হার্ডবোর্ডের বাক্স, আধ খোলা ঢাকনি সহ। কিচেন হয়ে বারান্দায় বেরিয়ে এল সবাই। এখান থেকে লেকটা পরিষ্কারই দেখা যায়। বাতাস আজ একটু জোরাল, ঢেউয়ের মাথায় সাদা ফেনা দেখা যাচ্ছে। বাতাসের সঙ্গে ভেসে চলেছে একটা সেইলবোট, তীর থেকে এক মাইল দূরে। ওদেরকে দেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন ঝাঁঝর সিং, হাতে খবরের কাগজ। 'মি. রানা, মিস শাকিলা, জানি ফেরার পথে দেখা করতে এসেছ তোমরা–ধন্যবাদ।'

'একটু বসো তোমরা, আমি চা নিয়ে আসি?' জিজ্ঞেস করলেন মিসেস সিং।

কফি পেলে খুশি হত রানা, তবু হাসিমুখে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'চা চলবে।'

'তোমরা সম্ভবত স্যালভেজ প্রজেক্ট সম্পর্কে জানাতে এসেছ আমাকে,' বললেন ঝাঁঝর সিং।

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'হ্যাঁ। আর্ট ট্রেজারের সন্ধান আপনিই আমাদের জানিয়েছেন। কিন্তু আপনি আপনার পরিচয় প্রকাশ করতে নিষেধ করায় আমরা

একটু ঝামেলায় পড়ে গেছি।'

'কি রকম?'

'আমেরিকায় ফাইন্ডার'স ফী বলে একটা আইন আছে,' বলল শাকিলা। 'যেখানেই পুরানো ট্রেজার কেউ খুঁজে পাক বা সন্ধান দিতে পারুক, পঁচিশ পার্সেন্ট তার পাওনা। কিন্তু আপনি যদি নিজের পরিচয় প্রকাশ করতে না চান, সরকার আপনাকে কিছুই দিতে পারবে না।'

পরিবারের সবাই এ বিষয়ে আলাপ করেছি আমরা,' ঝাঁঝর সিং বললেন। 'কেউই ফাইন্ডার'স ফী নিতে রাজি নয়। আমেরিকা আমাদেরকে অনেক কিছু দিয়েছে, তাতেই আমরা সন্তুষ্ট। আমার দুই ছেলে দুই করপরেশনের মালিক, এক ছেলে আর্মিতে আছে, যে-কোন দিন জেনারেল হয়ে যাবে, এক মেয়ে ডাক্তার, এক মেয়ে নাসার বিজ্ঞানী। কিছু আইনগত অসুবিধের কথা আগেও তোমাদের জানিয়েছি আমি। আমাদের নাগরিকত্ব পাওয়া সম্পর্কে যদি কোন তদন্ত হয়, ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ ও ক্যারিয়ার নিয়ে বিপদ দেখা দেবে। এরকম একাধিক কারণেই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, প্রিন্সেস হিয়ার শেষ যাত্রায় আমরা দু'জন ছিলাম এটা গোপনই থাক।'

'আপনাদেরকে যিনি খুঁজে বের করেন, বিউ মরটন, তাঁর কিন্তু ফাইন্ডার'স ফী পাওনা হয়নি,' বলল শাকিলা। 'কারণ তিনি রানার অনুরোধে প্রিন্সেস হিয়াকে খুঁজতে শুরু করেন। তবু রানা ভদ্রলোককে বেশ মোটা একটা টাকা দিচ্ছে।'

'তিনি গবেষক, তাঁর হয়তো টাকার প্রয়োজন আছে,' বললেন ঝাঁঝর সিং। 'বুঝতে পারছি, অত্যন্ত ভদ্রভাবে তোমরা আমাকে একটা প্রস্তাব দিচ্ছ। অসংখ্য ধন্যবাদ, কিন্তু না, আমরা কিছুই চাই না।'

'কেন চাইব?' বারান্দায় বেরিয়ে এসে বললেন মিসেস সিং, হাতে ট্রে। 'আমাদের কি কম আছে?' হাসছেন বৃদ্ধা। তারপর হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, চেহারা ম্লান হয়ে গেল। 'দুঃখ শুধু একটাই, মিরাকলের স্মৃতি ভুলতে পারি না।'

চায়ের কাপে দু'একটা চুমুক দিয়েই শাকিলা বলল, 'এবার তাহলে আমাদেরকে উঠতে হয়।'

পায়ের কাছ থেকে বাক্সটা তুলল রানা। চেয়ার ছেড়ে মিসেস সিং-এর সামনে এসে দাঁড়াল। 'আপনার জন্যে আমার তরফ থেকে ছোট্ট একটা উপহার।'

'প্রিন্সেস হিয়া থেকে পাওয়া আর্ট ট্রেজার নয় তো?' জিজ্ঞেস করলেন বৃদ্ধা, অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন রানার দিকে। 'তা যদি হয়, নিলে চুরি করা হবে।'

'না, আর্ট ট্রেজার নয়,' বলল রানা।

বাক্সটা হাতে নিয়ে ঢাকনি খুললেন মিসেস সিং। ভেতরে, প্যাডের ওপর বসে রয়েছে ছোট্ট একটা ড্যাশান্ড কুকুর। 'ওমা, এ তো দেখছি আমার মিরাকল...মানে হুবহু প্রায় মিরাকলের মতই দেখতে!' আনন্দে তাঁর চোখ দুটো নেচে উঠল। তারপরই ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললেন বৃদ্ধা। কুকুরটাকে বুকে নিয়ে আদর করছেন। 'তুমি বাবা আমার কথা মনে রেখেছ? কি বলে যে ধন্যবাদ দেব...'

'আদর্শ একটা পরিবার, তাই না?' গাড়ি চালিয়ে এয়ারপোর্টের দিকে যাচ্ছে রানা, জিজ্ঞেস করল শাকিলা।

'যাকে তুমি ভালবাস, সে আর তুমি একসঙ্গে বুড়ো হতে পারলে জীবনের খুব বড় একটা সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু সবাই অতটা ভাগ্যবান নয়।'

রানার দিকে তাকিয়ে থাকল শাকিলা। 'তোমাকে কখনও আমার সেন্টিমেন্টাল বলে মনে হয়নি।'

'সবার জীবনেই বেদনা আছে,' বিড়বিড় করল রানা, ঠোঁটে নীরব হাসি।

সীটে হেলান দিয়ে উইন্ডশীল্ডের বাইরে তাকাল শাকিলা, রাস্তার দু'পাশে গাছপালা দেখছে। 'ইচ্ছে হচ্ছে এভাবেই পথ চলতে থাকি, ওয়াশিংটনে কোন দিন ফিরব না।'

'কে তোমাকে বাধা দিচ্ছে?'

'তুমি কি পাগল হলে? আইএনএস-এ কাজের পাহাড় জমে আছে আমার। নুমারও তোমাকে প্রয়োজন। দু'জনেই আমরা আগামী কয়েক হপ্তা এত ব্যস্ত থাকব যে ছুটির দিনেও হয়তো দেখা করতে পারব না।'

রানা কথা বলল না। হুইল থেকে একটা হাত তুলে জ্যাকেটের পকেটে ভরল, দুটো এনভেলাপ বের করে ধরিয়ে দিল শাকিলার হাতে।

'কি এগুলো?' জানতে চাইল শাকিলা।

'মেক্সিকোয় যাবার একজোড়া এয়ারলাইন টিকিট। তোমাকে বলতে ভুলে গেছি, আমরা ওয়াশিংটনে ফিরছি না।'

শাকিলার চিবুক ঝুলে পড়ল। 'তোমার পাগলামি প্রতি মিনিটে বাড়ছে।'

'মাঝে মধ্যে নিজেকেও আমি ভয় পাইয়ে দিই।' তারপর হাসল রানা। 'চিন্তা কোরো না। তোমার বসকে অনুরোধ করায় তিনি তোমার ছুটি মঞ্জুর করেছেন। দশ দিন। তোমার রিপোর্ট লেখালেখির কাজ আর আমার ট্রেজার ভাগ-বাঁটোয়ারের কাজ পরে করলেও চলবে।'

'কিন্তু আমি যে সঙ্গে করে কোন কাপড়চোপড়ই আনিনি!'

'তোমাকে আমি সম্পূর্ণ নতুন একটা ওয়ারড্রোব কিনে দেব।'

'কিন্তু মেক্সিকোয় আমরা কোথায় যাচ্ছি?' জানতে চাইল শাকিলা, হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। 'ওখানে গিয়ে আমরা করবই বা কি?'

'আমরা,' শব্দটার ওপর জোর দিল রানা, 'মাজাটলান সৈকতে শুয়ে থাকব, মার্গারিটা পান করব, আর কর্টেজ সাগরে সূর্যাস্ত দেখব।'

'মনে হচ্ছে খুবই আনন্দে কাটবে সময়টা,' রানার একটু কাছে সরে এল শাকিলা।

'আমারও তাই ধারণা,' বলল রানা, শাকিলার দিকে তাকিয়ে হাসল। 'বিশেষ করে আমি যখন নানাভাবে বিরক্ত করব তোমাকে।'

তাড়াতাড়ি সরে বসল শাকিলা। 'না, বাবা, তাহলে আমি যাব না।'

'ঠিক আছে, আমি তোমাকে বিরক্ত করব না,' বলল রানা। 'তবে তুমি বিরক্ত করলে আমি কিছু মনে করব না। রাজি?'

একটু চিন্তা করে মাথা ঝাঁকাল শাকিলা। 'হ্যাঁ, তাহলে হয়তো যাওয়া যায়।'

***